এই সংখ্যায় আদর্শ নাটক প্রকাশিত হইয়াছে।

আজ বৎসর দুই পূর্ব্বে যে আদর্শ নাটক অভিনয় করিয়া শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে বিমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, যে আদর্শের গানগুলি একবার শুনিলে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে দিবানিশি ঝঙ্কার দিতে থাকে, আমরা বহু পরিশ্রমে সেই আদর্শ নাটক সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে প্রকাশ করিতেছি। এই আদর্শ নাটক পড়িয়া, আলোচনা করিয়া জনসাধারণ হৃদয়কে উন্নত করিয়া তুলুন এইটুকু আমাদের অনুরোধ। এবারে কেবল প্রথম দৃশ্য প্রকাশিত হইল।

Tattwabodhini Patrika

462.

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৮৯৮ সংখ্যা | ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। — আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব”

ধিক্ বলং ক্ষাত্র বলং।

ভারতের পুরাণাদি যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই পুরাকালের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের মহাযুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন রাজা বিশ্বামিত্র নিজের বলদর্পে দর্পিত ধনৈশ্বর্য্যমদে মত্ত। তবু তাঁর মনের কথা এই যে তিনি যাহা কিছু চাহিবেন বা পাইতে ইচ্ছা করিবেন, চাহিবা-মাত্রই, ইচ্ছামাত্রই সেটী তাঁর পাওয়া চাই। বলা বাহুল্য এ বিষয়ের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, এবং সেই কারণে তাঁহার হৃদয়ে পরাজিতের একটা দুঃখ চিরজাগরূক ছিল। তাঁহার গর্ব্ব ও অহঙ্কার এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে প্রবাদ আছে যে তিনি ভগবানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান প্রভৃতি জড়ীয় জ্ঞানচর্চ্চায় বা culture বিষয়ে সম্ভবত তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এদিকে বশিষ্ঠ আপনার তেজে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধর্ম্মকে সহায় করিয়া নিজের কাজকর্ম্ম, পরের উপকার প্রভৃতি যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। গর্ব্ব অহঙ্কারের তিনি কোনই ধার ধারেন না। ন্যায় দয়া প্রভৃতি হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয়েন না। যাহা কিছু করেন, বা যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঈশ্বরেরই দান বলিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার সেই অবিচলিত ভগবদ্ভক্তির পুরস্কারস্বরূপে বলিতে গেলে তিনি একটী কামধেনু লাভ করিয়াছিলেন। সেই কামধেনুর নিকট চাহিলেই তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত তাহাই পাইতেন। কাজেই তাঁহার কোন বিষয়ে অন্যায় লোভ করিবার অবসরও ছিল না।

বশিষ্ঠের এই কামধেনুর গুণের পরিচয় পাইয়া বিশ্বামিত্র তাহাকে ছলেবলে কৌশলে যে কোন উপায়ে হউক হস্তগত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের কথা এই যে এমন একটী ধেনু তাঁহার ন্যায় রাজারই নিকটে থাকা কর্ত্তব্য, বনবাসী ফলাশী এক দরিদ্র ঋষির সেই ধেনুর উপর কোন অধিকার থাকা সঙ্গত নহে। ছলে কৌশলে সহজে যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট সেই ধেনুকে লাভ করিতে পারিলেন না, তখন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইবার অভিলাষে বশিষ্ঠকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজা, তাঁহার রাশি রাশি সৈন্য যথারীতি শিক্ষিত ও সমরাগ্নিতে দীক্ষিত। বশিষ্ঠের দলস্থ লোকেরা সেরূপ শিক্ষিত দীক্ষিত ছিল না। কাজেই ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষণার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও প্রথম প্রথম বশিষ্ঠ পদে-পদেই পরাজয় লাভ করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি অনন্যগতি হইয়া, যাহার জন্য সংগ্রাম ও বিরোধ, সেই কামধেনুরই শরণাগত হইলেন। তখন কামধেনুর প্রতাপে সেকালের প্রাচ্য জগতের প্রায় সকল জাতিই একে একে বশিষ্ঠের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিল। পরিণামে বিশ্বামিত্র পরাজয় স্বীকার

করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহার গর্ব্বদৃপ্ত হৃদয়ের অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বের রাজা বিশ্বামিত্র ভস্ম হইয়া গেলেন এবং এক নবতর ভক্ত বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ধূলি-লুণ্ঠিতমস্তক বিশ্বামিত্রের সমুদয় হৃদয় ভেদ করিয়া এমন এক তেজঃপূর্ণ মহাবাণী উদিত হইল, যাহা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র মানবজগতকে ধর্ম্মের পথে ভগবানের পথে দৃঢ় থাকিতে শিক্ষা দিতেছে। সেই মহাবাণী হইতেছে—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং—ক্ষাত্রবল বা জড়ীয় বলকে ধিক; ব্রহ্মতেজ যে বলের ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল।

শত সহস্র বৎসর পরে আমরাও আজ বর্ত্তমান মহাসমরে সেই বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রেরই মহাযুদ্ধের প্রতিরূপ দেখিতেছি। ইংরাজজাতি ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর আপনার সিংহাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে সমুদ্রের আধিপত্যরূপ একটী কামধেনু প্রদান করিয়াছেন। এই কামধেনুর সাহায্যে তাঁহারা সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই আপনাদের অভিলষিত বিষয় সকল লাভ করিতেছেন। এদিকে বিশ্বামিত্রের প্রতিরূপ জর্ম্মনগণ সাহিত্যে ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে খুবই উন্নত হইলেও এবং ব্যবসায়বাণিজ্যে বলিতে গেলে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে বসিলেও সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। জর্ম্মনেরা চায় যে তাহাদের ইচ্ছামাত্র সকল অভিলষিত বস্তু লাভ হয়; তাহারা পৃথিবীর প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব মনে করিয়া স্বজাতি ভিন্ন অপর সকল জাতিকেই ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে চাহে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল, জর্ম্মনি সহসা প্যারিস নগর অবরুদ্ধ করিয়া ফ্রান্সের পরাজয় সাধন করিবার পর অবধি অহঙ্কারের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিতে করিতে বর্ত্তমানে গর্ব্বের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছে। তাই এখন জর্ম্মনি ইংরাজের কামধেনু সেই সমুদ্রের আধিপত্য হরণ করিতে উদ্যত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরাজেরা ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই একে একে তাঁহাদের সপক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে ও হইতেছে। সেই ফ্রান্সকে পরাজিত করিবার পর অবধি আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া, ইংরাজের কামধেনু হরণের অভিপ্রায়ে জর্ম্মনি জড়ীয় বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছিল। জড়ীয় বিজ্ঞান তাহার সাধ্যমত বরদান করিয়াছে বটে, কিন্তু আশঙ্কা হয় যে সেই বিজ্ঞানই পরিশেষে জর্ম্মনির সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। আমরা কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যে পক্ষে ধর্ম্ম, যে পক্ষে নীতি, সেই পক্ষেই ভগবান এবং পরিণামে সেই পক্ষেরই নিশ্চিত জয়।

বর্ত্তমান মহাসমর ও তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্য-কলাপ যাঁহারা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই নিশ্চয় উপলব্ধি করিতেছেন যে, যে পক্ষেরই জয় হউক না কেন, জড়ীয় বিজ্ঞানের উন্মাদ তাণ্ডবনৃত্য ভেদ করিয়া, সমুদয় আকাশ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া, সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে আচ্ছাদিত করিয়া পুরাকালের সেই বিশ্বামিত্রের মুখসমীরিত ক্রন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং—ক্ষাত্রবলকে ধিক, ব্রহ্মতেজই যাহার ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল।

আত্মার শান্ত তেজই যে পরিণামে সমস্ত জগত জয় করিবে একথা কে অস্বীকার করিবে? মানুষ জড়বিজ্ঞানে সহস্র উন্নত হইলেও তাহার অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং যে প্রজ্ঞানবীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছেন, জড়বিজ্ঞান সেই প্রজ্ঞানবীজের ধ্বংস সাধন করিতে পারে না। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণে জড়বিজ্ঞানকে আপাতত মহাশক্তিশালী এবং প্রজ্ঞানবীজকে আপাতত একটী সর্ষপবীজের ন্যায় দেখিতে হইলেও কালক্রমে সেই প্রজ্ঞানবীজই যে জড়বিজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহের আকার ধারণ করে তাহা আমরা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি। পৃথিবীর কত অংশ যে ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে, কিন্তু সেই সকল বিপ্লবতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানবীজ সকল কেমন আশ্চর্য্যরূপে ভাসিয়া আসিয়াছে। এই যে একটী প্রজ্ঞানকথা যে আত্মা অবিনশ্বর, তাহার ধ্বংস নাই বিনাশ নাই মৃত্যু নাই—ইহা কোন্ সুদূর অতীতে মানবহৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছিল। তাহার পর কতবার এই সত্য জড়-

বিজ্ঞানের ধূলিরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে শত বিপ্লবরাশি জড়বিজ্ঞানের সহস্র তর্কজাল ভেদ করিয়া বেদবেদান্তের সময়ে কেমন আশ্চর্য্যরূপে তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদিগের ধর্ম্মে আত্মার অবিনশ্বরত্ব দৃঢ়রূপে প্রচারিত হইলেও, পাশ্চাত্যগণ সে কথা মুখে স্বীকার করিলেও, তাহাদিগের হৃদয়কে ধনৈশ্বর্য্যের মোহমদিরা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই যে জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনৈশ্বর্য্য লাভ হয়, প্রজ্ঞানকে ছাড়িয়া দিয়া সেই জড়বিজ্ঞানেরই চর্চ্চায় পাশ্চাত্যগণ বড় বেশী আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে। তাহারই ফলে বর্ত্তমান মহাসমরের ঘূর্ণাবায়ু সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই মহাহবের অগ্নির ভিতর দিয়া, হতাহত সৈনিকগণের নানা উক্তি ও কার্য্যের মধ্য দিয়া সেই প্রজ্ঞান-প্রচারিত সত্য—আত্মার অবিনশ্বরত্ব—যেন আরও স্পষ্টতর রূপে দেখা দিতেছে। সেই সঙ্গে ন্যায় ধর্ম্ম প্রভৃতির অবিনশ্বর ভাবসকলও যেন সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

ব্রহ্মতেজই যাহার ভিত্তি সেই প্রজ্ঞানবল যে জয়লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই, যখন দেখি যে অন্তত মহাযুদ্ধের এক পক্ষও ঘোষণা করিতেছেন যে তাঁহারা পরের ধন কাড়িয়া নিজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নহে, অন্যের সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে নহে, কিন্তু সত্যরক্ষার জন্য, নীতিরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য বর্ত্তমান সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যুগে স্বার্থের কথা, জড়বিজ্ঞানের মোহ মানবহৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিতেছিল, সে যুগে একথা, নবতর ভাবের কি সুগম্ভীর কথা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া আসে—হৃদয় হইতে স্বতই বিশ্বামিত্রের সেই মহাবাণী বাহির হয়—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং।

এই যে মহাবাণীর ধ্বনিতে আজ দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এই যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট উইলসন বর্ত্তমান সমরে নামিবার পূর্ব্বে ন্যায়, ব্যক্তিগত অধিকার প্রভৃতি উচ্চতম নীতিসমূহের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, কে বলিতে পারে যে তাহাতে মহাধর্ম্মসঙ্ঘ প্রভৃতির সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের পবিত্র প্রভাবের নির্দ্দেশ দেখা যায় না? পরলোকগত শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভারতবাসীই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ও তদানুষঙ্গিক শান্তিপ্রবর্ত্তক অন্যান্য ভাবসকলের বীজ গভীররূপে বসাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যতই আলোচনা করি, ততই মনে হয় যে জগতকে মূল সত্যতত্ত্বসমূহে শিক্ষাদীক্ষা দিবার জন্য ভগবান যেন প্রাচ্যভূখণ্ডকে, বিশেষত প্রাচীনতম সভ্যতার উচ্চতম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই ভারতবর্ষকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষও যেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ নহে।

ভারতবর্ষ তো জগতের চিরন্তন শিক্ষাগুরু, বর্ত্তমান যুগেই বা ভারতবর্ষ সেই শিক্ষাগুরুর দায়িত্ব গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবে কেন? যদি আমরা দেশের উপযুক্ত সন্তান হই এবং ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহি, তবে আমাদের এক নিমেষও আলস্যে কাটাইলে চলিবে না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, প্রত্যেক ভারতবাসীকে চিন্তায়, কথায় এবং কার্য্যে দেখাইতে হইবে যে ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষাগুরু হইবার উপযুক্ত। আমাদের প্রত্যেককে ভগবৎপ্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ শ্রেষ্ঠতম উপাসনাকে জীবনের প্রতি নিশ্বাসে জীবন্ত মূর্ত্তি প্রদান করিতে হইবে। এই যুগসন্ধিক্ষণে, এই নবযুগের প্রারম্ভে আমাদের মধ্যে যে কেহ যে পরিমাণে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইবেন, তিনি সেই পরিমাণেই দেশের অমঙ্গলের জন্য, জগতের লোকক্ষয়ের জন্য দায়ী হইবেন, এটা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

জগতের শিক্ষাগুরুর গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে ভারতবর্ষকে চিরঅধিষ্ঠিত রাখিতে চাহিলে ভারতের প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমি অহমিকামূলক ব্রাহ্মণ্যের কথা এখানে বলিতেছি না। যে ব্রাহ্মণ্যের ফলে সমগ্র ভারতের অধিবাসী এক সময়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করাকে শ্রেষ্ঠতম অধিকার

বলিয়া মনে করিত, সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ্যকে আমাদের জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ক্ষাত্রবলের উপর যাহার ভিত্তি সেই পার্থিব সুখসম্পদকে তুচ্ছ করিতে হইবে এবং ব্রহ্মতেজের উপর যাহার ভিত্তি, সত্যধর্ম্ম যাহার মূল, সে-ই ব্রাহ্মণ্যকে প্রত্যেক ভারতবাসীর অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণ্য কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক কার্য্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব পরিচয় পাইয়া, এই ব্রাহ্মণ্য কাহাকেও নীচ বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে না; প্রত্যুত, যথাসাধ্য স্বীয় শক্তি-প্রয়োগে প্রত্যেককে ব্রহ্মের পথে অগ্রসর করিবার বিষয়ে, উন্নতির পথে প্রত্যেকের অভিব্যক্তিসাধনে সহায়তা করে। এই ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাই আমরা বৈদিকপূর্ব্ব যুগের জাবালি মুনিতে। জাবালির উপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে জাবালির গুরু তাঁহার সরলতার কারণেই কিরূপে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাই সেই ব্রাহ্মণে, যিনি গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ধনরাশির প্রলোভনেও প্রলুব্ধ না হইয়া তাঁহাকে পৃথিবীর সুখসম্পদের তুচ্ছভাব প্রত্যক্ষ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবলি যে ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মণ্যের পরিচয় পাই তাহা নহে। রুষিয়াতেও এই ব্রাহ্মণ্যের জীবন্তমূর্ত্তি কাউণ্ট টলষ্টয়ের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহার মূলমন্ত্র ছিল অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিতে হইবে।

জগদ্‌গুরুর দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আমরা যখন সংসারে দাঁড়াইতে চাহি, তখন আর আমাদিগের পিছাইলে চলিবে না—পিছাইবার উপায়ও নাই। ভগবানের মঙ্গলরাজ্যে এমনই নিয়ম যে, যাহার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়, সে সে-কাজ সহজে স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারে না—নামাইতে গেলে ঘাতপ্রতিঘাতের মহাবিপ্লব সহ্য করিতে হয়। যে দায়িত্ব আমরা লইয়াছি, অথবা আমাদের মস্তকে ভগবান দিয়াছেন, সে দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে না পারিলে আমাদের রক্ষা নাই। আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে, প্রত্যেকের পরিবারকে, প্রত্যেকের সমাজকে, প্রত্যেকের দেশকে এই দায়িত্ব সম্পন্ন করিবার এক একটী অপরিহার্য্য সহায় বলিয়া জানিতে হইবে। একাকী আমা দ্বারা এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব। অথচ সে কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে। কাজেই আমার নিজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, সমাজ ও দেশকে উন্নত করিতে হইবে। যে ব্রহ্মনামের দুন্দুভি একবার বাজিয়া উঠিলে দেশবিদেশের লোক সচকিত হইয়া উঠে, সেই ব্রহ্মকে এবং তিনি যে ধর্ম্মকে আমাদের হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন সেই সত্যধর্ম্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া যেমন আমাদের নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, সেইরূপ পরিবারেরও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; সমাজকে সুসংস্কৃত করিয়া অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের পথ সকল রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে; দেশ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথে চলিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। কোন কাজ করিলে আমার নিজের স্বার্থহানি হইবে অর্থাৎ আমার পার্থিব সুখসম্পদ লাভে আঘাত পড়িবে, এ কথা ক্ষণেকের তরেও মনে স্থান দিব না। স্বার্থের খাতিরে যদি আমরা আমাদের গৌরবমণ্ডিত উচ্চ আসন ছাড়িয়া দিই, তবে আমরা তো ভীষণ আঘাত পাইব, কিন্তু ইহাও স্থির যে, আমাদের চিরন্তন আসন অন্যের অধিকারে চলিয়া যাইবে।

গত বৎসরে আমাদের দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক বিষয়ে দেশ অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে আমাদের আরও অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের যে রাজন্যবর্গ পরস্পরের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাঁহারা যে মিলিয়া মিশিয়া দেশের ভালমন্দ আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা একটী আশ্চর্য্য শুভ লক্ষণ। এই যুদ্ধের কারণে প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতি অনুরাগ সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে প্রত্যেকের আত্মনির্ভরের ভাব অল্পবিস্তর জাগিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সমধিক জাগ্রত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা এখন অনেকটা উন্নতিকামী সমাজের অন্যতর স্বাভাবিক অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে নাই, অত্যাচার করিলেই তাহার প্রতিঘাতে সমানুপাত বিপ্লব উপস্থিত হয়,ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

আমাদের কর্ত্তব্য, রাজন্যবর্গকে নানা উপায়ে সমবেতভাবে দেশের উন্নতি করিবার জন্য উৎসাহিত করা। আমাদের কর্ত্তব্য দেশের প্রত্যেক লোককে আত্মনির্ভরে দীক্ষিত করা—বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে অনুরক্ত থাকিতে শিখাইলেই আত্মনির্ভর খুবই সহজ হইয়া আসিবে। সকল প্রকার শিক্ষাই যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং শিক্ষার প্রভাবে সকলেই যাহাতে উন্নত হয় তাহার উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে।

এইরূপ করিতে পারিব কখন্? যখন আমরা নিজেরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য অবলম্বন করিয়া, নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করিয়া পার্থিব সুখসম্ভোগকে পদাঘাত করিতে পারিব এবং হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব—ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং। তখনই আমাদের ভারতবাসী এবং ঋষিদের বংশধর হওয়া সার্থক হইবে।

অপেক্ষায়।

জীবনের লতা গিয়াছে শুকায়ে
পাতাগুলি গেছে ঝরে একে একে।
শুধু আছে ডাল শ্মশানের মাঝে
সাক্ষী দাঁড়াইয়া অষ্ট অঙ্গে বেঁকে॥
মরমের পরে বহেনাকো আর
মৃদুল হিল্লোলে বসন্তের বায়।
ফোটেনাকো আর কুসুম সুগন্ধ
গন্ধ মধু নাহি প্রাণেরে জুড়ায়॥
কোথায় বা আর বনের সে হাসি,
প্রভাতের সেই লুকোচুরি খেলা?
সন্ধ্যা সমীরণে নব ভাব আর
করে না আঘাত হৃদয়ের বেলা॥
মরণের শ্বাস লেগে আছে যেন
গায়ে গায়ে গায়ে—আনন্দকল্লোল
কোথারে লুকাল—অপেখিয়া আছি
কবে পাব মা'র শীতল সে কোল॥

জ্ঞান ও চিন্তা।

(শ্রীমতী প্রতিভা দেবী)

ভাল চিন্তা হৃদয়কে অধিকার না করিলে ভাল হইবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। চিন্তার ভাল মন্দ গতি আমাদের আচার ব্যবহারের গতি নিয়মিত করে। চিন্তা সংযত না হইলে আমাদের স্বভাব যথেচ্ছাচারী ও শিথিল হইয়া পড়ে। কিন্তু কাহার চালনায় এই চিন্তাকে আমরা সংযত করিতে পারি, কুপথ হইতে ফিরাইয়া লইতে পারি? সে সারথি কে? সে আর কেহ নয়—জ্ঞান। চিন্তাকে সুপথে চালনা করিবার জন্য আমাদের জ্ঞানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরকে সকল চিন্তার কেন্দ্রস্থলে রাখিলে আমাদের সমস্ত চিন্তাই নিয়মিত হইয়া চলিতে থাকিবে। তাহাতে আমাদের কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না। চিন্তা কেন্দ্রভ্রষ্ট হইলে আমাদের ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া যাইবার ভয়। চিন্তার ভিত্তি জ্ঞানে স্থাপিত হইলে তাহাতে ধর্ম্মরূপ মহা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া মানবসমাজকে পরম সুখের করিয়া তুলে। জ্ঞানরূপ বীজে সুচিন্তা অঙ্কুরিত লইলে উহা ক্রমে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া জগতে সুফল প্রদান করিবে। চিন্তা জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে আমাদের জীবন যে কত ভয়সঙ্কুল হয় তাহা কে বলিবে? কত ঝড় ঝটিকা আসিয়া তখন আমাদিগকে বিধ্বস্ত করিবে, আমাদের চিত্ত কত না বিপদে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে!

জ্ঞানের দ্বারা চিন্তাকে সংযত করাই মনুষ্যের বিশেষত্ব। ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ এইখানে। ইতর প্রাণীরা মানুষের মত জ্ঞান দ্বারা চিন্তাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। মানুষের মত ইতর প্রাণীর জ্ঞানের বিকাশ হয় না। তাই মানবের ন্যায় তাহাদের অন্তরে চিন্তা কার্য্য করিতে পারে না। চিন্তার শক্তি বড় কম নয়। ইহা আমাদের মনকে কত না ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। চিন্তার সাহায্যে আমরা কত কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করি; কত ভাঙ্গন, কত গড়ন, চিন্তা দ্বারা সাধিত হয়। কত যুক্তি, কত কল্পনা, কত ভাবান্তর, আনয়ন করিয়া চিন্তা আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। চিন্তাকে শাসন করিতে হইলে জ্ঞানের [illegible] লাগাম দিতে

হয়। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা সংযত হইলে তখন উহা প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। চিন্তার প্রশান্ত ভাব ধ্যান। চিন্তা ধ্যানে পরিণত হইলে তখন উহা দ্বারা আমরা আনন্দ-লোকে উপনীত হই। চিন্তার গতি সুপথে চালিত হইলে আমরা অমৃতের পথে সহজেই আসিতে পারি।

চিন্তাকে মন্দ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য পূর্ণ-জ্ঞান ভগবানকে আমাদের সারথি করিতে হইবে। তাঁহার হস্তে সমস্ত চিন্তার ভার অর্পণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব। চিন্তাকে ভগবানের অধীন করিলেই আমরা আরামে গম্যস্থানে যাইতে সক্ষম হইব, আমাদের সকল ভয় তিরোহিত হইয়া যাইবে। আমরা স্বেচ্ছায় চিন্তা সুপথে চালনা না করিলে দণ্ডের কশাঘাতে সুপথে ফিরিতেই হইবে। চিন্তা যেন আমাদিগকে গহন বনের কণ্টকিত পথে লইয়া না যায়। আমরা চিন্তার দ্বারা যেন স্বেচ্ছাচারিতার পথে না যাই। তাঁহার যে পথ তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতার পথ, মুক্তির পথ। সেই পথে যাইতেই আরাম। তিনি রাশ ধরিয়া থাকিলে জ্ঞান, প্রেম, শান্তি, সৌভাগ্য, সকলই সহজায়ত্ত হয়। তাঁহার বিচ্ছেদে আমরা এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারি না। তিনি রাশ ছাড়িয়া দিলে আমরা ভগ্ন, চূর্ণ হইয়া কোন্ অন্ধকারে যে নিপতিত হইব তাহা কে বলিতে পারে? সেই রাজরাজেশ্বরকে কর্ণধার করিয়া জীবন-তরী ভাসাইয়া দাও তাহা হইলে সংসার-স্রোতে অক্লেশে বাহিয়া যাইতে পারিবে। যদি সংসারে শক্তি চাও তো তাঁহার মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। সেই শক্তিই তোমাকে উদ্ধার করিবে, তাঁহারই বলই তোমাকে বলবান করিবে। নিজের চিন্তার জঞ্জালে আপনাকে জড়াইও না। তাঁহার চরণ ধরিয়া থাক। তাহা হইলেই শান্তি, মুক্তি, সকলই করতল-ন্যস্ত হইবে, তাহা না হইলে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিবে।

যথেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা এক কথা নয়। যথেচ্ছাচারিতা আমাদিগকে অন্ধতম নরকে লইয়া যায়, আর স্বাধীনতা মুক্ত গগনে বিচরণের জন্য আমাদিগকে উন্নত-লোকে লইয়া যায়। স্বাধীন-তাতেই আমাদের মুক্তি। স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য ভগবান। ভগবানের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

সেই স্বাধীন মুক্তিরাজ্যের আনন্দময়কে প্রাপ্ত হওয়াতে আমাদের অন্তরে কত আনন্দধারা না প্রবাহিত হইতেছে। যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন যে আমরা কত সুখী। তিনিই তাঁহার সঙ্গে আমাদের চিন্তা যুক্ত করিবার ক্ষমতা দিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অসৎচিন্তা দূর কর। সরলতা ও পবিত্রতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার কাছে দাঁড়াও, তাহা হইলে ভগবানের সুদৃষ্টি তোমার উপর পড়িবে। তাঁহার কৃপা-বারি বর্ষিত হইলে তোমার পাপতাপ সকলি বিধৌত হইয়া যাইবে। পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অনুশোচনা কর। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান কর তিনি তোমার অশ্রু মুছাইয়া দিবেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। সেই সত্যস্বরূপকে অবলম্বন করিলে নির্ভয়ে সকল দিকে চলাফেরা যায়। তিনি অনাদি ও অনন্ত, পূর্ণ পুরুষ। তাঁহার দয়া অসীম। তাঁহার অপার করুণা সকলের জন্য রহিয়াছে। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে অম্লানবদনে সন্তোষের সহিত তাঁহার প্রতিদিনের দান গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সকল ঋতু, সকল দিন, সকল মুহূর্ত্ত জীবের মঙ্গলস্বরূপ যাহা কিছু দিবেন তাহাই আমাদের শ্রেয়স্কর জানিয়া হাত পাতিয়া লইবে। আমাদের মত দুর্ব্বল প্রাণীকে তিনি কখনই বিস্মৃত হয়েন না। সর্ব্বদা ভাল চিন্তাকে মনে স্থান দিও। ভক্তিভাবকে মনে জাগাইয়া তোল। ঈশ্বরের পূজায় মনকে নিযুক্ত রাখ। তাহা হইলে ক্রমেই তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। চিন্তাকে ধর্ম্মের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, নিয়মিত কর। তাহা হইলে তোমার বাক্য ও কার্য্য সকলি সুপথে চালিত হইবে। সংযম ও পূজা আরাধনার দ্বারা চিন্তাকে সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে লইয়া যাও, দেখিবে মুক্তির অভয়পদ তোমার সম্মুখে। তখন স্বর্গ-রাজ্য তোমার হৃদয়ে অনুভূত হইবে। ভগবানের প্রীতির সুরে চিন্তার তন্ত্রী বাঁধিয়া জীবন-বীণা বাজাও, তাহা হইলে তোমার নিরানন্দ প্রাণ আনন্দ-ময় হইয়া উঠিবে।*

* আনন্দ সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত ও বিবৃত।

নববর্ষে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

নূতন করে নে' তোরে—
চির নূতনেরি মাঝে।
জাগে রবি প্রভাত হ'তে
নূতন আলোর অগাধ স্রোতে
নূতন গীতি গাহে বিহগ
ধরা নূতনতায় সাজে!
শিশির-সজল দুর্ব্বাদলে
দে'রে দে' তোর হৃদয় মেলে!
নূতন দিনের নূতন ফুলে
যেন রে তোর হৃদয় খুলে,
হাওয়ার দোলায় যেন দোলে,
প্রাণে কলগীতি বাজে!
এই যে চিরনবীনতায়
ভরে' নে তোর সকল হৃদয়।
চিরদিন এই স্থলে জলে
তারায় তারায় ফুলে ফলে
উৎসারিত যে প্রাণ, যে গান
জাগ্ রে (তুই) তারি মাঝে॥

দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার।

(শ্রীসত্যানন্দ দাস)

আমরা এখনও আলস-বালিশে মাথা দিয়া বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছি—আমাদিগকে ধিক। আমাদের চারিদিকে মহাসর্ব্বনাশকর প্রথাসমূহ আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও যে আমরা অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতেছি—আমাদিগকে শত ধিক। কোন্‌টাকে ছাড়িয়া কোন্‌টার কথা যে বলিব তাহা খুঁজিয়াই পাই না। এই যে পাপোদ্দেশ্যে বালিকা পোষণরূপ ভীষণ ব্যবসায় আমাদের চারিদিকে অব্যাহতভাবে চলিয়াছে—এ বিষয়ে তো বলিতে গেলে আমরা কোনই আন্দোলন করিতেছি না। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার পুলিস পরীক্ষা করিতেছিল যে ফৌজদারী দণ্ডবিধির সাহায্যে এই ব্যবসা বন্ধ করা যাইতে পারে কি না। এখন বলিতে গেলে সেই পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়া গিয়াছে যে এই ব্যবসায় বন্ধ করা যায়। এবিষয়ে বিশেষভাবে আন্দোলন করিবার ইহাই তো অবসর। সংবাদপত্রে এবিষয়ে যে যৎসামান্য আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি নাই। কেন যে এবিষয় লইয়া আরও তীব্র ও বিস্তৃত আন্দোলন হয় না, তাহার কারণ আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এবিষয়ের আন্দোলনে দেশমধ্যে এখনও যে সে-রকম একটা সাড়া পড়িয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য হই বা কেন? আমাদের বুদ্ধি অনেকটা মেষপালের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এমন বিপদের মধ্যেও বাস করিয়া আমরা নিজেরা চক্ষু বুজিয়াই আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করি। এই ভীষণ ব্যবসায়ের ফলে ভীষণ পাপসমূহ ও তদনুসঙ্গী ভীষণতম রোগবীজসমূহ সমাজের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত সমাজকে যে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে, তবু আমাদের সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না—আমাদিগকে শত ধিক।

এই মহা অমঙ্গলের প্রতিবিধানে আমরা নীরব কেন? কেন আমরা এবিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতেছি না? বাহিরে বাহিরে দেখিয়া ইহার কারণের সন্ধান করিতে না পারিলেও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে একটী সন্দেহ মনের ভিতর জাগিয়া উঠে—বুঝি বা আমরা অন্তরে এই ব্যবসায়কে প্রশ্রয় দিবার ইচ্ছা পোষণ করি, বুঝি বা সেই অন্তঃসলিল ইচ্ছাই আমাদিগকে ইহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতে দিতেছে না। বর্ত্তমানে আমাদের সংযমের বড়ই অভাব হইয়াছে, তাই আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে অনেক সময়ে নানাভাবে তাহার সমর্থনে অগ্রসর হই।

ইহার ফলে দুঃসাধ্য ভীষণ ভীষণ রোগের বীজ সকল এক ব্যক্তি হইতে শত ব্যক্তির শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইতে সমাজশরীরকে একেবারে রোগজর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা বলি ম্যালেরিয়াতে দেশ গেল, কলেরাতে দেশ গেল। ইহা কতকাংশে সত্য বটে। কিন্তু আমরা কেন এই ম্যালেরিয়া প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি না, সে বিষয়ে একটীবারও ধীরভাবে ভাবিয়া দেখি কি না সন্দেহ। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিষয়ে উপর উপর আমরা অনেক আলোচনা জল্পনা

করি বটে, কিন্তু আমরা মূল ধরিয়া আলোচনা করিতে সাহস করি না। মূল ধরিয়া আলোচনা করিলেই আমাদের ঘাঁতে ঘা লাগিবে, আমাদিগকে সংযম অভ্যাসের সপক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। তাই ম্যালেরিয়া হইতে আত্মরক্ষার আলোচনাকালে সংযম অভ্যাস প্রভৃতির কথাকে একটা বাজে কথা ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা অনেকেই উপহাসের দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহি। তাহাই কি ঠিক? ম্যালেরিয়া কলেরা আজও আছে এবং চিরকালই ছিল। কিন্তু ঐ সকল রোগের বিষকে দেহ হইতে এবং নিজেদের বাসস্থান হইতে তাড়াইবার জন্য যে উদ্যম, যে শক্তিব্যবহার আবশ্যক, পুরাকালে ভারতবাসীর সে উদ্যম সে শক্তিব্যবহার ছিল। আজ আমাদের বংশানুক্রমে সংযম হারাইবার ফলে আমরা সে উদ্যম ও শক্তিব্যবহারের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়াছি বলিয়াই ঐ সকল রোগের জ্বালায় আমরা সহজেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হই। জাপানের কাউণ্ট ওকুমা তাঁহার একটী বক্তৃতায় অতিবড় এক সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পচ ধরিবার ফলে কাঠ প্রভৃতি জীর্ণ হইয়া গেলে তবে তাহাতে শতাবিধ কীট বাসা বাঁধিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদেরও শরীরমনকে ম্যালেরিয়া কলেরা অপেক্ষা ভীষণতর রোগবীজসকল বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, তাই সেই ম্যালেরিয়া প্রভৃতিকে নির্ব্বাসিত করিবার উপযুক্ত উদ্যম ও শক্তি সকলই হারাইয়া বসিয়াছি। সেই ভীষণতর রোগের বিষে আমাদের সমাজশরীর একেবারে পচিয়া গিয়াছে, তাই কথায় কথায় নানা রোগ শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে।

আমাদের সমাজে পচ ধরিবার অন্যতর প্রধান কারণ দুর্নীতি। দুর্নীতির ফলে যখন ছেলেদের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধুভাব সকল শিথিল হইয়া যায়, তখন তাহাদের প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কোন প্রকার কুণ্ঠা আসে না। গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয়বিধ দুর্নীতিই আমাদের সমাজদেহকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে। এই দুর্নীতি আমাদের সমাজশরীরের যক্ষ্মারোগ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যক্ষ্মারোগে যেমন রোগী নিজের ক্ষয় বুঝিতে পারে না, দুর্নীতিও তেমনি সমাজকে বুঝিতে দেয় না যে তাহার শরীরে ঘুণ ধরিয়াছে। প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয়বিধ দুর্নীতি পরস্পরের সাহায্যে বিস্তৃত হইবার ফলে আমাদের সমাজ ক্রমশই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ইহা আমরা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এই যে প্রতি বৎসর ভারতে ছোট ছোট বালক বালিকার বিবাহ দেওয়া হইতেছে, ইহাতে একেতো সেই বালকবালিকাদিগকে কিলাইয়া অকালপক্ক করিয়া তোলা হইতেছে। তাহার উপর, এই সকল বিবাহে প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া একটী প্রথাতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় যে বিবাহোৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ বাইনাচ।* যাঁহারা এ বিষয়ে কোন সংবাদ রাখেন, তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে বাইনাচ যতই জমাট বাঁধিতে থাকে, ততই তাহাতে গান ও ভাবের অশ্লীলতাও প্রগাঢ়তা লাভ করিতে থাকে। প্রকাশ্যভাবে এইরূপ দুর্নীতির সমর্থনের ফলে ভারতের অনেক অঞ্চলেই ধনীদিগের বারবনিতা পোষণ করা একটা সম্মানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি, অনেকস্থলে মহিলাগণও শিক্ষার দোষে এই প্রথা সমর্থন করেন দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভাব অনেকটা কমিয়া গেলেও সম্পূর্ণ যে চলিয়া গিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। বঙ্গদেশও এই কুপ্রথার হস্ত সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

বঙ্গদেশ আবার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী দুর্ব্বল কি না, তাই এই দুর্ব্বলতর দেশে বাইনাচ অপেক্ষা অশ্লীলতর কার্য্য বিবাহোৎসবের অঙ্গস্বরূপে একটী প্রথাতে দাঁড়াইয়াছে। সেই প্রথা হইতেছে খেমটানাচ। যে পরিবার প্রধানত অর্থ বিষয়ে একটু ধনী মানী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে চাহেন, প্রায় সেই পরিবারেই প্রধানত ফুলশয্যার রাত্রে এই খেমটানাচের বিষবীজ ছড়ানো হইয়া থাকে। যাঁহারা এই নাচ কখনও দেখিয়াছেন, তাহার আনুষঙ্গিক গান শুনিয়াছেন এবং নর্ত্তকীদিগের হাবভাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই

* সামাজিক দুর্নীতির কথা ব্যক্ত করিতে গেলে দুই চারটী অভদ্র শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, আশা করি তজ্জন্য পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

এই নাচের অশ্লীলতার গভীরতা বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে প্রায়ই ছোট ছোট বালকবালিকার বিবাহ হয় বলিয়া বিবাহ উপলক্ষে বরকন্যার সমবয়সীদেরই মধ্যে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ধুম পড়িয়া যায়। ফুলশয্যার রাত্রে আবার সমবয়সী মেয়েদেরই সমাগম অত্যন্ত বেশী হয়। বরকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই সকল ছোট ছোট বালক বালিকারা নর্ত্তকীদের গান, নৃত্য ও হাবভাব একেবারে গিলিতে থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন, দুর্নীতির বিষবীজ তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে কি প্রকার স্থায়িত্ব লাভ করে, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? সেই সকল বালক বালিকাগণকে চিরজীবনের সর্ব্বনাশের পথে তাহাদের পিতামাতা আমরাই তো বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছি। তাহারা যখন দেখে যে তাহাদের গুরুজনেরা এই সকল দুর্নীতিময় কার্য্যকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করেন, তখনই তাহাদের ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সেই সকল কার্য্যের কায়মনোবাক্যে সমর্থন করা ভাল হউক বা না হউক, অন্তত অন্যায় হইতে পারে না।

আজকাল অবশ্য অনেক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষ বাইনাচ খেমটানাচ প্রভৃতির অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কোন উৎসবে তাহার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা না করিলেই বা কি আসে যায়? বাড়ীর মেয়েরা যে তাহা চাহেন। কাজেই অনেক পরিবারের দুর্ব্বলচিত্ত কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধের চাপে মনের ইচ্ছা না থাকিলেও অনেক সময়ে কার্য্যে সেই সকল কুপ্রথা সমর্থন করিতে বাধ্য হয়েন। বাড়ীর মেয়েদের মতে সেগুলি বিবাহোৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিক্ষার অভাবে তাঁহারা একদিকে ঐ সকল কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতেই পারেন না, অপরদিকে ভাবেন যে ঐ সকল কুপ্রথা ছাঁটিয়া ফেলিলে বিবাহের অঙ্গহানি হইবে। ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে—ইহা আমার প্রত্যক্ষ।

এই সকল কুপ্রথা প্রধানত সমাজের এক অংশের—ধনীসম্প্রদায়ের—অবলম্বিত হইলেও দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাহার কুফল দুর্নীতি ও তদনুষঙ্গী রোগসমূহ সমগ্র সমাজকে অকালে জরাজীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ইহার প্রভাব কি প্রকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, একটী ঘটনাতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের দেহে কোন-না কোন আকারে যক্ষ্মারোগের ভাব দেখা গিয়াছে। শতকরা ১০০ জনের দেহে কেন যে তাহা দেখা যায় নাই তাহাই আশ্চর্য্য। অধুনাতন চিকিৎসকগণ এবং বিদ্যালয়সংক্রান্ত কমিশনরগণ ইহার উপরিস্থ কারণসমূহ আবিষ্কার করিবেন এবং তৎপ্রতীকারক নানা উপায় অবলম্বন করিবেন বটে। তাহার ফলে রোগের বৃদ্ধি ও প্রসার উপকরণ অভাবে কতকটা নিবারিত হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে রোগের বিনাশ হইবে না। স্কুলের ছেলেদের রোগের প্রধান কারণই হইল বাল্যকালের গুপ্ত দুর্নীতি। একেতো তাহাদের দেহ বংশানুক্রমে ভীষণতম রোগবীজের সংস্পর্শে অপটু হইয়া রহিয়াছে, কাজেই তাহা ম্যালেরিয়া ও কুইনাইনের নিত্য বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর, স্কুলের ছেলেদের ভিতরকার খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন যে গুপ্ত দুর্নীতির নিকট আত্মসমর্পণই তাহাদের দেহে যক্ষ্মাবীজের অস্তিত্বের অন্যতর কারণ না হইয়া যাইতে পারে না। এই দুর্নীতি যে সামাজিক কুপ্রথার ফলে ছেলেদের ভিতর সংক্রামিত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে।

এখন, আমরা যদি আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, পরিবারকে এবং ভবিষ্যৎ বংশকে এই মহা সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তবে, যেমন আর্থিক উন্নতিসাধনের জন্য একদিকে আয় বৃদ্ধি, অপরদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, সেই প্রকার এ বিষয়েও আমাদের একদিকে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, অপরদিকে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টকর ভাব আসিবার সম্ভাবনাও যথাসাধ্য প্রতিরুদ্ধ করিতে হইবে। একদিকে শরীর, মন ও আত্মার স্বাস্থ্যবিধায়ক নিয়মসমূহ পালন করিতে হইবে, অপরদিকে দুর্নীতি-সমর্থক সকল বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

ঈশ্বরের নিয়ম এই যে আমরা আমাদের দেহমনের স্বাস্থ্যবিধানের একটুও চেষ্টা করিলেই সমস্ত প্রকৃতিই সে বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিতে উদ্যত হয়।

বালকবালিকা-নির্ব্বিশেষে সন্তানগণকে ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষা দিলে তবে তাহারা দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম করিবার একটা বল পাইবে। ইহাই ভারতের মনুপ্রমুখ ঋষিদের আদিষ্ট শিক্ষাপথ। তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে ভারতের দুরদৃষ্টবশত এক শ্রেণীর লোক ব্রহ্মচর্য্যের মূলোচ্ছেদক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন এবং নানা উপায়ে করিতে বসিয়াছেন। তাঁহারা কলাকৌশলের দোহাই দিয়া বাইনাচ প্রভৃতির সমর্থন করেন এবং তাঁহাদের লিখিত নানা প্রসঙ্গে মানবের নীচভাবের ও তজ্জনিত মন্দ কার্য্যের স্পষ্ট চিত্র দিয়া অধঃপতিত দেশকে আরও অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়া চলেন। তাঁহাদের মতে এই সকল বিষয়ের এ প্রকার স্পষ্ট চিত্র realistic art বা প্রত্যক্ষব্যঞ্জক কলাকৌশল। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, সকল বিষয় হইতে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলাই হইল কলাকৌশল। প্রত্যক্ষ মাত্রই ব্যক্ত করা যদি কলাকৌশল হয়, তবে চুরি ডাকাতি ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় কুক্রিয়ার কিছুমাত্র গোপন না রাখিয়া অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চিত্র দেওয়াকেও কলাকৌশল বলিতে হয়। কি ভয়ানক কথা—ইহা তো কলাকৌশল নিশ্চয়ই নহে। আর যদি বা ইহা কলাকৌশল হয়, তবে সে কলাকৌশলকেও শত ধিক। কলাকৌশলের নামে শিক্ষার এই অপভ্রংশ ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহে।

একদিকে যেমন ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার সাহায্যে সন্তানগণের হৃদয়ে সুনীতির পথে চলিবার উপকার দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ তাহাদিগকে দুর্নীতির সংস্রব হইতে দূরে রাখিতে হইবে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতভঙ্গের সহায়ক কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি নিজেরাও পড়িয়া সময় বৃথা নষ্ট করিব না এবং সন্তানগণকেও করিতে দিব না। আমরা নিজেরা যদি ঐ সকল পড়িয়া সময় নষ্ট করি, তবে সন্তানগণকে সে বিষয়ে নিষেধ করিবার অধিকার থাকিবে না।

সন্তানগণকে দুর্নীতির সংস্রব হইতে দূরে রাখিবার অন্যতর প্রধান উপায় হইতেছে বালিকাব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়া। প্রজাদের মঙ্গলে গভর্ণমেণ্টের মঙ্গল। প্রজাদের শারীরিক প্রভৃতি সকল বিষয়ে মনুষ্যত্ব বজায় থাকিলে প্রয়োজনের সময়ে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইতে পারেন। তাই এই বালিকা ব্যবসায় উঠাইবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টেরও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। এই দুর্নীতিপোষক ব্যবসায় উঠাইবার পক্ষে আমাদেরও যে প্রাণপণ চেষ্টা আবশ্যক, সমুদয় দেহ মন দিয়া এ বিষয়ে যে আমাদেরও লাগা আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও দুইবার করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ও আমরা, আমাদের সমবেত চেষ্টা থাকিলে উহা উঠাইয়া দিতেই বা কত সময় লাগে? ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের সাহায্যে বালিকাব্যবসায় অনায়াসে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পুলিসকে এ বিষয়ে কার্য্যের দ্বারা, আমাদের সমবেত সপক্ষ মত জানাইয়া এবং অন্যান্য নানা উপায়ে সাহায্য করা উচিত। সমাজের একটী বিষকীট বিদূরিত করিবার এমন শুভ অবসর যেন আমরা অবহেলা পূর্ব্বক না হারাইয়া বসি।

কেবল বালিকাগণকে বেশ্যাদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিলেও চলিবে না। তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া রাখা হইবে কোথায়? খৃষ্টানদিগের ভিতর ইহাদিগকে রক্ষা করিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি একটী খৃষ্টীয় মহিলার উদ্যোগে কটকে ইহাদিগের জন্য একটী আশ্রয়স্থান (Children's Shelter) খোলা হইয়াছে। আত্মবিক্রয়রূপ ভীষণ কষ্টকর জীবন যাপন করা অপেক্ষা যে কোন একটী ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্দ্দোষ জীবন যাপন শতগুণে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে হিন্দুসমাজের ভিতরে এইরূপ বালাশ্রম খুলিয়া ঋষিপ্রদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং তৎসঙ্গে আশ্রিত বালিকাদিগের ভবিষ্যত জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিলে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রসূ হইবে এবং বালিকাব্যবসায় অচিরে উঠিয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে যে সময় আসিয়াছে, এখন আমাদিগের প্রত্যেককে সমাজের মঙ্গলের জন্য দেশের কল্যাণ

কামনায় যথাযুক্ত শক্তিনিয়োগ করিতে হইবে। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা যে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছি—কাহাদের জন্য? আমাদের সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য কি নহে? তাই যদি হয়, তবে ইহা কেমন কথা যে একদিকে আমরা তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত, অথচ অপরদিকে তাহাদের চিরজীবনের সর্ব্বনাশের উপায় অপসারিত করিবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিব না? আমরাও জননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মাতার মাতৃত্বই আমাদিগকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; ভগ্নীর, কন্যার স্নেহহস্ত কতবার আমাদিগকে অশান্তির মাঝে শান্তিদান করিয়াছে। মাতার, ভগ্নীর, কন্যার ছায়া যখন আমরা প্রত্যেক বালিকাতেই দেখিতে পাই, তখন সেই বালিকাগণকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করা, তাহাদিগের মাতৃত্বকে বিনষ্ট হইতে না দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানসন্ততিকে রোগশোকের বিষবীজের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার পথ প্রস্তুত করা—এ সকল কার্য্য যে আমাদের কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ভারতের জননী সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির অন্যতর প্রধান মূল এই বালিকাব্যবসায় উঠাইয়া দিবার বিষয়ে আমাদের শুভমতি ও ক্ষমতা প্রদান করুন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

হে প্রাণের দেবতা,
তোমারি চরণে
প্রাণ যেতে চায়।
অনেক পেয়েছি দুখ,
ভেঙ্গেছে আঘাতে বুক,
লহ লহ তুলে
তোমারি কোলে॥

বঙ্গসাহিত্যের নবীন যুগ।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীগণ—ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইলে খৃষ্টান মিশনরিগণ বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারার্থ বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা আরম্ভ করেন ইহার ফলে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকার হয়। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের তাঁহারাই সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের সময়ে বঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

রামমোহন রায় ও বঙ্গে নব যুগ—যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গদেশকে বর্ত্তমান উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রণী। বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং নানাবিধ উন্নতির পথ তাঁহার দ্বারাই উন্মুক্ত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গভাষাকে যে কি পরিমাণে উন্নত করিয়াছে তাহা বলা যায় না। রামমোহন রায় বাঙ্গালা দেশের নব যুগের সাহিত্যের আচার্য্য। তিনি গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হয় বটে কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ই সর্ব্বাগ্রে গদ্যে উপনিষদ অনুবাদ করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত তর্কবিতর্কের জন্য পদ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সুবিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন।

এই প্রকারে বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের পত্তন হইলে অনেক প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ ধারাবাহিক ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিতে লাগিলেন। এই সকল সাহিত্যসেবীগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গের বাণীমন্দিরের অন্যতর প্রধান পুরোহিত। বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্যকে তিনি নব নব অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়াছেন। তিনি, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্য অচিরকালেই জনসাধারণের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। অক্ষয়কুমার দত্তের সময়কে আমরা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" যুগ বলিতে পারি, কারণ দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ঐ পত্রিকাতেই সর্ব্ব প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর ঐ সময়ে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। গুপ্ত কবি নানাবিধ কাব্য রচনা দ্বারা

বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষ অলঙ্কৃত করেন—সমালোচকগণের মতে গুপ্ত কবিই বাঙ্গালার শেষ খাঁটী বাঙ্গালী কবি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও নব যুগের বাঙ্গালা কাব্য—প্রতিভা নিজের জন্য নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লয়। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালায় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন এবং ইংরাজ কবির অনুকরণে বাঙ্গালায় কাব্য প্রণয়ন করেন। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিতগণ প্রাচীন কবিগণের লেখা বড় পছন্দ করেন না। তাঁহারা মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাঠক। পদ্যে যেমন মাইকেল নব যুগের প্রবর্ত্তন করেন, গদ্য সাহিত্যে সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের প্রবর্ত্তক। বিদ্যাসাগরের সাধুভাষা এবং আলালী ভাষা এই দু'য়ের সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষায়র সৃষ্টি করেন তাহা অপূর্ব্ব। তাঁহার কল্পনার লীলাদণ্ড আবর্ত্তন করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব উপন্যাস বঙ্গভাষায় রচনা করেন পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তাহা একেবারেই ছিল না। বস্তুত মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই জন বাঙ্গালার ভাবরাজ্যের দুই বিভাগের সমসাময়িক দুই সম্রাট। দুজনেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং দুজনেরই গ্রন্থে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বিশেষভাবে মাইকেলেরই অনুকরণ করিয়াছেন বলিলেই হয়। তবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কাব্যে যে জাতীয়তার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেন—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাহা বিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগে "গীতি কবিতার" পুনরভ্যুত্থান হওয়ায় মাইকেলের যুগ আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। "সারদামঙ্গল" কাব্যপ্রণেতা ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের গীতি কবিতার একটী নূতন সুর সংযোগ করেন। আজকাল রবি বাবুর দেখাদেখি অনেকে যে অস্পষ্ট ভাবের কবিতা (mystic poems) লেখা সুরু করিয়াছেন—সেই অস্পষ্ট ভাবের প্রথম আভাস পাওয়া যায় বিহারীলালের "সারদা মঙ্গল" কাব্যে। বর্ত্তমানে কাব্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিতেছে বলা যায়।

বাঙ্গালা নাটক। মুসলমানের যুগের সাহিত্যে নাটক ছিল না। ইংরাজ রাজত্বে আবার নাটকের পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার আদি নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। নাটকে মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় হাস্যরসের মধুর নাটক লিখিবার শক্তি অতি অল্প নাট্যকারেই দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন যথার্থ ভাবুক কবি। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার আসরে নূতন সুরে গান গাহিয়াছেন।

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র—এই দু'য়ের দ্বারা সাময়িক সাহিত্য আলোচিত হয়। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গ দর্শন, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালায় অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে। এক এক সময়ে এক একখানি বিশেষ উন্নত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে প্রভাবশালী কয়িয়াছে। সংবাদপত্র অনেকগুলি প্রচলিত হইয়াছে তন্মধ্যে সমাচারদর্পণ, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ও বসুমতী প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছে। এই সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গের চিন্তাশীল সুলেখক এবং বাণীর একনিষ্ঠ সাধক—যথাযোগ্য স্থানে তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

আজকাল বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দিনে শুধু কাব্য, নাটক ও উপন্যাস লইয়াই বঙ্গসাহিত্য নয়। বঙ্গভাষাকে সর্ব্ববিদ্যার আধারভূতা করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা বঙ্গভাষার এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর তাঁহারা আমাদের সকলের ধন্যবাদভাজন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রণী। এই সাহিত্যপরিষদের প্রধান প্রধান সভ্যগণের চেষ্টায় বৎসর বৎসর "সাহিত্য সম্মিলন" হইতেছে। এই সম্মিলনের ফলে একদিকে যেমন আমাদের সাহিত্য কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণে উন্নত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, অন্য দিকে বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সাহিত্যসম্মিলন চারিভাগে বিভক্ত—

এই চারিভাগে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনা হইয়া থাকে। এইভাবে যদি সাহিত্যের আলোচনা কোনরূপ বাধা না পাইয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে আমরা যে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশের সমুন্নত পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত আমাদের বঙ্গসাহিত্যের তুলনা করিতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৺হিতেন্দ্রনাথের প্রতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বরষের পর বর্ষ গিয়াছে চলিয়া।
ধরণীর সুখদুখ গেছ এড়াইয়া॥
কত চেষ্টা করেছিনু রাখিবারে ধরি।
নিরাশের আশা গেলে সুনিস্ফল করি॥
গেছ ভাল স্বরগের পেয়ে দিব্য বলে—
ফেলি অবিশ্রাম মোরা নিতি অশ্রুজলে॥
ছিলে যবে হেথা, কত করিতে উৎসব—
যত্ন কিসে ভাল থাকে ভাইবোন সব॥
কোথা সে আনন্দোৎসব আজিকার দিন
বিষয় কুটিল লয়ে রয়েছি মলিন॥
এক দুই করি হেথা গণি গো বৎসর।
কালের যায় না সেথা গর্ব্বপদভর॥
কিবা মাস কিবা বর্ষ বুঝি তব কাছে।
কালের জটিল ভাগ ঘুচিয়া গিয়াছে॥
তোমা বিনা করি হেথা যত গীত গান।
সকলি নিবস্ত যেন—নাহি যেন প্রাণ॥
যে গান শুনিছ তুমি সংসারের পারে।
বন্ধু দেবগণ হতে অনাহত তারে॥
তেমন সঙ্গীত বল কোথা পাব হেথা—
অর্দ্ধ পথে থেমে যায় তুলি মর্ম্মব্যথা॥
যৌবন-মাখানো তব সরল সে মুখ,
ঢাকিতে পারেনি কভু শত কষ্ট দুখ॥
স্বচ্ছ অতি স্বচ্ছ তব নিষ্কলঙ্ক চিত্ত।
তুচ্ছ ছিল তব কাছে রাশি রাশি চিত্ত॥
প্রেমময় পরে তুমি অটল নির্ভর
রেখেছিলে চিরকাল—আনন্দনির্ঝর
বহিত তোমার প্রাণে—বারেকের তরে
নামেনি আঁধার তব জীবনের পরে॥
বিভুরে জানাই মোর প্রাণের এ কথা।
তুমি যেন নাহি পাও সেথা কোন ব্যথা॥
দীর্ঘশ্বাস অশ্রু যেন ফেলিতে না হয়।
মৃত্যু কষ্ট কাছে যেন ঘেঁসিতে না পারে॥
এতদিন সেবা তুমি করিয়াছ যাঁরে,
সার্থক জীবন তব—পাইয়াছ তাঁরে॥
কালের পরদা ছিন্ন করি দুই ভাগে,
অনিমেষ দেখিতেছ—তাঁরি আঁখি জাগে॥
তাঁহারি মহিমা গান করিয়াছ চলি।
সুনিস্তব্ধ শূন্যে তাঁর আহরিছ বলি॥

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরস্থ প্রান্তর। কাল শরৎ—প্রভাত।
(নৃত্য গীত করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ)

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

একি সাম্‌লে থাকা যায়?
ডাক্ পড়েছে, সকাল বেলা
——"আয়রে ছুটে আয়"!
কে রয়েছ ঘরের কোণে,
কে করেছ মুখ ভারী,
পুঁটলি ফেলে আয়রে চলে
তাড়াতাড়ি কাজ সারি'।
সকাল বেলায় পাগল হাওয়ায়
এম্‌নি করেই কাজ ভাঙ্গায়।
হাওয়ার মতন আয়রে মেতে
আলোর মতন হেসে;
পাখীর মতন গান গেয়ে আয়
মেঘের মতন ভেসে;
সারা জগৎ দিচ্ছে সাড়া—
প্রাণে প্রাণে প্রেমে জাগায়।

১ম বালক। যাই বল, দাদাঠাকুর না এলে আমোদ হয় না।

২য় বালক। ঠিক বলেছ। দাদাঠাকুর যখন নাচেন, মনে হয় যেন খোলা মাঠের ঝোড়ো হাওয়া এসে তাঁর সাথে যোগ দেয়। যখন গান গান, বনের পাখী তাঁর সঙ্গে গেয়ে উঠে। আকাশ তাঁর গান কান পেতে শোনে, ফুলগুলি তাঁর হাসি দেখে হেসে ওঠে। বাতাসে যখন তাঁর সাদা চুলগুলি ওড়ে তখন তাঁকে কি সুন্দরই দেখায়।

১ম বালক। দাদাঠাকুর আমাদের যে কে, তা কেবল বুঝতে পারি, বলতে পারিনে। তিনি না হলে' আমাদের কোনো কাজে মন বসে না।

৩য় বালক। আজ দাদাঠাকুর এলেন না কেন?

৪র্থ বালক। আমি ভাই আজ দাদাঠাকুরের উপর অভিমান করব। তাঁর সাথে মোর আড়ি।

১ম বালক। এমন কথা বলতে নেই। দাদাঠাকুরের উপর কি অভিমান ক'ত্তে আছে? তাঁকে যে মান্য ক'ত্তে হয়।

৪র্থ বালক। আমার ভাই তাঁর সাথে সবই চলে। আমি একদিন খুব রেগে তাঁর সাথে আড়ি করলুম; কিন্তু ভাই মজার কথা কি বলব, যাই তিনি এলেন, আর অমনি আগে আমিই হেসে ফেল্লুম।

২য় বালক। ঠিক বলেছ তাঁকে দেখলে আর অভিমান থাকে না। আমার তো ভাই তাঁকে দেখলেই নাচতে ইচ্ছা করে।

৪র্থ বালক। দাদাঠাকুর ভারী মজার মানুষ—পাগলের রাজা।

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

দাদাঠাকুর পাগলের রাজা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌বো গাইবো তাঁরি সঙ্গে—
বাজায়ে বগল বাজা।
নাইকো কোনো বাঁধন ছাঁদন
নাইকো ঢাকা-চাপা
আমোদে তাঁর নতুন ধরণ
নাইকো যোখা মাপা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌ব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।
আকাশ তাঁরে দিয়েছে প্রাণ
পাখী দেছে স্বর
ঝোড়ো হাওয়া দেছে নাচন্
ঠাকুর দেছেন বর
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ—
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌ব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।
কেবল গান আর কেবল হাসি
কেবল ভালবাসাবাসি
হাজার কসুর হ'লেও যে তার
কেবল দয়া—নাই সাজা।
বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ,
মনের মানুষ গো—
নাচ্‌ব গাইব তাঁরি সঙ্গে
বাজারে বগল বাজা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ।

দাদা। নাচ্ ব্যাটারা, খুব নাচ্, আরো নাচ্, যাহোক, যাই বলিস, আমোদ হ'লেই হ'ল। খুব নাচতে হবে; আরো নাচতে হবে। আজ নাচে গানে এই ভোরের আলো চম্‌কে দিতে হবে; আজ নাচে গানে এই শরতের আকাশ লুট্ করে নেব।

(বালকগণ ঘুরিয়া গিয়া দাদাঠাকুরকে ঘেরিল)

গৌড় সারঙ্গ—একতালা।

দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর
খোদার উপর খোদগিরিটে করেছে চতুর।
পাক্‌চে যতই চুল তোমার
পড়্‌চে যতই দাঁত
আমোদ ততই যাচ্ছে বেড়ে—
কি এক নতুন ধাত।
সকলেরি সমবয়সী—এমনি মধুর—
বাইরে বুড়ো হচ্ছ যতই
ভিতরের যৌবন
উথ্‌লে উঠে পড়্‌চে ছেপে
ভাস্‌চে এ ভুবন;
যতই পেকে যাচ্ছ ততই রসে ভরপুর।
কালেরে যে দেছ ফাঁকি
কাল যে তোমায় দাস
তোমার রাজ্যে ভরা ফাগুন
সদাই বারোমাস
অফুরন্ত সুধাকলস—বিলাচ্ছ প্রচুর।

দাদা। নাচ, আরো নাচ, খুব নাচ্। যা হোক যাই বলিস্, আমোদ হলেই হোল।

১ম বালক। নাচো ভাই নাচো; দাদাঠাকুর বলেছেন আমোদ কর্ত্তেই হবে।

দাদা। ওরে তা নয়; আমোদ কর্ত্তেই হবে ভাবিস্নে—তাতে আমোদ হয় না। নাচ গান কর্ত্তেই হবে ভাবিস্নে, ওতে নাচ গান আসে না। চেয়ে দ্যাখ্ ঐ আকাশের দিকে, ঐ খোলা মাঠের দিকে, চেয়ে দ্যাখ্ ঐ নদীর পানে। বাইরের এই আনন্দটুকু টেনে আন্ দেখি প্রাণে! তার পর দেখবি নাচতে গাইতে পারিস্ কিনা!

১ম বালক। দাদা ঠাকুর, তুমি ঈশ্বরের নাম কর, ঈশ্বরের নাম করে' করে' নাচব গাইব।

দাদা। কেন, তা না হলে' আর নাচতে গাইতে পার্বিনে?

১ম বালক। ওতে আমোদও হবে, পুণ্যিও হবে। ঈশ্বরের নাম করলে স্বর্গবাস হয়।

দাদা। দূর্ ব্যাটা! অ্যা মাটি করেছে। ঈশ্বর আর কে?—এই আনন্দই যে ঈশ্বর। পুণ্যি, স্বর্গ এসব উঁচু কথা তোদের কে শিখিয়ে দিলেরে? অত বড় কথায় কাজ কি? কেবল আমোদ কর্বি—কেবল আমোদ। ও সব উঁচু কথা পেলি কোথা?

১ম বালক। এসব আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনেছি।

দাদা। কোন্ পণ্ডিত মশাই?

১ম বালক। ঐ যে টোলের পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভট্‌চাজ মশায়ের কাছে।

দাদা। এঃ—তোদের কাছে মিনি-পয়সায় অমনি এসব বড় বড় কথা গুলো বলে ফেল্লে।

১ম বালক। আমাদের ঠেয়ে কি আর ব'লেছেন? উনি যখন টোলে ছাত্তরদের পড়ান্ তখন আমরা শুনে নিয়েছি।

দাদা। অ্যা—মাটি করেছে! পণ্ডিতের কথা শুনে ফেলেছিস্! ওরে তিনি যে বড় মানুষের পণ্ডিত। তোরা যে ছোট লোক। ওসব এখন থাক্। আমোদ কর্; খালি আমোদ কর্বি। ওসব বড় বড় পণ্ডিতি কথা এখন থাক্। আজকের পণ্ডিত এই শরতের আকাশ, আজ্‌কের পুঁথি এই শরতের পৃথিবী, আজকে পড়তে হবে এরই শাস্ত্র, গাইতে হবে এরই গান। এরই মধ্য দিয়ে আনন্দ আজ আকার ধরে দেখা দেবে—আর সেই আনন্দেই ঈশ্বরকে দেখতে পাবি।

১ম বালক। তাই নাকি?

দাদা। তা নয়তো কি?

১ম বালক। তবে আর পণ্ডিতের মানা শুন্‌ব না। এস ভাই গাই আর নাচি।

পিলু বারোঁয়া—একতালা।

কে শোনে আজ মানারে, ভাই
কে করে আজ মানা?
সকল বাঁধন কাটে যখন
আমোদ তখন একটানা।
প্রাণের মাঝে জাগ্‌ল পাগল—
তুলেছে কি গণ্ডগোল;
বাইরে ঘরে কি কলরোল
কে রাখে কার ঠিকানা?
এর নাই পরিমাণ, নাইরে হিসাব
নাইকো কোনো সীমানা
কেবল নাচানাচি মাতামাতি
বিভোল করে প্রাণখানা।

(ক্রুদ্ধভাবে বিদ্যানিধির প্রবেশ)

বিদ্যানিধি। আঃ ভারী আলাতন করলে! ভারী আলাতন করলে! (একটু গম্ভীরভাবে বসে) দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করবার যো নেই; টোলে ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত! এ ব্যাটারা তো ভারী আলাতন করলে। ওহে দাদাঠাকুর তুমিও একেবারে খেপ্‌লে নাকি?

দাদা। প্রণাম।

বালকগণ। প্রণাম।

বিদ্যা। আরে যাও! হ্যাঁ দ্যাখ দাদাঠাকুর, দিন নেই রাত নেই এই সব ছোটলোকের ছেলেগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করছ কেন বল দিকিন্?

দাদা। ওরা যে আমায় হাসায়, নাচায়, কাঁদায়, মাতায়—আমি কি কর্‌ব?

বিদ্যা। তুমি একটা বুড়ো-পাগল। বুড়ো হয়েছ, এখন গম্ভীর হওয়া উচিত।

দাদা। গম্ভীর হতে পার্‌ব না। ও আমার ধাতে সয় না।

বিদ্যা। অত আমোদ টামোদ বুড়োদের জন্যে নয়।

দাদা। বুড়ো হয়েছি? বুড়ো আবার কি! আমি তো বুড়ো হই নি। তবে এসেছি এখানে অনেক দিন হ'ল বটে। তাতেই তো এ জায়গাটার সঙ্গে আরো বেশী পরিচয় হয়েছে। চেয়ে দেখুন এই শরৎ-প্রভাতের দিকে, কেমন তরল আনন্দে সে মেতে উঠেছে; সে তো কতবার এল কতবার গেল, কিন্তু যত বার আস্‌ছে তত বারই নতুন। ওতো পুরাণো হয় নি; ওতো বুড়ো হয়নি। ও যে কেবলি যেন বেশী নতুন হচ্ছে। এই

প্রভাতের আলো যে আজ প্রাণে আনন্দের দোলা দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে স্রোত বহিয়ে যাচ্ছে। না—যেতে দে পারি না।

বিদ্যা। কি বল্‌ছো তোমার মাথা আর মুণ্ডু। প্রভাতের আলোর কথা এল কিসে? প্রভাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

দাদা। সম্পর্ক নেই? খুব সম্পর্ক—ভারী সম্পর্ক। এই বিশ্বের সাথে যে আমাদের নাড়ীর বাঁধন! বলেন কি? এই আলো ছায়া হাসি গান এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই? এই প্রভাতে ফুল ফুট্‌ছে পাখী গাচ্ছে, রৌদ্র হাস্‌ছে। আর আমরা কেন ফুলের মত ফুটে উঠ্‌ব না? রৌদ্রের মত হেসে উঠ্‌ব না? পাখীর মত গেয়ে উঠ্‌ব না? আমরাও যে এই জায়গারই মানুষ।

বিদ্যা। দ্যাখ, এ পৃথিবীটা কিছু নয়। দর্শন শাস্ত্র বলেছে, এসব মায়া মিথ্যা; কেবল সেই মায়াতীত যিনি, তিনিই সার; এসব ছেড়ে, আমোদ টামোদ ত্যাগ করে গম্ভীর হয়ে বসে' ব্রহ্ম চিন্তা কর।

দাদা। মায়া—মিথ্যা? তবে এ দর্শনশাস্ত্র আমার জন্যে নয়। এ যদি মায়া হয় তবে আপনিও মায়া—মিথ্যা, আপনার দর্শনও মিথ্যা, আমিও মিথ্যা, সকলি মিথ্যা। না—এ মায়া নয়, এ মিথ্যা নয়। ঐ যে ফুল হাস্‌ছে—এ তাঁরি হাসি; ঐ যে পাখী গাচ্ছে, এ যে তাঁরি কণ্ঠস্বর; এই শ্যাম-রম্যা পৃথিবীর অজস্র সৌন্দর্য্য—এ যে তাঁরি অঙ্গলাবণ্য। আমি এই সকলের মধ্যে তাঁরে পেতে চাই। এই সারা জগতে ছড়ানো আনন্দই আমার তিনি। আমার সত্য, মিথ্যা, ভালো, মন্দ, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য সকল নিয়েই যে তিনি! তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবো? এ যদি মায়া হয় তো হো'ক মায়া, আমি এই মায়া নিয়েই থাক্‌ব। আমি এই প্রভাতের আলোতে প্রাণ হাসাব; এই শিশিরে প্রাণ ভেজাব; এই তরল আনন্দ পান কর্‌ব। গম্ভীর হয়ে একা বসে দুয়ার বন্ধ করে—এই আপন ঘরে প্রবাসী হয়ে—মালা জপা আমার মোটেই চলবে না। আমি সবাইকে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াব।

বিদ্যা। নেচে মেতে বেড়াবে এই সব ছোটলোকের ছেলের পিলের সঙ্গে? কি আশ্চর্য্য! এরা সব কেউ নমঃশূদ্র, কেউ কৈবর্ত্ত, ওদের সঙ্গে মিশে এইরূপ মাতামাতি করছ! ছি ছি! ওদের স্পর্শ করলে যে অপবিত্র হ'তে হয়!

দাদা। ওরা ছোট বলেই তো ওদের সঙ্গে এত সহজে মিশতে পেরেছি। ওদের যে হিসাব নেই। আনন্দ যে ওদেরি ভিতরে বেশী সহজ হয়ে উঠছে। ওরা যখন মাঠে বাঁশী বাজায়, ধেনু চরায়, ওরা ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে, আনন্দ তখন আপনি এসে যে ওদের খোঁজ করে' নেয়।

বিদ্যা। দ্যাখ, তুমি লেখা পড়া শিখেছ, একটা জননায়ক হ'তে চলেছ।

দাদা। তাইতো কারেও ছাড়্‌তে পারছিনে। আমি যে এই-ই শিখেছি কেবল সারা জীবন ভরে'। আমার সকল বিদ্যাই—এই সবার সাথে মিলে মিশে আমোদ করা।

বিদ্যা। এমন-ধারা করলে মানুষের কাছে হালকা হয়ে পড়বে। আর কেউ তোমাকে ভয় করবে না।

দাদা। ভয় করবে? সে কি! তার মানে কি? ভয় কেন? ভয়ের সঙ্গে আনন্দের যে বড় বিবাদ। ভয় করবে কেন? আমি এদের সঙ্গে নেচে গেয়ে বেড়াব—এর ফল যা হয় হবে।

বিদ্যা। তুমি ভুল বুঝেছ।

দাদা। এ যদি ভুল হয় তো আমি এই ভুল নিয়েই থাকব। এর চেয়ে কোনো সত্য আমি চাই নে।

বাস্তভাবে সেবাব্রতের প্রবেশ

সেবা। গুরুদেব!

দাদা। চুপ্, বল্ দাদাঠাকুর। ভারী একটা কথা শিখেছেন "গুরুদেব"! ও সব উঁচু কথা রেখে দে—বল্ দাদাঠাকুর।

সেবা। আপনি যে গুরুর গুরু।

দাদা। আবার! মার খাবি। দাঁড়া আগে তবে—(চপেটাঘাত করিলেন)।

(সেবাব্রত হাসামুখে দাদাঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দাদাঠাকুর তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন)

হ্যাঁ দ্যাখ্, গুরু ভাবিস্ যা ভাবিস্—ভাব্‌বি, আমার কাছে বলিস্‌নে। আর গুরু টুরু ব'ল্লেই যেন কেমন আর একটা ভাব আসে, তাতে দাদাঠাকুরের মজা থাকে না। গুরু বল্লেই মনে হয়,—গম্ভীর মুখ, গেরুয়া পরা, লম্বা দাড়ী, ফোটা তিলক-কাটা, মাথায় টিকি, পায়ে খড়ম, একেবারে সার্ব্বভৌম ঠাকুর। আমি পাগ্‌লা মানুষ, অত শত হ'তে' পারব না। আমি দাদাঠাকুর। আমার তাই ভাল।

সেবা। আচ্ছা এখন থেকে তাই ই-বল্‌ব। একটা খবর আছে।

দাদা। কি খবর?

সেবা। হরিচরণ মণ্ডলের ছেলের কলেরা হয়েছে।

দাদা। অ্যাঁ—তাই নাকি? ওরে চল্, আমরা সবাই মিলে সেখানে যাই।

সকলে। চলুন।

দাদা। ভট্‌চাজ্‌ মশাই, আপনিও চলুন।

বিদ্যা। কোথায়?

দাদা। হরিচরণের বাড়ী।

বিদ্যা। কেন?

দাদা। ছেলেটির শুশ্রূষা কর্ত্তে। আহা ওরা বড় গরীব।

বিদ্যা। তা আমি কি কর্‌ব?

দাদা। আপনিও শুশ্রূষা কর্‌বেন। আপনি সঙ্গে থাক্‌লে একটু বল হবে।

বিদ্যা। রাম, রাম, রাম, মহাভারত, মহাভারত! তুমি বল কি! ব্রাহ্মণ হয়ে' এখন চণ্ডালের সেবা করব? তুমি কি উন্মত্ত নাকি? ও জানিই তো; কলিতে ধর্ম্ম নাই,—ধর্ম্ম নাই। যত সব ম্লেচ্ছাচারী জুটে একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতলে দিলে! পৃথিবী যাবে; বুঝেছি—পৃথিবী যাবে। চা'রপো পাপ পরিপূর্ণ হয়েছে। এইবার পৃথিবী যাবে।

দাদা। সেবা কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়? সেবা কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের বাইরে? যে সেবা—রোগে জননী, দুঃখে সান্ত্বনা! সেবা—যা ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারার ন্যায়, দিব্য আলোকের ন্যায়, বিধাতার আশীর্ব্বাদের ন্যায়, মানবের বহুভাগ্যফলে ধরায় নেমে এসেছে, সে সেবার অধিকারী হয়ে মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে কর্‌বে না? কৃতজ্ঞ অন্তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে না? দয়া সেবা যে নীচ পরিত্যক্ত ব্যক্তির জন্যই প্রায় হয়েছে। সেবায় ধর্ম্ম যে জলের মত, সে নিম্নদিকেই ধাবিত হবে।

বিদ্যা। সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। সেবা শূদ্রের ধর্ম্ম—জান তো গুণানুসারে বর্ণ বিভাগ হয়েছে?

দাদা। হা অদৃষ্ট! তার অর্থ কি এই? সেবা মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, যদি গুণ অনুসারে বর্ণ-বিভাগ হয়ে' থাকে; ব্রাহ্মণের যদি উচ্চ প্রবৃত্তি থাকে, তাঁর যদি উচ্চ অধিকার থাকে, তাহ'লে সেবা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম না হয়ে আর কার ধর্ম্ম হবে?

বিদ্যা। চণ্ডাল সেবালাভের অধিকারী নয়। সেবা যদি ব্রাহ্মণের হয়, তো সে সেবা লাভের যোগ্য দেবতারা। ব্রাহ্মণ কেন নীচ জাতির সেবা কর্‌বে?

দাদা। সেবা লাভের, সেবা প্রাপ্তির অধিকারী কি কেবল উচ্চ জাতিমাত্র? পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যদি কেবল হিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গেই থাক্‌ত তবে কি তার অমৃত-ধারায় এই শ্যামা বসুন্ধরা শীতল হোত? সে যে নীচে নেমে এসে তবে বিশ্বকে প্লাবিত পুণ্যপূত করেছে। সে ভাল মন্দ, পবিত্রাপবিত্র স্থাননির্ব্বিশেষে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে তো কোনো বিচার করে না, কেবল অশ্রান্ত পুণ্য স্রোতে ধরিত্রীকে স্নেহসিক্ত করে দিয়ে যায়।

বিদ্যা। দাদাঠাকুর, তুমি পণ্ডিত, তুমি উচ্চ বংশোদ্ভব তা সত্য, কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কি বোঝ? তুমি কায়স্থ। ব্রাহ্মণ অবশ্যই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; না হলে' তুমি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ এ প্রভেদ কেন হোল?

দাদা। ব্রাহ্মণ! ক্ষমা করুন; তবে আজ কিছু বল্‌ব; আমি না বলে থাকতে পারছিনে। হাঁ, অবশ্যই ব্রাহ্মণ উচ্চ কেন, তার একটা কারণ আছে—একথা কারো সাধ্য নাই যে অস্বীকার করে। কিন্তু ব্রাহ্মণের উচ্চতার কারণ কি এই নয় যে তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম, পরোপকারই তাঁকে শ্রেষ্ঠ করেছে?

ব্রাহ্মণ তাঁকেই বলে, যাঁর সমস্ত চিন্তা ভগবচ্চরণে, যাঁর সমস্ত সাধনা বিশ্বের কল্যাণের দিকে। সংসারে জাতি পূজ্য নয়, গুণই পূজ্য। ব্রাহ্মণ! একবার মনে করুন সেইদিন, সেই মানবের ইতিহাসের স্মরণীয় বরণীয় মহাপুণ্যময় দিন—যেদিন এই ব্রাহ্মণজাতি সকল স্বার্থ সকল বিলাসলালসা ছেড়ে কেবল স্বেচ্ছা-বৃত দারিদ্র্য মাত্র সম্বল করে তপোবনবাসী হয়ে বিশ্বের কল্যাণ কামনায় দেহপাত কর্ত্তেন। তখন তাঁর—এই ব্রাহ্মণের পদতলে গর্ব্বোদ্ধত রাজমুকুটশোভিত শির বিলুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে কৃতার্থ মনে করত। হায় সেদিন আর ব্রাহ্মণের নেই। একদিন ছিল যখন ব্রাহ্মণত্ব কেবল বংশগত অধিকার ছিল না। একদিন ছিল সমাজের, যখন ব্রাহ্মণগণ গুণানুসারে ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ কর্ত্তেন, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুতা করতেন, তাঁদের অস্ত্র শিক্ষা দিতেন, আবার শিষ্যভাবে শাস্ত্রাধ্যয়ন কর্ত্তেন। ব্রাহ্মণ! একবার এ অন্ধ অভিমান, স্বার্থমুগ্ধ বিচার পরিত্যাগ করে একবার সেই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন।

বিদ্যা। দাদাঠাকুর, তুমি যেন কতকটা ঠিক বলচ মনে হচ্চে। আচ্ছা আমি ভেবে দেখব। তবে কি জান, এতকাল ধরে যা মেনে চলেছি তার উপর কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে; হঠাৎ ছাড়তে পারা যায় না। —না—না তোমার কথা শুনতে পারি না। এতে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাহানি হবে।

দাদা। ব্রাহ্মণ! প্রণাম; তবে থাকুন আপনার ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে। চণ্ডালের সেবা করবেন না? চণ্ডালকে স্পর্শ করলে অধর্ম্ম হবে? কি আশ্চর্য্য! চণ্ডাল কি মানুষ নয়? তারও কি মানুষের প্রাণ নয়? তারও কি মানুষের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়? সেই জগৎপ্রাণ কি তার প্রাণে নেই? ব্রাহ্মণ! সূর্য্য কি চণ্ডালের ঘরে কিরণ বিতরণ করেন না? বর্ষাধারা কি সর্ব্বস্থানকেই স্নেহসিক্ত করে না? ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমি যেন জন্ম-জন্ম চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করি, তবু যেন হীন এরূপ স্বার্থদাস ব্রাহ্মণ না হই। চল ভাই' চল, আমরা যাই, কর্ম্মময় জগৎ,

অনেক কাজ কর্ত্তে হবে। কার চোখের জল পড়বে, চল তার চোখের জল মুছিয়ে দিইগে। কে ক্ষুধায় অন্ন পাচ্ছে না, চল তাকে আহার্য্য দিইগে। কোন্ অভাগা অনুতাপের অনলে দগ্ধ হচ্চে চল তার বক্ষ শীতল করে দিইগে। ঐ যে অন্ধ, আতুর, অসহায়—আমাদের ঈশ্বর যে ওরাই। যদি ওদের মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলে দিতে পারি, সেখানেই যে দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হল। ওদের সেবা কর্ত্তে পারলেই যে তাঁর সেবা হোল। চল ভাই সব, আমরা ধন্য, কৃতার্থ যে এমন সেবার অধিকার পেয়েছি।

সকলে। চলুন আমরা প্রস্তুত।

বেহাগ—একতালা।

সবার সাথে পড়লে বাঁধা
খুলবে তোমার এ বাঁধন।
আপনাকে ভাই বিলিয়ে দিলে
মিলবে তোমার সে আপন।
বড়ই বোঝা নিজের বোঝা
সে যে বোঝা যায় না বোঝা—
সবার বোঝাই নেয়া সোজা
বুঝলি নারে ওরে মন।
নেমে আয় সবার মাঝে
লেগে যা সবার কাজে;
চলে আয় সবার সাজে
সবার মাঝে নে আসন।

সকলে প্রস্থানোদ্যত—বিদ্যানিধি বাধা দিলেন।

বিদ্যা। দাঁড়াও দাদাঠাকুর, একটু দাঁড়াও। আমিও মানুষ, যতই বলি আমিও মানুষ, আমারও মানুষের প্রাণ।—দাদাঠাকুর, কে তুমি? কে তুমি? তুমি মানুষ নও,—কে তুমি? তোমার প্রতি বাক্যে আমার প্রাণে নবীন প্রেরণা, নব-জীবনের হিল্লোল মর্ম্মরিত হয়ে উঠ্‌চে। কে বলে আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ। না না তুমিই ব্রাহ্মণ, আমিই শূদ্র। দাদাঠাকুর, আজ যদি তোমার চরণে এ মস্তক লুণ্ঠিত হয়, সেটা বেশি কিছুই করা হবে না। হায় অন্ধ সমাজ! দাদাঠাকুর, আবার বলি—কে তুমি? তোমার বাক্যে মেঘের গর্জ্জন, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বজ্রের দৃঢ়তা, অঙ্গ সঞ্চালনে ঝটিকা —কে তুমি? এর পূর্ব্ব ক্ষণে তোমার কি ভাবে দেখেছি—দেখেছি এক হাস্যোজ্জ্বল আনন্দময় মূর্ত্তি; এখন আবার একি দেখ্‌ছি—যেন প্রখর প্রদীপ্ত মহিমাময় মূর্ত্তি! দাদাঠাকুর নিয়ে চল, আমি অন্ধ, আমার হাত ধরে নিয়ে চল। হে মহাকর্ম্মী আমায় এ মহাকর্ম্মের অধিকারী কর। আমিও তোমার মত এ বিশ্বের কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব। হে আনন্দময়, আমায় তুমি এমনি তোমার মত আনন্দে নাচাও মাতাও, কাঁদাও গলাও; আর আমার জাত্যাভিমান নেই। আজ এ কি শুনছি, —কেউ তো এমন কথা কখনো শোনায় নি! আমার চক্ষে একটা নূতন জগৎ খুলে গেছে। এ আমায় কি শুনালে, কি দেখালে দাদাঠাকুর? মানুষ নও, দেবতা নও—কে তুমি? কে তুমি?

দাদা। আমি অধম, দীনাতিদীন, আপনার চরণের দাস দাদাঠাকুর। গাও সেবকগণ, তাঁর নাম কর; ধন্য তাঁর লীলা, আজ বড় মধুর মুহূর্ত্ত। আজ ব্রাহ্মণ! আপনাকে পেয়েছি। আপনি অগ্রবর্ত্তী হোন্, আমরা আপনার পিছনে যাবো। আমি পাগল, আমি অজ্ঞান, আমি অধম; ব্রাহ্মণ! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। আজ বড় আনন্দ। কে বলে ব্রাহ্মণসমাজ পতিত? বিশ্বসমাজ! আশ্বস্ত হও। অবোর সেই মহামুহূর্ত্ত আস্‌বে। কি আনন্দ আজ—আবার ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ত্তী হয়ে শূদ্রের হাত ধরে, মানবসমাজের মহামিলনের মন্দিরাভিমুখে চলেছে! ওরে তোরা ডঙ্কা বাজা, নিশান উড়া, পুষ্প বৃষ্টি কর্। আবার সকল জাতি মিলে এক মহা মানবসঙ্ঘ সংগঠিত হবে। সব ভেদ বিবাদ দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হবে। বিশ্ব অমৃতময় হবে। ওই শোন্ ধর্ম্মের বিষাণ বেজে উঠেছে। দেবতা জাগ্রত হয়েছেন। একি আলো! কি আনন্দ! কি অমৃতপ্লাবন। ব্রাহ্মণ! আমার পদধূলি দিন্।

বিদ্যা। একি! একি! কর কি! কর কি! এস ভাই তোমার বক্ষে বক্ষ মিলিয়ে ধন্য হই। গাও ভাই, তোমরা একবার তাঁর নাম গান কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে একবার গেয়ে ধন্য হই। তার পর চল, সবাই মিলে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িগে। দাদা-ঠাকুর, এস, ভাই, এস একবার আমায় আলিঙ্গন দাও।

উভয়ের আলিঙ্গনও সকলের নৃত্য গীত।

পিলু বারোয়াঁ—তাল একতালা।

আপনি ঠাকুর বাঁধা যে তাঁর জগতের কাজে
আমরা হেথায় রব বসে' তাও কি রে সাজে?
ঘরে বসে' জপলে মালা হয় না পূজা তাঁর।
ছোট বড় সবাই আসুক খুলে দাও দুয়ার।
সবার সনে আসবে সে জন—পাবে সকলের মাঝে।
প্রাণসাগরে পড় ঝাঁপায়ে পাবি শত প্রাণ
আসল চেয়ে অংশ বাড়ে যতই কর দান।
কেউ আসেনি আপন লয়ে' ঘুরতে আপনার মাঝে
কারেও যদি দাও তাড়ায়ে, তাড়ারে তাঁরে;
আস্‌তে দিলেই আনা হবে সেই দেবতারে;
হাস্‌লে ধরা হাসেন তিনি, ব্যথা দিলে তাঁরে বাজে।

সকলের প্রস্থান।

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত।

আদিব্রাহ্মসমাজের ত্রৈবার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

(১৮৩৭-৩৯ শকের পৌষ পর্য্যন্ত)

১৮৩৪ শকের শেষভাগে দেখা গেল যে আদিব্রাহ্ম-সমাজের দেনা ন্যূনাধিক ১০০০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে এবং অগত্যা তাহার কার্য্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে—উন্নতিসাধন তো দূরের কথা। সেই কারণে সভাপতি মহাশয়দিগের উপদেশ অনুসারে অধ্যক্ষসভা ঐ বৎসরে ৩ রা ফাল্গুনের অধিবেশনে আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত করিলেন। ইহা যথারীতি ট্রষ্টীগণের অনুমোদিত হইল।

১৮৩৫ শকের প্রথম অবধি ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত সহযোগে সমাজের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ক্ষিতীন্দ্র বাবু অন্য কার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় সমাজের কার্য্যে যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি এই বৎসরের আয়-ব্যয়ের একটী আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া সমাজের আর্থিক হিসাবে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এই হিসাব ঐ বৎসরের ২৫ শে শ্রাবণ অধ্যক্ষসভায় আলোচিত হইয়া অনুমোদিত হইয়াছিল। "আদি ব্রাহ্মসমাজের ১৩২০ সালের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব নূতন আকারে প্রস্তুত করিয়া আলোচনার সুবিধা করিবার কারণে" সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষসভা ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই আনুমানিক হিসাব অতি কষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রতি বৎসর আয়-ব্যয় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

১৮৩৬ শকের অধিকাংশ সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুদীর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে মনস্থ করিয়া ঐ বৎসরের শেষভাগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও এই বৎসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চালাইয়াছিলেন এবং তিনিও সময়াভাব বশত পত্রিকার সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিলেন।

১৮৩৭ শকের প্রথম অবধি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পত্রিকার সম্পাদনভার ন্যস্ত হইল।

এই বৎসরে বগুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত কয়েক মাসের জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও আদিব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উৎসাহ অদম্য ও অনুকরণীয়। তিনি ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে একটী মণ্ডলী গঠনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু প্রথমত মণ্ডলী গঠনের আবশ্যকতা বুঝা-ইয়া এবং কি প্রণালীতে আদিব্রাহ্মসমাজের অধীনে অসাম্প্রদায়িক একটী মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে তাহা বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া দুইটী প্রবন্ধ যথাক্রমে এই বৎসরের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই দুইটী প্রবন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাণের কথা ব্যক্ত হইয়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই বৎসরের ১৫ই ফাল্গুনের অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উপরোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে ব্যক্ত মণ্ডলীসংগঠন প্রস্তাবনা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়া সাধারণত গৃহীত হইয়াছিল। অধ্যক্ষসভা কর্তৃক গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই প্রবন্ধ দুইটী সভাপতি মহাশয়-গণের নিকট প্রেরিত ও তাঁহাদের কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

উক্ত মণ্ডলীপ্রস্তাবনার মর্ম্ম অনুসারে আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীভুক্ত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অধ্যক্ষসভার সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রচারিত হইয়াছিল :—

সবিনয় নমস্কার,—

ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বর্ত্তমানে সমগ্র ভারত-বর্ষে ধর্ম্মবিষয়ক একটা বৃহৎ জাগরণের ভাব আসিয়াছে। ইহাও আপনার অবিদিত নাই যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতেই অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই জাগরণের মূল প্রোথিত হইয়া-ছিল। আজ এই জাগরণের সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উদারতম ট্রষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-দৃষ্ট উদারতম ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ যাহার দুইটি মূল ভিত্তি, সেই আদিব্রাহ্মসমাজই এই দেশব্যাপী জাগ্রত ধর্ম্মভাবকে প্রকৃতপথে পরিচালিত করিতে পারিবে। আদিসমাজের কার্য্য করিবার এমন শুভ অবসর অবহেলায় হারাইলে চলিবে না। দেশে দেশে নগরে নগরে ইহার সত্য প্রচার করিয়া জনসাধারণকে ইহার পতাকার নিম্নে সমবেত করিতে হইবে। কিন্তু একথা আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে আদি-সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র এ ভাবে বিস্তৃত করিতে গেলে একটী মণ্ডলী অত্যাবশ্যক। আপনি ব্রাহ্মসমাজের একজন হিতৈষী বন্ধু। আপনাকে উক্ত প্রস্তাবিত মণ্ডলীর সভ্য-

ভুক্ত করিয়া লইলাম। এই সঙ্গে আদিসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের একটি প্রস্তাবনাও আপনার নিকট প্রেরিত হইল। তাহা হইতেই আপনি এ বিষয়ে আমাদিগের মূল বক্তব্য অবগত হইতে পারিবেন। পুনশ্চ, ষ্ট্যাম্পযুক্ত একখানি পোষ্টকার্ড পাঠান যাইতেছে, তাহাতে আপনি আগামী বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার (কার্য্য নির্ব্বাহক সভা) সভ্য হইয়া উহার কল্যাণসাধনে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক কিনা পত্রোত্তরে জানাইলে বাধিত হইব।

নিবেদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক — শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

প্রায় পঁয়ত্রিশখানি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিন চার খানি ব্যতীত অন্য সকলগুলিই সম্মতিজ্ঞাপক ছিল। এই বৎসরের চৈত্র মাসে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আদিসমাজের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন:—সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় জষ্টিস সার আশুতোষ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি। সহকারী সম্পাদক—শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি। অধ্যক্ষ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে বা ex-officio), মাননীয় জষ্টিস সার আশুতোষ চৌধুরী (স্বপদে), শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে), শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় (স্বপদে), শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীসিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত, শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার, শ্রীগোবিনলাল দাস, শ্রীআশুতোষ রায়, শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক, শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক, শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশশধর সেন, শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, শ্রীরাজকুমার সেন, শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্ন শাস্ত্রী, মিঃ এস, পি, মিত্র। হিসাব পরীক্ষক—শ্রীসিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়। ট্রষ্টী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইঁহাদের অনেকেই কোন না কোন প্রকারে আদিব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়া সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা কোন প্রকার সাহায্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের আদিব্রাহ্মসমাজকে সাহায্যপ্রদানের অবসর করিয়া লওয়া উচিত। তাঁহাদের যেন ইহা স্মরণ থাকে, তাঁহারা আজ ধর্ম্ম বিষয়ে এবং সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনভাবে যে মতামত প্রকাশ করিয়া এবং কার্য্য করিয়া সমাজে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মূল ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আদিব্রাহ্মসমাজ। তাঁহারা অন্য কোন উপায়েও যদি না পারেন, অন্ততঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হইয়াও সাহায্য করিতে পারেন।

স্বদেশবাসীগণ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে আদিসমাজ হইতে যে উপকার লাভ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কোন না কোন প্রকারে আদিসমাজকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনেক মাসিক পত্র প্রভৃতি থাকিলেও আদিব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীর সর্ব্বাগ্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হওয়া কর্ত্তব্য। যদি তাহার প্রবন্ধ বা তৎসংক্রান্ত কোন কিছু তাঁহাদের অমনোনীত হয়, তবে তাহার সংশোধন করা তো তাঁহাদের হস্তে—সে বিষয়ে জানাইলেই তো তাহার সংশোধনের চেষ্টা হইতে পারে।

আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীড অনুসারে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া (প্রতি বুধবার) উপাসনা কার্য্য নিয়মিত ভাবে নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুএক দিন ব্যতীত প্রতি বুধবারই বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর প্রায় সাত আট মাস ধরিয়া মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া চিন্তামণি বাবুর সহিত ক্ষিতীন্দ্র বাবুও বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ যে দিন বিশেষ ভাবে কোন বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণকে এবং পত্র দ্বারা মণ্ডলীভুক্ত সভ্যগণকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হইয়াছে। চিন্তামণি বাবুর মত অক্লান্তকর্ম্মা ব্রাহ্মসমাজসেবক পাওয়া দুর্ঘট। তিনি পারিশ্রমিক বিনা আদিসমাজের উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহাতে তিনি আদিসমাজের সমগ্র মণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন নিঃসন্দেহ। বিশেষ বিশেষ দিনে প্রদত্ত উপদেশগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অধ্যক্ষসভা যে কয়জন আদিসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিকে আচার্য্য পদে বরিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই যদি উৎসাহ পূর্ব্বক আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার হইত।

আচার্য্যের কার্য্যের জন্য চিন্তামণি বাবু কোন বেতন গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপে সামান্য কিছু দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে একটী পণ্ডিতলোকের ভরণপোষণের উপযুক্ত কিছু পারিশ্রমিক,

আন্দাজ মাসিক ৫০৲ টাকা দিয়া সমাজের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাখিলে ভাল হয়।

সমাজের সঙ্গীতের কার্য্য সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক বার তিনি অনুপস্থিত থাকিবার কালে তাঁহার কোন ছাত্র অথবা সমাজের পূর্ব্বতন গায়ক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্রের দ্বারা কাজ চালাইয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র নামক এক ব্যক্তি হারমোনিয়ম বাজাইয়া থাকেন। তাঁহাকে পাথেয় স্বরূপে পাঁচ টাকা মাত্র দেওয়া হয়। তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ আদিসমাজের প্রতি অনুরাগের কারণে উপাসনার দিনে হারমোনিয়ম বিনা পরিশ্রমিকে বাজাইতেন।

গত বৎসর উপাসকদিগের সুবিধার জন্য প্রায় দুইশত টাকা ব্যয় করিয়া ইলেক্ট্রিক আলোর সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উপাসনা গৃহের দুইদিকে দুই সারি আলো দেওয়া গিয়াছে। ইলেক্ট্রিক পাখারও বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে নানা বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

মিউনিসিপাল ট্যাক্স হিসাবে সমাজকে বৎসরে দুইশত টাকার অধিক দিতে হয়। এই ট্যাক্স না দিতে হইলে সমাজের অনেক উপকার হয়। আগামী বৎসর এই বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে।

যুদ্ধের জন্য কিরূপ ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। সমাজের একটী পায়খানা ভগ্নাবস্থায় ছিল, তাহা নূতন করিয়া গড়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। যুদ্ধের ঠিক প্রারম্ভ-ভাগে এই প্রস্তাব উঠিয়াছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়র প্রথমে আন্দাজ দেড়শত টাকা মাত্র ব্যয়ের এষ্টিমেট করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের কারণে উপকরণ সমূহের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি যুদ্ধ শীঘ্র থামিয়া যাইবে আশা করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পরে যখন দেখা গেল যে যুদ্ধ শীঘ্র থামিবে না এবং জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়িতে চলিল, তখন ইঞ্জিনিয়র অগত্যা কার্য্য আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন আবার নূতন করিয়া বাজার-দরের উপর এষ্টিমেট করিয়া দেখা গেল যে ১৫০৲ টাকার স্থলে প্রায় ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা লাগিবে। এই ৩৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়াই পাইখানাটী নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে।

সমাজবাটীর পশ্চিম দিকে যে সকল গৃহ ছিল, তাহাদের কতকগুলি এক এটর্ণি ক্রয় করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। সেই অবসর গ্রহণ করিয়া সমাজের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে প্রায় ১০০৲ টাকা ব্যয়ে বালির কাজ করানো হইয়াছে।

আদিসমাজ পূর্ব্বাপর বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ এবং কালনা ব্রাহ্মসমাজে খাজানা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকার সমাজে উপাসনা কার্য্য হয় না। ইহার প্রধান কারণ প্রচারকের অভাব। প্রচারক প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। একটি সুযোগ্য প্রচারকের ভরণপোষণ হিসাবে আন্দাজ ৫০৲ টাকা করিয়া প্রতিমাসে লাগিতে পারে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। চিন্তামণি বাবু উঁহার উপাসনা কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। সিতিকণ্ঠ বাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহার উৎসাহ অদম্য। তাঁহাকে সম্পাদকরূপে লাভ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্য। বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যও সুন্দরভাবে চলিতেছে। শ্রী মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় অধিকাংশ দিন উপাসনার কার্য্য করিয়া চলেন। চিন্তামণি বাবুর ভ্রাতা ও পুত্রগণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী ও নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে সাহায্য করেন।

প্রচারক রাখিবার জন্য থিয়লজিকাল কলেজ ফণ্ড হইতে ৬২৫৲ টাকা পাইবার কথা আছে। এই টাকার কোম্পানির কাগজের সুদ বর্ত্তমান দরে ধরিয়া আন্দাজ ২৫৲ টাকা বৎসরে পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের টাকা হইতে ঋণ শোধ করিয়া ১০০০৲ টাকার কাগজ এবং ১০০৲ টাকার যুদ্ধঋণের কাগজ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ৪০৲ টাকা সুদ হিসাবে পাওয়া যাইবে। যুদ্ধ থামিয়া গেলে মূলধন আরও শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চিত হইতে পারিবে আশা করা যায়। আদিসমাজের প্রত্যেক হিতৈষী যদি বার্ষিক ১৲ এক টাকা মাত্রও সাহায্য করেন, তাহা হইলেও মাসে ৫০৲ টাকা আসা অতি সহজসাধ্য। গত তিন বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ৯৮৮৲ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে।

অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আদিব্রাহ্ম-সমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সম্পত্তি। তাহার যাহা কিছু ব্যয় তাহা তাঁহারাই বহন করেন। ইহা ঠিক নহে। অবশ্য মহর্ষির জীবিত অবস্থায় উঁহার যে কোন অভাব হইত, তাহা তিনি মোচন করিতেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর তিনি যে মাসিক দুইশত টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই স্থায়ী সাহায্য হিসাবে তাঁহার ষ্টেট হইতে পাওয়া যায় না। এই দুই শত টাকা হইতে বলিতে গেলে কষ্টেসৃষ্টে সমাজের প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যদি সমাজের কার্য্য বিস্তৃত করিতে হয়, সমাজের বিশুদ্ধ মত সকল দেশবিদেশে ভালরকম প্রচার করিতে হয়, তবে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন।

মহর্ষিদেবের পরলোকগমনের পর সমাজের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য দুইজন লোক রাখা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা কার্য্য চলিয়া যাইতেছে, কেবল তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হিসাব-পত্র সুচারুরূপে রাখিতেছেন সত্য, কিন্তু সমাজের যাহাতে অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যদি তিনি সেদিকে সমাজের বিশেষ উপকার করিতে পারেন, তবে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিলেও লোকসান হইবে না।

আদি সমাজের জীবনরক্ষার অন্যতর উপায় যন্ত্রালয়। রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺রমাপ্রসাদ রায় সমাজকে উপকরণসহ একটী এবং ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় আর একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করিয়া বড়ই দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন নিঃসন্দেহ। যন্ত্রালয়ের উন্নতি সাধনের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারা যায় নাই। তবু, গত তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচশত টাকার অক্ষরাদি উপকরণ কেনা হইয়াছে। পায়খানা প্রভৃতির জন্য অল্পস্বল্প যাহা দেনা আছে, তাহা পরিশোধ হইলেই আমরা যন্ত্রালয়ের উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিব। "জব-ওয়ার্ক" হইতেই প্রেসের বেশী লাভ হয়। সেই কাজের জন্য ছোট বড় মেসিন প্রেস দুএকটা চাই। যন্ত্রালয়কে আত্মপুষ্ট করিতে গেলে প্রায় দশহাজার টাকা লাগিবে। আপাতত তিন হাজার টাকা হইলেই চলিতে পারে। তারপর, সংস্কৃত ও ইংরাজী অক্ষরের সম্পূর্ণ সেট রাখা আবশ্যক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বরের কৃপায় কোন না কোন ধনী ব্যক্তি এবিষয়ে আমাদের সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন।

বর্ত্তমান যুগে কোন একটী সমাজ স্থাপিত হইলেই তাহার মুখপত্র স্বরূপে একটী সাময়িক পত্রও স্থাপিত করা চাই। আবার, সাময়িক পত্র চালাইতে গেলেই নিজের একটী যন্ত্রালয় থাকা আবশ্যক, নচেৎ ব্যয়বাহুল্যবশত সেই সাময়িক পত্রের দীর্ঘজীবন লাভ অসম্ভব। সুখের বিষয় যে আদিসমাজের নিজের যন্ত্রালয় আছে, কাজেই তাহার মুখপত্রের জন্য বিশেষ ব্যয়বাহুল্য হয় না। আদি-সমাজের মুখপত্র সেই সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আজ ৭৫ বৎসর চলিতেছে। প্রথম বারো বৎসর সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই বলিতে গেলে সুমার্জ্জিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশে তাহা সুপ্রচলিত করিবার ব্যবস্থা করে। যে চারুপাঠ তিন ভাগ পড়িয়া সেই সময় অবধি আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বঙ্গসন্তান নিজের মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত হইতে পারিয়াছেন, সেই চারুপাঠে লিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধাকারে তত্ত্ব-বোধিনীরই অঙ্গ ভূষিত করিয়াছিল। পরে কয়েক বৎসর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন সেই সময়েই মহাভারতের অনুবাদ ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকিয়া শাস্ত্রপ্রকাশের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল। তিনি সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিলে পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে ইহার সম্পাদন ভার ন্যস্ত হয়। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রশেখর বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মনীষীগণ শাস্ত্রমাহাত্ম্যমূলক নানাবিধ প্রবন্ধ এবং সেকালের সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ সীতানাথ বসু মহাশয়ের তড়িৎ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধসকল পত্রিকাকে সর্ব্বজনমান্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে দর্শনপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের কথা ইহাতে এত অধিক পরিমাণে থাকিত যে, সেই সময় অবধি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দর্শনপ্রধান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। আজ পর্য্যন্ত পত্রিকার সেই খ্যাতি অবিচলিত রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর পত্রিকা সম্পাদন কালে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বহুকাল যাবৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বৎসর ধরিয়া পত্রিকা সম্পাদন করিবার কালে নানাবিষয়ক প্রবন্ধের দ্বারা তাহার কলেবর পূর্ণ করিলেও পত্রিকার দর্শনপ্রধান খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। সেই দর্শনপ্রধান খ্যাতির ফলে আর্থিক হিসাবে পত্রিকার কিছু ক্ষতি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। পত্রিকার নাম শুনিলেই তাহা দর্শনপ্রধান বলিয়া অনেকে তাহার গ্রাহক হইতে অস্বীকার করেন।

রবীন্দ্র বাবুর আমেরিকায় সুদীর্ঘ প্রবাসের ইচ্ছা থাকায় তিনি পত্রিকার সম্পাদনকার্য্য পরিত্যাগ করায় ১৮৩৭ শক অবধি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার ভার গ্রহণ করিলেন। আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে গত তিন বৎসরে গ্রাহক সংখ্যা ৬০এর উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সুখের বিষয় যে উহার মূল্যও (বকেয়া ও হাল) পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিত রূপে আদায় হইতেছে। যাঁহারা মূল্য প্রদান পূর্ব্বক পত্রিকার জীবন রক্ষা করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৮৩৭ শক অবধিই পত্রিকার উন্নতি সাধনের জন্য আমরা বিশেষ ভাবেই চেষ্টা করিতেছি এবং আমাদের বিশ্বাস যে আমরা সে বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যও হই-

য়াছি। ইহাতে জ্যোতিষ প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধ সচিত্র হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবধি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব অথবা আদি-ব্রাহ্মসমাজের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্র দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে সে ইচ্ছা সফল হইতে পারে নাই, কেবলমাত্র রামমোহন রায়ের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের নিরপেক্ষ ইতিহাস ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক অবস্থা ও তাহার উন্নতিসাধন সম্বন্ধেও নিরপেক্ষ আলোচনা হইয়া থাকে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারি লাল চৌধুরী বৈজ্ঞানিক একটী নূতন তত্ত্ব "মেণ্ডেলতত্ত্ব" সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ অতি সরল ভাষায় লিখিতেছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকার কারণে কয়েক মাস এবিষয়ে কোন প্রবন্ধ দিতে পারেন নাই, পুনরায় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত প্রবন্ধ সকল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র বেদান্ততীর্থ তন্ত্রসমূহের তত্ত্বসকল ক্রমশ প্রকাশ করি-তেছেন। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী বৈয়াসিক ন্যায়মালা নামক একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রমূলক বেদান্তগ্রন্থ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। স্বরলিপি বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এবং শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত গীতারহস্য এবং রাণাডেপত্নী লিখিত সুপ্রসিদ্ধ রাণাডে মহোদয়ের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া ধারা-বাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

অনেকগুলি সংবাদ পত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন সাদরে বিনা মূল্যে প্রকাশ করিতে সম্মতি জানাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ জানাইতেছি।

আদিব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট একটী বিক্রেয় পুস্তকালয় আছে। তাহা হইতে আদিসমাজ হইতে প্রকাশিত ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক সমূহ সাধারণতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই পুস্তকালয়ের সহিত একটী গচ্ছিত পুস্তক বিক্রয়েরও বিভাগ ছিল। কিন্তু ১৮৩৭ শকের পূর্ব্বেই গচ্ছিত পুস্তকের বিভাগ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেই চলে। সেই বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে। গচ্ছিত পুস্তক বিক্রয়ার্থে রাখা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অন্যতর উপায় এবং সেই কারণে প্রত্যেক সমাজেরই ইহা একপ্রকার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

এইবারে আমাদের অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া এই বিবরণের উপসংহার করিব।

আদিব্রাহ্মসমাজের কোন কোন হিতৈষী ব্যক্তির মত এই যে আদিব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতে ইচ্ছা করিলে যেখানে ছাত্রমণ্ডলীর অধিক পরিমাণে অবস্থিতি, এমন কোন কেন্দ্রে সরাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কথাটীর মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে, কিন্তু ঐ রূপ কোন কেন্দ্রে নূতন একটী ভাল রকমের বাটী নির্ম্মাণ করিতে গেলে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা আবশ্যক। অবশ্য সমাজের সভ্যগণ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে যে তাহা অসম্ভব তাহা আমাদের মনে হয় না।

আদিসমাজের অভাব ও অভিযোগের শেষ পাওয়া যায় না। সমাজের তত্ত্বাবধানে একটী ভদ্রলোকের নিবাসস্থান করিতে পারিলে সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা হয়। সমাজের অধীনে এমন একটী সাধারণ স্থান থাকা আবশ্যক, যেখানে দরিদ্র ব্রাহ্মগণ সহজে একেশ্বরবাদ-সম্মত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে পারেন।

অনুষ্ঠানের কথা বলাতেই পুরোহিতের কথা মনে পড়ে। সমাজের অধীনে এমন একজন সুপণ্ডিত পুরোহিত থাকা আবশ্যক, যাঁহাকে প্রয়োজনমত দেশ বিদেশে পাঠানো যাইতে পারে। বর্ত্তমানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক পুরোহিতকেই প্রয়োজনমত বিদেশে পাঠানো হইয়া থাকে।

আদিব্রাহ্মসমাজের বাটী সুবিধামত স্থানে না থাকিলেও আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মবন্ধুকে সাপ্তাহিক ও মাসিক উপা-সনার সময়ে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে ইহার ফলে সমাজের কি প্রকার বল আসে। নিয়মিত উপাসকদিগের সাহায্য লাভ করিলে অনেক সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়।

প্রত্যেক সৎকার্য্যেই অর্থ আবশ্যক। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আদিব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীদিগের অনেকেরই এদিকে দৃষ্টি নাই। আমরা আমাদের প্রত্যেক বন্ধুকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেটুকু পারেন সেই-টুকুই অর্থ সাহায্য করুন। তাঁহাদের যেন মনে থাকে যে তৃণসংহতি দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক সভ্য যদি অন্ততঃ বৎসরে ৩৲ টাকা বা মাসে চারি আনা মাত্র দেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ উপকার করা হয়, এবং সেই সঙ্গে সভ্যগণও বিনা মূল্যে প্রতিমাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিত পাইতে পারেন।

আদিসমাজের অধীনে একটী বালক এবং একটী বালিকা বিদ্যালয় থাকা বিশেষ আবশ্যক। বালক বালিকাদের ভিতর দিয়াই প্রচারকার্য্য শীঘ্র ও সুচারু-রূপে নিষ্পন্ন হয়।

গত তিন বৎসরের মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রালয়

হইতে ব্রাহ্মধর্মসংক্রান্ত দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—একটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রচারিত একেশ্বরবাদসম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। উহাকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওঁ "পিতা নোহসি" গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের পিতৃভাব সকল দিক হইতে দেখানো হইয়াছে। এই গ্রন্থ বয়স্ক বালক বালিকাদিগের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই ত্রৈবার্ষিক বিবরণ সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন আদিসমাজের উন্নতিসাধন তাঁহাদের সমবেত যত্ন ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। আদিসমাজের প্রচার সম্বন্ধীয় মত অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক। সকলেই ইহার মণ্ডলী ভুক্ত হইতে পারেন। আমরা দেখিতেছি যে ভগবানও তাঁহার প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই কারণে ইহার কৃতকার্য্যতা বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ আশান্বিত আছি।

উপসংহারে আমরা আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চৌধুরী শতকরা ৩৷০ টাকা সুদের ৫০০৲ পাঁচশত টাকার একখানি কোম্পানির কাগজ মাঘোৎসবের সময়ে সমাজে দান করিয়াছেন।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাক্; মানব-অন্তঃকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে ইহা দেখিয়া, মন ও বুদ্ধির কাজ কি, ও 'বুদ্ধি' শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে মন ও ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি কোন্ পথে চলে তাহা দেখা যাক্। ভালমন্দনির্ব্বাচন করাই এই দেবতার কাজ হওয়ায় (কনিষ্ঠ) মনের মধ্যে তাহার সমাবেশ হইতে পারে না; এবং একমাত্র ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিই বিচার করিয়া যে-কোন বিষয়ের নির্ণয় করে বলিয়া সদসদ্‌বিবেচনশক্তির আর পৃথক্ কোন স্থান থাকে না। যে কথার কিংবা যে বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, সেই বিষয় অনেক হইতে পারে। বাণিজ্য, যুদ্ধ, ফৌজদারী বা দেওয়ানী মোকদ্দমা, মহাজনী, কৃষিকার্য্য ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ে বিবিধ প্রসঙ্গে সারাসার বিচার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহার দরুণ উহাদের ভিতরকার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি বিভিন্ন হয় না। সারাসারবিবেক বলিয়া যে ক্রিয়া, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার; এবং সেই জন্য সেই বিবেক কিংবা নির্ণয়কারী বুদ্ধি একই হওয়া চাই। কিন্তু মনের ন্যায় বুদ্ধিও, শারীরধর্ম্ম হওয়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা, বংশানুক্রমিক সংস্কারবশতঃ বা শিক্ষাদি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে; এবং সেই জন্যই একের বুদ্ধিতে যে বিষয় গ্রাহ্য তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রত্যেক সময়েই ভিন্ন হইয়া থাকে, এরূপ বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর চোখ। কাহারও চোখ ট্যারা, কাহারও বোজা, কাহারও কাণা; আবার কাহারও দৃষ্টি ঘোলাটে, কাহারও বা স্বচ্ছ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া, চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে—বহু, এইরূপ আমরা বলি না। বুদ্ধি সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে বুদ্ধির দ্বারা চাউল কিংবা গম বাছাই করা যায়, যে বুদ্ধির দ্বারা পাথর ও হীরার ভেদ জানা যায়, যে বুদ্ধির দ্বারা কালো, সাদা, মিষ্ট কটু বুঝা যায়, সেই বুদ্ধিই কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় করিবে না, কিংবা সৎ ও অসৎ, লাভ কিংবা ক্ষতি, ধর্ম্ম কিংবা অধর্ম্ম এবং কার্য্য কিংবা অকার্য্য এই সমস্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া শেষে নির্ণয় করিয়া থাকে। সাধারণব্যবহারে, মনোদেবতা বলিয়া উহার যতই গৌরব করা হউক না কেন তথাপি তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে উহা একই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি। এই কথা মনে করিয়াই গীতার ১৮ অধ্যায়ে একই বুদ্ধির সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করিয়া—

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥

"অর্থাৎ—কোন্ কর্ম্ম করিবে, কোন্ কর্ম্ম করিবে না, কোন্ কর্ম্ম করা উচিত, কোন্ কর্ম্ম করা অনুচিত, কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় করিবে না, বন্ধন কিসে হয়, ও মোক্ষ কিসে হয়, ইহা যে-বুদ্ধির দ্বারা (যথার্থ) জানা বুঝা যায় তাহাই সাত্বিকী বুদ্ধি" (গী, ১৮৷৩০) এইরূপ বলিবার পর—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥

অর্থাৎ—"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কিংবা কার্য্য ও অকার্য্য, ইহার মধ্যে যথার্থ নির্ণয় যে করে না, অর্থাৎ ভুল করে, সেই বুদ্ধিই রাজসিক" (১৮।৩১) এবং শেষে—

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

অর্থাৎ—"যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত অর্থাৎ উল্টা নির্ণয় করে সেই বুদ্ধি তামসী" এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন (গী, ১৮।৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, কেবল ভালমন্দ-নির্ব্বাচনকারী অর্থাৎ সদসদ্‌বুদ্ধিরূপ স্বতন্ত্র পৃথক দেবতা গীতার অভিমত নহে। বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভালনির্ব্বাচনকারী কখনই হইতে পারে না এরূপ ইহার অর্থ নহে। তবে বুদ্ধি একই হওয়া প্রযুক্ত, ভালোর নির্ব্বাচন করা এই যে সাত্ত্বিক ধর্ম্ম ইহা এক জনের বুদ্ধিতে পূর্ব্বসংস্কার, শিক্ষা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কিংবা আহারাদির দ্বারা হইয়া থাকে; এবং এই পূর্ব্বসংস্কারাদিকারণের অভাবে এই বুদ্ধিই, কেবল কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের কাজে নহে, অন্য বিষয়েও রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে, এইরূপ উপরের শ্লোকের ভাবার্থ। চোর ও সাধুদের অথবা বিভিন্নদেশীয় মনুষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কেন হয়, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহার যেরূপ উপপত্তি হয়, সেরূপ সদসদ্‌বিবেচনশক্তি স্বতন্ত্রদেবতা বলিয়া মানিলে হয় না। আপনার বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক করা ইহা প্রত্যেকেরই কাজ; এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহব্যতীত এ কাজ হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি, মনুষ্যের প্রকৃত হিত কিসে হয় তাহার নির্ণয় বা পরীক্ষা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়দের মর্জ্জি অনুসারে চলে, সে পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধিকে শুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতে না দিয়া, উল্টা, মন ও ইন্দ্রিয় যাহাতে বুদ্ধির অধীন আসে এইরূপ আমাদের ব্যবস্থা করা উচিত। ভগবদ্‌গীতাতে অনেক স্থানে এই তত্ত্বই কথিত হইয়াছে (গী, ২।৬৭,৬৮; ৩।৭,৪১; ৬।২৪,২৬); এবং এই কারণেই কঠোপনিষদে শরীরের সহিত রথের উপমা দিয়া ঐ রথে যোজিত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে বিষয়োপভোগমার্গে সুনিয়মে চালাইবার জন্য (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধিরূপ সারথীকে মনোময় লাগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টানিয়া ধরিতে হইবে, এইরূপ রূপক করা হইয়াছে (কঠ, ৩।৩-৯); এবং মহাভারতেও দুই তিন স্থানে এই রূপকই কিছু ন্যুনাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহীত হইয়াছে (সভা, বন, ২১০।২৫; স্ত্রী ৭।১৩; অশ্ব, ৫১।৫)। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বর্ণনা করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে, গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ তত্ত্ববেত্তা প্লেটো আপন গ্রন্থে (ফীড্রস ২৪৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টান্তই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাতে এই দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই বটে; তথাপি উপরে নির্দ্দেশিত গীতার শ্লোকে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা এই দৃষ্টান্তটি মনে রাখিয়াই করা হইয়াছে,—এই বিষয়ের পূর্ব্বাপরধারা যাঁহারা অবগত আছেন, ইহা তাঁহাদের চোখে না পড়িয়া থাকিতে পারে না। সাধারণত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মভেদ করিবার আবশ্যকতা যখন হয় তখন ইহাকেই মনোনিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে মন ও বুদ্ধির যখন ভেদ করা হয় তখন নিগ্রহের কর্ত্তৃত্ব মনের হাতে না থাকিয়া ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির হাতে চলিয়া যায়। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে হইলে, পাতঞ্জল যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে একই আত্মা আছে এই তত্ত্ব বুদ্ধির মধ্যে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। ইহাকেই আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ আত্মনিষ্ঠ হইলে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে, ইচ্ছা, বাসনা ইত্যাদি মনোধর্ম্ম (কিংবা বাসনাত্মক বুদ্ধি) স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্ম্মের দিকে ইন্দ্রিয়দিগের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইহাই সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগশাস্ত্রের রহস্য।

মন ও বুদ্ধি ইহাদের নিত্যক্রিয়া ছাড়া সদসদ্‌বিবেকশক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র দেবতা আমাদের শাস্ত্রকারেরা কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি

হইবে। মনকে কিংবা বুদ্ধিকেও গৌরবার্থে দেবতা বলিয়া মানিতে, তাঁহাদের মতে কোন বাধা নাই; কিন্তু যাহাকে মন কিংবা বুদ্ধি বলি, তাহা হইতে ভিন্ন ও স্বয়ম্ভু এরূপ তৃতীয় সদসদ্‌বিবেকদেবতা তাত্ত্বিক বিচারান্তে নিষ্পন্ন হয় না, ইহাই তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। 'সতাং হি সন্দেহপদেষু' এই বাক্যের মধ্যে 'সতাং' পদ বসাইবার উপযোগিতা এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যাঁহাদের মন শুদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ তাঁহাদের পক্ষে অন্তঃকরণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা কিছুই অসঙ্গত নহে। অধিক কি, তাঁহারা যতই কেন আপনার মনকে শুদ্ধ করুন না, কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে মনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক এরূপও বলা যাইতে পারে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রের লোকেরা যে বলেন 'আমরাও এই রকম করেই চলি' এইরূপ বলিবার কোন অর্থ নাই। কারণ, দুজনের সদসদ্‌বিবেচনশক্তি এক নহে, সাধু লোকদিগের সাত্ত্বিক ও চোরদিগের তামসিক হইয়া থাকে। সার কথা—যাহাকে আধিদৈবতপক্ষের লোক সদসদ্‌বিবেকদেবতা বলেন তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মনে হয় না, ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্বরূপদিগের মধ্যে উহা এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ সাত্ত্বিক স্বরূপ, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, আধিদৈবতপক্ষ স্বতই খোঁড়া হইয়া পড়ে।

আধিভৌতিক পক্ষ একদেশদর্শী ও অপূর্ণ এবং আধিদৈবতপক্ষের সহজ যুক্তিও এইরূপ খোঁড়া হইয়া গেলে, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি নির্দ্ধারণ করিবার অন্য কোন মার্গ আছে কি না, ইহা দেখা আবশ্যক হয়। এই মার্গ আধ্যাত্মিক। কারণ, বাহ্যকর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু দেবতা নাই এইরূপ স্থির হইলে পর, শুদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদনের বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, কিংবা বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়া করা যায়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রেও এই প্রশ্নের বিচার আবশ্যক হইয়া থাকে; এবং এই বিচার শুধু বাহ্যজগতের বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রকে ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রবেশ না করিলে পূরা হয় না। আত্মা কিংবা পরমেশ্বরের প্রকৃত সর্ব্বব্যাপী স্বরূপের জ্ঞান যে বুদ্ধির হয় নাই সে বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, এইরূপ এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রকারদিগের চরম সিদ্ধান্ত; এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি কেন বলা হয় তাহা বলিবার জন্যই গীতাতে অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিরূপণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের প্রতি ঠিক্ লক্ষ্য না করায় গীতাসম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন, বেদান্তই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্যবিষয়। গীতার প্রতিপাদ্যবিষয়সম্বন্ধে উক্ত টীকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় ঠিক্ নহে, তাহা পরে সবিস্তার দেখান যাইবে। বুদ্ধি শুদ্ধ কিরূপে হয় ইহা দেখিবার জন্য আত্মারও বিচার করা কেন আবশ্যক হয়, এক্ষণে ইহাই দেখাইব। এই আত্মার বিচার দুই দিক্ দিয়া করা আবশ্যক হয়। (১) আপন পিণ্ডের, ক্ষেত্রের, কিংবা শরীরের এবং মনের ব্যাপারাদির পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আত্মা কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহার বিচার করা—ইহা প্রথম প্রকার (গী, অ, ১৩)। ইহারই সংজ্ঞা—শারীরক কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার; এবং এই কারণেই বেদান্তসূত্রকে "শারীরক (শরীরের বিচারকারী) সূত্র" বলে। নিজের শরীর ও মনের এইরূপ বিচার হইলে পর (২) তাহা হইতে যে তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহা, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহার পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা যে তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহা, এই দুই মিলিয়া একই কিংবা ভিন্ন, ইহা দেখা আবশ্যক হয়। এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত জগতের বিচার-আলোচনাকে "ক্ষরাক্ষরবিচার" কিংবা "ব্যক্তাব্যক্ত বিচার" বলে। ক্ষর কিংবা ব্যক্ত অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমস্ত নশ্বর পদার্থ, এবং অক্ষর কিংবা অব্যক্ত অর্থাৎ সৃষ্টির অন্তর্গত নশ্বর পদার্থের যাহা সারভূত নিত্য তত্ত্ব (গী, ৮।২১; ১৫।১৬)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারের দ্বারা এবং ক্ষরাক্ষর বিচারের দ্বারা নিষ্পন্ন এই দুই তত্ত্বের পুনর্ব্বার বিচার করিয়া, এই দুই তত্ত্ব যাহা হইতে বাহির হয় এবং এই দুয়ের অতীত (পর) সমস্তের মূলীভূত যে তত্ত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহাকে পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম বলে (গী, ৮।২০)। ভগবদ্‌গীতাতে

এই সমস্তের বিচার আছে; পরিশেষে সকলের মূলীভূত যে পরমাত্মারূপ তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হয় তাহা দেখাইয়া কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি বলা হইয়াছে। তাই এই উপপত্তি আমাদের বুঝিতে হইলে আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষরাক্ষর বিচার, পরবর্ত্তী প্রকরণে বিবৃত হইবে। সদসদ্বিবেকদেবতার প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকরণে যাহা সুরু করা হইয়াছে সেই পিণ্ডজ্ঞান কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় তাহা এক্ষণে পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে।

পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক পাঁচ বিষয়, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি,—এই সম্বন্ধে বিচার শেষ হইল। কিন্তু ইহাতেও শরীরের বিচার পূরাপূরি হয় নাই। মন ও বুদ্ধি ইহারাই বিচার করিবার সাধন কিংবা ইন্দ্রিয়। জড় শরীরের মধ্যে ইহা ব্যতীত চেতনা অর্থাৎ চেষ্টাচাঞ্চল্য যদি না থাকিত তাহা হইলে মন ও বুদ্ধি থাকা ও না থাকা একই হইত। সুতরাং উপরি-উক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত চেতনা বলিয়া শরীরের মধ্যে আর এক তত্ত্বের সমাবেশ করা চাই। কখন কখন চেতনাশব্দের অর্থ "চৈতন্য" হইয়া থাকে। কিন্তু চেতনাশব্দ উপস্থিত ক্ষেত্রে 'চৈতন্য'-অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখা হয়। চেতনা অর্থাৎ জড়দেহের মধ্যে যে প্রাণ-চেষ্টা, বা জীবন-ব্যাপার দেখা যায় সেইরূপ অর্থই এখানে অভিপ্রেত। যে চিৎশক্তির দ্বারা জড়ের মধ্যেও চেষ্টা কিংবা ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য; এবং এই শক্তিটি কি, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। শরীরের মধ্যে পরিদৃশ্যমান জীবন-ব্যাপার কিংবা চেতনা ব্যতীত আত্মপর ভেদ যাহার দরুণ উৎপন্ন হয় তাহা এক পৃথক্ গুণ। কারণ, উপরি-কথিতানুসারে, বুদ্ধিরূপ ইন্দ্রিয় কেবল সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করে বলিয়া, আত্মপর ভেদের মূলস্বরূপ অহঙ্কারকে তাহা হইতে পৃথক করা আবশ্যক হয়। ইচ্ছা দ্বেষ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বগুলি মনেরই গুণ; কিন্তু নৈয়ায়িক, এই গুণ আত্মার বলিয়া মনে করায়, এই ভ্রম দূর করিবার জন্য বেদান্তশাস্ত্র মনেতেই উহার সমাবেশ করিয়া থাকে। সেইরূপ পঞ্চমহাভূত যে মূল তত্ত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রকৃতিরূপ তত্ত্বের সমাবেশ মনেতেই হইয়া থাকে (গী, ১৩।৫,৬)। এই সমস্ত তত্ত্ব যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে সেই শক্তি আবার সর্ব্বাপেক্ষা পৃথক। তাহাকে 'ধৃতি' বলে (গী, ১৮।৩৩)। এই সমস্ত বিষয় একস্থানে জড়ো করিলে যে সমুচ্চয়রূপ পদার্থ হইয়া দাঁড়ায় তাহা শাস্ত্রে সবিকারশরীর কিংবা ক্ষেত্র এই নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং ইহাকেই ব্যবহারে আমরা 'চলা-বলা', (সবিকার) মনুষ্যশরীর কিংবা পিণ্ড বলিয়া থাকি। ক্ষেত্র শব্দের এই ব্যাখ্যা আমি গীতা অবলম্বনেই করিয়াছি; কিন্তু ইচ্ছাদ্বেষাদিগুণ গণনা করিবার সময় এই ব্যাখ্যার অল্পস্বল্প ইতরবিশেষ করা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—শান্তিপর্ব্বে জনক-সুলভ সংবাদে (শাং, ৩২০) শরীরের ব্যাখ্যা করিবার সময় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া দিয়া তাহার বদলে কাল, সদসদ্ভাব, বিধি, শুক্র ও বল এই ছয় গুণের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই গণনাঅনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয় এবং গীতার গণনানুসারে কালকে আকাশের ও বিধিশুক্রবলাদিকে মহাভূতের বা প্রকৃতির অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হয়। যাহাই হউক, ক্ষেত্রশব্দের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত। মানসিক ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপ বিশিষ্টচেতনাযুক্ত যে 'সমুদায়' তাহার নাম ক্ষেত্র। শরীর এই শব্দ দেহ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্দ, উপস্থিত স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রশব্দের মূল অর্থ এইরূপ; কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, 'সবিকার ও সজীব মনুষ্যদেহ' এই অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ করা হইয়াছে। উপরে যাহাকে আমি বড় কারখানা বলিয়াছি তাহা ইহাই। বাহিরের মাল এই কারখানায় আনিবার ও কারখানা হইতে মাল বাহিরে পাঠাইবার দরজা—অনুক্রমে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার; চেতনা তাহাদের কর্ম্মচারী; এবং এই কর্ম্মচারী যে ব্যবহার করে, কিংবা করায় তাহাকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার কিংবা ধর্ম্ম বলে।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তম—পরিচ্ছেদ। *

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জানুয়ারী (১৮৮১) তারিখে আমরা বোম্বায়ে আসিলে পর, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোসাভাই-ফ্রাম্‌জি কড়াকার নিকট হইতে আমার স্বামী চার্জ বুঝাইয়া লইলেন। এই বদ্‌লি শুধু তিন মাসের জন্য হইয়াছিল। আমরা শেত-ওলীতে এক বাঙ্গলা ভাড়া করিলাম এবং ভাণ্ডারকারের প্রতিবেশী হইলাম। এই সময়ে ভাণ্ডারকারের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে আমার চেনাপরিচয় হইল। তাঁহার বড়মেয়ে শান্তা-বাইর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমিয়া গেল; সেই সূত্রে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যাওয়া আসা হওয়ায়, শান্তার মা, বোন ও ভায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। ঐ পরিবারের কর্ত্রীঠাকরুণ প্রেমার্দ্রহৃদয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নিরলস; তাই তাঁহার সংসারের সকল লোকই সুখী, নীতিমান্, উদ্যোগী ছিলেন। আনন্দে তাঁহার সময় কাটিত, এবং তিনি যে মনে করিতেন স্বর্গসুখ সংসারেই আছে সে কথা খুবই সত্য। যে কয়েকটি এইরূপ ভাগ্যবান পরিবারের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ভাণ্ডারকারের নাম প্রথমেই ধর্ত্তব্য এইরূপ আমাদের ধারণা। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা-বাই-ভাণ্ডারকার মেয়ে ও বৌর মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না—তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ ব্যবহার কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন গৃহে অল্পস্বল্প দেখা যায়, কিন্তু ভাণ্ডারকারের গৃহে এই ভেদ-ভাব কখনই দেখা যাইত না। সেজন্য, পরিবারের সকল লোকই বেশ মিলিয়া মিশিয়া আনন্দে থাকিত। এই ভাবটা যেমন যেমন আমার চোখে পড়িতে লাগিল, সেই পরিমাণে বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণীর উপর আমার ভক্তি পর-পর বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমশ তাঁহাকে একেবারে আমার মায়ের মতো মনে হইতে লাগিল। সেই ভাবেই আমি তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতাম এবং তিনিও আমাকে ভালবাসিয়া পুনঃ পুনঃ শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলিতেন। শ্রীমতী শান্তা-বাই ও আমার মধ্যে বন্ধুত্ব আমরণ শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিল। ২৪ বৎসর-ব্যাপী বন্ধুত্বের মধ্যে কখনও আমাদের পরস্পরের মধ্যে একবারও ভুল-বুঝাবুঝি হয় নাই; মুখের উপর কিংবা আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করিবার কোন প্রসঙ্গ কখন উপস্থিত হয় নাই। শান্তা-বাই অতিশয় ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৮৪ অব্দে অবোধ শিশুসন্তান-দিগকে, বৃদ্ধ ও বয়স্ক [illegible] পুত্র পতিকে, এবং আমাদের সবাইকে, দুঃখে দুঃখী করিয়া আমার মৈত্রিণী ইহলোক ছাড়িয়া অক্ষয় সুখভোগার্থ পরলোকে গমন করিলেন।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সম্মুখ-ঘরে, পণ্ডিতা রমা-বাই, আর্য্যমহিলাসমাজ নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতি শনিবারে উহার অধিবেশন হইত। এই সভায়, ৮।১০ জন মহিলা ও ৫।৬ জন পুরুষ আসিতেন। কেহ না কেহ কোন বিষয়ের প্রবন্ধ কিংবা দুই এক পংক্তি লেখা, অথবা কখন কখন পুস্তক হইতে কোন উদ্ধৃত অংশ লিখিয়া আনিতেন। তথাপি ডাঃ আত্মারাম দাদা, ভাস্কর-রাও-ভাগবত প্রভৃতি যে সমস্ত বিজ্ঞ লোক সভায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিতেন, "বেশ লেখা হইয়াছে"। "এই সম্বন্ধে কিছু মুখে বলা হউক"—কেহ কেহ এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু মুখে বলিতে কেহ সাহস না করিলে, "উনি"ই ২।৪টি সহজ বাক্য বলিয়া দেখাইতেন এবং বলিতেন এরূপ করিয়া বাক্য বলিবে। এইরূপে আমাদের বোম্বায়ের দিনগুলি বেশ কাটিয়া গেল এবং আমরা পুণায় আসিলাম। যাক্। বোম্বায়ের বৃত্তান্ত লিখিবার সময়, যে সকল কথা সহজ-ভাবে মনে আসিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি।

পুণায়, ১৮৮১ অব্দে, প্রোফেসর সমর-আমীনের জায়গায় উনি নিযুক্ত হইলেন। তদনুসারে আমরা সেখানে আসিলে পর, উনি সেখানকার "চার্জ্জ" গ্রহণ করিলেন; এবং পুণায় কিছুদিন অবস্থিতি করিবার পর, তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে নবীন শিক্ষার্থী মহিলাদের জন্য একটি সভা স্থাপন করিলে ভাল হয়; সেই সভায় নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহিলারা একত্র সমবেত হইবেন; সেই সভায় আমাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ পরিপক্ক ব্যক্তি সহজ সহজ বিষয় লইয়া সহজ ভাষায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া, ১৮৮১র এপ্রিল মাস হইতে, "কাম্বাবলা"র অভ্যঙ্কর বাড়ীতে যে "ফিমেল ট্রেনিং কলেজ" ছিল, তাহারই এক বৈঠকখানা-ঘরে প্রতি শনিবারে সন্ধ্যাকালে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম সভায় ৪।৫ ঘরের প্রায় ১০।১২ জন মহিলা ও ৫।৬ জন পুরুষ আসিত। তন্মধ্যে কৈ-কেরোপন্ত-নানা-ছত্রে নিয়মিতরূপে আসিতেন। ইনি সকলের আগে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনই ভুলিতেন না। কাষ্ঠফলকের উপর ভুগোল, খগোল সম্বন্ধে বিভিন্ন আকৃতি খড়িতে কিরূপ আঁকিতে হয়, একদিন সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্য সময়ে, গ্রহ তারা নক্ষত্র আকাশে কে কোথায় আছে,—কোন্ নক্ষত্র কত রাত্রি থাকে,

* এই পরিচ্ছেদ ভুলক্রমে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

আর চন্দ্রের কোন্ তিথি, এবং কিরূপে তাহা জানিতে পারা যায় প্রভৃতি বিষয়; সহজ ভাষায় বুঝাইয়া বলা হইত এবং যে বিষয়সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত, সে বিষয় কে কতটা বুঝিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই এইরূপ বলা হইত ;—"আমি যাহা তোমাদিগকে বলিলাম, সে বিষয় তোমরা যতটা বুঝিয়াছ তাহা লিখিয়া আনো অথবা এখনই দাঁড়াইয়া মুখে বল।" কোন বিষয় বুঝিয়া থাকিলেও, তাহা তখন দাঁড়াইয়া বলা অপেক্ষা লিখিয়া আনা আমাদের ভাল মনে হইত। কারণ, আমাদের মধ্যে কাহারও দাঁড়াইয়া মুখে বলিতে সাহস হইত না। তাই, লিখিয়া আনিব বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্য শনিবারে যতটা পারিতাম লিখিয়া আনিতাম। এইরূপ লিখিয়া আনা হইয়াছে দেখিয়া "নানা"র খুব আমোদ হইত, এবং যাহারা ঐ লেখা পাঠ করিত সেই সকল মেয়েদিগকে প্রশংসা করিয়া তিনি উৎসাহ দিতেন। কখন কখন আমাদিগকে যে বিষয় বুঝাইয়া বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারায় আমরা যাহা তাহা একটা কিছু লিখিয়া আনিতাম। তখন তিনি হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া, যাহাতে আমাদের ভুল আমরা বুঝিতে পারি সেইরূপ করিয়া বুঝাইয়া বলিতেন এবং সেই বিষয়ের পুনঃ প্রতিপাদন করিয়া আগ্রহের সহিত উপদেশ দিতেন, "আমার নিকট হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ তদনুসারে এই বিষয়ের বৃত্তান্ত আবার লিখিয়া আনো" এইরূপ তিনি বলিতেন। কখন কখন ঐরূপ পুনর্ব্বার লিখিয়া আনিতে আমাদের বিরক্তি বোধ হইত। কিন্তু না লিখিলেও, আমার স্বামীর রাগ হইত বলিয়া "নানা"র কথা-মত লিখিয়া আনিতাম। এইরূপ আশাপ্রদ বাক্য বলিয়া, কখন কখন মাষ্টারের মত রাগ করিয়া ১০।২০ ছত্র লেখা ও ২।৪ ছত্র মুখে বলার কাজ আমাদের দিয়া "নানা" করাইয়া লইতেন। তাছাড়া, আমাকে সংস্কৃত শিখাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সেই সম্বন্ধে তিনি ২।৪ দিন পরে, দুই একবার মৌখিক উপদেশও দিয়াছিলেন। আমার স্বামীরও মত হইল। তথাপি বাড়ীর মহিলারা (প্রাচীন ও নবীন) শিক্ষার বিরোধী হওয়ায়, আমি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এইরূপ জানিবামাত্র, কে শিখাইতে আসেন তাঁহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, যাহাতে কোন সময় তাঁহার কাণে আসে এইরূপ অপমানসূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন এবং "নানা"র স্বভাব মানী ও তেজীয়ান হওয়ায় উহা তাঁহার সহ্য হইল না; তখন, ঐরূপ কোন উপলক্ষ্য না আসিতে দেওয়াই ভাল এইরূপ "উনি" স্থির করিলেন। সাত আট মাস পরে আমাদের এই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। যাক্, আমরা সভায় যে দশ বারো জন জমা হইতাম তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ট্রেনিং-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাষ্টারণী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা রীতিমত শিক্ষিত ও অধিক শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহাদেরই শিক্ষাধীনে আন্নাসাহেব-ভিড়ের কন্যা শিক্ষিত ও বিচক্ষণ হইয়াছিলেন। তাছাড়া তিনি পিত্রালয়বাসিনী হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কাজ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। অবশিষ্ট মহিলারা পদ্ধতিপূর্ব্বক শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমিই কেবল কম শিক্ষিতা এবং সহরের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ ছিলাম। তথাপি "নানা"র স্নেহ আমার উপরেই বিশেষ ছিল। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, কিংবা কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইলে, তিনি প্রথমে আমাকে বলিতেন; আমার কোন ভুলচুক হইলে, আমার স্বামীর সামনেই, "পাগলী" বলিয়া আমাকে রাগাইতেন; এবং এইরূপ ভুল আর কখন করিও না, এইরূপ বলিতেন। সভা জিনিসটা যে কি ও সভায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই সভাসূত্রেই তাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই সভার নামডাক আদৌ না থাকায় আমাদের বাড়ীর মহিলাদের নিকট হইতে আমার কষ্ট পাইতে হয় নাই। শুধু তাহা নহে, আমি প্রতি শনিবারেই বাহিরে যাইতাম, এবং আমি কোন সভায় যাইতেছি এ কল্পনা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে কখন আসে নাই। অন্য মৈত্রিণী যাঁরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের সহিত আমিও কখন কখন সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, এইরূপ হয়ত তাঁহারা মনে করিয়া থাকিবেন। বাড়ীতেই আমার পাঠাভ্যাস চলিত। কিন্তু রাত্রে ও প্রভাতে যতটা হইতে পারে ততটাই হইত; কারণ, দিবসে পুস্তক হাতে লইয়া নীচে যাওয়া সুবিধা হইত না। পুস্তক পড়িতে বসিয়াছি, এই সংবাদমাত্র তাঁহাদের কাণে পৌঁছিয়াছে কি,-অমনি তাঁরা নিন্দাচর্চ্চা সুরু করিয়া দেন। তারপর, ঠাট্টা টিট্‌কারী করিয়া হাবাহাসি করিয়া কত কথাই তাঁরা বলিতেন। এই সকল কথা আমি চুপ করিয়া শুনিয়া, সমস্তই সহ্য করিতাম। তজ্জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইত। এই কথা আমার স্বামীর কানে কখন-না-কখন আসিতই আসিত।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

নব-বর্ষে।*

(শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়)

আজ বিগত বর্ষের ঐ ম্রিয়মান জ্যোতি অতীত সাগরের ধূসর বক্ষ চুম্বন করিতেছে; আজ অতীত বর্ষের

* শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বালিগঞ্জস্থ ভবনে নববর্ষোপলক্ষে প্রাতঃকালে পঠিত হইয়াছিল। আমরা তাহা আনন্দসহকারে প্রকাশ করিলাম।

বিদায়গান পত্র পল্লবে ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া হর্ষের মাঝে বিষাদের ঢেউ তুলিয়া দিতেছে। কিন্তু এই আগামী বর্ষের স্বাগত সঙ্গীতে ঐ বিগত বর্ষের বিদায়সঙ্গীত ছাপিয়া যাইতেছে। নববর্ষের ঐ হেম-অরুণিমা ধরণীখানিকে এক আশ্চর্য্য মহিমামণ্ডিত করিয়া বিশ্ববিমোহন শোভায় বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে।

আজ আমরা সকলে, এই নূতন বৎসরের শুভ প্রারম্ভে নূতন উৎসাহে, নূতন উৎসব-জাগরণে মিলিত শুভেচ্ছা লইয়া বিশ্বের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যে মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল নিয়মের অধীন হইয়া, আমরা বিভিন্ন পথে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া আজ পুনর্ব্বার নব বর্ষের দ্বারে অতিথিভাবে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছি, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। যে সকল প্রাণের জিনিষ লইয়া আমাদের অতীত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাদিগকে নব বর্ষের নূতন উদ্দীপনায় আরও প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া লই; যে সকল স্নেহের ফুল, প্রীতির রত্ন, প্রেমের প্রতিমা, ভক্তির মূর্ত্তি আমাদিগকে শুভেচ্ছার বর্ম্মে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে স্নেহ প্রীতি প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া আমরা আমাদের জীবন সার্থক করি; আর যাঁহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়মধ্যে তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি চিরসঞ্জীবিত করিয়া রাখি।

এই নূতন বর্ষের নূতন উদ্দীপনায় আমাদের প্রাণের কালিমারাশি বিধৌত হইয়া যাক; আবার আমরা আমাদের নিজ নিজ কার্য্যে নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে ব্রতী হই। গত এক বৎসরে আমাদিগের মধ্যে কেহ বা জীবন-পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন কেহ বা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছেন। যিনি অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন তিনি নব উদ্যমে আরও অগ্রসর হইয়া চলুন; আর যিনি নিজ অবহেলা বশতই হউক আর দৈব বশতই হউক পিছাইয়া পড়িয়াছেন, তিনি ভগবানের কর্ম্মময় সংসারে কর্ম্মযোগসাধনায় অগ্রসর হইতে শিক্ষা করুন। নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। সাধনায় সিদ্ধি আছেই আছে। আমাদের জীবনপথ—কাঁটাবন, জলা ও মরুর ভিতর দিয়া মানবত্বের পবিত্র তীর্থের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যেন বাধা বিঘ্ন দেখিয়া উদ্যম-হীন হইয়া না যাই। সংসারে বাধাবিঘ্ন, সুখ-দুঃখ স্বাভাবিক। এই সুখদুঃখ নিয়ত ও নিয়মিত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। যদি অহর্নিশি আমাদিগকে দুঃখসাগরেই ডুবিয়া থাকিতে হইত তাহা হইলে জীবন শুধু বিড়ম্বনা হইত। অথবা যদি আমরা জীবন ধারণ অবধি জীবনবিয়োগ পর্য্যন্ত সুখের হিল্লোলেই ভাসমান হইয়া থাকিতাম তাহা হইলে আর আমাদের জীবনের মহত্ত্ব কখনই বর্দ্ধিত হইতে পাইত না। দুঃখ ও নিরাশার কশাঘাত না থাকিলে মানবজীবন এত সুখময় এত গৌরবময় হইয়া উঠিত না। অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় মানবজীবন দুঃখের পরীক্ষাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া খাঁটি হইয়া যায়। বিগত বৎসরের নিরাশাপূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদিগের আগামী বৎসরের ভবিষ্যৎ পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। অতীতের ত্রুটি পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের জীবনপথের সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে সাহায্য প্রদান করিতেছে।

নববর্ষের উৎসবের হর্ষসঙ্গীতে প্রাণে পুলক সঞ্চারিত হউক। সেই পুলক সঞ্চারণে হৃদয়ে শক্তির বন্যা উথলিয়া উঠুক। সেই উচ্ছ্বসিত শক্তিতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদিগের জীবনতরী কর্ত্তব্য লক্ষ্য করিয়া অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলুক। সংসারের জটিল কুজ্ঝপথ ধর্ম্মালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। মানুষ আমরা—শুধু আমোদ প্রমোদ, আহার নিদ্রা আমাদের জীবনের কার্য্য নয়। আমাদের স্কন্ধে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত আছে—যাহার জন্য আমরা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—"মানব" নামে অভিহিত হইয়াছি। সেই সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিতে যেন আমরা অবহেলা না করি। এই সকল মহৎ কার্য্যসমূহের মধ্যে ধর্ম্মসাধনাই মহত্তম কার্য্য। এই ধর্ম্মেই একমাত্র আমাদের আত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান, প্রেম সেই খাদ্যের প্রধান উপাদান। আত্মার এই আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগানো মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শরীরের খাদ্য যোগানো তত আবশ্যক নয় যত আবশ্যক এই আত্মার খাদ্য যোগানো। সুদূর অতীত যুগের মহাধর্ম্ম প্রচারক সন্ন্যাসীর মহাবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলিতেছি—"Better starve the body than the Soul."

আজ আমরা আমাদের নিজের নিজের সমাজের প্রদর্শিত পথে, নিজের নিজের জাতীয়ভাবে এই নবীন বর্ষে নব উৎসাহে মানবত্বের দুর্লভ তীর্থের পথে আবার চলিতে আরম্ভ করি। আপাতত বিভিন্ন পথে যাত্রা করিলেও ভবিষ্যতে দেখি যে আমরা একই স্থানে একই তীর্থে উপনীত হইয়াছি। সে তীর্থ এক, বহু নয়—সকলকেই সেই একই তীর্থে উপস্থিত হইতে হইবে। তবে পথ ভিন্ন বলিয়া কেহ বা আগে কেহ বা পরে পৌঁছাইবেন। বিভিন্ন পথের পরিব্রাজক আমাদের নিষ্কামভাবে সেই তীর্থে যাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। বৃথা "মুক্তি মুক্তি" করিয়া কোন ফল নাই। যত কামনায় কামনা মিটে না—বরং আরও বাড়িয়া

যায়। সাধনায় সিদ্ধি হয়; মুক্তি সাধনার স্বভাবজ ফল। আমাদের চাহিতে হইবে না; সাধনা পূর্ণ হইলে মুক্তি আপনিই হইবে।

সুখ ও দুঃখের মাঝে আশা ও নৈরাশ্যের মাঝে, উৎসাহ ও নিরুৎসাহের মাঝে আমাদের এই নবীন বর্ষ নবীন আলোকছটায় আমাদের জীবনটাকে সমুদ্ভাসিত করিতে আসিয়াছে। এস আজ আমরা এই নববর্ষের আগমনে স্বাগত সঙ্গীতে বিশ্ব ভরিয়া দিই। এই নববর্ষের স্বাগত সঙ্গীত নব নব রাগ রাগিণীর সুরে বাজিয়া উঠুক। তরুণ অরুণিমায় আজ ধরণীর পৃষ্ঠ মণ্ডিত করুক, আমরা সেই স্বর্গগত অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলি:—

আজ পুরাণ যা কিছু দাওগো ঘুচিয়ে,
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে,
শ্যামলে, কোমলে কনকে হীরকে
ভুবন ভরিয়ে দাও গো।
আজি বীণায় মুরজে স্বননে পয়জে,
জাগিয়ে উঠুক গীতি গো
আজি হৃদয় মাঝারে অন্তর বাহিরে
ভরিয়া উঠুক প্রীতি গো।
আজি নূতন আলোকে নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভূলোকে দ্যুলোকে,
নূতন হাসিতে বাসনা রাশিতে
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

মিশ্র আলাইয়া—ঝাঁপতাল।

(নববর্ষের প্রাতঃকালে আনন্দসভায় গীত)

নব বরষের আলো প্রবেশিল ঘরে।
উজলিল তব আলো বিশ্ব চরাচরে॥
তোমার মহিমা দেখি জগতের মাঝে।
গাহে সবে শুভ গীত শঙ্খ ধ্বনি বাজে॥
আনন্দ করহ সবে আজি মহোৎসব।
উষার শুভ্র আলোকে দেখা দিল নব॥
পূর্ণ তব জ্যোতিঃ কিবা চৌদিকেতে ভাসে
রসভরা বসুন্ধরা পুলকিত হাসে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

II { ধা ণা। ধা -পা পা। পা মা। গা -া মগা I গা রা। গমা -পা মা।
ন ব ব • র ষে আ লো• প্র বে শি•

০ ১ ॥ ২ ৩
। পা -রা। সা -া -া I সা সা। মা -গা মা। পা পা। ধা -া না I
ল • রে • • উ জ লি • ল ত ব আ • লো

২ ৩ ০ ১
I র্সা র্রা। র্সর্রা -র্গা র্রা। র্সা -না। ধা -পা -া } II
বি শ্ব চ• • রা চ • রে • •

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
II পা পা। র্সধা -র্সা র্সা। র্রা র্সা। র্সা -া র্সা I র্সা ধা। র্সা -া র্রা।
তো মা র• • ম হি মা দে খি জ গ তে

০ ১ ২ ৩
। র্সা র্সা। ধা -পা -া I { র্গা র্গা। র্গা -া র্মা। র্গা র্রা। র্সা না ধা I
র • ঝে • • গা হে স • বে শু ভ গী • ত

২ ৩ ০ ১
I পা পা। ধনা -র্সর্রা র্সনা। ধা ণা। ধা -পা -া } II
শ ঙ্খ ধ্ব• •• নি• বা • জে • •

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I·I { সা মা । মা -মপা মা । পা পা । মপা -ধা পা I মা মা । মা -গা মা ।
আ ন ন্দ ০ ০ ক র হ স০ ০ বে আ জি ম ০ হোৎ

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। মপা ধা । পা -া -া I পা পা । ধনা -র্সর্রা র্সা । ন্না ধা । ণা ধা পা I
স০ ০ ব ০ ০ উ ষা র০ ০০ ড ভ্র আ লো কে ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I মা মা । মা -গা মা । পমা -ধা । পা -া -া } I পা পা । র্সধা -র্সা র্সা ।
দে খা দি ০ ল ন০ ০ ব ০ ০ পূ র্ণ ভ০ ০ ব

০ ১ ২ ৩ ০ ১ ২
। র্রা র্সা । র্সা -া র্সা I র্সা ধা । নর্সা র্রা । না র্সা । ধা পা -া I র্গা র্গা ।
জ্যো তি কি ০ বা চৌ দি কে০ ভে ভা ০ সে ০ ০ র স

৩ ০ ১ ২ ৩ ১
। র্মা র্গা র্রা । র্সা না । ধনা -র্সর্রা র্সা I পা পা । ধনা র্সরা র্সনা । ধা ণা ।
ভ ০ রা ব স্থ ন্ধ০ ০০ রা পু ণ কি০ ০০ ত০ হা ০

১
। ধা -পা -া II II
সে ০ ০

প্রতিদান।

(শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী)

দাও প্রভু, যত দুঃখ আছে মোরে দাও ;
যতেক যাতনা তব এ বিশ্ব সংসারে,
সবি মোরে দিয়ে তার বিনিময়ে নাও
দক্ষিণার মূল্যরূপে হে প্রভু আমারে।
তোমার সকল দান বহি নত শিরে,
দুঃখ ব্যথাভরা মোর ক্ষুদ্র দেহখান,
তোমারি চরণে সঁপি দিব ধীরে ধীরে
প্রতিদানে হে দয়াল ! লহ মোরে দান।

উন্নতি প্রসঙ্গ।

দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার—আমাদের দেশের হইল কি ? আমরা কি শিক্ষিত হইয়াও প্রকৃত মানুষ হইব না ? আমাদের যথার্থ হিত কোথায় তাহা বুঝিয়াও কি চলিতে শিখিব না ? কিছুদিন পূর্ব্বে খুলনা বাসীতে দেখিলাম যে সেখানকার গভর্ণমেণ্টের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বিদায়োৎসব উপলক্ষে নাকি "খেমটা নাচের" বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা শিক্ষিত, দেশের মধ্যে গণ্যমান্য, তাঁহারা কোথায় আদর্শস্থল হইয়া দেশের জনসাধারণকে মঙ্গলের পথে,—সত্যের পথে টানিয়া আনিবেন, না তাঁহারাই স্বয়ং সেই অতি ঘৃণ্য অমঙ্গলময় দুর্নীতির বীজ সাধারণের চিত্তক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতেছেন। কি লজ্জার কথা !

এবারকার তত্ত্ববোধিনীতে "দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার শীর্ষক" যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে তাহাতে সমাজের দুর্নীতির প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্যব্যাধির বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজের এই ব্যাধিটি এতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইল।

ইহার বিপরীতে একটী ঘটনায় আমরা কিছু আশ্বাসিতও হইয়াছি, আমরা বুঝিয়াছি যে সমাজের এই ব্যাধি নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য নহে। সেদিন যখন অন্যতর পুলিস কোর্টের সুবিচারে একটী কুলীয় রমণীকে ভুলাইয়া লইয়া যাইবার অপরাধে দুইটী দুষ্টা স্ত্রীলোকের সশ্রম কারাবাস দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইল, তখন সেই শাস্তির আদেশ শুনিয়া আদালতে উপস্থিত জনসাধারণ যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল—তাহাতে এ বিষয়ে দেশবাসীর মন যে বেশ একটু সজাগ হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইয়াছিল।

মুসলমানের বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা—গত মাঘ মাসের আল্ এসলাম পত্রে শ্রীযুক্ত সিরাজী লিখিত বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত

হইলাম। বহুকাল যাবৎ এদেশে একটা ধারণা ছিল যে মুসলমানের, হোক না কেন সে বাঙ্গালী, কেবল উর্দ্দু, পারসী প্রভৃতি ভাষা নিজস্ব করা উচিত—বঙ্গভাষা কিছুতেই নহে। সুখের বিষয় যে এই ভ্রমান্ধ কুসংস্কার দূর হইতেছে। "বঙ্গীয় মুসলমান পুঁথিসাহিত্যের সংখ্যা প্রায় ৮৭০০।" শুনিলেও যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। লেখক যে বঙ্গভাষাকেই বঙ্গবাসী মুসলমানের মাতৃভাষা সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারই চর্চ্চায় বঙ্গবাসী মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান সময়ের যেমন উপযোগী, তেমনি ইহা সমীচীন হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যদি চিন্তাশীল লেখক উঠিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া রহিয়া বসিয়া উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দসমূহ যথাযুক্তরূপে আপনাদের লেখার প্রবেশ করাইতে পারেন, তবেই তো সেগুলি ক্রমেই বঙ্গভাষার নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইবে। তখন আর বঙ্গীয় মুসলমান লেখকদিগকে বিদ্যাসাগরী ভাষার জন্য দুঃখবোধ করিতে হইবে না। যদি তাঁহারা উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার শব্দ জোর জবরদস্তিতে তাঁহাদের লেখায় বড় বেশী ঢুকাইতে যান, তবে আমাদের বিশ্বাস যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই সূত্রে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহাদের সাহিত্যসমিতি হইতে একটী উর্দ্দু-বঙ্গ এবং বঙ্গ-উর্দ্দু অভিধান প্রণয়ন করুন। এরূপ একটী অভিধান থাকিলে (বঙ্গাক্ষরে লিখিত) তাহার অনেক কথা বঙ্গভাষায় ঢুকাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

সমাজ সেবা—আমাদের দেশের উন্নতির অন্যতর প্রধান লক্ষণ এই যে দেশে মানবসেবার একটা মহান্ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। মানবসেবার যে প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে, এই তরঙ্গ উঠাইবার মূল মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য দেশের চিরনমস্য হইয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম বলিতে গেলে স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনকে তাঁহার উপাসনার অন্যতর অঙ্গ ঘোষণা করিয়া মানবসেবারও বীজ দেশে ভাল করিয়া প্রোথিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ সেই বীজকে সযত্নে লালনপালন করিয়া আজ তাহাকে ফলবান বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। সমাজসেবাসমিতির প্রদর্শনী খুলিবার উপলক্ষে সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় একটী মহান্ সত্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, জীবনের লক্ষ্য কেবল নিজেকেই উন্নতির চরম শিখরে তোলা নহে, কিন্তু অপর সকলকে সুখী করা।

গ্রন্থ পরিচয়

The Bose Institute:—হিন্দুপেট্রিয়ট আফিস হইতে এই পুস্তিকা খানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ইহাতে সার জগদীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদত্ত বক্তৃতা, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিসের লেখনীপ্রসূত বিজ্ঞানমন্দিরসম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ, আমেরিকার Scientific American নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্র হইতে উদ্ধৃত সার জগদীশচন্দ্রের প্রাণের একতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞানমন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি ছবিতে ছবিতে ভরা। ইহার পক্ষে ১৲ এক টাকা মূল্য যৎসামান্য। বিজ্ঞান মন্দিরের ন্যায় বঙ্গের এত বড় গৌরবের জিনিস যে পুস্তিকাতে বর্ণিত আছে, তাহা বঙ্গের ঘরে ঘরে এক এক খণ্ড রাখা উচিত।

সংবাদ।

আনন্দ সভা—গত ১লা বৈশাখে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে আনন্দ সভার বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর আতিথেয়তায় অভ্যাগত সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে বৈদিক অর্চ্চনা মন্ত্র (ওঁ পিতা নোঽসি) এবং ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত স্তোত্র (ওঁ নমস্তে সতেতে জগৎ কারণায়) পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। সঙ্গীত সঙ্ঘের ছাত্রীগণ স্বরসন্ধিসহ সেতার বাদ্যে সকলকেই আনন্দিত করিয়াছিলেন। ভবানী সাহিত্যসভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী—ইহাতে ছেলেদের মনের "খোঁচ" অনেকটা কাটিয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন যুগ প্রবন্ধ সাধারণের উপাদেয় লাগিয়াছে—ইহা গত সংখ্যায় শিক্ষাসমাচারে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান পদ্ধতি—আমরা গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী অভিমত পাইয়াছি, তাহা এস্থলে সাদরে প্রকাশ করিলাম।

The book appears to me the very best of its kind, and I only wish that the cultured and educated Hindu families of Bengal followed these principles, which any Hindu can adopt without much difficulty.

শোক সংবাদ।

৺উমাশশী দেবী—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে আদিব্রাহ্মসমাজের সংশ্লিষ্ট ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণির পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে। বিগত ৫ই বৈশাখ ৪৮ বৎসর বয়সে বিষম কলেরারোগে তাঁহার দেহান্ত হয়। সুমিষ্ট ব্যবহারে তিনি প্রতিবেশী সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক তাঁহার সিঁথির সিন্দুর সংগ্রহ করিবার জন্য মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। আমরা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি। ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

৺স্বর্ণপ্রভা বসু—বিগত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বসুর পত্নীর দেহান্ত হইয়াছে। তিনি সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক শুভানুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল। মহর্ষি তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বে যখন যোড়াসাঁকোতে তাঁহার আবাস-নিকেতনে থাকিতেন, আমরা প্রায়ই বসুজায়াকে তথায় দেখিতে পাইতাম। তিনি মহর্ষিকে বার্দ্ধক্যে সেবা করিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। মহর্ষিও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, তাঁহার মত নিষ্ঠাবতী রমণীকে হারাইয়া আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার সহায় হউন।

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ১২ইবৈশাখ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি দরিদ্র পুস্তক রচয়িতার উৎসাহদাতা ছিলেন। গুরুদাস বাবু না থাকিলে তাঁহাদের অনেক সুযোগ্য লেখকের রচিত পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি সাধুতায় সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে গ্রন্থপ্রকাশকের অগ্রণী ছিলেন, এবং এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শে আজকাল অনেকে সুলিখিত ও সুচিন্তিত পুস্তকের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমরা গুরুদাস বাবুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ পিতার পথ তুল্যভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন আমরা এইরূপ আশা করি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

গত চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজে আগমনের পূর্ব্বে" প্রবন্ধে পুস্তক দেখিয়া গণিত প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কারণে কেশবচন্দ্রকে পরীক্ষা হইতে উঠাইয়া দিবার কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মানন্দের আত্মীয় স্বজনেরা মনে ব্যথা পাইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমরা এবিষয় লেখকের কর্ণগোচর করাতে তিনি আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"আমার প্রবন্ধের কোন অংশে কেশবচন্দ্রের কোন কোন আত্মীয় হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছেন জানিয়া আমি নিজেও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কেশবচন্দ্রের আত্মীয় ছাড়িয়া অন্য কোন ব্যক্তিও এতটুকু আঘাত পাইবেন জানিলে আমি উহা প্রকাশ করিতাম কি না সন্দেহ। ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে কি সামান্য ঘটনা হইতে ভগবানের কি প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহাই আমি প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। আলোচ্য বিষয়টী এতই প্রচারিত যে ইহা প্রকাশ করিলে যে কাহারও মনে আঘাত লাগিবে তাহা আমার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই বিষয়টী শ্রদ্ধেয় ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের Life and Teachings of Keshab Chandra Sen গ্রন্থে প্রথম দেখি, ঐ কথাই শ্রদ্ধেয় ৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের কেশব চরিত গ্রন্থে (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণেও) দেখি। তাহাই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের History of the Brahmo Samajএও উল্লিখিত দেখি। কাজেই বিষয়টীর সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমানে দেখিতেছি এই ঘটনা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমি উপরোক্ত তিনজন মনীষী ব্যক্তির প্রধানত পদানুসরণ করিয়াছি মাত্র। যাই হোক, এই ঘটনা উল্লেখ করাতে যখন একজনেরও হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তখন আমিই তাহাতে অধিকতর আঘাত পাইলাম, তাহা বলা বাহুল্য।"

আয় ব্যয়।

১৮৩৯ শকের বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৭৮২/১
পূর্ব্বকারস্থিত	৩৶৶/১১
সমষ্টি	৯৭৮৬/০
ব্যয়	৯৭৮০৶/৬
স্থিত	৫৶৶/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	১৪০০৲
বণ্ডেড অয়ার হাউস	১০০৲
কাগজের সুদ	৫০৶৬
সাম্বৎসরিক দান	২৮৲
আনুষ্ঠানিক দান	১০৩৷৬
এককালীন দান	৬১৫৷০
দানাধারে প্রাপ্ত	৫৷৶০
মাঘোৎসবের দান	৬১৷৶০
থিওলজিক্যাল কলেজ ফণ্ড	৬২৫৲
সসপেন্স	১১৶৭
গচ্ছিত আদায়	১০১১৶৯
হাওলাত আদায়	৬৬৷৶৬
হাওলাত জমা	২৭০০৶/৩
সমষ্টি	৭৭৮৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বকেয়া মূল্য	১২৬৲
হাল মূল্য	২০৪৶৶০
মাশুল	১৬৷৶০
নগদ বিক্রয়	৫৶৶০
সমষ্টি	৩৫৩৷০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	১৩১৶/৬
গচ্ছিত পুস্তক	১৪৫৲
কমিশন	৷/৯
মাশুল	১৩৶৬
সমষ্টি	২৯০৷/৯

যন্ত্রালয়।

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৪৮৫৲
সমাজের পুস্তক মুদ্রণ	৭৩৲
অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৫৪৫৷/৬
কাগজের মূল্য	২১৭৷/৯
দপ্তরী	২৮৲
সমষ্টি	১৩৪৮৶৶৩
	৯৭৮২/১

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	১৪২৶
কর্ম্মচারীর বেতন	৭৭২৲
সরঞ্জামী	৮৶৬
ডাকমাশুল	৯৶৶৭
পাখাকুলি	৭৷৯
Electric Light	৪১৷৶০
Tax	২০৭৶৶০
License	১২৲
খাজনা	১৶৩
সসপেন্স	৯৫৲
পূর্ত্তকার্য্য	১২৭৶০
পায়খানা	৩৫৬৲
কাগজ ক্রয়	৩৫১৶০
থিওলজিক্যাল কলেজ ফণ্ড	৬৩১৷৶৯
অন্যান্য	১৫৫৶৶৬
গচ্ছিত খরচ	৯১৭৶৶৬
হাওলাত	৩৬৶৬
হাওলাত শোধ	২২৪১৷৶৯
কাগজ গচ্ছিত	৫০০৲
সমষ্টি	৬৬১৫৶৶৯০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

কাগজ ক্রয়	৩১৬৲৬
পত্রিকা মুদ্রণ	৪৮৫৲
প্রবন্ধ	১৭১/০
বাঁধান	৩০৲
ডাকমাশুল	৬৪৷/৬
কর্ম্মচারীর বেতন	৭০৲
সমষ্টি	১১৩৭৶৶০

পুস্তকালয়।

দপ্তরী	১৶৶০
পুস্তক ক্রয়	৬৷/০
আসবাব	৫২৷০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	৬০৷৶০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	১৭/৬
বিজ্ঞাপন	৬৷৶০
ডাকমাশুল	১৩৶৶৯
অন্যান্য	১৶৬
মূল্য ফেরত	৶৶০
সমষ্টি	১৬০৷/৯

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	৯৯৭৷৶০
জলপানী	৩৶০
প্রুফ কাগজ	১৩৷৶৩
ছাপার কাগজ	৪১৭৶৶৬
কালী	১৩৶০
দপ্তরী	৫০৷০
অক্ষর	১৫০৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৬২৶৶৬
অন্যান্য সরঞ্জামী	১৫৬৶৯
সমষ্টি	১৮৬৫৷৶০
	৯৭৮০৶/৬

কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি

উৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, ভবনাথ রায়	১৲
,, চুণীলাল মজুমদার	১৲
,, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৷৵৹
,, চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, চারুচন্দ্র মিত্র	১৲
,, রাধাকিষণ ভট্টাচার্য্য	১৲
,, দুলালচাঁদ মল্লিক	৷৷৹
,, বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
,, ভগবতীচরণ মিত্র	১৲
,, ক্ষণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, বিনোদবিহারী দত্ত	১৲
,, হরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
,, বীরেন্দ্র চন্দ্র শীল	৷৷৹
,, যুটবেহারী চট্টোপাধ্যায়	৷৷৹
G. Sarwar	৷৷৹
,, মনীন্দ্রনাথ রায়	৷৹
,, রমেশচন্দ্র দত্ত	৪৲
,, জিতেন্দ্রনাথ দাস	৷৹
,, দক্ষিণারঞ্জন চন্দ্র	৷৹
,, কল্যাণচন্দ্র বড়াল	৷৷৹
,, শ্রীশকুমার মুখোপাধ্যায়	৷৹
,, তারিণীচরণ গুপ্ত	১৲
,, লালচাঁদ সাহা	৷৹
,, অম্বিকাচরণ মিত্র	১৲
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, অবনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
,, তুলসীদাস দত্ত	২৲
,, বরদাচরণ চন্দ্র	৷৹
,, শ্যামলাল সরকার	৪৲
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	

১৮৩৯ শকের শ্রাবণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দত্ত	১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৫৲
,, সীতানাথ বক্সী	১৮৩৭। ৩৮ ও ৩৯ শক	৯৲
,, সতীনাথ রায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
,, সুশীলকুমার গুপ্ত	১৮৩৮ শক	২৲
,, ভগবতীচরণ মিত্র	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
,, সুধীন্দ্রনাথ নন্দী	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৪৲
,, শ্রীজানকীনাথ রায়	১৮৩৮ শক	১৲
,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৮৩৬। ৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৩৲
,, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী	১৮৩৯ শক	৩৲
S. D. Gupta Esqr.	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু	,,	৩৲
,, ভুবেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	১৷৷৹
ডাক্তার জি, এল, গুপ্ত	,,	২৲
পি, সি চৌধুরী স্কোয়ার	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র বসু	,,	৩৲
,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	,,	৩৲
C. S. Ghosal Esqr.	,,	৩৲
মাননীয় মহারাজা হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর	,,	৩৲
শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক	,,	৩৲
,, গোবিন্দলাল দাস		৩৲
রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রকুমার বসু		২৲
শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়		১৲
,, বিজয়চন্দ্র সিংহ		৩৲
,, পান্নালাল মিত্র	,,	৩৲
,, [illegible]বিহারী বসাক		৩৲
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর		৩৲
,, রসিকলাল রায়		১৷৷৹
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ		৩৲
,, রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়		৩৲
,, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য		২৲
,, অক্ষয়কুমার সিংহ		৩৲
,, বনমালী চন্দ্র		৩৲
,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী		৩৲
,, রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর		৩৲
,, সতীশচন্দ্র মল্লিক		৩৲
,, কালীপ্রসন্ন বিদ্যাপঞ্চানন		২৲
,, অসিতবরণ মিত্র		২৲
মিসেস আর, এন, রায়		২৲
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন		৩৲
ডাক্তার বি, এল, চৌধুরী		৩৲
রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর		৩৲
শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৩৯ শক	৩৲
,, বটকৃষ্ণ ঘোষ	১৮৪০ শক	২৲
শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	১৮৩৯ শক	২৲
শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র নাথ	,,	২৲
,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত	১৮৪০ শক	১৷৷৹
রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে	১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ শক	৯৲
,, মনোহর মুখোপাধ্যায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক	৬৲
,, সত্যরঞ্জন বসু	১৮৩৮ শক	২৸৹
,, দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ পর্য্যন্ত	৮৲
রায় সাহেব নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৮৩৫—১৮৩৯	১৫৸৹
শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আঢ্য	১৮৩৪ হইতে ১৮৩৬ শক	৫৲
,, হৃদয় চন্দ্র আচার্য্য	১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৪৲
,, অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৮৪০ শক	৩৲
যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮৩৯ শক	৩৲
গৌরহরি নন্দী	১৮৩৯ শক	১৷৷৹
প্রফুল্লকুমার বাগচী	১৮৩৯ শক	২৲
পাঁচুগোপাল মল্লিক	১৮৪০ শক	৩৲
শিশিরকুমার দত্ত	১৮৪০ শক	১৷৷৹
,, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৪০ শক	৩৲
মাননীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	১৮৪০ শক	৩৲

১৮৩৯ শকের শ্রাবন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দান প্রাপ্তি।

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, বনমালী চন্দ্র	১৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু	২৲
,, স্বর্ণকুমারী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক	৪৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রী ক্ষতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০১০
শ্রীমতী সরোজিনা দেবী	২০১০
শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে	২৫৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৫৲
,, প্রতিভা দেবী	২৫৲
,, মোহিনী সেন গুপ্তা	২৲

এককালীন দান।

শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী	৫০০৲

শ্রীযুক্ত হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশঙ্করনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের উপনয়ন উপলক্ষে দান ১০০৲

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে]	৩৸৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷৹
দশোপদেশ	৷৷৹
মাঘোৎসব	৷৷৹
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজসনের সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত)	৵৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৸৵৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৵৹
ব্রহ্মোপাসনা	⁄৹
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	⁄৹
Trust Deed	⁄৹

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵৹
পরলোক ও মুক্তি	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄৹
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	„ 1 „
The Theist's Prayer Book	„ 1 „
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸৹
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	১৲

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	৷৷
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸৹
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Adi Samaj as a Church	„ 4 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	„ 4 „
The Doctrine of Christian Resurrection	

	পূর্ণ মূল্য।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

গদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷৹
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	৷৷৹
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৷৷৹

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (ভাল বাঁধা)	৸৹
রাজা হরিশ্চন্দ্র „	৷৷৹
আঁখিজল „	৷৷৹
শ্রীভগবৎ কথা „	৷৷৹
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১৷৹
ওঁ পিতা নোঽসি	৷৷৹
প্রাণের কথা	৷৵৹
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	৷৷৹
বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	⁄৹
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	৷৹

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

সত্যসুন্দর মঙ্গল	১৲
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	৷৷৹

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	৷৹
ধর্ম্মশিক্ষা	⁄৹

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১৷৹

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত

সনেট পঞ্চাশৎ	৷৷৹

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

আমার খাতা	৸৹
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸৹

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীত পরিচয়	৵৹

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত মঞ্জরী	৪৲

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

Life of Dwarka N. Tagore	৷৹

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 462.

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৮৯৭ সংখ্যা ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা আষাঢ়, শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ৷৴০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। { আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

নিবেদন।

কমলাকান্ত-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি আমি কালীভক্ত কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। রামপ্রসাদী পদাবলীর পরই কমলাকান্তের পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় কমলাকান্তের জীবনীকথা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কেহই আলোচনা করেন নাই। রামপ্রসাদের জীবনী লিখিয়া আজ আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্গবাসীর নিকট, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান-বাসীদের নিকট আমার এই প্রার্থনা তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তাহা হইলে আমার ও বঙ্গভাষার পরমোপকার সাধন করা হইবে। শুনিয়াছি ফরিদপুর থানথানাপুরের ভুলুয়া সন্ন্যাসী ও "পল্লীবাসী" সম্পাদক সাধকের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "পল্লীবাসী" সম্পাদককে আমি এ বিষয়ে চিঠি লিখিয়া কোনই উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ বাঙ্গালী সমাজ যে অনুসন্ধান ব্যাপারে উদাসীন ইহা আমি প্রসাদের জীবনী লিখিবার সময় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। নিরুৎসাহ না হইয়া আমি পুনরায় বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইলাম। আশা করি এবার মিলিত বাঙ্গালী আমাকে কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি।

Po. Ranchi-Sectt.
Govt. Quarter B/20
Dorenda--(B & O.)

নিবেদক—
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১। কমলাকান্তের জন্মস্থান কালনা কি মাতুলালয় চান্না গ্রামে। এই চান্না গ্রাম থানা-জংসনের নিকটবর্ত্তী।

২। ইনি কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর পিতৃবংশের বংশতালিকা কাহারও জানা থাকিলে লিখিবেন।

৩। ইহাঁর জন্ম সন ও তারিখ জানিবার কোন উপায় আছে কিনা?

৪। ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন? ইহাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল কি না?

৫। স্বর্গীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে কমলাকান্ত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানা কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়া করিয়া রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইবেন। আমি বইখানা দেখিয়া তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইব।

৬। কথিত আছে উক্ত মহারাজা বাহাদুর সাধকের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুস্তক আনাইয়া উহা সংগ্রহ করেন। এই মহিলার কোন আত্মীয় জীবিত আছেন কিনা এবং থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। এই পাণ্ডুলিপি এখন কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

৭। কথিত আছে, কমলাকান্ত 'সাধন পঞ্চক' (ষট্‌চক্র নিরূপণ) নামে একখানা গ্রন্থ (বাংলা পয়ারে) লিখিয়াছিলেন। 'সাধন পঞ্চক' যে কমলাকান্তের রচিত ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা।

৮। কমলাকান্তের কত বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়; বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার কমলাকান্ত নাটিকার ১ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'দামোদরের বেলাভূমিতে তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল।' এই চিতাভূমি এখনও নির্ণয় করা যায় কিনা? এই পুণ্যস্থানে কমলাকান্তের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং সেই সময়ে 'কালী সব ঘুচালি লেটা' এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী সাধকের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল।

৯। কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোনও অপ্রকাশিত জনশ্রুতি কাহারও জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

১০। অপ্রকাশিত কমলাকান্ত পদাবলী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন।

১১। কমলাকান্তের নামের সহি এবং তাঁহার হাতের লেখা থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন, উহা আমি ব্লক করিয়া ছাপাইব।

১২। সাধকের শেষ সঙ্গীত— 'কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি স্মরণ লব।।'

এই পদটীর সম্পূর্ণ অংশ কাহারও জানা থাকিলে আমাকে লিখিবেন।

১৩। কোটাল হাটের কমলাকান্তের গৃহের প্রাঙ্গণে যে স্থানে (তৃণশয্যায়) ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থান এখনও নিরূপণ করা যায় কি না?

১৪। কমলাকান্তের তৈল চিত্র পাইবার কোন উপায় আছে কি না?

১৫। কমলাকান্ত নিজেই কি গানগুলি লিখিয়া রাখিতেন, না অপর কেহ গান গাহিবার সময় লিখিয়া লইতেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

১৬। কাল্‌নায় সাধকের কোন চিহ্ন এখনও আছে কি না?

১৭। চান্নাগ্রামের বিশালাক্ষী দেবী কত কালের; ঐস্থানে যে কমলাকান্ত সাধনা করিতেন ইহার কোনও প্রমাণ আছে কি না?

১৮। বঙ্গসাহিত্যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর (১২৬৪ সাল), ৺শ্রীকান্ত মল্লিক (১২৯২ সাল), 'সাধক সঙ্গীত' রচয়িতা (১৩০৬ সাল) ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহ, 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ সাল) লেখক শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। এই কয়জন ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যিক কমলাকান্তের পদাবলীর আলোচনা করিয়াছেন কি না?

১৯। পদাবলী পড়িয়া মনে হয় কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং দক্ষিণাকালী তাঁহার বীজমন্ত্র ছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

২০। 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার' স্থান নির্দ্দেশ এখনও করা যায় কি না। এই মাঠ কোথায়? চান্নাগ্রামের নিকট কি?

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

প্রার্থনা।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

জগতের দ্বার হতে আমারে তোমার দ্বারে
ডেকে লও দয়াময়! বারেক করুণা করে।
পথে পথে, পথে পথে, 'তিতি' শুধু নেত্রাসারে-
ঘুরিতে পারি না আর সারাটী জনম ধরে॥

দাও দেব! কণ্ঠে মম বিহঙ্গের মধু তান,
পরাণে ফুলের হাসি, তটিনীর প্রেমোচ্ছ্বাস,
গাহিতে একান্তে শুধু তোমারি আরতি-গান,
আনন্দে আপনা-হারা নিশিদিন-বর্ষ-মাস॥

দাও নাথ! হৃদে মম মলয়ের পরশন,
পুলকে খেলিয়া যাক্ সুধাধারা চন্দ্রমার,
সুপ্তি যেন টুটে যায়, যেন আসে জাগরণ,
রাতুল চরণে তব অর্পিবারে অর্ঘ্যভার॥

হে প্রভু, হে দীনবন্ধু, বড় শ্রান্ত চিত আজ,
ক্ষণেক বিশ্রাম শুধু, দাও মোরে বিশ্বরাজ!

আনন্দ।

নানা জাতি ফুল ফুটিয়া নানা বর্ণে উদ্যানটীকে সুসজ্জিত করিয়াছে। সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালা, পূর্ণ শশধর শোভা পাইতেছে। অদূরে বনরাজি, পর্ব্বতমালা, কল-নিনাদিনী তটিনী। নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিতেছে।

এই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিয়া তুমি প্রেমিক, তোমার হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতেছে। তুমি আত্মহারা হইয়া সেই সুধাসিন্ধুতে ভাসমান হইয়াছ। আমি প্রেমিক নহি, কিন্তু প্রেমিকদের সহবাসে থাকিয়া কতকটা প্রেমের আভাস পাইয়াছি, তাই আমিও সেই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারি না। তাহার পানে তাকাইয়া থাকি এবং যদিও সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে না পারি, কতকটা আনন্দ অনুভব করি। আমার হৃদয়রূপ শুষ্ক ভূমিতে যেন বারিবিন্দু বর্ষণ হইতে থাকে। আমার নিরবচ্ছিন্ন দগ্ধ-হৃদয় যেন যন্ত্রণা হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করে। আমি মনে করি যদি ঐ সৌন্দর্য্যরাশি রাখিবার জন্য আমার হৃদয়ে প্রচুর স্থান থাকিত, তাহা হইলে আমি সেগুলিকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া চিরজীবন সুখী হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আমার হৃদয় নিতান্ত সংকীর্ণ, সে শান্তিবারির এক বিন্দুর অতিরিক্ত ধরিবার স্থান নাই, তাই আমি ঐ প্রেমিকের ন্যায় পরম-আনন্দে বঞ্চিত।

হতভাগ্যের উপরেও হতভাগ্য আছে। আমার ত দশা এই; আবার ঐ ভাগ্য-হীনের পানে একবার চাহিয়া দেখ, তাহার হৃদয়টী দুঃখে পরিপূর্ণ। এই

মনোহর দৃশ্যের চমৎকারিতা তাহার হৃদয়ের দ্বারদেশ পর্য্যন্তও পৌঁছিতে পারে না। তাহার হৃদয়ের কপাট সর্ব্বদাই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সে এই মনোহর দৃশ্যের ভিতর দিয়া যখন চলিয়া যায়, তখন অন্ধের ন্যায় সে কিছুই দেখিতে পায় না। তাহার হৃদয়ে নিয়ত আগুন জ্বলিতেছে, সেই অনলে সে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, সে হাহাকার করিতেছে, জগতের কোন বস্তুই তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না, পক্ষান্তরে সুন্দর সুমনোহর বস্তুগুলি তাহার হাহাকার বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

হাহাকার কিসের? অভাবের। এ অভাব এমনি যে, জগতের কোন বস্তু দ্বারা তাহা পূর্ণ হয় না। যত পায় ততই এ অভাব বাড়ে বই আর কমে না। কোন একটী বস্তু লাভ করিলে এই অভাব পূর্ণ হইবে মনে করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য সে নিয়ত চিন্তায়, পরিশ্রমে, হাহুতাশে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে বস্তুটীকে পাইয়াও সে সুখী হয় না, কারণ তখন সে দেখিতে পায়, উহার দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ হয় না। হৃদয়ের অশান্তি যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। তখন আবার অপর একটী বস্তু লাভ করিয়া অভাব পূর্ণ করিবার আশায় যত্ন ও চেষ্টা আরম্ভ করে। উত্তরোত্তর লালসা বৃদ্ধিই হইতে থাকে, অভাব পূর্ণ হয় না, শান্তি আসে না। তাহার হৃদয় যাহা চায়, তাহা পায় না। কোন কালে সে সুখী হইতে পারে না। সুখ বস্তুতে নাই, ঐশ্বর্য্যে নাই, বিলাসিতায় নাই। সুখ কোথায় আছে? সুখ প্রেমে আছে। যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, সে নিত্য-সুখী, তাহার অভাব কিছুমাত্র নাই, তাহার হৃদয় সদাসর্ব্বদা পরিপূর্ণ। জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাহার নিকট অনন্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে রঞ্জিত। প্রেম শূন্য হৃদয় মরুভূমি সদৃশ। বারিধারা পতিত হইলেও শুষ্ক হইয়া যায়।

সুখ প্রেমে। প্রেমের স্থান হৃদয়, সুতরাং বাহ্য বস্তুর সহিত প্রেমের বা সুখের অতি সামান্য সম্বন্ধ। হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে বাহ্য বস্তু কোন প্রকারে আমাদিগকে সুখী করিতে পারে না। বাহ্য বস্তুর সুখোৎপাদনের অধিকার থাকিলে উহা সমভাবে সকলকে সুখী করিত। বাহিরে অনেক বস্তু আছে, যাহা প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের উদ্দীপন করে, ইহা সত্য। কিন্তু প্রেমিকের করে, সকলের করে না। তবে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে প্রেমের আবাস বাহিরে? ঐ সুমনোহর কুসুমরাশিতে, ঐ সুনীল আকাশে, ঐ সুমধুর স্বর-লহরীতে যদি প্রেম থাকিত, তবে উহা সমভাবে সকলের মন আকর্ষণ করিত। তাহা ত করে না। ঐ প্রেমিক যে আত্মহারা হইয়া পড়ে, আমি হই না কেন? ঐ হতভাগ্য কেন সঙ্গীতের স্বরমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? প্রেম প্রেমিকের হৃদয়ে বাস করে। বাহিরের বস্তুগুলি যে এত সুন্দর, তাহা ঐ প্রেমিকের হৃদয়ের প্রেমরাশি বিনির্গত হইয়া উহাদিগকে রঞ্জিত করে বলিয়া। তাই উহারা আমার নিকট যত সুন্দর, প্রেমিকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সুন্দর এবং অপ্রেমিকের নিকট সৌন্দর্য্যহীন।

জগতে এমন কতগুলি বস্তু আছে, তাহা সাধারণতঃ অনেকের হৃদয়ে প্রেমোদ্দীপন করে, তাই বলিয়া প্রেম যে ঐ সকল বস্তুতে বাস করে, ইহা বলা যায় না। অধিকাংশের হৃদয়ে ততটুকু প্রেম আছে যাহা দ্বারা ঐ সকল বস্তু প্রেমরঞ্জিত হয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে ততটুকু প্রেমেরও অভাব কোন কোন হৃদয়ে কোন কোন সময়ে ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রকিরণ বা মলয়হিল্লোল যে ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রেমের সামগ্রী, ইহা বলা যায় না। এমনও লোক আছে যে, এসবে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। আবার আজি যাহা প্রিয় হয়, অনেক সময়ে কাল তাহা প্রিয় হয় না। শোক-সন্তপ্ত-হৃদয় চন্দ্রকিরণাদি কিছুই উপভোগ করিতে সমর্থ নহে, অথচ ঐ ব্যক্তিই শোক-সন্তপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল বস্তুতে প্রেমানুভব করিত। ফল কথা, হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত না হইলে বাহিরের কোন বস্তুই প্রেম আনিতে পারে না। বাহিরের কোন বস্তুতে প্রেম নাই। প্রেমের উৎস অন্তরে; ঐ উৎস অন্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া বহির্জ্জগতকে প্লাবিত করে। বাহিরের প্রত্যেক সুন্দর বস্তুটী অন্তরের প্রেমে বিনির্ম্মিত। যাহার অন্তরে যত অধিক প্রেম, বাহিরের প্রেমের বস্তুও তাহার নিকট তত অধিক। যিনি প্রেমময় তাঁহার নিকট বিশ্ব-

সংসারের যাবতীয় বস্তুই স্বর্গীয় প্রেমে রঞ্জিত। ঐ শিশুর পানে তাকাইয়া দেখ, অধিক দূরে যাইতে হইবে না। শিশু যাহা দেখিতেছে, যাহা পাইতেছে, তাহাতেই আনন্দ অনুভব করিতেছে। অনন্তের প্রেমের বস্তুও তাহার নিকট অনন্ত। তুমি আমি যাহা দেখি তাহাই মাত্র সে দেখে না, তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক দেখে। অনন্ত প্রেমের রাজ্য তাহার সম্মুখীন হয়, অনন্ত সৌন্দর্য্য-রাশিতে সে পরিবেষ্টিত হয়; সে সৌন্দর্য্য, সে প্রেম, সাধারণ দৃষ্টির অগোচর!

হৃদয়ভেদে যে প্রেমের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয় তাহার কারণ কি? প্রেমের উৎস কি কাহারও হৃদয়ে বড়, আর কাহারও হৃদয়ে ছোট? প্রেমের উৎস অনন্ত, তাহার ছোট বড় নাই সকল হৃদয়ে সমভাবে আছে। কাহারও হৃদয়ে এই উৎস চাপা পড়িয়া আছে, আর কাহারও হৃদয়ে উহা উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাই হৃদয়ভেদে প্রেমিকতার ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। উৎস উন্মুক্ত হইলে প্রত্যেক হৃদয় অনন্তপ্রেমে প্রেমিক হইবে। আমাদের দেহটী পার্থিব হইলেও আমরা পার্থিব নহি। আমার "আমি" বলিতে যাহা আছে—তাহা সেই অনন্ত "আমি"র অবতার। আমার "আমি"ও অনন্ত। আমাতেও সেই অনন্তের অনন্তত্ব আছে। আমার দেহটী সান্ত হইলেও, আমি অনন্ত। আমার প্রেমও অনন্ত, আমার জ্ঞানও অনন্ত, আমার সত্তাও অনন্ত। আমি প্রেম, জ্ঞান ও সত্তা কোথায় পাইব? এসকল সেই অনন্ত হইতে আসিয়াছে। দৃষ্টিশক্তির দোষেই হউক, কি কোন আবরণবশতই হউক, সময় সময় বৃহৎ বস্তুকে যেমন ক্ষুদ্র দেখায়, আমার "আমি"কেও আমি সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখি, অনন্ত দেখি না। আমার চক্ষুর দোষ, আমার চক্ষু অনন্ত দেখিতে জানে না—ততদূর প্রসারিত হয় না, একদেশমাত্র দেখিতে পায়।

আমার জ্ঞান ও সত্তা যেমন অনন্ত হইলেও আমার নিকট সান্ত, আমার প্রেমও যদিও অনন্ত, তাহার অনন্তত্ব আমার অনুভূতির বিষয় নহে। আমরা জীবনের পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকি ততই আমাদের অনন্তত্ব সংকীর্ণতা লাভ করিয়া আমাদিগকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বার্থপর হইতে থাকি, অর্থাৎ "আমিত্বের" গণ্ডীটিকে ক্রমশঃ ছোট করিয়া ফেলি। প্রাকৃত অবস্থায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড লইয়া "আমি"; কৃত্রিম স্বার্থপর অবস্থায় আমার বাড়ীটী আমার পরিবারস্থ কয়েকটী লোক ও আমার কয়েকটী জিনিসপত্র লইয়া "আমি"। আমার প্রেম তখন ঐ কয়েকটী লোক ও জিনিসে মাত্র আবদ্ধ থাকে। ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের আর কোনও বস্তুতে যায় না। যদি এই স্বার্থ-পরতার গণ্ডীকে কোন প্রকারে উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমি যে চক্ষে আজ ঐ আমার বাড়ীটীকে, আমার পরিবারবর্গকে দেখিতেছি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে সেই চক্ষে দেখিব, আমার প্রেম অনন্তত্ব লাভ করিবে। এইটী আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা; আমরা এই স্বাভাবিক অবস্থা হারাইয়া ক্রমশঃ কৃত্রিমতা লাভ করি। জগতের যাহা কিছু সমস্তই আমার—আমার প্রেমের বস্তু, স্বার্থপরতা তাহা বুঝিতে দেয় না।

স্বার্থচিন্তা হইতে যাবতীয় বাসনার উৎপত্তি হয়। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ এই স্বার্থচিন্তা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া আমাদিগকে শান্তিময় রাজ্য হইতে দূরে লইয়া যায়। আমাদের অন্তরস্থ প্রেমজলধি এই বাসনারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আমাদিগকে প্রেমানন্দ অনুভব করিতে দেয় না। আমরা ত প্রত্যেকে প্রেমের মূর্ত্তি, বিশ্বচরাচর ত প্রেমেরই রাজ্য, ভগবানের অনন্ত প্রেম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়ান রহিয়াছে, আমরা সকলে ভগবানের অনন্ত প্রেমে বিনির্ম্মিত, তথাপি আমাদের এত দুঃখ এত অভাব! আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সুধা পরিত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করিতেছি, কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করিতেছি। হাসিতে ইচ্ছা করিলেই চিরজীবন হাসিয়া কাটাইতে পারি, আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে পারি; তাহা করি না,—হাসি আসিলে হাসিকে চাপি, নৃত্য আসিলে পা থামাইয়া দেই; যাহাতে আনন্দ আছে,—প্রকৃত সুখ আছে, সে পথে চলি না; কণ্টকাকীর্ণ পথে চলি, নিজের হাত পা নিজে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া চিরজীবন বন্দী-

ভাবে অতিবাহিত করি। একদিনের জন্যও মনে শান্তি পাই না; একদিনের জন্যও আত্মাকে স্বাধীন মনে করিতে পারি না, চিরকাল যেন পরাধীনভাবে অতিবাহিত করিতেছি; চিরজীবন দুশ্চিন্তায়, ভয়ে, আশঙ্কায়, সন্তর্পণে কাটাইতেছি। পদে পদে বিপদের বিভীষিকা দেখিতেছি, সকল সময়ে আপনাকে বিপন্ন মনে করিতেছি, এ সকল যন্ত্রণা কেন ভোগ করিতেছি? এ যন্ত্রণার মূলে কি কিছু আছে, না শুধুই ভ্রম? নশ্বর কখনও স্থায়ী হয় না, আপন কখনও পর হয় না, কামক্রোধাদি রিপু কখনও প্রকৃত সুখ দিতে পারে না; এই সকল অসম্ভব যদি সম্ভব করিতে চাও, এবং তাহা না করিতে পারিলে যদি তোমার দুঃখ উপস্থিত হয়, তবে তুমি যে বিষম ভ্রমে পড়িয়াছ এবং সেই ভ্রমে পড়িয়াই যে এত কষ্ট পাইতেছ, তাহার আর সন্দেহ কি? ইহা তোমার স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রসর্পাদির ভীতির ন্যায়—নিদ্রা না ভাঙ্গিলে এ ভীতি যায় না। মায়ানিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে এ সব কিছুই থাকিবে না। কে আপন, কে পর, কে আমার, কে তোমার, মান, অভিমান, আধিপত্য, যশ, এসকল একে একে অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে; তখন দেখিতে পাইবে যে তুমি আপনাকে আপনি বাঁধিয়া ছাঁদিয়া আপনি কষ্ট পাইতেছিলে। তুমি কোন কালে পরাধীন নও, তুমি চিরস্বাধীন; এ জগতে তুমি হাসিতে আসিয়াছ, কাঁদিতে আস নাই। আনন্দের লহরী তোমার চারিদিকে বহিয়া যাইতেছে, আনন্দের উৎস তোমার হৃদয়মাঝে অহরহ প্রবাহিত হইতেছে, আনন্দের মধুর-মুরলী তোমার কর্ণকুহরে দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে—তুমি এই অনন্ত আনন্দজলধির একটী বুদ্বুদ, আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছ। এস মানব! একবার এই বাসনারাশি বিসর্জ্জন দিয়া, আত্মপর ভুলিয়া গিয়া,—মান, অভিমান, কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া, শান্ত সমাহিতভাবে ঐ বিজন স্থানে বসিয়া আত্মনিষ্ঠ হইয়া থাক; দেখিবে, তুমি অনন্ত সুখে সুখী; তুমি অনন্ত সত্তা! তুমি অনন্ত আনন্দ!

শাণ্ডিল্য-কথা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইতিহাস প্রণয়ন বিষয়ে বড়ই উদাসীন ছিলেন। ইতিহাসের উপকরণ স্বরূপে তাঁহারা আপনাপন মহৎ কার্য্য সকল রাখিয়া গিয়াছেন—সেই সকল কার্য্য আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরেও আমাদের জীবনকে নবতর শক্তিমন্ত্রের সঞ্জীবনীশক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। তাই বর্ত্তমান যুগে আমরা দিনক্ষণের হিসাবসহ এবং মহাপুরুষদিগের ও বড় বড় রাজ্যের দৈনন্দিন ঘটনার উল্লেখসহ যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থকে ইতিহাস নামে গৌরবান্বিত করি, সে ভাবের ইতিহাস সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য—সংগৃহীত হইলেও তাহা নির্ভুল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অসম্ভব হইলেও পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসসংগ্রহে আমাদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে দেশের অধিবাসীগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণে এবং তাঁহাদের নামকীর্ত্তনে গৌরব অনুভব না করে, সে দেশ নিশ্চয়ই সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং সে দেশের অধিবাসীগণ অতীব কৃপাপাত্র।

বঙ্গদেশে আজ যে এত উন্নতি দেখা যাইতেছে, ইহার মূল যে সেই সুদূর অতীতকালে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সঙ্গে আগত পঞ্চকায়স্থ, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। তাঁহাদের বংশগৌরবে আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিব, ইহা কি কিছু আশ্চর্য্য? কাহারও মতে কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন এবং কাহারও মতে তাঁহাদের পিতা ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং অপর কাহারও কাহারও মতে দুই বিভিন্নসময়ে উক্ত দুইদল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন—এক সময়ে ক্ষিতীশপ্রভৃতি এবং পরবর্ত্তী সময়ে ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই সকল আলোচনার মধ্যে এইটুকু সার পাওয়া যায় যে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আবার ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে ভট্টনারায়ণই মান্যতম ছিলেন দেখা যায়। সেই ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ছিলেন।

শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রেরই শাণ্ডিল্যঋষি হইতে উৎপত্তি ধরা হইয়া থাকে। গোত্রশব্দের মূল ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কি ছিল বা না ছিল, তাহা এখানে আলোচনা করা আবশ্যক নহে। বর্ত্তমানে গোত্র শব্দের অর্থে মূলে যে বংশ হইতে তদনুস্যুত বংশ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বংশকেই ধরা হয়। যেমন, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় যত বংশই হৌক, সকলই সেই মূল শাণ্ডিল্যবংশ হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। এই শাণ্ডিল্যের পিতা কশ্যপ ঋষি। কশ্যপঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র অর্থাৎ কশ্যপঋষির পূর্ব্বপুরুষদিগের নামপর্য্যন্ত গোত্রপ্রবর্ত্তনের সময়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

শাণ্ডিল্য গোত্রকর্ত্তা বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা ঋষি ছিলেন। তিনি এত বড় লোক হইয়াছিলেন যে তাঁহার নামে তাঁহার বংশ পরিচিত হইতে পারিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম আট জন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন—যমদগ্নি, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি ও অগস্ত্য। এই আট ঋষি হইতে আট গোত্র উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে উনপঞ্চাশ গোত্রে বিভক্ত হয়। শাণ্ডিল্যগোত্র এই উনপঞ্চাশ গোত্রের অন্তর্গত একটী গোত্র।

এই উনপঞ্চাশ গোত্রগুলির প্রত্যেকটীর ভিন্ন ভিন্ন প্রবর উল্লিখিত হয়। ইহা সর্ব্ববিদিত যে পূর্ব্বকালে আর্য্যদিগের প্রত্যেক গার্হস্থ্য-অনুষ্ঠানেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞকালে যজ্ঞকর্ত্তা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নামোল্লেখ করিতেন। কোন গোত্রের তিন, কোন গোত্রের চার, এইরূপ যে গোত্রের যত সংখ্যক পিতৃপুরুষের নাম উল্লেখ করা বিধি ছিল, যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে সেই সেই গোত্রীয় যজ্ঞকর্ত্তার ততসংখ্যক পিতৃপুরুষের নামোল্লেখ করিতে হইত। বিভিন্নগোত্রের বিভিন্নসংখ্যক পিতৃপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিবার নিয়ম থাকাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ বা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে গোত্রে যে কয়েকজন মহাপুরুষ বা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গোত্রের সেই কয়জন ঋষিরই নামোল্লেখ করিবারই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভবত সেই সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখযোগ্য ঋষিগণই প্রবর নামে অভিহিত হইতেন। 'প্রবর' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ (প্র+বর=প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ) আমাদের এই অনুমানকে বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। ক্রমে যতসংখ্যক ঋষিদিগের নামোল্লেখপূর্ব্বক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, সেই যজ্ঞকেও ততসংখ্যক ঋষিসম্বন্ধীয় প্রবর বলিয়া বলা হইত—যথা, দ্ব্যার্ষেয় প্রবর, ত্র্যার্ষেয় প্রবর ইত্যাদি।১ শাণ্ডিল্যগোত্রে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ত্র্যার্ষেয় প্রবর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কেহ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাক সেই যজ্ঞ উপলক্ষে স্বগোত্রের তিন ঋষির নাম উল্লেখ করিতে হয়—শাণ্ডিল্য, আসিত এবং দেবল।

শাণ্ডিল্যঋষি যে গোত্রকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামে যে একটী বংশ ধারাবাহিকরূপে অভিহিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মবিষয়ক অনেক নূতন তত্ত্ব তিনি উত্তরবংশীয়দিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রের মধ্যে আমরা তাঁহার অনেক উক্তি উদ্ধৃত দেখিতে পাই। লাট্যায়ন সূত্রের পঞ্চবিংশতম "ব্রাহ্মণের" (বেদবিভাগবিশেষের) এক প্রবক্তা বলিয়াই তাঁহাকে দেখি। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অগ্নিরক্ষার জন্য বেদীনির্ম্মাণপ্রণালীসম্বন্ধে শাণ্ডিল্য ঋষিই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।* তিনি আর একটী বিষয় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জগতের নিয়ন্তা ও আমাদের অন্তরাত্মা,† উভয়েই যে সেই একই ব্রহ্ম, ইহা শাণ্ডিল্য ঋষিই সর্ব্বপ্রথম অন্তরে অনুভব করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উক্ত

১ "তস্য (অগ্নেরাহবনীয়স্য) প্রকর্ষেণ প্রার্থনানি [illegible]দৃগ্ভিরেকদ্বিত্রিপঞ্চসংখ্যাকৈর্বিশিষ্টানি একার্ষেয়া [illegible] পঞ্চার্ষেয়াঃ প্রবরা ইত্যুচ্যন্তে।" আশ্বলায়ন—Max Muller's Ancient Sans. Lit. P. 386.

* ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় (অবশ্য ইহা অনুমানমাত্র) যে, গৃহাদিনির্ম্মাণ প্রভৃতি বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে শাণ্ডিল্য ঋষি একজন authority ছিলেন।

† ছান্দোগ্যে আছে "আত্মা"; কিন্তু সেই স্থানটি (৩য় প্রপাঠক ১৪ অ) পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে আমাদের "আত্মার আত্মা"কে "আত্মা" বলিয়া বলা হইয়াছে।

হইয়াছে—"ইহা শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন, ইহা শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন।" শতপথ ব্রাহ্মণেও (১০ম-৬-৩) এই জ্ঞান শাণ্ডিল্যকথিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "শাণ্ডিল্যসূত্র" নামক ভক্তিতত্ত্ববোধক একখানি গ্রন্থও তাঁহার কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাহারও কাহারও মতে গ্রন্থখানি শাণ্ডিল্য ঋষির বিরচিত নহে, তদ্বংশীয় অন্য কোন লোকের লিখিত। কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আসিত এবং দেবল, ইহাঁরা উভয়েই বেদমন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের পঞ্চম অবধি চতুর্ব্বিংশতিতম সূক্ত পর্য্যন্ত কুড়িটী সূক্ত ইহাঁদের উভয়ের রচিত। দেবল ঋষি একটী সংহিতাও রচনা করিয়াছেন। সেই সংহিতা তাঁহারই নামানুসারে দেবলসংহিতা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শাণ্ডিল্য ঋষি ভারতের কোন্ স্থলে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে স্থিরনির্ণয় করা অসম্ভব। তবে দেখা যায় যে হর্দোই জেলার অন্তঃপাতী ব্রহ্মাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত একটী স্থান শাণ্ডিল্য নামে অভিহিত। "এই হর্দয় প্রদেশের চারিদিকে শাণ্ডিল্য নাম ধ্বনিত। এখানকার প্রধান তহশিল শাণ্ডিল্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান পরগণার নাম শাণ্ডিল্য। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন শাণ্ডিল্য, এই জেলার সর্ব্বপ্রধান তড়াগের নাম শাণ্ডি—ইহা শাণ্ডিল্যেরই সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে এই হর্দয় প্রদেশে কেবল কান্যকুব্জীয়-ব্রাহ্মণদিগের বাস—অন্য কোনও ব্রাহ্মণ নাই। তাই মনে হয়, এই হর্দয় প্রদেশ, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ বৈদিক ঋষি শাণ্ডিল্যের স্থান ছিল। মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে; আই যুগযুগান্তর পরে এখনও এই স্থানের শাণ্ডিল্য নাম স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই যে শাণ্ডিল্যের আশ্রম ছিল, তাহা মহাভারতে শল্যপর্ব্বোক্ত নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া একটী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে আশ্রমটী কাহার, বলরাম সেই স্থানের ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন—এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের ধৃতব্রতা, সাধ্বী, সংযতা ও ব্রহ্মচারিণী কন্যা শ্রীমতী ছিলেন।"* ইহা আলোচনা করিয়া আমাদের অনুমান হয় যে শাণ্ডিল্যঋষি কোন না কোন সময়ে এই শাণ্ডিল্যনামক স্থানে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই কারণে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই শাণ্ডিল্যস্থান অন্যতর পরম তীর্থস্থান নিঃসন্দেহ।

প্রাণ গেল।

(বাউলের সুর)

প্রাণ গেল প্রাণ গেল—
(ওমা) প্রাণ গেল, প্রাণ গেল।
সুখের আগুণ চাইনাকো আর
দুখের জলই ভালো—
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল।
সুখের দুখের দুলিয়ে দোলায়
কি যে ভেল্‌কী খেল—
(যবে) সুখের নেশায় ভুলি মা তোমায়,
মরণ পরশে আপনে হারাই,
(তখন) অসাড় জীবন করতে চেতন
প্রাণের দহন জ্বালো!
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল।
সুখের দুখের দুলিয়ে দোলায়
কি যে ভেল্‌কী খেল—
(যবে) দুখের ভয়ায় একলা ধরায়
পাগল হয়ে ছুটিয়া বেড়াই,
(তখন) আপন কোলে লইয়ে তুলে
শান্তিধারা ঢালো।
প্রাণ গেল প্রাণ গেল
(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল॥

১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১০২৫।

* ১০১৮ সালের শ্রাবণের সাহিত্যে শ্রীযুক্ত ক্ষতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য" প্রবন্ধ দেখ।

তন্ত্রের ইতিহাস

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অত্রকথিত চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম বামকেশ্বর তন্ত্রের প্রথম পটলে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—দেবী মহাদেবের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন, হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট সমস্ত তন্ত্র (সাত কোটি মহামন্ত্র) এবং মাতৃদিগের উত্তম চতুঃষষ্টিতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তি-তন্ত্রের মধ্যে প্রধান যে চতুঃষষ্টি তন্ত্র তাহা বলিয়াছেন। তাহাদের নাম মহামায়া তন্ত্র, শম্বরতন্ত্র (শম্বর দুই প্রকার বৃহৎ ও সাধারণ) যোগিনীজাল, তত্ত্বশম্বর, ভৈরবাষ্টক (অষ্ট ভৈরব বিষয়ক এক তন্ত্র) বহু রূপাষ্টক, অষ্টমাতৃকা-বিষয়ক আটখানা তন্ত্র বহুরূপ তন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। যামলাষ্টক ব্রহ্ম যামল, বিষ্ণু যামল, রুদ্র যামল, লক্ষ্মী যামল, উমা যামল, স্কন্দ মামল, গণেশ যামল ও জয়দ্রথ যামল। চন্দ্রজ্ঞান তন্ত্র, বাসুকি তন্ত্র, মহাসম্মোহন তন্ত্র, মহোচ্ছুষ্য তন্ত্র, বাতুল, বাতুলোত্তর, হৃদ্ভেদ, গুহ্য তন্ত্র, কামিক তন্ত্র, কলাবাদ, কলাসার, কুব্জিকামত, তন্ত্রোত্তর, বীণা তন্ত্র, ত্রোতল, ত্রোতলোত্তর, পঞ্চামৃত, রূপভেদ, ভূতোড্ডামর, কুলসার, কুলোড্ডীশ, কুলচূড়ামণি, সর্ব্বজ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, মহালক্ষ্মীমত, সিদ্ধ-যোগেশ্বরী মত, কুরূপিকা মত, দেবরূপিকামত, সর্ব্ববীরমত, বিমলামত, পূর্ব্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, উত্তরাম্নায়, নিরুত্তর, বৈশেষিক তন্ত্র, জ্ঞানার্ণব তন্ত্র, বীরাবলী তন্ত্র, অরুণেশ তন্ত্র, মোহিনীশ তন্ত্র ও বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র"। *

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরী স্তবের উপাদান তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত করিয়াছেন। বামকেশ্বর তন্ত্রই তাঁহার প্রধান অবলম্বনরূপে প্রতিভাত হয়। এক হাতে বামকেশ্বর তন্ত্র অপর হাতে আনন্দলহরী স্তোত্র রাখিয়া পাঠ করিলে উভয়ের একতানত্ব বুঝিতে আর বাকী থাকে না। অনেকেরই জানা আছে যে,—শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া পুনরায় ভারতে শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র পাঠে জানা যায় যে, তিনি শুধু বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিবারণার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই, তাঁহার আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মমত অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মব্যপদেশে অনেক প্রকার অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল। শৈব বৈষ্ণব গাণপত্য প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই শরীরে উপাস্য দেবতার আয়ুধ-চিহ্ন ধারণ প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ তামসিক আচরণ সমাদৃত হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিরুদ্ধ মত নিরাসপূর্ব্বক শ্রৌত মত স্থাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। শক্তির উপাসকগণ উপাসনা ব্যপদেশে অবৈধরূপে মদ্য মাংস প্রভৃতি ভোজনে সমাসক্ত হইয়াছিল † সেই সমস্ত শাক্তদিগকে তিনি শাস্ত্রবলে এবং যুক্তির সাহায্যে পরাভূত করিয়া নিজমতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অশাস্ত্রীয় ব্যবহারনিরত সেই সমস্ত সম্প্রদায়ীকে তিনি স্পষ্টভাষায় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রাদি

---

* শ্রীদেব্যুবাচ—
ভগবন্ সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ ভবতা যে প্রকাশিতাঃ।
চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৄণামুত্তমানি চ॥
মহামায়া শম্বরঞ্চ যোগিনীজালশম্বরম্।
তত্ত্বশম্বরকঞ্চৈব ভৈরবাষ্টকমেব চ॥
বহুরূপাষ্টকঞ্চৈব যামলাষ্টক মেব চ।
চন্দ্রজ্ঞানং বাসুকিঞ্চ মহাসম্মোহনস্তথা।
মহোচ্ছুষ্যং মহাদেব! বাতুলং বাতুলোত্তরং॥
হৃদ্ভেদং তন্ত্রভেদঞ্চ গুহ্যতন্ত্রঞ্চ কামিকং।
কলাবাদং কলাসারং তথান্যৎ কুব্জিকামতং॥
তন্ত্রোত্তরঞ্চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তরং।
পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোড্ডামরমেব চ॥
কুলসারং কুলোড্ডীশং কুলচূড়ামণিস্তথা।
সর্ব্বজ্ঞানোত্তরং দেব! মহাকালীমতস্তথা॥
মহালক্ষ্মীমতঞ্চৈব সিদ্ধযোগেশ্বরী মতং।
পূর্ব্বপশ্চিম দক্ষঞ্চ উত্তরঞ্চ নিরুত্তরং॥
তন্ত্রং বৈশেষিকং জ্ঞানং বীরাবলী তথাপরং।
অরুণেশং মোহিনীশং বিশুদ্ধেশ্বরমেব চ॥
এবমেতানি শাস্ত্রাণি তথান্যান্যপি কোটিশঃ।
ভবতোক্তানি মে দেব! সর্ব্বজ্ঞানময়ানি চ॥

† অথ শিষ্যবরৈর্বৃতঃ সহস্রৈ রমুযাতঃ স সুধন্বনাচরাজ্ঞা।
ককুভো বিজিগীষু রেব সর্ব্বাঃ প্রথমং সেতুমুদারধীঃ প্রতস্থে॥
অভবৎ কিল তস্য তত্রশাক্তৈ র্গিরিজার্চ্চাকপটাত্মধুপ্রসক্তৈঃ
নিকটস্থ-বিতীর্ণভূরিমোদস্ফুটরিংখৎ পটুযুক্তিমান্‌বিবাদঃ॥
সহিযুক্তিভরৈর্বিধায় শাক্তান্ প্রতিবাগ্‌ বাহরেণহপি তান শক্তান্।
দ্বিজজাতি বহিষ্কৃতাননার্য্যান্ অকরোল্লোক-হিতায় কর্ম্মসেতুং॥
(শঙ্কর দিগ্বিজয়। ১৬ সর্গ। ১।২।৩)

শাস্ত্রোক্ত বেদের অনুকূল আচার, অর্থাৎ যাহা বৈদিক মতেরই সহায়তা করে, তাদৃশ আচার গ্রহণীয়, কিন্তু বেদের বিরুদ্ধ আচার কিছুতেই গ্রাহ্য নহে *। তিনি উপদেশমাত্র দিয়াই নিরস্ত হন নাই; কিন্তু তদনুরূপ আচরণেরও সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কাঞ্চী নগরীতে পরাবিদ্যার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি-দেবীর উপাসনার উপযোগী বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অসদাচার তান্ত্রিকদিগকে নিরস্ত করিয়া তথায় বেদসম্মত শক্তির উপাসনা প্রচারিত করিয়াছিলেন। †

এইস্থলে বলা আবশ্যক যে তাঁহার প্রচারিত পূজাপদ্ধতি তন্ত্রবিহিত এবং বেদসম্মত অর্থাৎ বেদাবিরুদ্ধ। তাঁহার সময়ে ভৈরবোপাসক কাপালিকদিগের ভীষণ তাণ্ডবে কর্ণাট প্রদেশ প্রকম্পিত হইতেছিল। ইহাদের দলে বহুলোক সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল না। শঙ্করানুচরদিগের সহিত ইহাদের প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল। ভগবৎ শঙ্করের হুঙ্কারে এবং সুধন্ব-রাজের বিশিখজালে কাপালিকের দল বিনাশিত হইলে দলনেতা ক্রকচ শঙ্করাবতারের প্রতি অভিচার করিয়া নিজেই অভিচারের ফলে বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের শাস্ত্র ভৈরবাগম নামে প্রসিদ্ধ।

কাপালিকদিগের এবং শাক্তদিগের বামাচার সাধারণের পরিচিত। কিন্তু শঙ্কর যুগে গাণপত্যদিগের মধ্যেও প্রবল বামাচারের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল। দিগ্বিজয়রত শঙ্করসমীপে "হেরম্ব সুত" নামক একজন গাণপত্য আসিয়া স্বসম্প্রদায়ের মত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে,—গাণপত্যদিগের ছয়টি শাখা, এই ছয়টি শাখা যথাক্রমে মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি ও সন্তানগণপতিকে উপাসনা করিত। যিনি শঙ্কর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি উচ্ছিষ্ট গণপতির উপাসক। ‡ তিনি স্বকীয় উপাসনামার্গের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্যভিচার ইহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ, পরস্পরের সংযোগ জন্য আনন্দোৎপত্তিই মুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই মতে সমস্ত কর্ম্মই ইচ্ছাধীন। কোন প্রকার কঠোরতা নাই। সকলের একই আত্মা সুতরাং জাতিভেদ নাই, এবং এই পুরুষের এই স্ত্রী এমত নিয়মও নাই। পরমাত্ম-স্বরূপ গণপতি আনন্দময়, ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবতা তাঁহারই অংশ। অংশ এবং অংশীর কোনও ভেদ নাই, বেদেও এই-মত কথিত হইয়াছে। "ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা কর্ম্মের মোক্ষ-সাধনতা নিরস্ত হইয়াছে, এবং সহিষ্ণুত্ব-প্রভৃতি-গুণযুক্ত কর্ম্মত্যাগই মুক্তির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; অতএব মুমুক্ষুদিগের পক্ষে এই মতই অনুকূল ও সেব্য। পাপ পুণ্য বিচার থাকিলেও দ্বন্দ্বতা অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকিয়া যায়; অতএব পাপপুণ্যবিচারও পরিহরণীয়। এই গাণপত্য মত শুনিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—যে মতে বেদনিন্দিত সুরাপান এবং পরদারসেবা বিহিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই সুখাকাঙ্ক্ষীদিগের পক্ষে দূর হইতে পরিত্যজ্য। অতএব তোমরা ব্রাহ্মণদিগের বাক্যানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হও, মোক্ষমার্গের পথিকদিগের ইহাই কর্ত্তব্য। § এইরূপে তিনি বেদ-বিরুদ্ধ মতের পথিক প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই পঞ্চদেবতার পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এইস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভগবৎপাদ শঙ্কর পঞ্চদেবতার পূজার উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং কেবল উক্ত পঞ্চদেবতার পূজাই

* আগমাদ্যুক্ত আচারো গ্রাহ্যো বেদানুকূলতঃ।
বিরোধে তস্য ন গ্রাহ্য উক্তং চেদং স্ফুটং কিল॥
(টীকাকারধৃত)

† সুরধাম স তত্র কারয়িত্বা পরাবিদ্যাচরণানুসার-চিত্রং।
অপবার্য্যচ তান্ত্রিকান তানীদৃ ভগবত্যাঃ শ্রুতিসম্মতাং সপর্য্যাং॥ ১৫।৫

‡ ততো গণকুমারাখ্যে নিরস্তেহন্যঃ সমাগতঃ।
আচার্য্য মাহ হেরম্ব সুত ত্বং পরমং গুরুং॥
মহাগণপতে স্ত্বেকং হরিদ্রাগণপস্য চ।
উচ্ছিষ্টগণপস্যৈকং নবনীতগণেশিতুঃ॥
মত সেকং তথা স্বর্ণগণপস্যৈক মীরিতং।
সন্তানগণপস্যৈক মাগমে শৈব সংজ্ঞকে॥
উচ্ছিষ্টগণপস্যাহ মুপাসন-পরায়ণঃ।
উচ্ছিষ্টগণপঃ প্রোক্তো বামমার্গাব-লম্বনাৎ॥

§ পুনা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত শঙ্কর দিগ্বিজয়ে ১৬ সর্গ ৫৪৯ পৃষ্ঠে তত্রত্য বর্ণিত বিষয়ের মূল বচন দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অভিমত, অন্যান্য দেবতাপূজার আবশ্যকতা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, কাহারও মনে যেন এমত ধারণা না হয়। কারণ এই পঞ্চদেবতার অবান্তর ভেদরূপে অবস্থিত অসংখ্য দেবতার বিবরণ তন্ত্র প্রভৃতি বিবিধশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরা প্রভৃতি সমস্ত স্ত্রী দেবতাই শক্তির অন্তর্গত। ভগবৎপাদ 'বৃহদারণ্যক'ভাষ্যেও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্থলে তেত্রিশ শত দেবতার যে নির্দ্দেশ দেখা যায়, তাহা মধ্যম পরিমাণাভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে, পরমার্থতঃ দেবতার সংখ্যা অনন্ত। তৎকৃত প্রপঞ্চসারেও বহুদেবতার উপাসনাপদ্ধতি নিবদ্ধ হইয়াছে।

ভগবৎপাদ বিবিধ দেবতার যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তান্ত্রিক অনেক গূঢ়-রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। তারাদেবীর স্তোত্রে তিনি ধ্যেয় রূপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্থূল মূর্ত্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ অধুনা দৃশ্যমান ধ্যানসংজ্ঞক পদ্যে দেবীর গাত্রে আভরণরূপে নিহিত সর্পাবলীর উল্লেখ নাই; ভগবৎপাদকৃতস্তোত্রে সর্পবিন্যাসের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকৃত স্তোত্রকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য "তারারহস্যবৃত্তিকা" নামক গ্রন্থে গদ্যাকারে তারাদেবীর সর্পাদি-সমলঙ্কৃত রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, * এবং স্বমতসমর্থনের জন্য স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। † ভগবৎপাদকৃত স্তোত্রের মূল শ্রুতি; সেই সকল মূলীভূত শ্রুতিও তারারহস্য-বৃত্তিকায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

* অতিনীল-নাগবদ্ধজটাজুটাং ললাটে জবাকুসুম সঙ্কাশতক্ষকনাগকৃত-কুণ্ডলামিত্যাদি ॥

† অথবা শঙ্করাচার্য্যভগবৎপাদৈঃ স্তোত্ররূপেণোক্তং জলৎপাবকেত্যাদিনা সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈধ্যায়েৎ। তদ্ যথা—
"জ্বলৎ পাবক জ্বাল-জ্বালাতিভাস্বং
চিতামধ্যসংস্থাং সুপুষ্টাং সুখর্ব্বামিত্যাদি ॥"
এই স্তোত্রে ১২টি শ্লোক আছে।

গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণায়ক বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থের অংশবিশেষ এবং শঙ্করাচার্য্যের নাম কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং তিনি কৃষ্ণানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ১৫২৬ শাকে লিখিত এক খণ্ড তারারহস্যবৃত্তিকা বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।

স্তোত্রপাঠ উপাসনার একটি প্রধান সহজ উপায়। সংস্কৃত সাহিত্যে স্তোত্রপদ্ধতির উন্মাদনীশক্তি অনেকেই অবগত আছেন। উহার পদের মাধুর্য্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে নিতান্ত সংসারাসক্ত মানবের হৃদয়ও অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবে বিভোর হইয়া উঠে। এই সহজ পথের পথিকদিগের উপকারেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার লালিত্যপূর্ণপদাবলীঘটিত স্তোত্রনিচয় রচনা করিয়া উপাসনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

কেবল শঙ্করযুগের তান্ত্রিকবিবরণ লিখিতে গেলেই একখানা বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হয় না। মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্যে শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবল প্রবাহ চলিতেছিল, অপর দিকে জ্ঞানগৌরবে সর্ব্বতোভাবে জয়লক্ষ্মী কাশ্মীর দেশকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে স্বকীয় জন্মের দ্বারা গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

শঙ্কর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা হইতে জানা যায়—বিষ্ণু শঙ্করাচার্য্যকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, "আপনি ভাস্কর, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ, গুরু মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি প্রধান পণ্ডিতদিগকে জয় করিয়া পৃথিবীতে অদ্বৈত তত্ত্ব স্থাপিত করুন।" ‡ ইহাদের মধ্যে ভাস্কর ভেদাভেদবাদী, অভিনব গুপ্ত শাক্ত, নীলকণ্ঠ ভেদবাদী শৈব, গুরু প্রভাকর, মণ্ডন মিশ্র ভট্টমতানুযায়ী। পশ্চিম সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী গোকর্ণ তীর্থ সন্নিধানে নীলকণ্ঠ বাস করিতেন। ইনি শিবপক্ষে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্করের সহিত বিচারে পরাভূত হইয়া ইনি স্বমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার প্রধান শিষ্যের নাম হরদত্ত। নীলকণ্ঠ পরাজিত হইলে শঙ্করাচার্য্য সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে স্বকীয় ভাষ্য প্রচার করিয়া দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের অধ্যবসায়ে তত্রত্য অনেক দুর্লভ তন্ত্র গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। তত্রত্য রাজকীয় পুস্তকাগারে এবং

‡ ভাস্করাভিনবগুপ্ত-পুরোগ-নীলকণ্ঠগুরুমণ্ডন মিশ্রান্ পণ্ডিতানথ বিজিতাজগত্যাং খ্যাপয়াদ্বয়মতে পরতত্ত্বং। ৬।৫

দাক্ষিণাত্যের বিবিধ পুস্তকাগারে রক্ষিত অমুদ্রিত পুস্তকাবলীর বিবরণসূচী হইতে বেশ বুঝা যায় যে তন্ত্রের মূলগ্রন্থ অদ্যাপি ঐ উভয় দেশেই রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালায় তাহাদের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। এই সমস্ত দুর্লভ গ্রন্থ সুধীবৃন্দের নয়ন-পথিক হইয়া, এক সময়ে তন্ত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করিবে, সময়স্রোতের পরিবর্তন দর্শনে এরূপ আশা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাস্করভট্ট উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন। ভগবান্ শঙ্কর তথায় যাইয়া ভাস্কর মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। অভিনবগুপ্ত কামরূপবাসী; ইনি শক্তি পক্ষে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনিও শঙ্করের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবৎপাদ শঙ্কর গৌড়দেশবাসী মুরারি মিশ্র ধর্ম্মগুপ্ত মিশ্র ও উদয়নকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তন্ত্র সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের অভিমত।

ভারতীয় দার্শনিকদিগের সম্প্রদায়ভেদে প্রভূত মতদ্বৈধসত্ত্বেও তন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কাহারও প্রায় অবজ্ঞা দেখা যায় না। কারণ মৌলিকতত্ত্বগত বিবাদবাহুল্য সত্ত্বেও সগুণোপাসনার আবশ্যকতা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উপাসনার অনুষ্ঠানজ্ঞাপক তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি পদ-পদার্থবিৎ প্রমাণজ্ঞদিগের অবজ্ঞা-প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না। গৌড়পাদ হইতে শঙ্করসম্প্রদায়ের তন্ত্র-চর্চ্চার নিদর্শন স্বরূপ আমরা কতিপয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজস্বামীর পরমগুরু যামুনমুনির আগমপ্রামাণ্যনিরূপণের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। সংপ্রতি মধ্বসংপ্রদায়ী আনন্দতীর্থের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইনি পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে বেদাদিশাস্ত্রের সহিত সমস্বরে তন্ত্রের প্রামান্য স্বীকার করিয়াছেন।* ইঁহার কৃত তন্ত্রসার গ্রন্থ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থের ত্রুলারি—নৃসিংহাচার্য্যকৃত টীকা আছে। এই টীকাসমেত আনন্দ তীর্থের তন্ত্রসার মান্দ্রাজ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে অমুদ্রিত অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে। ইহাতে নারায়ণের উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মধ্বসংপ্রদায়ও তন্ত্র-পারতন্ত্র, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচয়িতা প্রতিভারবি দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ স্বকীয় নৈষধকাব্যকে চিন্তামণিমন্ত্রচিন্তনের ফল বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। উক্ত চিন্তামণি মন্ত্র শিবোপাসনায় বিনিযুক্ত; অর্দ্ধনারীশ্বর ইহার দেবতা। প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্রে উহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শ্রীহর্ষ কবি কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্মানিতপণ্ডিতপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ঐ সময়ে কান্যকুব্জে তান্ত্রিকোপাসনা প্রচলিত ছিল, ইহাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। শ্রীহর্ষের উক্তি হইতে তাঁহার তন্ত্র-ভক্তির আরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বকীয় কাব্যে একমাত্র তন্ত্রপরায়ণ কাশ্মীর পণ্ডিতদিগকেই চতুর্দ্দশ বিদ্যাবিৎ বিশেষণে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি "শিব-শক্তিসিদ্ধি" নামক নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, তথাকার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টের কাদম্বরীতেও তান্ত্রিকানুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে অপত্যকামনায় যে শিবাবলিদানের উল্লেখ আছে, উহা তান্ত্রিক ক্রিয়ারূপেই প্রসিদ্ধ। অপিচ কাদম্বরীতে যে জ্যেষ্ঠাদেবীর সপর্য্যা বর্ণিত হইয়াছে, ইনি তন্ত্রপ্রসিদ্ধ ত্রিশক্তির অন্যতমা।

* চ শব্দেন সকল-বেদ-শাস্ত্রাগম-তন্ত্র যামল-পুরাণাদিষু বিষ্ণুপরত্বং পুরুষসূক্তস্য সূচয়তি। ১।২।২৬।সূ ভাং।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ইমন—মধ্যমান।

হে প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণে প্রাণ যেতে চায়।
অনেক পেয়েছি দুখ আঘাতে ভেঙেছে বুক;
লই লই তুলে তোমারি কোলে।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´
না -া ধা পা মধা -পপা মা গা II মা -া -া -ররা -গমা -পগা -পা -া।
হে ০ প্রা ণে র০ ০০ দে ব তা ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

৩ ০
। -া পা মগা -ধনা -মধা -পপা মা গা। পপা গা -া -রা -নরা -সসা -া -া।
০ তো মা০ ০০ ০০ ০০ রি চ র০ ণে ০ ০ ০০ ০০ ০ ০

১ ২´
। -া -া না -রা -গা -মগা -পা -া I মধা -পপা -গা -পরা -গা -া -রা -া।
০ ০ প্রা ০ ০ ০০ ০ ০ ণ০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

। -া গা পমা -ধা -া মধা -নর্সা -র্রর্রা। -র্সনা -ধনা -র্সর্সা -নধা -পমা -গা গমা -পধা।
০ যে তে০ ০ ০ চা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ য়, "হে০ ০০

১
। -নধা -নর্সা না ধা মধা -পপা মা গা II
০০ ০০ প্রা ণে র০ ০০ দে ব"

১ ২´
II পাপা মধা -নর্সা -র্রধা -র্সা র্সার্সা। নর্রা -র্সর্সা -া র্সা র্সা -র্সা -া -া।
অনে ক০ ০০ ০০ ০ পেয়ে ছি০ ০০ ০ দু খ ০ ০ ০

৩
। র্সার্সা র্সনা -র্রা -া -া র্সা র্সা। নর্সা -র্রগা -র্গর্রা -র্সনা -নর্সা না ধা -া।
আঘা তে০ ০ ০ ০ ভে ঙে ছে০ ০০ ০০ ০০ ০০ বু ক ০

১ ২´
। -মধা -পপা -া মা ধা না পপা -মগা I পপা গা -া -রা -া রা গা পমা।
০০ ০০ ০ ল ই ল ই০০ ০০ তু০ লে ০ ০ ০ তো মা রি০

৩
। -ধা -া -া মধা -নর্সা -ধা -র্সা নর্সা। -র্রগা -র্রর্সা -নর্রা -র্সনা -ধপা মগা গমা -পধা।
০ ০ ০কো০ ০০ ০ ০ লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ "হে০ ০০

১
। -নধা -নর্সা না ধা মধা -পপা মা গা II II
০০ ০০ প্রা ণে র০ ০০ দে ব"

কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজের সহ-যোগী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণে ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিচালিত হইবার কালে কেশবচন্দ্র তাঁহার উৎসাহাগ্নি চতুর্দ্দিকে এতদূর বিকীর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই উৎসাহের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদেরও হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই অগ্নির স্পর্শ পাইয়া যাঁহার হৃদয়ে যে বিষয়ের ক্ষমতা নিদ্রিত ছিল, তাহাও জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই জাগরণের অন্যতর পরিচয় আমরা তদানীন্তন ব্রহ্মসঙ্গীতে দেখিতে পাই। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকালে রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার সহচরদিগের রচিত সঙ্গীত গীত হইত। সেই সকল সঙ্গীতের অনেকগুলিতে মায়াবাদের ভাব উল্লিখিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজ হইতে অদ্বৈতবাদের সংস্পর্শ মুছিয়া দিলেন, সেই সময় অবধি অদ্বৈতমতসংশ্লিষ্ট সঙ্গীত সকলও সমাজে গাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। অবশ্য বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল গানের মধ্যে কতকগুলি গান তখনও গাওয়া হইত, কিন্তু সেগুলি ক্রমে উপাসকমণ্ডলীর কর্ণে বড়ই নীরস ও কঠোর বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানের সামঞ্জস্যমূলক কয়েকটী গান রচনা করেন। সেগুলি আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত সঙ্গীতপুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মবিষয়ক যে উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই উৎসাহের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণও সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থভাগে সন্নিবিষ্ট সঙ্গীতগুলি এই সময়ের রচনা। এগুলির অনেকগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথের এবং অধিকাংশই সত্যেন্দ্রনাথের রচিত। এগুলিতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃপূর্ণ সরল হৃদয়ের সরল কথা শোনা যায়, প্রাণের সরল উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। এই সকল সঙ্গীত শুনিলে প্রত্যেক মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে তাহার নিজেরই হৃদয়ের কথা সেই গানে শুনিতে পাইতেছে। ঈশ্বরের সহিত মানবের যে পিতাপুত্রের একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে মানব যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, সেই মহাবাণী এই সকল সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে উপলব্ধ হয়।

কেশবচন্দ্র যখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহলে, তখনই তাঁহার আত্মীয়স্বজন স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে আর ব্রাহ্মসমাজ লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিবার অবসর পাইবেন না। সেই সময়ে কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। কেশবচন্দ্র সিংহলযাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইতে না হইতেই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রথমেই হরিমোহন তাঁহাকে সেই ব্যাঙ্কের এক কেরাণীপদে বসাইয়া দিলেন। ত্রিশ টাকা বেতনে প্রবেশ করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই কেশবের বেতন পঞ্চাশ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। শীঘ্রই তাঁহার একশত টাকা বেতন হইবারও আশা ছিল। কিন্তু বৎসর খানেক এই কর্ম্ম করিয়া ১৮৬১খৃষ্টাব্দের১লা জুলাই (১৭৮৩ শকের আষাঢ়) কেশব সহসা ব্যাঙ্কের পদ পরিত্যাগ করিয়া একদিকে যেমন আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, অপরদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে অনুরাগ প্রকাশের কারণে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারের ততোধিক প্রীতিভাজন হইলেন।

এই বৎসরের ১১ই পৌষ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী বৎসরের বিত্তসংস্থান জন্য ব্রাহ্মদিগের এক সভা হয়। কানাইলাল পাইন তাহার সভাপতি ছিলেন। এই সভার বিবরণ ১লা মাঘের পত্রিকায় প্রকাশিত দেখি। এই বিবরণে দেখা যায় যে, "ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী" দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে "তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দান করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উপায়। * * * তত্ত্ববোধিনী সভা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষরাদি যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন।"

এই সভাতে "সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সমাজের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন :—

সভাপতি	অধ্যক্ষ—
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়	পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	যন্ত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত
সম্পাদক	ধনাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সহকারী সম্পাদক	পরিদর্শক
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

উপরোক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ হইতেই দেখা যাইবে যে এখন অবধি ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধীয় সমুদয় ক্ষমতা দেবেন্দ্রনাথের স্বহস্তে আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিতর্কের পর ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব তিনি স্বীয় স্কন্ধেই গ্রহণ করিলেন দেখা যায়। সভাপতি হইলেন রমাপ্রসাদ রায়—ইনি নিজে একজন ট্রষ্টী, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের পরম বন্ধু। এ অবস্থায় রমাপ্রসাদ রায় সভাপতি হইলেও দেবেন্দ্রনাথের সমাজকার্য্য পরিচালনায় কোনই ব্যাঘাত আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষত তিনি নিজের কার্য্যভারেই এত ব্যস্ত থাকিতেন যে ইহা জানা কথা ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে একটুও মন দিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পিতৃকীর্ত্তি বলিয়া তাহার রক্ষাসাধনে তাঁহার যেটুকু যত্ন ও আগ্রহ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ এবারে স্বয়ং ট্রষ্টী ও সম্পাদক হইলেন। কাজেই ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহারই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও সহযোগে কেশবচন্দ্র সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের খিটিমিটি লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন না। বাহিরের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে স্বয়ং সংগ্রামে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে অপরাপর উপযুক্ত লোকের দ্বারা সংগ্রাম করাইতেন। তিনি নিজে জ্ঞানার্জনে এবং ধ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতে ভাল বাসিতেন। তাই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগী কেশবচন্দ্রকে সম্পাদকরূপে লাভ করিয়া নিজে ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যের ভার হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলেন। সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বাল্যাবধি দেবেন্দ্রনাথেরই সাহায্যে মানুষ। ইনি সহকারী সম্পাদক হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত কোন কার্য্যই ইঁহার অজ্ঞাতসারে হইবার উপায় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ বিদেশে গেলেও ইঁহার দ্বারা সমাজসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ পাইবার উপায় রহিল।

তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার পর ব্রাহ্মসমাজের দুইটী অঙ্গ দাঁড়াইয়াছিল—ব্রাহ্মসমাজ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। উপরোক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেই বুঝা যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাসম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতাও দেবেন্দ্রনাথের হস্তে রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই পত্রিকাধ্যক্ষ হইলেন; পত্রিকাতে কোন প্রবন্ধ প্রকাশের যোগ্য এবং কোন্ প্রবন্ধ অযোগ্য তাহা তাঁহার বিচারসাপেক্ষ হইল। পত্রিকা-সম্পাদক হইলেন তাঁহারই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ—বলা বাহুল্য যে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ পিতৃদেবের অধীনে থাকিয়া তাঁহারই মতানুসারে পত্রিকা চালাইবার ক্ষমতা ও আদেশ পাইয়াছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সিংহল ভ্রমণের দৈনন্দিন লিপির উক্তি হইতে দেখিয়া আসিয়াছি যে কেশবের উপর ব্রাহ্মসমাজের নানা গুরুতর কার্য্যের ভার দিবার ইচ্ছা দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বেই হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার প্রথম সোপান স্বরূপে সিংহল হইতে প্রত্যাগমনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ কেশবস্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়কে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনয়ন করিলেন। অবশেষে মাস খানেক পরেই (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে—১৭৮১ শকের ১১ পৌষে) কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদকপদে প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি নিজ প্রীতির পরিচয় দিয়া সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

সন্ধ্যায়।

শান্ত সন্ধ্যা নেমে এল ডুবে গেল রবি,
আঁধার ছাইল ধরা যেন এক ছবি।
পথপ্রান্তে বৃক্ষছায়া দীর্ঘ হয়ে উঠে,
সাদা সাদা ফুলগুলি একে একে ফুটে।
জীবজন্তু যত সব নিজ ঘরে গেল,
অবিশ্রাম কোলাহল ধীরে থেমে গেল।
নিবিড় গাছেতে দূরে গাহে সান্ধ্য তান,
শত পক্ষী শত সুরে রসে ভরা প্রাণ।

নীরবতা যেন তাহে জাগে গাঢ় হয়ে,
আমি বাঁচি সন্ধ্যা সাথে কত কথা ক'য়ে।
ধীরে ধীরে থেমে যায় পক্ষী-কলতান,
শান্তিসুধা মধু ঝরে জুড়াইয়া প্রাণ।
তারাগুলি একে একে ফুটে শূন্যভূমে,
ছন্দে প্রেমে গাহে গান এনে দেয় ঘুমে।
প্রাণের ভিতরে এক জাগে মহাগান,
দুঃখের আনন্দধারা—অনাহত তান।
যারা সবে শোকহত শুনে পাবে বল,
ঝঞ্ঝাবায় থেমে যাবে পাবে শান্তিজল।

রামায়ণী।

(দশরথ)

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রামায়ণী চরিত্রসমালোচনার প্রারম্ভেই দশরথ-চরিত্রের আলোচনা করিব।

রাজা দশরথ—বীর, প্রজারঞ্জক, রাজনীতিজ্ঞ, স্নেহ-প্রাণ, সত্য-প্রতিজ্ঞ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান এবং ঈষৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ।

বীরত্ব।

দেবরাজ ইন্দ্র অসুরবিজয়ের জন্য দশরথের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দশরথ সে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তাঁহার শরসন্ধানে শব্দবেধিত্ব শক্তি ছিল। অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দবেধী বাণ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা দেখিতে পাই যে ব্যবহারের বিভিন্নতায় গুণও দোষের হইয়া পড়ে। আত্মরক্ষার্থ যে শব্দবেধী বাণ ধর্ম্ম-মূলক, ব্যসনে প্রযুক্ত তাহাই পতনের কারণ হইল।

প্রজারঞ্জন।

দশরথ প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে অযোধ্যানগরীর বর্ণনা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রাজনীতিজ্ঞতা।

অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-ব্যাপারে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামকে তিনি উৎকৃষ্ট রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক দশরথের একান্ত অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তিনি কৌশলে অপরের মুখে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের প্রস্তাব করাইতেছেন। অভিষেকের কথা উল্লেখ করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্
ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যাদ্বিচিন্ত্যতাম্
অন্যা মধ্যস্থচিন্তা তু বিমর্দ্দাভ্যধিকোদয়া।

সকলে সম্মতি দান করিলেও আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ্রুত্বৈতদ্বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছথ
রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ
কথন্নু ময়ি ধর্ম্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি
ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্।

রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা।

কেবল অবিশ্বাসের দ্বারাই রাজ্য পালন করা যায় না। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব তাহার দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করা এবং অবিশ্বাসীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাই উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞতা। রামের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে রাজা দশরথ কিন্তু অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে একটু অনর্থ ঘটিল। দশরথ রামচন্দ্রকে কহিলেন—

বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভরতঃস্থিতঃ
জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা সানুক্রোশোজিতেন্দ্রিয়ঃ
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্
সতাঞ্চ ধর্ম্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব।

রামচন্দ্রের নিকটে ভরতের মত ছন্দানুবর্ত্তী ধার্ম্মিক পুত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞ দশরথের এরূপ উক্তি করা ভালো হয় নাই। ভরতের অসাক্ষাতে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হওয়াই কৈকেয়ীর পক্ষে বিশেষ অসন্তোষের কারণ হইল। হয় তো বা ভরত উপস্থিত থাকিলে ব্যাপারটী অন্য রকম ঘটিত। এটা দশরথের রাজনৈতিক দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কি বলিব?

দেবদ্বিজে ভক্তি, সত্যপ্রতিজ্ঞতা ও স্নেহপরায়ণতা।

দশরথ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শ না লইয়া কোনো কার্য্য করিতেন না। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং অন্যান্য পৌরবর্গের প্রতি ব্যবহারই তাঁহার স্নেহপ্রাণতার পরিচয়। রাম-নির্ব্বাসন-ব্যাপার হইতেই তাঁহার

সত্যপ্রতিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাণত্যাগ করিয়াও সত্যরক্ষা করিতেন।

দশরথ অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রকেই অধিক স্নেহ করিতেন। রামচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি একটু পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট। এই পক্ষপাত-দোষ দ্বারাই দশরথের সত্যপালনের দার্ঢ্য এবং মহনীয়তা কবি ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

দশরথ একটু ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্তি নানা প্রকারের আছে। শীকারে অত্যধিক আসক্তিই তাঁহার প্রথম নিদর্শন। শাস্ত্রে আছে মৃগয়া একটী ব্যসন। এই মৃগয়া করিতে যাইয়াই তিনি অন্ধমুনির পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। এবং তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

বহুবিবাহ।

বহুবিবাহের দ্বারাই রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিল। ব্যসনাসক্তি এবং বহুবিবাহ দ্বারা দশরথের প্রাণত্যাগ, রাম-নির্ব্বাসন প্রভৃতি যত অনর্থ সম্ভূত হইল। কিন্তু তৎকালে নানা কারণে রাজগণ এরূপ বহুবিবাহ করিতেন। এক কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন। অর্থাৎ বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বারা এক রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের মৈত্রীস্থাপন। অন্য কারণ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব। কিন্তু দশরথ কৈকেয়ীকে রূপের জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন।

রাম নির্ব্বাসন।

এখন আমরা দশরথের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অধ্যায়—রাম-নির্ব্বাসন-সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন জন্য তিন ব্যক্তিই দায়ী—মন্থরা, কৈকেয়ী এবং দশরথ। এই তিন জনের ভিতরে দশরথেরই দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মন্থরা নীচকুলোদ্ভবা দাসী, কৈকেয়ী রাণী, মন্থরার কথা শুনিলেন কেন? আবার, কৈকেয়ী স্ত্রীলোক মাত্র—দশরথ ইক্ষাকুবংশীয় রাজা, তিনিই বা কৈকেয়ীর কথা শুনিলেন কেন?

ইহার সহজ উত্তর, দশরথ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—সেই জন্য। কিন্তু দশরথের পক্ষে কোন্‌টা কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞাচ্যুতি না রাম-নির্ব্বাসন? কর্ত্তব্য কাহাকে বলে প্রথমতঃ তাহাই বিচার্য্য। দেশকালপাত্রানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ভর করে। এ সময়ে দশরথের পক্ষে কি কর্ত্তব্য তাহাই দেখা যাউক।

শ্রীরামচন্দ্র ভরত অপেক্ষা অধিক গুণশালী; এবং জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া ন্যায়তঃ সিংহাসন লাভের অধিকারী। প্রজাগণেরও ইচ্ছা শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তি অনুসারে রামচন্দ্রকেই রাজা করা দশরথের কর্ত্তব্য ছিল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হওয়া মহাপাপ। দশরথ এরূপ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে নিতান্ত কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। কারণ—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।

কিন্তু ইহাতে বিশেষভাবে একাকী দশরথই নিন্দিত। অপর পক্ষে রামচন্দ্রকে রাজা করিলে বহু লোকের উপকার হইবে। একদিকে নীতিবাদ, অপরদিকে হিতবাদ, এস্থলে যে কোন্‌টা অবলম্বনীয় তাহা বিষম সমস্যার বিষয়।

লোকের প্রকৃত মহত্ব কোথায়? ত্যাগে। দশরথ রামকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালো বাসিতেন। সেই রামকে বনে পাঠাইয়া সত্যপালন করিতে হইবে। এস্থলে দশরথের সত্যের উপর প্রবলানুরাগ দেখা যাইতেছে এবং ত্যাগও যথেষ্ট। ইহা যদি দোষও হয়—তবে গুণাতিরেক দোষ। কাহারো মতে এরূপ সত্যপালন নির্ব্বুদ্ধিতা। আবার কাহারো মতে এরূপ সত্যপালন না করা মহাপাপ—ইহার কোন্‌টা সত্য?

এই স্থানে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা গেল।

এক বনের ভিতরে এক মহাপুরুষ তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিলেন তাঁহার নিকট দিয়া এক বণিক টাকার থলি হাতে লইয়া প্রাণভয়ে পলাইতেছে। কিয়ৎকাল পরে একদল দস্যু আসিয়া সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এইদিকে কোনো বণিককে যাইতে দেখিয়াছেন? সে কোন্ দিকে গেল?" বণিক যে কোন্ স্থানে পলাইয়াছে তাহা সাধুর অবিদিত নহে। এ অবস্থায় সাধুর কি কর্ত্তব্য? যদি বলেন "অমুক স্থানে পলাইয়াছে" তাহা হইলে বণিকের প্রাণ যাইবে। যদি বলেন—"আমি বলিব না" তাহা হইলে সাধুর নিজের প্রাণ

যাইবে। আর যদি বলেন—“আমি জানি না” তবে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এ অবস্থায় সাধুর কি কর্ত্তব্য তাহা বিচারের ভার পাঠকগণের উপরে দিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সত্যপালনের জন্য রাম নির্ব্বাসন যদি দশরথের সম্পূর্ণরূপেই উত্তম কার্য্য হয়, তবে নিরাপত্তিতে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনাজ্ঞা পালন করার তাৎপর্য্য অনেকটা কমিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে রামায়ণ রচনাকালে রামচরিত্রকেই শোভনীয়রূপে ফুটাইয়া তোলার দিকেই কবির বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

“দুর্দ্দিনে”।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী—ইমন-ভূপালি।

ঘোর ঝঞ্ঝাঘন তিমির রাতে
যবে ডাকিব কাতরে
যেন সাড়া পাই!
যবে দিশেহারা হয়ে অন্ধকারে
ডাকিব তোমারে
যেন সাড়া পাই!
বাসনা যেদিন শতেক ডোরে
বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিবে মোরে
যবে ডাকিব সঘন ‘নাথ’ ‘নাথ’ ক’রে
যেন সাড়া পাই!
শুকায়ে যাবে যবে এ জীবন-ধারা
জীবন-নদী হবে মরুমাঝে হারা
ফুটিবে না ফুল উঠিবে না গান
জাগিবে না প্রাণ—
যেন সাড়া পাই!
তোমারে রাখিব জীবন মাঝারে
সতত হেরিব হৃদয়-রাজারে
ডাকিব কাতরে আলোকে আঁধারে
যেন সাড়া পাই॥

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—হরিচরণের বাটী। কাল-অপরাহ্ণ।

(হরিচরণের পুত্রকে ক্রোড়োপরি স্থাপন করিয়া দাদাঠাকুর উপবিষ্ট। চতুর্দ্দিকে বালকগণ রোগীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। কবিরাজ নাড়ী দেখিতেছেন। নিকটে হরিচরণ সাশ্রুনেত্রে কবিরাজের পানে চাহিয়া আছে।)

হরি। দাদাঠাকুর, আমার বাছা বাঁচবে তো?

দাদা। হরিচরণ, অস্থির হ’য়োনা। (জনৈক বালকের প্রতি) ওহে তুমি এর পায়ে একটু সেঁক দাও।

(বালকের কথাবৎ কার্য্যকরণ)

হরি। দাদাঠাকুর, আমার আর যে কেউ নেই!

দাদা। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকো। (অপর একজন বালকের প্রতি) ওহে, তুমি একে একটু বাতাস দাও।

(বালকের কথাবৎ কার্য্যকরণ)

হরি। দাদাঠাকুর, তুমি মুখ দিয়ে একবার বল, তা হ’লেই আমার ছেলে বেঁচে উঠবে। কব্‌রেজ মশাই, আপনার পায়ে পড়ি তুমি কিছু মনে করোনা। আমার কিছু নেই; জমীদার সব লুটে নিয়েছে। আমার উপর ব্যাজার হ’য়োনা। (পদধারণ)

কবি। আরে কর কি, কর কি! হরিচরণ, আমরা কি কসাই? আমাদেরো প্রাণ আছে। পাঁচ যায়গা থেকে নিচ্চি। না হয় তোমার কাছ থেকে কিছু নাই বা পেলুম। দাদাঠাকুর দয়া করে’ যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কিছু চাইনে। আমি যথাসাধ্য চিকিৎসা করব।

দাদা। সে কি কবিরাজ মশাই, তা কেন? আপনার ন্যায্য প্রাপ্য আমিই দিব।

কবি। দাদাঠাকুর মাপ করুন। এই যে এখানে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, এই-ই আমার পরম লাভ।

দাদা। কবিরাজ মশাই, দেখুন তো একবার নাড়ীটে—রোগী যেন কেমন করছে।

রোগী। জ—অ—অ—(ক্ষীণস্বরে)

দাদা। এই যে বাবা, জল খাও। (জল দান)

কবি। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সময় হয়ে’ আসচে।

হরি। বাবা, যাদু আমার, গোপাল আমার। এই দ্যাখ একবার চেয়ে দ্যাখ, এই যে আমি তোমার সামনে

দাঁড়িয়ে। ঠাকুর, আমার পথের কাঙাল ক'রো না, আমার অন্ধের নড়ী কেড়ে নিও না।

(জনৈক জমীদার-কর্মচারীর সহিত চারিজন বরকন্দাজের প্রবেশ)

কর্ম্ম। এই যে হরে, বাঁধো ওরে।

(বরকন্দাজগণ হরিচরণকে ধরিল)

১ম বরকন্দাজ। চল্ ব্যাটা চল্।

হরি। একি আমার কোথায় নে' যাচ্ছ ?

কর্ম্ম। কাছারীতে; তোর তলব হয়েছে।

হরি। এজ্ঞে, আমি—আমি সেই দিনই তো বলেছি। বেগার খাটতে পারবনা। আমি গরীব মানুষ।

কর্ম্ম। সেখানে গিয়ে কাঁদুনি গাইবি। এখন চল্।

হরি। আপনার পায়ে পড়ি আজকের দিনটে আমায় রেয়াৎ কর।

কর্ম্ম। আরে চল্ ব্যাটা। ও সব কান্নাকাটি শুনবোনা। মনিবের কড়া হুকুম।

হরি। আপনার পায়ে পড়ি।

কর্ম্ম। এই বরকন্দাজ! ধরে' নিয়ে চল্।

বর। চল্ চল্ ব্যাটা (গলাধাক্কা)

দাদা। মশাই, মনিবেরও মনিব আছে। যিনি সকলের মনিব তাঁর দরবারে ওর বিচার হবে। এখানেই বিচারের শেষ নয়; এটা মনে রাখ্বেন।

কর্ম্ম। মশাই, ও সব লম্বাচওড়া কথা শুনতে গেলে আর আমাদের চলে না। আমরা যার খাই, তার কাজ করি।

দাদা। আজ ওকে ছেড়ে দিয়ে যান। কাল না হয় ওর বিচার হবে। আপনার মনিব এতে রাগ করবেন্ না। আমি ওর জামিন হলুম। দেখুন ওর ছেলে মৃত্যু-শয্যায়।

কর্ম্ম। আপনার এত রাক্ষুসে মায়া কেন ? আপনাকে আমরা বেশ চিনি। সে দিন তো একটা হাঙ্গামা করতে গিয়েছিলেন।

দাদা। আচ্ছা ভেবে দেখুন আপনিই একবার, এ অবস্থায় কি ওকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে ? ধর্ম্ম তো আছেন।

কর্ম্ম। তোমার ওসব ধর্ম্মের কচ্‌কচানি রেখে দাও।

জনৈক বালক। এই। মুখ সাম্‌লে কথা কও। দাদাঠাকুর, একবার হুকুম দিন তো, তার পর দেখি কার সাধ্য ধরে' নিয়ে যায়।

দাদা। স্থির হও; আমাদের কাজ এরূপ নয়। এখনো এর সময় হয়নি।

বর। (হরিচরণকে) চল্ ব্যাটা চল্। (ধাক্কা মারিল)।

হরি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার বাছাকে বুঝি আর ফিরে এসে দেখ্‌বোনা। দাদাঠাকুর, আমি যাই আপনি আমার বাবার কাছে থেকো। আমায় না দেখে ও আর বাঁচবে না। মশাই আমায় একবার ছেড়ে দিন। আমি বাছাকে একবার বুকে করি।

কর্ম্ম। বরকন্দাজ, নিয়ে চল।

বরকন্দাজ। চল্ ব্যাটা চল্।

হরি। ওঃ—গরীবের কেউ নেই।

দাদা। ঈশ্বর আছেন। যাও হরিচরণ, নির্ভয়ে যাও, দীননাথ তোমার সহায়, তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। তোদের বুকে আঘাত করলে যে তা তাঁরি বুকে বাজে। যাও হরিচরণ, যার কেউ নেই তার তিনি আছেন।

কর্ম্ম। তোমারো একদিন যেতে হবে। ধনদাস রায়ের বিষ নজরে পড়েছো। চল্ ব্যাটা চল্।

(কর্ম্মচারী ও বরকন্দাজগণ হরিচরণকে লইয়া প্রস্থান করিল)

রোগী। বাবা ... উঃ

কবি। রোগীর আর বিলম্ব নেই। সময় হয়ে' এসেছে।

দাদা। তাইতো, (ছেলেদের প্রতি) তোমরা প্রস্তুত হও।

(কিয়ৎকাল পরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করিল। দাদাঠাকুর কিয়ৎকাল নির্নিমেষ লোচনে মৃত দেহের পানে চাহিয়া পরে কহিলেন)

এই তো সব শেষ। কি আশ্চর্য্য; এত ক্ষণস্থায়ী এত নশ্বর এই মানব-জীবন! এরি জন্যে মানুষ মানুষকে হিংসা করে। ক্ষুদ্র মানব, চেয়ে দেখ, তোমার অত্যাচার ও অনুগ্রহের সীমা কতটুকু মাত্র! তুমি কত ক্ষুদ্র! এস আমরা সবাই মিলে একে শ্মশানে নিয়ে যাই।

(সকলের গীত গাইতে গাইতে মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান)

বাউলের সুর।

এমনি করেই দুদিন পরে ফুরিয়ে যাবে সব খেলা;
ঐ যে আঁধার আস্‌চে ধেয়ে গগনে আর নাই বেলা।
(ওকি ভীষণ কালো গো, ঐ যে আঁধার)
এখনো বাহির ছেড়ে——(ও তুই কোন্ প্রভাতে
বাহির হলি গো সন্ধ্যা হোল)
এখনো বাহির ছেড়ে আয়রে ঘরে থাকিস্‌নে আর
একেলা।

চেয়ে দ্যাখ্ সাথী যত যাচ্ছে চলে সবাই—
কেউ রবেনা চোখের জলে ভাসবি যখন ভাই
কিসের আপন, কেউ কারো নয়, মিল্‌ছে দুদিনের
মেলা।

আপন জনে গেলি ভুলে, মত্ত হয়ে খেলায়
ঘরে বসে' রে অভাগা ডেকে মরে যায়
ও তুই দেখবি না পথ আঁধার হলে তুই যে বড়
একেলা।
হবে তোর খেয়া বন্ধ, (আমায় দেখে ওরে অন্ধ)
পড়ে রবি পথের মাঝে হয়ে' সবার পায় ঠেলা।

দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্ষেত্র শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে পর, এই ক্ষেত্র কিংবা ক্ষেত কাহার, এই কারখানার মালিক আছে কি না, এই প্রশ্ন পরে সহজে নিষ্পন্ন হয়। আত্মা এই শব্দ কখন কখন মন, অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বয়ং—এই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা শরীরের মালিক বা স্বামী। মনুষ্য যে যে ক্রিয়া করে,—তাহা মানসিক হোক্ বা শারীরিক হোক্—সে সমস্ত তাহার বুদ্ধি-আদি অন্তরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় কিংবা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত সমূহের মধ্যে মন ও বুদ্ধি এই দুই ইন্দ্রিয়ই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উহারা শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় এই সমস্ত, মূলে জড়দেহের কিংবা প্রকৃতির বিকার (পূর্ব্বপ্রকরণ দেখ)। তাই, মন ও বুদ্ধি এই দুই ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদের আপন-আপন বিশিষ্ট, ব্যাপারের বাহিরে উহারা অন্য কিছুই করিতে পারে না, ও করিতে সমর্থও নহে। মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধি নিশ্চয় করে, ইহা সত্য; কিন্তু এই কাজ মন ও বুদ্ধি কাহার জন্য করে, অথবা বিভিন্ন সময়ে মন ও বুদ্ধির যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তাহাদের একত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই জ্ঞান হইবার নিমিত্ত যে একীকরণ আবশ্যক হয় সেই একীকরণ কে করে, কিংবা পরে সমস্ত ইন্দ্রিয়, স্ব স্ব ব্যাপারকে তদনুকূল করিবার সন্ধান কি করিয়া পায়, ইহার নির্ণয় উহাদের দ্বারা হয় না। মনুষ্যের জড়দেহই এই কাজ করে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, শরীরের চেতনা অর্থাৎ নড়াচড়া-ব্যাপার নষ্ট হইলে, যে জড়দেহ অবশিষ্ট থাকে, সে এ কাজ করিতে পারে না; এবং জড়দেহের মাংস স্নায়ু ইত্যাদি ঘটন-অবয়বসমূহ অন্নেরই পরিণাম, সুতরাং নিত্য ক্ষয়গ্রস্ত ও নিত্য নূতন নির্ম্মিত হয়; সুতরাং কাল যে ব্যক্তি অমুক বিষয় দেখিয়াছিল, সেই আমি আজ অন্য বিষয় দেখিতেছি, এইরূপ যে একত্ববুদ্ধি তাহা নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল জড়দেহের ধর্ম্ম, এইরূপ মানিতে পারা যায় না। ভাল; জড়দেহ ছাড়িয়া চেতনাকেই যদি মালিক বলা যায় তাহা হইলে গাঢ়নিদ্রাতে প্রাণাদি বায়ুর শ্বাসোচ্ছ্বাসাদি কিংবা রক্ত-চলাচল-আদি ব্যাপার অর্থাৎ চেতনা, বজায় থাকিলেও 'আমি' এই জ্ঞান হয় না (বৃ, ২, ১, ১৫, ১৮)। তাই, চেতনা কিংবা প্রাণাদি ব্যাপার কেবল জড়েরই এইরূপ বিশিষ্ট গুণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারদিগের একীকরণ করিবার মূল প্রভু-শক্তি নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে (কঠ, ৫, ৫)। 'আমার ও পরের' এই ষষ্ঠ্যন্তবিশেষণের দ্বারা গুণের বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' কে, ইহার নির্ণয় উহাদের দ্বারা হয় না। এই 'আমি'কে যদি নিছক্ ভ্রম বল, তাহা হইলে বলিতে হয় প্রত্যেকের প্রতীতি কিংবা অনুভূতি সেরূপ নহে এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়া কোন কল্পনা করা কেমন? না, যেমন শ্রীসমর্থ-রামদাস স্বামী বলিয়াছেন—

"প্রচীতীবীণ জেঁ বোলণে। তেঁ অবঘেচি কণ্টারব্যাণে।
তোঁড় পসরুণ চৈসেঁ স্বুণেঁ। রড়োন গেলে॥"

অর্থাৎ—মুখব্যাদান করিয়া কুকুরের কান্না যেমন বিরক্তিকর; প্রতীতি বিনা যাহা কিছু বলা হয় সমস্তই বিরক্তিকর (দা, ৯, ৫, ১৫); এবং এত করিয়াও তবু ইন্দ্রিয়ব্যাপারের একীকরণের উপপত্তি কিছুই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, 'আমি' বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই; মন, বুদ্ধি, চেতনা, জড়দেহ প্রভৃতি সকল তত্ত্বের সমাবেশ ক্ষেত্র এই শব্দের মধ্যে করা হইয়া থাকে; সেই সমস্তের সংঘাতকে বা সমুচ্চয়কে 'আমি' বলা যায়। কিন্তু কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্সো হয় না, কিংবা ঘড়ির সমস্ত চাকা একত্র যুক্ত করিলেই

তাহাতে গতিত্ব উৎপন্ন হয় না; ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। অই নিছক্ সঙ্ঘাতের দ্বারা কর্তৃত্ব আইসে এরূপ বলা চলে না; ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নহে, তাহাতে কিছু বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থাকে ইহা বলা বাহুল্য। এই ক্ষেত্র-রূপ কারখানার বুদ্ধি-আদি সমস্ত কর্ম্মচারীকে এই উদ্দেশ্য কে বলিয়া দেয়? সংঘাত অর্থে শুধু যুড়িয়া দেওয়া। সমস্ত পদার্থ একত্র করিলেও তাহার একপ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, তাহার মধ্য দিয়া একটা যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক। নচেৎ উহা পুনর্ব্বার কখন-না-কখন বিশ্বলিত হইতে পারে। এই যোগসূত্রটি কি, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। সংঘাত গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে; তবে, তাহার গণনা ক্ষেত্রসম্বন্ধেই করা হইয়া থাকে (গী, ১৩, ৬)। ক্ষেত্রের মালিক কিংবা ক্ষেত্রজ্ঞ কে, উহার দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন নূতন গুণ উৎপন্ন হয়, এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এই মতও আদৌ সত্য নহে। কারণ পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না তাহা এ জগতে নূতন উৎপন্ন হয় না, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরা পূর্ণবিচারান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (গী, ২, ১৬)। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ক্ষণতরে একটু পাশে সরাইয়া রাখিলেও, সংঘাতে উৎপন্ন নবগুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলিয়া কেন স্বীকার করা যাইবে না, এইরূপ ইহার পরে আর এক প্রশ্ন স্বভাবত উদ্ভূত হয়। এই সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দ্রব্য ও তাহার গুণ বিভিন্ন হইতে পারে না, গুণের কোন-না-কোন অধিষ্ঠান থাকা চাই। এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে আমরা সমুচ্চয়ই এই ক্ষেত্রের মালিক এইরূপ বুঝি। ঠিক কথা; কিন্তু পরে ব্যবহারে, তুমি অগ্নিশব্দের বদলে জ্বালানি কাঠ; বিদ্যুৎশব্দের বদলে মেঘ, কিংবা পৃথিবীর আকর্ষণের বদলে পৃথিবী,—এরূপ কেন তবে বল না? ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার এক ব্যবস্থা ও এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জন্য, মন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন আর কোন শক্তি থাকা চাই, এই কথা যদি নির্ব্বিবাদ হয়, তবে সেই শক্তির অধিষ্ঠান অদ্যাপি আমাদের অগম্য কিংবা সেই শক্তি বা অধিষ্ঠানের পূর্ণস্বরূপ অদ্যাপি ঠিক বলিতে পারা যায় না বলিয়া আদৌ সেই শক্তিও নাই এরূপ বলায় কি কোন যুক্তি আছে? যেই কেন হোক না, সে যেমন নিজের কাঁধের উপর বসিতে পারে না, সেইরূপ সংঘাতের জ্ঞান সংঘাত আপনিই সম্পাদন করিয়া লয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব, ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা লাভের জন্য হইয়া থাকে, সে যে কোন প্রকার সংঘাত হইতে ভিন্ন, এইরূপ তর্কদৃষ্টিতেও দৃঢ় অনুমান হয়। সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্ত্ব স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বের জ্ঞাতা বলিয়া, জগতের অন্য পদার্থাদির ন্যায় সে নিজেই নিজের জ্ঞেয় অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন বাধা হয় না। কারণ সমস্ত পদার্থকে এই একই "জ্ঞেয়ের" কোঠাতেই পড়িতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দুই বর্গ; দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে কোন বস্তু যদি না আসে তাহা হইলে প্রথম বর্গের মধ্যে তাহার সমাবেশ হয় এবং তাহার সত্তা জ্ঞেয়বস্তু—ইহাই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। অধিক কি, সংঘাতের অতীত আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা হওয়ায় সে তাহার জ্ঞানের বিষয় না হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, এইরূপ বলা যাইতে পারে; এবং এই অভিপ্রায় অনুসারেই "ওরে! যে, সমস্ত বস্তু জানে তাহার জ্ঞাতা অন্য কোথা হইতে আসিবে?—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—এইরূপ বৃহদারণ্যক-উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন (বৃ, ২, ৪, ১৪)। তাই হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়াদি হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে প্রাণ, চেতনা, মন ও বুদ্ধি এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শী কর্ম্মচারীদিগেরও বাহিরে থাকিয়া সেই সমস্ত ব্যাপারের একীকরণকারী ও তাহারা কিরূপ ভাবে কাজ করিবে তাহার নির্দ্দেশক কিংবা তাহাদের কর্ম্মের নিত্য সাক্ষীস্বরূপ—এইরূপ তাহাদের হইতে অধিক ব্যাপক সমর্থশক্তি এই চেতনাবিশিষ্ট সজীবদেহে অর্থাৎ ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে, এইরূপ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রেই এই সিদ্ধান্ত মান্য হওয়ায়, অর্ব্বাচীনকালে জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট বুদ্ধিব্যাপারের সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া

এই তত্ত্বই নিষ্পন্ন করিয়াছেন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিংবা চেতনা এই সমস্ত দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ কিংবা অবয়ব। যাহা ইহাদের প্রবর্ত্তক, ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও ইহাদের অতীত—"যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" (গী, ৩, ৪২) তাহাই সাংখ্য-শাস্ত্রে পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদান্তেও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতাই আত্মা এইরূপ বলে; এবং "আমি আছি" এই যে প্রত্যেকের সাক্ষাৎপ্রতীতি, তাহাই তাহার অস্তিত্বের উৎকৃষ্ট প্রমাণ (বেসু, শাং ভা, ৩।৩।৫৩।৫৪)। "আমি নাই" এরূপ কেহ মনে করে না; শুধু তাহা নহে, মুখে "আমি আছি" এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়েও 'নাই' এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তার অর্থাৎ 'আমি'র কিংবা আত্মার অস্তিত্ব সে পর্য্যায়ক্রমে স্বীকার করিয়াই থাকে। 'আমি' এই অহঙ্কারযুক্ত, সগুণরূপে দেহের মধ্যে অবস্থিত এইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের মূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত স্বরূপটি কি, তাহারই যথাশক্তি নির্ণয়ার্থ বেদান্তশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন (গী, ১৩, ৪); তথাপি এই নির্ণয় কেবল দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত হয় নাই। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ব্যতীত বাহ্য জগতেরও অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিচার করিয়া কি নিষ্পন্ন হয় তাহা দেখিতে হইবে, এইরূপ পরে কথিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ড-বিচারের নামই "ক্ষরাক্ষর-বিচার"। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের দ্বারা (অর্থাৎ দেহের মধ্যে কিংবা পিণ্ডের মধ্যে) কোন্‌টি মূলতত্ত্ব (ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা) ইহার নির্ণয় হয়; পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া দুই দিকেরই মূলতত্ত্ব এইরূপ প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নির্দ্ধারিত হইলে, তাহার পর আরও বেশী বিচার করিয়া এই দুই-ই একরূপ কিংবা একই—কিংবা "যাহা পিণ্ড তাহা ব্রহ্মাণ্ড"—এইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে শেষ-সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে *। ইহাই চরাচর সৃষ্টির চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ বিচারালোচনা হওয়ায়, ক্যাণ্ট প্রভৃতি কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত আমাদের বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত অনেকাংশে মিল হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, অর্থাৎ আধিভৌতিক শাস্ত্রের উন্নতি এখনকার মত পূর্ব্বে না হইলেও যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অতি প্রাচীনকালে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অলৌকিক বুদ্ধিবৈভব দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না; শুধু আশ্চর্য্য হইলে হইবে না, সেই সম্বন্ধে আমাদের উচিত গর্ব্ব অনুভব করাও আবশ্যক। ইতি ষষ্ঠ-প্রকরণ সমাপ্ত।

কি ভয়!

(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী)

যা কিছু আঁকড়ায়ে আমি
ধরেছিনু বুকে
নিমেষের মাঝে দেখি
সব গেল চুকে!
স্বপ্ন সম লুকাইল
কোন্ দেশান্তরে—
হে পূর্ণ! সম্পূর্ণ যত
পূর্ণ তব চরণ পরে।
মৃত্যু নাহি জরা নাহি,
নাহি নাহি ক্ষয়
মৃত্যু যে বহে গো হেথা
অমৃতের পরিচয়।
দাও দুঃখ দাও শোক
দাও অশ্রুজল
তার সাথে দাও যদি
ভকতি সম্বল।
জ্বলুক অন্তর মাঝে
দারুণ বিরহশিখা
এ বিশ্ব হোক্ ছারখার
তুমি যদি থাক প্রাণে
ওহে বিশ্বাধার
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে লয়
কি ভয় আমার!

* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার—আমাদের শাস্ত্রের এই বর্গীকরণ, গ্রীণ সাহেবের জানা ছিল না। তথাপি আপন Prologomena to Ethics এই গ্রন্থের আরম্ভে তিনি অধ্যাত্মের যে বিচার করিয়াছেন তাহা Spiritual Principle in Nature এবং Spiritual Principle in Man এইরূপ দুই ভাগ করিয়া পরে তাহাদের ঐক্য দেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের মধ্যে Psychology প্রভৃতি মানসশাস্ত্রের ও ক্ষরাক্ষর-বিচারে Physics, Metaphysics প্রভৃতি শাস্ত্রের পরে অন্তর্ভাব হইয়া থাকে; এবং এই সমস্তের বিচার করিয়া স্বরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়,—এই বিষয় পাশ্চাত্যবিদ্বান্‌দিগেরও মান্য।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

দশম—পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়বার জেলা-ভ্রমণ (১৮৮২-১৮৮৩)।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৮৮২ অব্দে দশহরার পর আমরা সাতারা জেলা ভ্রমণ করিতে গেলাম। এইবার আমাকেও "উনি" সঙ্গে লইয়াছিলেন। একথা আলাদা আর বলিতে হইবে না। এই সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিল—৫।৭ জন সিপাই, ৫।৭ জন কেরাণী, সিরেস্তাদার, দুইজন পাচক, ফাই-ফর্ম্মাস কাজের জন্য এক ব্রাহ্মণ, আমার এক দাসী, চাকর, বেহারা, গাড়োয়ান—সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫।৪০ জন লোক। তাছাড়া সাতটা গরুর গাড়ী, দুই তাঁবু ও এক ঘোড়ার গাড়ী—এই সমস্ত সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল। এইরূপ প্রবাস-ভ্রমণ আমাদের দুজনেরই খুব ভাল লাগিত। তাহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন হাওয়া, ভিন্ন জল, ভিন্ন দৃশ্য,—ইহার দরুণ মন সর্ব্বদাই উল্লসিত ও সুপ্রসন্ন থাকিত। তাহাতে আবার, পুণা অপেক্ষা প্রবাসে ওঁর শরীর—বিশেষত চোখ খুব ভাল থাকিত, এইজন্য সর্ব্বোপরি মনে সুখ ও শান্তি পাওয়া যাইত। প্রবাসে থাকিলেও, নিত্যকর্ম্ম ও কার্য্যক্রমে কোন ফাঁক পড়িত না—এই সমস্ত কাজ সমানই চলিত। আগের দিন যে আড্ডা নির্দ্দিষ্ট হইত, প্রাতঃকালে ৮।৯টার মধ্যে সেখানে গিয়া উঠিতাম। ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা দু-জন, এক সিপাই ও কোচম্যান; এবং সেই গাড়ীতে জিনিসপত্র অর্থাৎ গদী, তাকিয়া, দুই দপ্তর, দোয়াত, জলযোগের খোরা ও জলের কুঁজো—এই সমস্ত সর্ব্বদাই থাকিত। নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় পৌছিলে পর, যেখানে খুব গাছের ছায়া, সেইখানে গদী, তাকিয়া দোয়াৎ, দপ্তর সাজাইয়া, জায়গা প্রস্তুত হইয়াছে, এই খবর দেওয়া সিপাইদের কাজ ছিল। ততক্ষণ "উনি" গাড়ী হইতে নামিয়া মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, আড্ডার স্থানটা আশপাশে খোলা ও শুষ্ক আছে কিনা, খাবার জল বহতা-স্রোতের ও স্বচ্ছ কিনা, এই সমস্ত উনি দেখিয়া তাহার পর এখানে আসিয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। গরুর গাড়ীগুলো একটু আগেই আসিত, কিংবা আড্ডার স্থানে আসিয়া জমা হইত। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া, গরুর গাড়ী হইতে ভাঁড়ার ও রান্নার মালমসলা বাহির করিয়া, যেখানে রাঁধিতে হইবে সেই জায়গা ঝিকে দিয়া ঝাড়াইয়া ও গোবর-ছড়া দিয়া পরিষ্কার করাইতাম; এবং তাহার পর, হাঁড়ী-কুঁড়ি ও রান্নার মসলা বাহির করিবার পর হাত খোলসা হইলে, মোহনভোগ ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্য মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করিয়া যেখানে উনি বসিতেন, সেইখানে লইয়া যাইতাম। তখনো পর্য্যন্ত আমাদের গৃহে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—কাহারই চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না; সেইজন্য, পথ চলতি সময়ে রান্নার বিলম্ব হইলে সেইদিন মোহনভোগ লুচি এইরূপ কিছু টাটকা জলখাবার তৈরী করিয়া দিতে হইত। তৈরী জিনিস ভাল হইলেও এবং ক্ষুধিত হইলেও, নিত্যনিয়মানুসারে উনি চার পাঁচ গ্রাস মাত্র খাইতেন, তাহার অধিক খাইতেন না। কিন্তু নিজের আহারের পূর্ব্বে, আমাদের সঙ্গে আগত কেরাণীদিগকে কিছু দেওয়া হইয়াছে কিনা, খোঁজ লইতেন।

আমি "দেওয়া হয় নাই" বলিলে, তিনি বলিতেন "উহাদিগকে আগে দেও"। তাই উহাদের জন্য লাড়ু চিঁড়েভাজা প্রভৃতি কিছু জলখাবার তৈরী রাখিতে হইত। "ওঁর" জলযোগ হইয়া গেলে, আবার কাজ আরম্ভ হইত। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘাড় নীচু করিয়া লিখিতে লিখিতে একবার দুচার মিনিটের জন্য উনি ঘাড় উঠাইতেন; তখন সম্মুখে পাহাড় কিংবা নদী কিংবা গাছ যাহা কিছু আশপাশে থাকিত, তাহার দিকে সহজভাবে তাকাইয়া থাকিতেন; ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুখশ্রী গম্ভীর হইয়া উঠিত, এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দে যেন উৎফুল্ল হইয়া, সেই আনন্দের ভরে কোন শ্লোক কিংবা অভঙ্গের কোন এক চরণ আপন মনে আওড়াইতে আওড়াইতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন; এই বিশ্রামটুকুই তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। তারপর আবার কাজ আরম্ভ হইত। নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় পৌঁছিয়া দুই ঘণ্টার পর, স্নান করিতে উঠিতেন, এইরূপ নিয়ম ছিল। স্নান ও আহার হইয়া গেলে, সেই আসনে বসিয়াই সমস্ত লোকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। পূর্ব্বদিনে আমাকে যে কাজ করিবার জন্য বলিয়া রাখিতেন তাহা কিরূপ হইল ও কতটা হইল তাঁহার খোঁজ লইতেন। প্রতিদিন ডাকে নূতন পত্র কাহারও আসিলে তাহা দেখিয়া তাহাদের উত্তর কি দিতে হইবে তাহা বলিয়া আমি একটু বিশ্রাম করিতাম। উনি ততক্ষণ সমস্ত পত্রের উত্তর লিখিয়া রাখিতেন এবং আমি উঠিলে পর, আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন; এইরূপ আমাকে বলিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা, পৌনে ঘণ্টা, কখন কখন এক ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন। আমি সেইখানেই তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া পত্র লিখিতে বসিতাম। নিদ্রা হইতে উনি উঠিলে পর, ওঁকে লিখিত পত্র পড়িয়া শুনাইতাম, তারপর পত্রগুলি বন্ধ করিয়া ডাকে দিবার জন্য সিপায়ের হাতে দিতাম। তাহার পর আমি রঘুবংশের নূতন দুই শ্লোক বাহির করিয়া তাহা দুই তিনবার ওঁর নিকট পাঠ করিয়া বুঝিয়া লইতাম;—যাহাতে

তাহার পর দিন তৈয়ারী করিয়া রাখিবার সুবিধা হয়। এই সমস্ত হইলে পর, "উনি" একটু জল কুলকুচি করিয়া আফিসে যাইতেন। সেখানে ফল সুপারী লইয়া তাঁহাকে দিতাম, তারপর সন্ধ্যাকালপর্য্যন্ত ওঁর কোন কাজ আমার করিতে হইত না। তাহার পর আমি মারাঠী সংবাদপত্র লইয়া সেই বিছানার উপরেই পড়িতাম, কিংবা গ্রামের কোন মহিলা আসিলে তাঁহার সহিত গল্প করিতে বসিতাম, কিংবা তাঁহাদের গ্রামে দ্রষ্টব্য যদি কিছু থাকিত তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতাম।

এদিকে দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ওঁর সরকারী কাজকর্ম্ম হইয়া গেলে পর, সন্ধ্যাকালে, তালুকের কর্ম্মচারী, প্রধান প্রধান মহাজন, মাষ্টার প্রভৃতি লোক দেখা করিতে আসিত। তখন কলম ফেলিয়া রাখিয়া উনি দফ্তর বাঁধিতে বলিতেন এবং অভ্যাগত লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। সকালে যথেষ্ট বেড়ানো না হইয়া থাকিলে সেই লোকদিগের সহিত তিনি বেড়াইতে যাইতেন। উনি খুব জোরে দ্রুত চলিতেন, তাঁর সহিত সমান চালে আর কেহ হয়তো চলিতে পারিত; কিন্তু তালুকের গ্রামে আসিয়া কাজের অধিকার পাইয়া যাহাদের রাজ-রাজড়ার চাল হইয়া পড়িয়াছিল, পথ চলিবার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছিল, সেই রাও সাহেবরা ওঁর সঙ্গে সমান-চালে চলিতে নাস্তা-নাবুদ হইয়া পড়িতেন। আমাদের লোকেরা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে চলিত, কিন্তু রাওসাহেবদের দল পিছাইয়া পড়িত। চলিতে চলিতে উনি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া উহাদের পক্ষে মুস্কিল হইত, এইজন্য তাহার পর হইতে সাবধান হইয়া, বেড়াইতে যাইবার সময়টা এড়াইয়া উহারা একেবারে রাত্রি ৭টার সময় সাক্ষাৎ করিতে আসিত। মুন্সেফ, মাম্লেদার উঠিয়া গেলে পর, বাকীলোক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায়, নানাবিষয়ের সংবাদ ও খোঁজখবর পাইবেন—ইহাই "উহার" উদ্দেশ্য ছিল। সেই গ্রামে জমির খাজনা কত, কি পরিমাণ কর উহাদিগকে দিতে হয়, জমি কোন্ ফসলের পক্ষে ভাল, কর আনা পরিমাণ ফসল হয়, অবসরকালে গ্রামের লোকে কি করিয়া সময় কাটায়, বড় রকমের ব্যবসা কি ও তাহা কেমন চলে, কোন্ দেবতা গ্রামের মুখ্য দেবতা, তাহার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আয় আছে কি না, সেখানে কোন্ পুরাণ পাঠ হয়, গ্রামের বিশেষ উৎসবটা কি, সন্ধ্যাকালে কেরাণী, বেপারী, চাষী, দেশমুখ, দেশপাণ্ডা—এই সমস্ত গ্রামের লোক একত্র মিলিয়া কোন ভজনপূজন করে কি না, সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া শ্রান্তক্লান্ত প্রাণের ইহাই একমাত্র শ্রেয়স্কর বিশ্রামের জিনিস, এইরূপ বিশ্রাম লওয়া আবশ্যক—এই সকল কথা এবং গ্রামের পাঠশালার কাজ কিরূপ চলিতেছে, সে বিষয়ে লোকেরা কতটা মনযোগ দেয়—এই সমস্ত বিষয়ের খোঁজখবর লইতেন।

এইরূপ সহজ কথাবার্ত্তা হইতে খোঁজখবর লইবার উহার অভ্যাস ছিল। লোকেরা উঠিয়া গেলে পর, সন্ধ্যার সময় আহার করিতে বসিতেন; তারপর দুপুরের সময়, আমি যে সকল মারাঠা সংবাদপত্র পড়িয়া রাখিতাম তাহা হইতে কিছু কিছু মুখে মুখে বলিতে হইত। সেইরূপ আবার, আজ নূতন খবর কি, কোন্ মহিলা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, কি কথাবার্ত্তা হইল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি বলিতাম,—"বলিবার মতো কথা এমন কিই বা হইয়াছে? এখানকার সেখানকার 'যা' 'তা' কথা হইয়াছিল।" আমার এই কথা শুনিয়া "উনি" বলিতেন:—"হুঁ, ঠিকই হইয়াছে; তুমি শিক্ষিতা, তোমার সহরে বাস, রোজ তুমি খবরের কাগজ পাঠ কর—এইরূপ তোমার ধরণধারণ! সে বেচারীরা গ্রাম্য লোক, তারা সহরের সভাসমিতির কথা কোত্থেকে জানবে? তোমার এই ধরণধারণ ও বড়মানুষী দেখে তারা বোধ হয় অবাক্ হয়ে গিয়েছিল! তখন তারা আর কি বল্বে।" এইরূপ উনি দুই পক্ষেরই কথা কিছু কিছু বলিয়া আমাকে লজ্জা দিতেন, এই রকম বলবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল, আর কিছুতে না। এইরূপ আমোদ-আহ্লাদে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর শোবার আগে, একঘণ্টাকাল কেরাণীদের মধ্যে কেহ একজন আসিয়া ইংরেজি সংবাদ পত্র পড়িত। সেই সময় আমি ওঁর পায়ে ঘী মালিস করিতাম। কারণ চোখের পীড়া থাকায়, প্রতিদিন পায়ে ঘী মালিস না করিলে নিদ্রা হইত না। যে দিন পড়া হইত না, সেদিন আমরা দুজনে দাবা খেলিতাম। এই সময়ে চাকর পায়ে ঘী মালিস করিত। প্রায় ১১টার সময় আমরা শুইতে যাইতাম। ওঁর নিদ্রাটাই আসলে কম হইত বলিয়া ৪।৪॥০ ঘণ্টা নিদ্রা হইলেই উনি যথেষ্ট মনে করিতেন। এই সম্বন্ধে আমার আবার ঠিক্ উল্টা ছিল। আমি বেশী ঘুমাইতাম বলিয়া ৩।৩॥০টার সময় ওঁর ঘুম ভাঙ্গিলেই, আমাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেন। তখন উঠিতে বিরক্তি বোধ হইত বলিয়া মনে মনে আমার রাগ হইত এবং কখন কখন কষ্ট হওয়ায় আমার কান্না আসিত; কিন্তু ইহার কিছুই আমি বাহিরে প্রকাশ করিতাম না, বলিতামও না। তবু উনি জানিতে পারিতেন। কিন্তু যেন উনি জানিতে পারেন নাই এইরূপ দেখাইয়া, যতক্ষণ না আমি আমার নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম আরম্ভ করিতাম—ততক্ষণ আমাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। আমি একবার উঠিয়া নিকটে গিয়া পাঠ্য-পুস্তক হাতে লইলেই অমুক স্থানটা পাঠ কর—এইরূপ আমাকে বলিতেন। এইরূপ আমি পাঠ আরম্ভ করিয়া

দিলে, তাহা হইতে শ্লোক, কেকা, অভঙ্গ উনি বলিতে সুরু করিতেন; কিংবা শুনিবার সময় অর্থের দিকে মনটা গেলে, তল্লীন হইয়া হাতে তুড়ী কিংবা তাল পর্য্যন্ত দিতে থাকিতেন। নামদেবের কোন প্রেমরসপূর্ণ অভঙ্গ ওঁর ভাল লাগিলে, তাহা আমাকে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিতেন এবং সেই অভঙ্গের চিন্তায় মন নিমগ্ন হওয়ায়, চোখ বুজিয়া দুলিতে আরম্ভ করিতেন, এরূপ অবস্থাও কখন কখন হইত। এই সময়ে সকালের শান্ত মৃদু আলোকে সেই ভক্তিপূর্ণ মুখ বড়ই প্রেমার্দ্র দেখাইত, তাহাতে আমার মনও ভাবে গদগদ হইত এবং ওঁর উপর ভালবাসা ও ভক্তি স্বতই বৃদ্ধি হইত। আমি একলা থাকিলে আমার মনে হইত, আমি ওঁকে কেবল পার্থিব সম্বন্ধের দৃষ্টিতে, কিংবা সংসারের দৃষ্টিতেই দেখি, কিন্তু ওঁর ভিতরে আধ্যাত্মিক শক্তি ও দৈবী বিভূতি বেশী আছে। কিন্তু এইভাব মনে অনেকক্ষণ স্থায়ী হইত না। এই বিষয়ে ওঁকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব, এবং আমার যাহা মনে হয় ওঁকে বলিব, এইরূপ মনে করিয়া আমি যখন ওঁর মুখের পানে তাকাইতাম এবং সেই সময়ে উনিও যখন আমার দিকে তাকাইতেন, তখন এইরূপ চোখাচোখী হওয়ায়,, আমার সেই জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা বালির ইমারতের মতো সমস্ত ধ্বসিয়া যাইত। আমি কিছু বলিতে যাইতে ছিলাম, ইহা লক্ষ্য করিয়া উনি বলিতেন, "আমার বোধ হচ্চে, আমার বিষয়ে কোন টীকাটিপ্পনী করবে বোলে তোমার মনে ঘুট্‌মুট্‌ করচে—না? যদি তা হয়, বোলে ফেল না, অত ভাবচ কেন? আমরা সাদাসিধা মানুষ! কোন রকম করে' ভজন পূজন করি। তুমি ইংরেজী শিক্ষিতা মহিলা, এ তোমার তেমন রুচিকর হবে না।" এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় উঠিয়া যাইতাম। এইরূপ নিত্য চলিত।

তালুকের প্রত্যেক গ্রামে আমরা দুই তিন দিন থাকিতাম। তখন মেয়েদের স্কুলের মাষ্টার, স্কুল দেখিবার জন্য আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারা আমন্ত্রণ করিলে পর, "উনি" বলিতেন "বক্তৃতা দিবার কাজ মহিলাদের। তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ কর—তাহা হইলে তাঁহারা আসিবেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতেন, এবং কখন্ স্কুল দেখিতে যাইতে হইবে তাহার সময় ঠিক্ করিতেন। রাত্রে আহারের সময় "উনি" জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ দেখা করিতে কে কে আসিয়াছিল?" আমি বলিতাম—"কেহই না। মামলেদার-গৃহিনী ও মুনসেফ-গৃহিনী আসিয়াছিলেন।" সন্ধ্যার সময় বালিকা বিদ্যালয়ের মাষ্টার আসিয়া আমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। এই কথা শুনিয়া উনি বলিতেন, "তাহলে, কখন যাবে স্থির করলে? একটা কিছু বক্তৃতা ঠিক্ তৈরী করে রাখতেই হবে। আমিও একটু-আগে কাজে ব্যস্ত ছিলাম সেই সময়ে একটা কি শুনছিলাম বটে, কিন্তু তখন সে বিষয়ে ততটা লক্ষ্য করি নি। কোন কোন পথ-চল্‌তি রাস্তার লোক বল্‌ছিল যে, একজন খুব স্থূল (অর্থাৎ গভীর) বিদ্বান্ মহিলা আসিয়াছেন, কাল বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা হইবে; ইত্যাদি ইত্যাদি কথা তারা বল্‌ছিল বটে; কিন্তু আমরা নিজের কাজে ব্যস্ত; সে দিকে লক্ষ্য করি নি; এখন মনে হচ্চে যে কথাগুলা কানে আস্‌ছিল, তা তোমার সম্বন্ধেই হচ্ছিল।" এ কথা যে প্রথম শুনিবে, সে সত্যই মনে করিবে, "উনি" গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলিতেছেন। অবসর সময়ে, ঠাট্টা তামাসা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। আমি বলিলাম "খুব স্থূল" এই কথাটাই আমার পক্ষে খাটে, বাকী সমস্ত কল্পনা।" তার পর দিন, আমি স্কুল দেখিয়া আসিবার পরেও, এই রকম ঠাট্টাই চলিতে লাগিল। কোনও গ্রামে, কোনও বাধা কিংবা আলস্যের দরুন স্কুল দেখিতে না গেলে উনি রাগ করিতেন এবং এইরূপ বলিতেন যে,—"লোকেরা আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করতে আসে, সেখানে একবার গিয়ে দেখ্‌তে কি বাধা হয়? সে খানে গিয়ে কি বোঝা ঘাড়ে করতে হবে? ওদের নিমন্ত্রণে তুমি গেলে তাতে এদের কি মোক্ষলাভ হবে? সেখানে কিছু জ্ঞান লাভ হবে বোলেই তোমার যাওয়া, আমি বল্‌চি বোলেই কি যাবে? আমি শুধু একটু মজা করবার জন্য বলি ঠাট্টা কথার কাল্‌তো অর্থ নিও না।" এইরূপ সুখসন্তোষে প্রবাস কি আরও ভাল লাগিবার কথা নহে?

এইরূপ আমাদের তো গৃহ অপেক্ষা প্রবাসে অধিক সুখ হইত। ভ্রমণ করিতে করিতে একবার "তাসগ্রামে" আমাদের আড্ডা হইল। তালুকের গ্রাম বলিয়া আমাদের সেখানে ২।৩ দিন থাকিতে হইল। এই সময়ে আমরা শ্রীগণপতির ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম। সেখানে উঠিয়া আমাদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে দুপুরবেলায় ডে-এ ইনস্‌পেক্টর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমাদের এই তালুকের স্কুলের পরীক্ষা এই সবেমাত্র শেষ হয়েছে, আর এই সময়ে আপনাদের শুভাগমন হল। এরূপ সুযোগ বলবামাত্র ঘটে না। বালক ও বালিকাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণের কাজটা আপনার এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই করা যাবে; আপনাদের দুজনের হাত দিয়ে দুই স্কুলের পুরস্কার দেওয়া যাবে" ইত্যাদি ডেপুটি অনুরোধ করিলে পর, 'উনি' তাঁকে বলিলেন—"আচ্ছা।" কেবল আমাকে রাত্রে বলিলেন যে, "আজ দুপুর বেলা স্কুলের ডেপুটী এসেছিলেন। পরশু দিন বালিকা-স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হবে।

ওরা পুরস্কার তোমার হাত দিয়ে দেবে মনে করছে। এই সময়ে একটা বক্তৃতা তৈরী করে নিয়ে যেতে হবে। আমি যে রকম অন্য সময়ে ঠাট্টা করে বলি, এ কথা সে রকম ঠাট্টা করে বলচি নে। তুমি ঠাট্টা মনে কোরো না। সেখানে কেবল মেয়েরাই থাকবে, পুরুষ কেহই আসবে না। কিন্তু অনেক মেয়ে আসবে। সেখানে গিয়ে তুমি লজ্জায় না পড়, এই জন্য তোমাকে আগে থাকতে বোলে রাখচি। মুখে যদি বলতে না পার, যা মনে হয় একটু লিখে নিয়ে যেয়ো।" এই কথা শুনিয়া আমি সত্য সত্যই ভীত হইয়া পড়িলাম; একটা দুর্বহ বোঝা যেন আমার মাথায় চাপানো হইয়াছে এইরূপ অনুভব করিয়া আমি বলিলাম, আমি আবার কি বলব? আমার কি বলা অভ্যাস আছে? এখনি আমার হাত পা কাঁপচে, তার পর পরশু দিন না জানি কি হবে। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, কি লিখব, কি বলব, আমার কিছুই মনে হচ্চে না। তুমি কিছু মুখে বলো, আমি লিখে নি।" এই কথা শুনিয়া উনি একটু জোর করিয়া বলিলেন;—"আমি কিছু বলচি নে, আমার নিজের কিছু কাজ আছে, আমি অন্যের কাজ হাতে নেব কি করে?' আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে তার পর সেই লেখা সেখানে পড়বে? এ আমার ভাল লাগে না। ভাল হোক্ মন্দ হোক্ তোমার যা মনে আসে তাই লিখে ফেল। তার ভিতর দুই একটা কথা কমবেশী করা যেতে পারে এই মাত্র। আর তা যদি না হয় প্রসঙ্গোচিত দু চার কথা মুখে বলবে—সেই ভাল। তা বলতে তোমার কি বাধা? এখন যদি তুমি ঘাবড়িয়ে গিয়ে থাক, কাল ভোরে লিখে ফেলো। তুমি মেয়েমানুষ মেয়েমানুষদের মধ্যে টক্করা-টক্করি হবে! সেখানে কেবল মেয়েরাই বলবে; তুমি দুই চারটে কথা যা বলবে তা একটু গুছিয়ে বল্লেই হবে।" এই ধরণে "উনি" অনেক কথা বলিলেন। তার পর দিন ভাবনা চিন্তাতেই কাটিয়া গেল। কিন্তু কি লিখিব তাহা ঠিক্ করিতে পারিলাম না। তাসগাঁওকর ভাই-সাহেবের বৈঠকখানায় পুরস্কার-অনুষ্ঠানের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীমতী ভাই-সাহেব এবং গ্রামের প্রায় ৮৫ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমি সেখানে গেলাম। মেয়েরা কিছু কবিতা আবৃত্তি ও শিক্ষয়িত্রী কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর মেয়েদিগকে আমার দুই চারিটা উপদেশের কথা বলিবার সময় আসিল। আমি ত উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু আমার দম আটকাইবার মতো হইয়া হাত পা কাঁপিতে লাগিল; দুই তিন মিনিট এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তবুও আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—কে জানে কিরূপ হইল; ২০।২৫টা কথা আমি তাড়াতাড়ি ও অবাধে বলিয়া গেলাম সত্য। সভায় দাঁড়াইয়া সভাকর্ত্রীর হিসাবে বক্তৃতা করিবার প্রসঙ্গ আমার এই প্রথম উপস্থিত হয়। এই অনুষ্ঠান এখানকার মহিলাদের খুব ভাল লাগিয়াছে মনে হইল, কারণ, তারপর, ঐ গ্রামে আমরা যে দুই দিন ছিলাম, সেই সময়ে অনেক মহিলা, "হলুদকুঙ্কুমে" তাদের বাড়ী আমরা যাই এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং দুই দিনই অনেক মহিলা আমাদের বাড়ী আসিয়া গল্পগল্প করিত। এক সময়ে কোন কারণে "ওঁর" অন্দরে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু অনেক মেয়ে সেখানে থাকায়, ওঁকে ফিরিয়া যাইতে হইল। আমাকে ঠাট্টা করিবার উনি এই এক উপলক্ষ্য পাইলেন এবং বলিলেন "এখন তোমার এই শিষ্যমণ্ডলী তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দিবে কিনা আমার ভয় হচ্ছে। মেয়েদের কাণ্ড এই রকমই।" পুরস্কার অনুষ্ঠানের দিনে আমি গৃহে আসিলে, "আজ কেমন হল?" এইরূপ অনেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। শুধু এই কথা বলিলাম, মেয়েদের মধ্যে যাই হোক না, পুরুষদের সে-সব খোঁজ করবার দরকার কি? আমি লজ্জায় পড়ব, তুমি ভবিষ্যদ্ বাণী করেছিলে—সেই রকম কিছু হয়ে থাকবে। কিছু না বোলে দিয়ে, কিছু না শিখিয়ে দিয়ে একজন মূর্খ-মানুষকে এত লোকের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে এই রকমই ত হবার কথা। আর কি হবে?" এই কথা ওঁর ভাল মনে হইল না। মনে হইল যেন উনি কি একটা ভাবিতেছেন, কিন্তু তাহার পর, একটি কথাও বলিলেন না। কিন্তু ঘুমাইবার আগে আর না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না—আমাকে পুনঃ পুনঃ খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—"তুমি যা বলছিলে, এখন সব খুলে বলো, সমস্ত কথা না শোনা পর্য্যন্ত মানুষের ভাবনা হয়। একটা কোন কাজ দায়িত্বের সঙ্গে তুমি কতটা করতে পার, এইটিই আমি দেখতে চাই। এতে ঠাট্টা চলে না।" এই কথা শুনিয়া আমার যাহা মনে ছিল সমস্তই বলিলাম। এই সময়ে তিনি উদাহরণ দেখাইলেন।—"আমাদের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে আপত্তি আনে, তাতে এই কথাই তারা বিশেষ করিয়া বলে যে, মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে, উদ্ধত বে-পরোয়া ও মর্য্যাদারহিত হইবে। এইজন্য, মেয়েদের,—শিক্ষিতা মেয়েদের এই আপত্তি তুলিবার কোন অবসর তোমার দেওয়া উচিত নয়। মানুষ উদ্ধত হইবে—ইহা নিশ্চয়ই শিক্ষার পরিণাম নহে। সুশিক্ষা ও সম্পদের পরিণাম মানুষকে বিনয়সম্পন্ন ও নম্রই করিয়া থাকে। এর উদাহরণ, কলাগাছ; এ উদাহরণ সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার মতো, একটা বড় কাঁধিই—কলা গাছের ফল-

সম্পদ ; এই সম্পদ লাভ করিলেও কলা গাছ কিছুই মনে করে না, বরং তাকে আরও নম্র ও বিনয়ী হইতে দেখা যায়। এবং এইজন্যই কলাগাছের এত শোভা। ইহা হইতে আমাদের এইটুকু জ্ঞান লাভ হয় যে, বিদ্যা, ধনসম্পত্তি, অধিকার, এইরূপ কোন কিছু বৈভব লাভ করিলে, আমরা অধিক নম্র ও বিনয়ী হইয়া প্রীতি ও ভক্তিসহকারে আপন স্বামীর সহিত, গুরুজনদিগের সহিত ব্যবহার করিব, তাহাতে আমাদের কল্যাণ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই সমস্ত কথা আমি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিলাম—তাহাতে 'উনি' খুশী হইলেন মনে হইল। কোন উত্তর করিলেম না। এ-যাত্রা ফিরিবার সময় প্রথমে "ওয়াই"-নগর, তাহার পর মহাবলেশ্বর হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। মহাবলেশ্বরে ৮ দিন থাকিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি (ভিন্ন ভিন্ন points) দেখিয়া লইলাম এবং প্রতাপগড়ে গিয়া সেখানকার কেল্লা, যেখানে শিবাজী অবজুল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন সেই স্থান ও দেবীর মন্দির দেখিলাম।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।*

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত কয়েকটী গীত প্রকটন করিয়াছিলাম তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু ইহার তুল্য বঙ্গভাষা ভাষিত অমূল্য গীতরত্ন এ পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন, ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য ও কতকাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তথাচ ইঁহার কৃত একটিও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতন ভাবে পরিচিত হইতেছে ; যখনি যাহা শুনা যায় তখনই তাহা নূতন বোধ হয়, গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বর্ণে বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে। কোন সুগায়ক ব্যক্তি অপর কোন কবি রচিত গীত অতি সুস্বরে গান না করিলে শ্রুতিসুখকর হয় না তাহাতে বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে, রামপ্রসাদী পদে ইহার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন করে না, কাকের ন্যায় অতি নীরস কর্কশকণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদী পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকস্মাৎ অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এই গানে যন্ত্র না হইলে যন্ত্রণার বিষয় কি ! যিনি মানুষ হইবেন শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার মন অমনি মুগ্ধ হইবেক, ভাবার্থ গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে তৎকালে তাঁহার চিত্ত এতদপেক্ষা পরম প্রিয় বলিয়া আর কাহাকেই গ্রাহ্য করিবে না। কোন কোন রামপ্রসাদী পদের কোন কোন চরণের কোন কোন শব্দ ও কোন কোন ভাব এরূপ রমণীয় ও এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল পরিপূরিত যাহার স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে বহুশাস্ত্রের মর্ম্ম অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং তদ্দারা সিদ্ধান্ত-সূর্য্যের সন্দীপণে সমুদয় সংশয়ধ্বান্ত অস্ত হইলে হৃদয়ারবিন্দ আনন্দ-মকরন্দ-ভরে প্রফুল্ল হইয়া কি এক অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপারে অভিভূত করিতে থাকে।

কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইঁহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিনকালে দৎ-কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ-পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর-

* কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' 'কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন' প্রবন্ধ ১২৬০ সালের ১লা পৌষ শুক্রবারে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১—১৪ পৃঃ। প্রভাকর সংখ্যা ৪৮০১। 'প্রভাকরের' এই সংখ্যা এখন লুপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে একখানি মাত্র আছে। 'গয়াকাহিনী' ও নচিকেতা লেখক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজ ৮ বৎসর যাবৎ রামপ্রসাদ জীবনী লিখিতেছেন। তিনি বহু অনুসন্ধানে 'সংবাদ প্রভাকর' সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সযত্ন রক্ষিত লুপ্ত প্রায় প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আকারে যথাযথ ভাবে এখানে উদ্ধৃত করিলাম। স্থল বিশেষেও গুপ্ত কবির বানান সংশোধন (?) করা তিনি সঙ্গত মনে করেন না। কারণ সেই সময়ে এই বানান ও ভাষা দেশবাসীর আদর্শ ছিল। ভং বোং সং

প্রসঙ্গে তাহারই বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্নচিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্তমতাবিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, অতি জঘন্য দ্রব্য আহার করিয়া ও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উন্নতিকল্পে মনোযোগ না থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি যদ্রূপ অদ্বিতীয় কবি ছিলেন ও তাঁহার জীবিত সময়ে কবিতার যদ্রূপ সমাদর ছিল এবং তৎকালে এই দেশ যদ্রূপ ধনী লোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয়-বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাসনাবিশিষ্ট হইলে অক্লেশে বিপুল বিত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক পুত্র-পৌত্রাদিকে সমূহ সুখে সুখী করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করেন অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপাসোণার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে ?

রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য-পদের প্রয়োজন কি ? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন, সেন সদাত্মার যে পদ তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে, বিপদনাশক বিপদ। যিনি যথার্থ বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধন-রক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশমাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাক্ কলহ ও বিবাদ হইত, সেন-কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না তিনি মানসিক সংকল্প পূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব-প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সেদিকে দৃকপাতো করিতেন না, প্রতিদিবস নিয়মিতকালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগা গোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল "দুর্গা নামে" পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া বসিলেন। যথা ঃ—

(১)

আমায় দেওমা তবিল্‌দারী।
আমি নিমক্ হারাম্ নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে,
ইহা আমি সইতে নারি,
তাঁড়ার জিম্মা আছে যার,
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ্ স্বভাব-দাতা,
তবু জিম্মা রাখো তাঁরি ॥ (১)
অর্দ্ধ-অঙ্গ জায়্‌গির,
তবু শিবের মাইনা ভারি,
আমি বিনা মাইনায়্ চাকর কেবল্
চরণ ধুলার অধিকারী ॥ (২)
যদি তোমার বাপের ধারা ধর,
তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর,
তবে তোমা পেতে পারি ॥ (৩)
প্রসাদ বলে এমন পদের
বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত, পদ্ পাইত,
সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥ (৪)

খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন, "মহাশয়, একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাস-পূর্ব্বক কর্ম্ম দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাত মাত্র নাই, কেবল পাগলামি করিয়াছে ইত্যাদি" উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগা গোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে বিলোকন ও

"আমায় দেওমা তবিলদারি" এই পদটী সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করতঃ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন, "তুমি পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ ? এ ব্যক্তিতো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই করিয়াছে, তুমি কথার ঈঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়-মদে মত্ততা জন্য ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবী-পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি," পরে অতি প্রিয় বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন, "রামপ্রসাদ ! তুমি যে পদে পর্দাপণ করিয়াছ তাহাতে এপদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এ সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিকবৃত্তি প্রদান করিব (১) তোমার আর ক্ষণকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।"

রামপ্রসাদ সেন ৩০ ত্রিশ টাকা মাসিকবৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ স্বল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই সুপ্রতুলরূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, একারণ স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, শুদ্ধ শক্তিভক্তি সার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোন দ্রব্যেরি অপ্রতুল ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাঁহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও কবির প্রণামিস্বরূপ অনেক অর্থ ও বহুপ্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত, তিনি নিজে অতিশয় দাতা, এবং দয়ালু ছিলেন, স্নেহপাত্র অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন তাহাকেই তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এদিকে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরিবারগণ হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, এ জন্যই তাঁহার দীনতার ক্ষীণতা হইত না, কন্যা পুত্র স্ত্রী কিংবা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণপূর্ব্বক মনের ভাবে এক একবার এক একটা গান করিতেন।

যথা :—(২)

"তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না,
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না ॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর, হোক্ দিলে দিলে বাজি,
তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজি ভোর গো ॥(১)
এ মা দিতিস্, দিতাম্, নিতাম্, খেতাম্,
মজুরি করিয়া তোর, এবার মজুরি হোল না,
মজুরা চাব কি কি জোরে করিব জোর গো ॥ ২
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা,
মিছামিছি করি শোর্।
শুধু শোর্ করা সারা, তোর্ যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর্ গো ॥৩
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে,
কি কাজ তার কঠোর।
আমার এ-কূল, ও-কূল, দু-কূল মজিল,
সুধা না পেলে চকোর গো ॥৪
এমা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে,
দারুণ করম ডোর্।
রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে দুটানায়,
মরে মন ভুঁড়া চোর গো ॥৫

এই গীত যখন রচনা করেন, তখন তাঁহার মনের ভাব কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা ভাবজ্ঞ জনেরা বিবেচনা করিবেন। ইহার গূঢ়ার্থ যিনি গ্রহণ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের অভাবকালে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভাবের অভাব করা অথবা সেই অভাবকে অভাবে রাখিয়া স্বভাবে রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে, যে কেহ হউন, এই সহজ তখন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে, যখন তিনি সহজে সহজকে জানিতে পারিবেন। যথা :—(৩)

(১) এই স্থলে দুই প্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৺দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন কলিকাতায় নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরি-গিরি কর্ম্ম করিতেন।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে, এ সংসারে সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ বলে শিব ভিখারী॥১
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে যান্নি ব্রজেশ্বরী॥২
নাতোয়ানী কাচ্ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ ধরি,
ওমা কোথায় লুকাবে তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥৩
প্রসাদে প্রসাদী দিতে মা এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখো পদে,থেকে পদে,পদে পদে বিপদ সারি॥৪

তথা:—(৪)

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি-কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ খাদি উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা,
তেমনি ত দেখায়॥১
যে জন গৃহস্থলে, দুর্গা বলে, পেয়ে নানা ভয়,
এমা তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥২
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরুতলে রয়,
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা এ বড় সংশয়॥৩
প্রসাদে ঘেরেছে, তারা প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাইবন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায়॥৪

কোন আত্মীয় ব্যক্তি একদিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়া ছিলেন, "সেনজ এতদিন দুঃখে গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর" এই কথার তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল। যথা:—(৫)

মন কোরনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক,
তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে,সুখের আশে বড় কসা।
হোয়ে ধর্ম্ম তনয়,ত্যেজে আলয়,বনে গমন হেরে পাশা॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করনা এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুঃখ দুঃখেই সুখ
ডাকের কথা আছে ভাষা॥২
মন ভেবেছ কপট্ ভক্তি কোরে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,এড়াবেনা রতি মাষা॥৩
প্রসাদের মন হও যদি মন,কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন,রতন পাবে অতি খাসা॥৪

এই প্রকারের কত চমৎকার চমৎকার বিবরণ আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে। একদিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন "দেখ দেখ মাতাল ব্যাটা যাইতেছে", তৎকালে তৎস্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তটস্থ হইয়া দশনাগ্রে রসনাবিস্তারপূর্ব্বক বলিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি করিলেন, রাম প্রসাদ সেন অতি সাধু ব্যক্তি তাঁহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন?" এই কথা কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদ সেন হাস্যবদনে 'ও তার্কিক ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছ?' এই বলিয়াই গান ধরিলেন। যথা:—(৬)

"রসনে কালী রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে,
তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থ মাত্র, ঘট পটরে। ১
রসনারে কর বশ শ্যামানামামৃত রস,
গান কর, পান কর, পাত্র বটরে॥২
সুধাময় কালীনাম, কেবল কৈবল্যধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে। ৩
শ্রুতি রাখ সত্ত্ব গুণে, অন্য নাম নাহি শুনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিরে কটোরে॥" ৩৬

তথা (৭)

"সুরা পান করিনেরে, সুধা খাই কুতূহলে,
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে।"

আহা এই স্থলে রামপ্রসাদ সেন, কি বিচিত্র কবিত্ব পাণ্ডিত্য, ও পরমার্থ রসের রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন! বোধ করি জগদীশ্বর এবম্ভূত অদ্ভুত ক্ষমতা অপর কাহাকে প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাঁহার যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরতই ইঁহার কণ্ঠে

জাগ্রতাবস্থায় বিহারপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা ছিলেন না, নচেৎ এবম্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যে জলপ্রপাত।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

মলয়-পর্ব্বতের নাম কে না অবগত আছে? ভারতীয় ঋষিগণ মুক্ত কণ্ঠে এই পর্ব্বতের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি অগস্ত্য এই মলয়পর্ব্বতের (উপত্যকার) উপর আশ্রম স্থাপন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য এবং মাধবাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জনৈক মনীষী নিম্নলিখিত সূত্রত্রয় দ্বারা মলয়-পর্ব্বতের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

নব-চন্দন-কান্তার-কন্দল-মন্দ-মারুতং।
অভঙ্গুর ভুজঙ্গস্ত্রী সংগীতরসসংকুলং ॥
করিপোতকরাকৃষ্টস্ফুরদেলাতিবাসিতং।
বরাহদংষ্ট্রিকাধ্বস্ত মুস্তাসুরভি কন্দরং ॥
পটীরদল পর্য্যঙ্কপ্রসুপ্তব্যাধদম্পতিং।
মাধবীমল্লিকাজাতিমঞ্জরীরেণুরঞ্জিতং ॥

মলয় পর্ব্বতোপরি অসংখ্য চন্দন বৃক্ষ থাকা প্রযুক্ত মন্দ মন্দ সুগন্ধি বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়। নাগস্ত্রীগণের মধুর সঙ্গীত সর্ব্বত্র ধ্বনিত হয়। হস্তিশাবকগণের শুণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট এলা (ছোট এলাচি) এবং বন্যবরাহের দন্ত দ্বারা উৎপাটিত মুস্ত-মূল (খস-খস) হইতে সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। তথায় ব্যাধ-দম্পতী চন্দনপত্রের পর্য্যঙ্ক প্রস্তুত করিয়া তদুপরি শয়ন করে। মাধবী, মল্লিকা, জাতি প্রভৃতি পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়।

মলয়পর্ব্বতে বাস্তবিক নাগপত্নীগণ সঙ্গীত করিত কিনা জানা যায় না, তবে কবিগণ ইহা মলয়পর্ব্বতের একটি বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমঘাটের নিকটে কোন কোন স্থানে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তথায় একপ্রকার নাগিনীনামক অতি বৃহদায়তন (নারিকেল বৃক্ষের ন্যায়) সর্প ছিল। তাহার ফণা কয়েক হস্ত প্রশস্ত। এই সর্প বংশীধ্বনির ন্যায় এক প্রকার শব্দ করিত—যাহা অনেক দূর হইতেও মধুর সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুত হইত। সম্ভবতঃ ইহাকেই কবিগণ নাগস্ত্রীর সঙ্গীত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন মলয়পর্ব্বতের নানা স্থানে ঋষিগণ-মনোলোভা, কবিচিত্ত-উন্মাদিনী স্বাভাবিক শোভা বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে জল-প্রপাত অন্যতম। বোধ হয় এই সকল কারণেই মলয়াচল সকলের অতি আদরের স্থান ছিল।

মলয়পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম মহীসুর অধিত্যকা। এই মহীসুর অধিত্যকার উত্তর পশ্চিম-প্রান্তে ভীষণ বন-সংকুল পশ্চিমঘাট পর্ব্বত। যে কেহ এই স্থান একবার দেখিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ইহা জাগরূক আছে।

মহীসুর অধিত্যকা এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। তন্মধ্যে কাবেরী প্রপাত, গরসপা প্রপাত, গোকক প্রপাত এবং দুধসাগর প্রপাত বিশেষউল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটি প্রপাতের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল।

কাবেরী প্রপাত।

মহীসুর ষ্টেট রেলওয়ের বাঙ্গালোর এবং মহীসুরের মধ্যবর্ত্তী মাদার নামক ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে শিবসমুদ্র নামক গ্রামের সন্নিকট কাবেরী নদী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে মলয়পর্ব্বত হইতে প্রায় চারিশত ফিট নিম্নে কর্ণাটের সমতলক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া জগতের একটি অতুলনীয় শোভার সামগ্রী সৃষ্টি করিতেছে।

উক্ত প্রপাতের পশ্চিমশাখার নাম গগনচুক্কী এবং পূর্ব্বশাখার নাম ভড়চুক্কী। পশ্চিমশাখা অপেক্ষা পূর্ব্বশাখার প্রপাত অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী। বর্ষাকালে ইহা প্রস্থে প্রায় এক চতুর্থ মাইল হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তার অল্প হইলেও, ইহা কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রপাতে বিভক্ত হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণ ইহাকে জগতের মধ্যে একটি

বৃহৎ ও সুদৃশ্য প্রপাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গগনচুক্কী প্রপাতের অনতিদূরে পীরসাহেব নামক একটি মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। এই সমাধির নিকট হইতে অবতরণ করিয়া যাইলে দেখা যায় যে প্রপাতস্রোত দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ স্থানেকে এলিকুর নামক একটি দ্বীপে পরিণত করিয়াছে। এখানে দাঁড়াইলে প্রপাতের দৃশ্য এবং গগনবিদারী বজ্রনিস্বন দর্শকের মনে একাধারে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার করে। শিবসমুদ্রে কাবেরীর উপর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত পুরাতন সেতু আছে। এই সেতু অতিক্রম করিয়া প্রায় দুই মাইল যাইলে তথা হইতে প্রপাতের দৃশ্য আরও অধিকতর সুন্দর দেখায়।

এই প্রপাতের সৌন্দর্য্য যেমন চমৎকার এবং অতুলনীয়, ইহা হইতে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদিও তদনুরূপ বিস্ময়কর। মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব দেওবান সার্ শেশদ্রী আয়ারের সময় ইহা স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ভারতপর্য্যটক সার সিডনী লো (Sir Sidney Low) সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

There is nothing in India or in all Asia more remarkable in its own way, than this skilful and successful effort to utilise and transmit some of the wasted force of Nature, and it says much of the Mysore Administration under its late Diwan, the clever Brahmin statesman, Sir Seshadri Iyer, that it had the courage and fore-sight to carry out and finance this project. The Sivasamudram power station is worth coming a long way to see, by those who are interested in the future, as well as in the present and the past of India.

শিবসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি দ্বারা তথা হইতে ৯০ মাইল দুরস্থিত কোলার স্বর্ণ-খনি সকল পরিচালিত হইতেছে, এবং তথাকার এবং বাঙ্গালোর এবং মহীসুরের তড়িৎ-আলোক সকল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

সম্প্রতি শিবসমুদ্রের বর্ত্তমান বাঁধটি উচ্চ করিয়া মহীসুররাজ্যে কৃষিকর্ম্মাদির জন্য জলসম্ভারের একটি প্রকাণ্ড সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাও ভবিষ্যতে মহীসুরের বর্ত্তমান দেওবানের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

গরসফা প্রপাত।

মহীসুর-প্রদেশে আরও একটি প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত আছে! ইহার নাম গরসফা-প্রপাত। ইহা কাবেরী প্রপাত হইতে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও গভীরতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। গরসফা মহীসুর-ষ্টেট্-রেলওয়ের সিমোগা নামক ষ্টেশন হইতে প্রায় ৬০ মাইল। সিমোগা হইতে ৪৫ মাইল দুরে সাগর নামক স্থান পর্য্যন্ত সরকারী ডাকগাড়ী পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী ১৫ মাইল স্বতন্ত্র ঝট্কা বা গো-শকটে যাইতে হয়।

গরসফায় ২৫০ ফিট প্রশস্ত সরস্বতী নদী চারিশাখায় বিভক্ত হইয়া গিরিশিখর হইতে ৮৩০ ফিট নিম্নে নিপতিত হইয়া এক অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রথম শাখা একাধারে অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সহিত পর্ব্বতশিখর হইতে ৮৩০ ফিট নিম্নে পতিত হইতেছে! দ্বিতীয়-শাখা দুই-স্তরে এবং তৃতীয়-শাখা তিন-স্তরে বিভক্ত হইয়া মত্ত প্রমথগণের ন্যায় তাণ্ডব-নৃত্য করিতে করিতে যেন কৈলাস-শিখর হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। চতুর্থ-শাখা বহুধারে বিভক্ত হইয়া যেন স্বর্গীয় অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে।

আহা কি অপরূপ দৃশ্য! এ হেন অতুলনীয় দৃশ্য দেখিয়া কে না মুগ্ধ হইবে? য়ুরোপীয় এবং আমেরিকান পর্য্যটকগণ যে ইহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাতের মধ্যে গণ্য করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ দৃশ্যে সাধক ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হইয়া পড়ে, কবি-হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠে, মূকেরও বাক্যনিঃসরণ হয়।

জনৈক য়ুরোপীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক এই দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত ভাষায় ইহার বর্ণনা করিয়াছেন :—

With the sunshine flooding it, and lighting its mighty sides :of perpendicular rock,

গোকক জলপ্রপাত।

কং প্রঃ বিধান।

দুধ সাগর জলপ্রপাত।
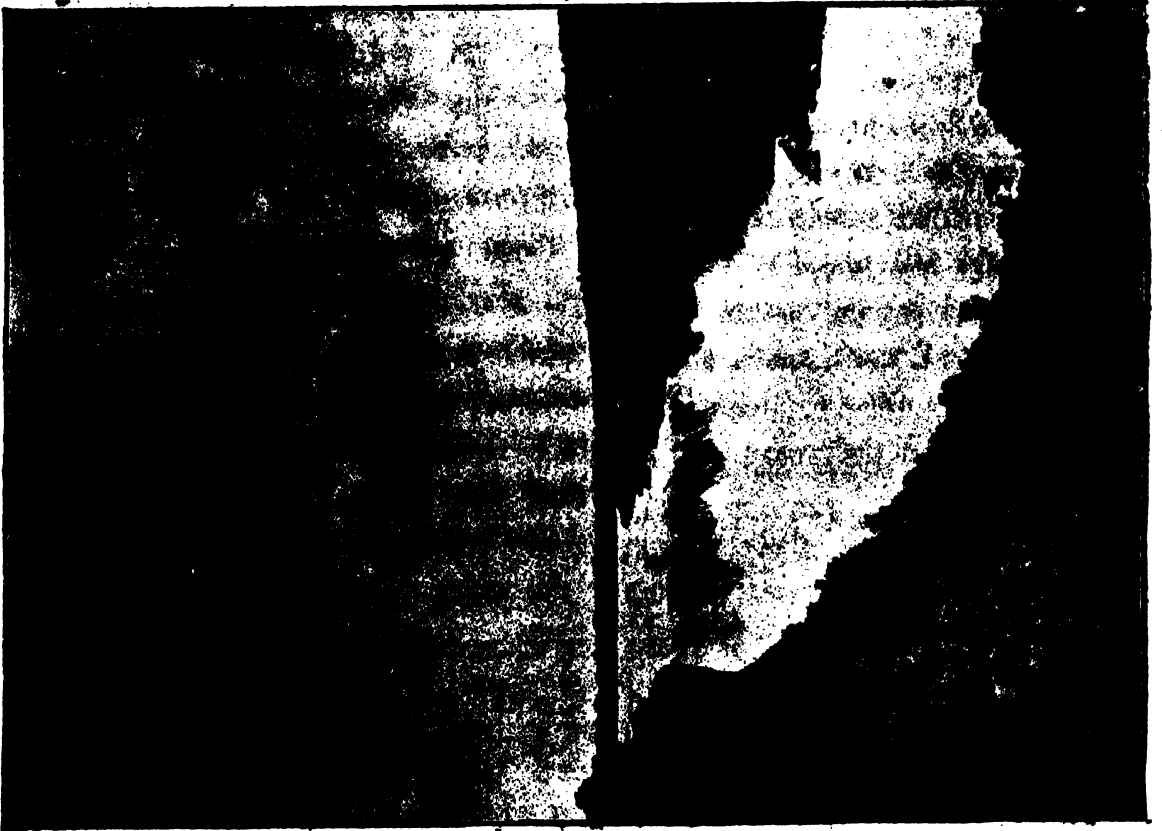
and jungle-filled gorges and ravines, it is a most beautiful and imposing panorama. Far below is the boulder-strewn bed over which the river, emerging from the vapour-shrouded pools, rushes in a network of rapids, while across the ever-rising veil of mist from the tumult of waters belew there is thrown a perfect rainbow spanning the end of the enchanted valley which sinks and ascends with the rising and setting sun. Lovely effects of lights and shadows are produced by the brilliant sunshine, which continually change with the passing hours, and greatly enhance the beauties of the multii-coloured rocks and foliage. Sitting in the increasing darkness and gazing into the obscurity of apparently bottomless depths, from which issue volumes of steam-like clouds, accompanied by an endless roll of thunder, one cannot but feel profoundly impressed by the scene, fit subject for the brush of a Dore and recalling his illustrations of Dante's Inferno.

গোকক প্রপাত।

বেলগাঁও হইতে গোকক-রোড চতুর্থ ষ্টেসন। এই ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩½ মাইল দূরে একটি জল-প্রপাত আছে। ইহা কাবেরী এবং গরসপা প্রপাত হইতে ক্ষুদ্র। ইহাকে গোকক-প্রপাত কহে। এখানে ঘটপ্রভা নদী একাধারে প্রায় তিন শত ফিট নিম্নে পতিত হইতেছে। এই জল-প্রপাত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গোকক্-মিল নামক একটি সুবৃহৎ সুতার কল পরিচালিত হইতেছে। কলটি প্রপাতের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ইহার সম্মুখে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। এই পথ দিয়া ৩১২টি সোপান অতিক্রম করিয়া শক্তি-সঞ্চয়-গৃহে উপনীত হওয়া যায়। এখান হইতে আরও কিছু দূর অবতরণ করিলে নদীর তীরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে প্রপাতের সম্পূর্ণ এবং অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রপাতের অপর পার্শ্বে একটি পাহাড় এবং তৎ-পশ্চাতে হুফেরী নামক গ্রাম এবং হুফেরী-রোড ষ্টেসন আছে। পূর্ব্বে এই ষ্টেসন হইতে গোকক মিলে যাইতে হইত। মিল হইতে নদীর অপর পারে যাতায়াত করিবার জন্য প্রায় এক-চতুর্থ মাইল লম্বা একটি তারের পুল (সেতু) আছে। ইহা প্রপাত হইতে কয়েক ফিট মাত্র পশ্চাতে অবস্থিত। এই পুলের উপর হইতেও প্রপাতের দৃশ্য সুন্দর দেখায়। আলোক-চিত্রে প্রপাতের উপরিভাগে যে কাল রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই উপরিউক্ত তারের পুল।

দুধ-সাগর প্রপাত।

আমরা অদ্য আর একটি জলপ্রপাতের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই প্রপাতের নাম দুধ-সাগর। ইহা গোয়া যাইবার পথে ক্যাসলরক (Castle Rock) এবং কোলেম (Collem) ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত ভীষণ অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই প্রপাতের শোভা ও দৃশ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। ঐ সময় প্রপাতের জল রেলের গাড়ী অতিক্রম করিয়া নিম্নস্থিত উপত্যকায় পতিত হয়। এমন কি যাত্রিগণ হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। ট্রেনে যাইতে যাইতে নানাস্থান হইতে এই প্রপাত নানাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। দূর হইতে এই প্রপাতটির প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন কেহ পর্ব্বত-শিখর হইতে দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে। এইজন্য ইহা দুধ-সাগর নামে অভিহিত হয়।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু এক্-সি-এস্)

আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তত্ত্ববোধিনীর শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিকা-গণকে সংক্ষেপে শুনাইতে বাসনা করিয়াছি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাধারণতঃ দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজনীতিমূলক প্রবন্ধ আলোচনার জন্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জড় পদার্থের উৎপত্তি ও সংস্থিতির সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক বিবরণী মানবসমাজে প্রচার করিতে অবসর প্রদান করিয়া সম্পাদক মহাশয় আমাকে সাতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছেন।

তোমরা মনে করিতে পার যে আমার মত ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থের আবার বলিবার কথা কি আছে? আমার যে কত মূল্য, তাহা তো কাহারও জানিবার বাকী নাই। বেণের দোকানে এক পয়সা ফেলিলে একতাল "চা-খড়ি" মিলে। আমার দ্বারা কি কাজ হয়, তাহা একজন পাঁচ বৎসর বয়সের স্কুলের ছেলে পর্য্যন্ত জানে। আমার আদর কত, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদিত নাই। সকালবেলা লোকে আমার দ্বারা দাঁতের ময়লা পরিস্কার করিয়া কুলকুচার সহিত মুখ হইতে আমাকে থু-থু করিয়া ফেলিয়া দেয়! অতএব আমার মত নগণ্য পদার্থের জীবনের ইতিহাসই বা কি এবং তৎসম্বন্ধে বলিবারই বা কি কথা আছে?

ওগো, তোমরা যদি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার কথা শুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটী কত রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যদিও আমি এতই দুর্ব্বল যে সামান্য আঘাতেই আমার দেহ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায় (brittle); যদিও বর্ষাস্নাত নির্ম্মল আকাশের ইন্দ্রধনুর ন্যায় আমার বর্ণবৈচিত্র্য নাই (colourless); যদিও তোমাদের শয়নগৃহের পার্শ্বস্থিত বিমলচন্দ্রিকাজাল-বেষ্টিত পুষ্পোদ্যানের সদ্যপ্রস্ফুটিত যূথিকা-সুন্দরীর ন্যায় সৌরভ-সৌন্দর্য্যে আমি তোমাদের নয়ন-মনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারি না (odourless); যদিও আমি রসশূন্য এবং মধুর ন্যায় জলে দ্রব হইয়া তোমাদিগের রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে অসমর্থ (tasteless, insoluble in water), তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি চিরদিন এরূপ অকর্ম্মণ্য, অচল, অসার পদার্থ ছিলাম না।

চা-খড়ি বর্ণ, স্বাদ ও গন্ধবিহীন, ভঙ্গপ্রবণ, জলে অদ্রবণীয়।

সে বহুদিনের কথা, তাহার পর কত দিন, কত মাস, কত বৎসর, কত যে যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, তাহা গণনার দ্বারা সংখ্যা করা যায় না। তখন পৃথিবীতে তোমাদের মত মানুষের আবির্ভাব হয় নাই। তখন কেবলমাত্র কতিপয় অতিকায় অদ্ভুতাকৃতি জলচর ও উভচর প্রাণী সসাগরা ধরণীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিত। বর্ত্তমান যুগ হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সেই সময়ে আমার জন্ম হইয়াছিল। একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ হইতে আমার উদ্ভব। আমি তাহার বড়ই আদরের বস্তু ছিলাম; আমি কঠিন হইলেও সে আমাকে সর্ব্বদা বুকে-পিঠে করিয়া সমুদ্রতরঙ্গের লীলাভঙ্গের সহিত নানা রঙ্গে আপনার আড়ম্বরশূন্য জীবনযাত্রা পরমসুখে নির্ব্বাহ করিত। আমি তাহার পিঠে চড়িয়া কখন সমুদ্রবক্ষে, কখন গভীর নীলাম্বুরাশির মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতাম; দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় আমার কঠিন আবরণে তাহার কোমল দেহ আচ্ছাদিত করিয়া প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া তাহার ভালবাসার কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিতে প্রয়াস পাইতাম। সেই একদিন, আর এই একদিন; সেই সুখস্বপ্নবিজড়িত অতীত জীবনের অস্পষ্ট স্মৃতি আজি সহসা মানসপটে উদিত হইয়া প্রাণের মধ্যে বড়ই ব্যাকুলতা উপস্থিত করিতেছে।

চা-খড়ির জন্ম।

এখন দেখিলে ত, আমি তোমাদের অপেক্ষা বয়সে কত প্রাচীন—এত প্রাচীন যে বৎসরের সংখ্যা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। বয়ঃকনিষ্ঠ হেতু তোমাদিগকে স্নেহসূত্রে "তোমরা, তোমাদের" বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, তোমরা কেহ ইহার জন্য রাগ করিও না।

পাথুরে কয়লার উৎপত্তি-বিবরণ তোমাদের কিছু কিছু জানা আছে। তাহার জন্মের সহিত আমার জন্মের কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য আছে, এইজন্য এস্থলে সে সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাথুরে কয়লা আমা অপেক্ষাও বয়সে অনেক প্রাচীন; আমার জন্মের বহু যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে জগতে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তোমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যেমন মাঝে মাঝে বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রভাবে কত পুরাতন সংস্কার, কত প্রাচীন প্রথা, কত জাতি, কত জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরার জীবনেতিহাসে কতবার যে কত ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার মূর্ত্তি যে কতবার নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। পাথুরে কয়লার জীবনের ইতিবৃত্ত এইরূপ একটী ভয়ঙ্কর বিপ্লবকাহিনীর সহিত জড়িত।

পাথুরে কয়লার জন্ম।

উদ্ভিজ্জগৎ হইতে পাথুরে কয়লার উদ্ভব। উদ্ভিদ মাত্রেরই মধ্যে যে অঙ্গারাংশ (carbon) থাকে, তাহাই জাগতিক বিপ্লবশক্তি সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া পাথুরে কয়লার আকার ধারণ করিয়া ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং মানবের বিবিধ কার্য্যে আত্মদান করিয়া কত প্রকারে তাহার সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধিসাধন করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শোকসংবাদ।

৺মাধুরীলতা দেবী—আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, সার রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা ৺মাধুরীলতা দেবী আজ কয়েক মাস ধরিয়া জ্বর ও কাস রোগে ভুগিয়া গত ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণসাধন করুন এবং পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৺ইরাবতী দেবী—গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে শ্রীমতী ইরাবতী দেবী পরিবারবর্গকে দুঃখে ভাসাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মহর্ষিদেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি হাঁপানি রোগে ভুগিতে ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দিন এবং পরিবারবর্গকে দুর্ব্বিষহ শোক বহন করিবার শক্তি প্রদান করুন।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 462.

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০০ সংখ্যা ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা শ্রাবণ, বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

গান।

রাগিণী হাম্বীর।

আমার পরাণ ধায়
ধায় তোমারি পানে।
গোপনে মরমব্যথা
লয়ে আছি একা হেথা
আকুল পরাণে।
তুমি আছ কোন্ দূরে
জ্যোতির্ম্ময় কোন্ পুরে
আমার কাতর ডাক
পশে না কি কাণে ?
বিরহে প্রভু তোমার
আঁখি ঝরে শত ধার
বাধা নাহি মানে।
কবে আসি দিবে দেখা
মধুরূপে প্রাণ সখা—
চৌদিকে উঠিবে ভরি
তব জয় গানে॥

ধর্ম্ম ও যুদ্ধ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান যুদ্ধে যে বিষম শোণিতপাত চলিতেছে, কবে তাহার শান্তি হইবে তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনের বিনাশে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রতি পরিবারের ভিতরে যে আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইতেছে, তাহার ফলে অনেকেই ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাদিগের বিক্ষত-হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিতে পারিতেছে না। অনেকগুলি সুবিখ্যাত সাময়িক সংবাদপত্রের স্তম্ভের ভিতর দিয়া এই আক্ষেপ বাহির হইতেছে, যে প্রচলিত ধর্ম্ম সত্য সত্যই সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে—উহা জনসাধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে (Faliure of the church)। এইরূপ আন্দোলন ও আলোচনার তরঙ্গ ইংলণ্ডের চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে।

সম্পদের ভিতর দিয়া যাহাদের জীবন চলিয়া যায়, ঐহিক বিভবের ভিতরে যাহারা অবস্থান করে, সুবিস্তৃত বাণিজ্যের কলরব যাহাদের কর্ণকে অনবরত প্রতিধ্বনিত করে, অবাধে যাহারা সংসারের সুখ উপভোগ করে, সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যপিপাসা ও গার্হস্থ্যের সুষমা যাহাদের দৃষ্টিকে নিরবচ্ছিন্ন সমাকৃষ্ট করিয়া রাখে, বিপ্লব ও বিপর্য্যয়ে যাহারা একেবারেই অনভ্যস্ত, তাহাদের মধ্যে যখন নিদারুণ বিপদপাত হয়, সমস্ত সৌষ্ঠব বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা হৃদয়ের শান্তি যে একেবারে হারাইবে, ভগবানের মঙ্গলময় হস্তের প্রতি যে সন্দিহান হইবে, ধর্ম্মমন্দিরে যাজকের নিকট গিয়া উপদেশ বাক্যের ভিতরে যে সান্ত্বনার অভাব উপলব্ধি করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি।

একেত পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মের ভিতরে পর-লোকের চিত্র, মানবাত্মার অনন্ত জীবনের ছবি সেরূপ পরিস্ফুট নহে; তাহার উপরে সমগ্র ইউরোপ-খণ্ড ধন-মান সম্পদ-বৈভবের নশ্বরতা আমাদের মত পদে পদে উপলব্ধি করিবার অবসর পায় নাই; তাহাতে এই কাল-সমরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের উপযোগী প্রার্থনা ও উপদেশের ধারা, যাহা এখনও অপরিবর্ত্তিত আকারে বিঘোষিত হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

যে কোন দেশেই হউক ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত ঘাত-প্রতিঘাতের ও বিপ্লবের ভিতর দিয়াই বিকশিত হয়। মানুষ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যখন অভাব বোধ করে, প্রকৃত মীমাংসা খুঁজিয়া না পাইয়া যখন তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, অতৃপ্তি অশান্তির ভিতরে পড়িয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, এবং যখন এই ভাব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখনই সেই দেশে সেই সময়ে অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়। তিনি আলোকরশ্মি সাধারণের সম্মুখে ধারণ করিয়া জনসাধারণের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেন, সর্ব্ববিধ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিয়া দেন, নূতন নূতন তত্ত্বের প্রচার আরম্ভ করিয়া দেন; লোকে তখন সেই নূতন শিক্ষা নূতন দীক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের অবসন্ন হৃদয়কে আবার প্রসারিত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়।

ভারতের উপর দিয়া অনেক বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক হিসাবে ইহা ভারতের দুর্ভাগ্যের কারণ হইলেও, অন্য দিকে ইহা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে ও বৈরাগ্যকে শতগুণে প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য জগত বাসনা-পরিপূরণে দৃঢ়ব্রত, কিন্তু এদেশের ধর্ম্ম বাসনা-নিবৃত্তিতে চরম সার্থকতা লাভের জন্য ব্যাকুল। সেখানকার আনন্দ ভোগে, এ দেশের তৃপ্তি ত্যাগে; সে দেশের লোক অস্থায়ীকে আঁকাড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, এখানকার লোক সাংসারিক সুখের উপকরণগুলিকে মায়া বা স্বপ্ন বলিয়া উপহাস করে; সে দেশের সুখের প্রতিষ্ঠা ক্ষুদ্রের উপরে, এ দেশের আনন্দের প্রতিষ্ঠা ভূমার উপরে; সে দেশে ইহজীবনেরই মূল্য আছে, কিন্তু এ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সামগ্রী পুণ্যস্নাত পরজীবন। সহিষ্ণুতাই এ দেশের অঙ্গের ভূষণ, তদ্‌বিপরীতই প্রতীচ্যের ভাব। দৈন্যে আমরা অটল, দীনতার চাপ পাশ্চাত্য জগৎ বহিতে চায় না।

ইহজগতে আমরা সৌভাগ্যলাভের আশা রাখি না। বহুশতাব্দী ধরিয়া আমরা রাজনৈতিক নিরাশার মধ্যে অবস্থান করিতেছি। ইহজীবনে নিরাশ হইয়া পরজীবনে আশান্বিত হইবার ব্যাকুলতা আমাদের অন্তরে বহুযুগ ধরিয়া কার্য্য করিতেছে; এবং ইহাই আমাদের বিশ্বাসকে ও ধারণাকে অন্যভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। তাই শত-বিপ্লবও আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না, হৃদয়ের স্থৈর্য্য হরণ করিতে পারে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াই আমাদের শিক্ষা; এবং এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতকে দেখিবার জন্য আমাদের চিরন্তন সাধনা। পাশ্চাত্য ভূমি এ সাধনার অবসর লাভে চিরবঞ্চিত। এ নব-সাধনা তাহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

এই নিদারুণ যুদ্ধে নরযজ্ঞ ভগবানের মঙ্গল-স্বরূপে প্রতীচ্যের বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিতেছে। কিন্তু ভগবানের রুদ্র মূর্ত্তির ভিতরে তাঁহার দক্ষিণ মুখের পরিচয়লাভ তাহাদের পক্ষে এতদিন সুদূর-পরাহত থাকিলেও তাহাদের নব দীক্ষা লাভের সময় সমুপস্থিত। এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া তাহারা নব সত্য নব আলোক লাভ করিবে, বিপ্লবের ভিতরে পড়িয়া তাহারা দিব্য দৃষ্টি লাভ করিবে। জগন্মাতার প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির ভিতরে তাঁহার সেই অভয় হস্তের পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইবে।

ফলত ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরীক্ষা মৃত্যুতে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ইহা সত্য, সমষ্টিগত জীবনেও ইহা তেমনি সত্য। ধর্ম্মকে জীবনে ভাসা ভাসা করিয়া রাখিলে বিনাশে, বিপ্লবে, অবস্থাবিপর্য্যয়ে উহা হৃদয়ে শান্তির রশ্মি বিতরণ করিতে পারিবে না, বৈদ্যুতিক তেজে অবসন্ন হৃদয়কে বলীয়ান্ করিতে পারিবে না। বিপদের সঙ্গে বিনাশের সঙ্গে আমাদের চিরসখ্য, তাই বিপর্য্যয়ের দিনে ভগবানের নিকট হইতে আলোক পাই, সান্ত্বনা পাই, নবচেতনা পাইয়া জীবিত থাকি।

দূরের পদার্থনিচয় দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বাঁধিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ তাহার focus স্থির করিয়া লইতে হয়, তেমনি ভগবানের মঙ্গলস্বরূপ সুনিপুণ-ভাবে বুঝিতে হইলে মনুষ্যজীবনের পরিণাম চিন্তায় আপনাকে বিভোর করিয়া লইতে হয়। প্রাচীন-ঋষিগণ ঠিক এইভাবে আপনাদের জীবনকে নিয়মিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা নচিকেতা ও যমের কথোপকথন-মুখে পরলোকতত্ত্বের পরিস্ফুট ছবি বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডব-রণের সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে যখন মৃত্যু চারিদিকে অট্টহাস্য করিতে-ছিল, সংসারের নশ্বরতা মনুষ্যজীবনের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবার বিপুল অবসর আসিয়া পড়িয়া-ছিল, তখনই গীতার পরলোকতত্ত্ব আবার সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকটিত হইবার সুবিধা ঘটিল, তাই কুল-ক্ষয়-ভয়-পীড়িত শোক-সংবিগ্ন-মানস অর্জ্জুনকে উদ্বোধিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার কর—

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

"শরীর নষ্ট হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন নববস্ত্র পরিধান করে, তেমনি এই জীর্ণ শরীর পরিহার করিয়া লোকে নূতন দেহ লাভ করে। শস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ক্লিন্ন করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে বিশুষ্ক করিতে পারে না।" মানবাত্মা চিরজীবী। কয়েকদিনের জন্য আত্মীয়-গণের বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

মানুষ যে পর্য্যন্ত না এই শিক্ষা হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে ধারণ করিবে, ততদিন তাহার শোকের সান্ত্বনা নাই। মৃত্যুর ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে কার্য্য করিতেছে, এ ধারণা সুস্পষ্ট না হইলে মানুষ পূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না। যে জাতির যে ধর্ম্মের ভিতরে এই পরলোকতত্ত্ব উদ্-ভাসিত, যে জাতির ভিতরে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস অচল অটল, তাহারাই রোগে বিপর্য্যয়ে বিরহে বিচ্ছেদে সান্ত্বনা লাভের আশা করিতে পারে।

মহাভারতের যুগে আমাদের দেশে যে ভয়াবহ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ইউরোপে তদপেক্ষা ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত। মহাভারতের যুগেই গীতাশাস্ত্রের পরলোকতত্ত্ব বিবৃত হইবার অবসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের এই মহাসমরের ভিতর দিয়া পরলোকতত্ত্ব নবভাবে বিবৃত হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরলোকতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিলে ভগবানের মঙ্গলস্বরূপের উপর অচল নিষ্ঠা জাগিয়া উঠিবে না এবং অন্তর সুদৃঢ় হইতে পারিবে না। ইউরোপীয় ধর্ম্মের ভিতরে এই পরলোকতত্ত্ব এতদিন তাদৃশ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি যে এই মহাসমরের ভিতর দিয়া এই শিক্ষা সমগ্র ইউরোপে অবতীর্ণ হইবে এবং এই ঘোর রক্তপাতের ভিতর দিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য পাশ্চাত্যভূমিকে স্পর্শ করিবে এবং তাহার জীবনকে নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিবে, তাহাদের দেশের ধর্ম্মকে আরও সুগঠিত করিয়া তুলিবে, তাহাদের হৃদয় হইতে ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা বিদূরিত করিয়া দিবে; সর্ব্ববিধ অভিমান তিরোহিত হইয়া বৈরাগ্যের সুরে এবং দীনতার ছন্দে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সখ্যবন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিবে এবং জগতে শান্তির ও মৈত্রীর রাজ্য সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।*

* বিগত ২৮এ এপ্রেল (Father Holmes) পাদ্রী হোমস কলিকাতা লাটের গির্জ্জাতে যে একটি উপদেশ দান করেন, তাহাতে অনেকগুলি মূল্যবান কথা ছিল। আমরা তাহার কয়েকটি কথা উপলক্ষ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তিনি বাইবেল হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করেন তাহার মর্ম্ম এই যে "আমরা চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিতে নহে, কিন্তু বিশ্বাসের দৃষ্টিতে চলি"। (We walk by faith, not by sight)

ঝঞ্ঝারাতে।

(রাগিণী—মিশ্র পিলু।)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আমার
কুটীর তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো—
নূতন ক'রে জাগিয়ো
আমায় তোমার মাঝে জাগিয়ো !
অমনি ক'রে বজ্র হেনে
সুখের বাসা দিয়ো ভেঙ্গে
রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি
চোখের জলে জাগিয়ো !

এই সুখে ম'রে থাকার চেয়ে
মরণ আমায় যাক্ না নি'য়ে
মৃত্যু মাঝে নবজীবন
ধন্য হব পে'য়ে !
আঘাত সে যে পরশমণি
অতুল ধনে করে ধনী
সেই আঘাতে সুপ্ত জীবন-
কমল তুমি ফুটিয়ো ॥

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

চতুর্থ অধিকরণ—বেদান্তসমূহের ব্রহ্মৈকপরত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

দ্বিতীয়ং বর্ণকমাহ—

অধিকরণ শ্লোক।—

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত।
শাস্ত্রত্বাত্তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ ॥২১
নাকর্ত্তৃতন্ত্রেঽস্তি বিধিঃ শাস্ত্রত্বং শংসনাদপি।
মননাদিঃ পুরা বোধাদ্ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ ॥ ২২ ॥

টীকা। একদেশী মন্যতে—ব্রহ্মপরত্বেঽপি বেদান্তা ন ব্রহ্মণ্যেব পর্য্যবস্যন্তি। কিং তর্হি পারোক্ষ্যেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রতিপাদ্য পশ্চাদপরোক্ষপ্রতিপত্তিং বিদধতি। তথা চ সতি বেদান্তানাং শাসনাচ্ছাস্ত্রত্বমুপপদ্যতে। কিঞ্চ "শ্রোতব্য" ইতি শ্রবণং শব্দজ্ঞানাত্মকং বিধায় অথ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যনুভবজ্ঞানাত্মকং মননাদিকং স্পষ্টমেব বিধীয়তে। তস্মাৎ—প্রতিপত্তের্বিধাতারো বেদান্তাঃ। ইতি প্রাপ্তে—

ক্রমঃ—ন প্রতিপত্তের্বিধিঃ সম্ভবতি, কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমশক্যত্বাদপুরুষতন্ত্রত্বাৎ। শাস্ত্রত্বং তু নানুষ্ঠেয়শাসনাদেব নিয়তং, সিদ্ধবস্তুশংসনেনাপি তদুপপত্তেঃ। শাব্দজ্ঞানে জাতে পশ্চাদনুভবাত্মকং মননাদিকং বিধীয়তে—ইতি বক্তুং ন যুক্তং। 'দশমস্ত্বমসি' ইতিবচ্ছব্দস্যৈবাপরোক্ষানুভবজনকত্বেন শাব্দবোধাৎ পুরৈবাসংভাবনাদিনিবৃত্তয়ে ব্যাপাররূপস্য কর্ত্তৃতন্ত্রস্য মননাদের্বিধানাৎ। তস্মাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদয়ো বেদান্তা ব্রহ্মণ্যবসিতাঃ।

শ্লোকানুবাদ। দ্বিতীয় বর্ণক বলা যাইতেছে—

(বেদান্ত সমূহ) জ্ঞান বিধান করিতে চাহে অথবা ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত ? সেগুলি যখন শাস্ত্র এবং যখন (সেই বেদান্তে) মননাদিরও উল্লেখ আছে, তখন সেই (বেদান্তসমূহ) (জ্ঞান-) বিধায়ক। কর্ত্তৃতন্ত্র যাহা নহে, তাহাতে বিধি নাই। কথনেরও কারণে শাস্ত্রত্ব (হয়)। মননাদি জ্ঞানের পূর্ব্বে। সেই কারণে (বেদান্তসমূহ) ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত।

টীকার অনুবাদ। কেহ বা বলেন—ব্রহ্মপর হইলেও বেদান্তসমূহ ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত নহে। তবে কি ? পরোক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া পরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিধান করিতেছে। তাহা হইলে বেদান্ত সমূহের শাসনের কারণে শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হয়। আরও, "শ্রোতব্যঃ" এই পদের দ্বারা শব্দজ্ঞানাত্মক শ্রবণ বিধান করিয়া পরে "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই পদের দ্বারা অনুভবজ্ঞানাত্মক মননাদি স্পষ্টই বিহিত হইতেছে। অতএব বেদান্তসমূহ জ্ঞানের বিধায়ক। ইহা প্রাপ্ত হইলে—

বলিতেছি—জ্ঞানের বিধান সম্ভবপর নহে, কারণ অপুরুষ-তন্ত্র বলিয়া (উহাকে) করা, না করা বা ভিন্ন প্রকারে করা সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রত্ব কেবলই যে অনুষ্ঠেয় বিষয়ের শাসন হইতেই হয় তাহা নহে, প্রসিদ্ধবস্তুসম্বন্ধীয় কথন হইতেও শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হয়। শাব্দ (বা শ্রবণাত্মক) জ্ঞান জন্মিলেই পরে অনুভবাত্মক মননাদি বিহিত হইয়াছে, ইহা বলা ঠিক নহে, যেহেতু "তুমি দশম হইতেছ" ইহার

ন্যায় শব্দেরই প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মাইবার শক্তির ফলে শাব্দজ্ঞানের পূর্ব্বেই (ব্রহ্মবিষয়ক) অসম্ভাবনা প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়ারূপ কর্ত্তৃতন্ত্র মননাদির বিধান করা হইয়াছে। অতএব "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্ত (বাক্য) সকল ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত।

তাৎপর্য্য। বেদান্তের ব্রহ্মৈকপরত্ব-অধিকরণে বুঝাইবার কথা যে, সমস্ত বেদান্ত বা উপনিষদ একমাত্র ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত, ব্রহ্মকেই একমাত্র প্রকাশ করে—উপনিষদ কর্ম্ম বা অন্য কোন কিছু, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানেরও বিধায়ক শাস্ত্র নহে, অর্থাৎ উপনিষদ কোন বিষয়েই এরূপ কর, ওরূপ করিও না, এই ভাবের বিধি-নিষেধের শাস্ত্র নহে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা পূর্ব্বভাগ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছে যে এই কর্ম্ম এই ভাবে অনুষ্ঠেয় ইত্যাদি। বেদের কর্ম্মকাণ্ডই বিধিবিধানের শাস্ত্র—তাহাতেই লেখা আছে যে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম কি প্রণালীতে করিতে হইবে। কিন্তু বেদের উত্তরভাগ বা উপনিষদসমূহ সেরূপ কোন প্রকার বিধিবিধানের শাস্ত্র নহে। বেদান্তের উদ্দেশ্যই হইল ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ চিনাইয়া দেওয়া—প্রত্যক্ষ প্রকাশ করা। সেই উদ্দেশ্যে যেটুকু জ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজন, সেইটুকু জ্ঞানেরই বিষয়ে বেদান্তে বলা হইয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত জ্ঞান বা কর্ম্ম বা অন্য কোন কিছুরই বিধেয়ত্ব বা অবিধেয়ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে প্রতিপন্ন করা হয় নাই।

এই বিষয়টী বুঝাইবার উপলক্ষে বর্ত্তমান অধিকরণে প্রথম বর্ণকে বুঝানো হইয়াছে যে বেদান্ত, দেবতা অথবা ক্রিয়াকর্ম্মসংশ্লিষ্ট কর্ত্তা বা সাধনাদির প্রতিপাদক নহে,—একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। এবার দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হইতেছে যে, উপনিষদ যে কেবল ক্রিয়াকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতিপাদক নহে তাহা নহে,—উপনিষদ কোন প্রকার জ্ঞানেরও বিধায়ক নহে অর্থাৎ কোন্ জ্ঞান গ্রহণীয় বা কোন্ জ্ঞান অগ্রহণীয়, উপনিষদ এ প্রকার কোন বিধিনিষেধেরও শিক্ষা প্রদান করে না। উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য হইল ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ করা, এবং উপনিষদে জ্ঞানের বিষয় যেটুকু বলা হইয়াছে, তাহা সেই মূল উদ্দেশ্যেরই অনুষঙ্গে উক্তি মাত্র—ইহাই দ্বিতীয় বর্ণকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে চাহেন যে উপনিষদ জ্ঞানেরই বিধান করে। পূর্ব্বপক্ষের মতে বেদান্ত ব্রহ্মপর হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করিলেও ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত নহে অর্থাৎ একমাত্র যে ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে। উহা প্রথমত পরোক্ষ ভাবে বা সামান্যত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেও পরে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই বিধান করে। পূর্ব্বপক্ষের এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উপনিষদকে যখন শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়, তখন তাহাতে বিধিনিষেধ বা শাসনরূপ শাস্ত্রের মূল কথা থাকা চাই—শাসনের ভাব না থাকিলে বেদান্তের শাস্ত্রত্বই থাকিতে পারে না। যদি বেদান্তে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বমাত্রই প্রকাশ করা হয়, তবে তাহা লইয়া বিধিনিষেধের কোন কথাই আসিতে পারে না, কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধবস্তু—তাহার আর বিধিনিষেধ কি? সিদ্ধবস্তুকে একমাত্র প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিধিনিষেধের কথা না থাকিলে কাজেই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বও থাকিতে পারে না। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক। পূর্ব্বপক্ষ ব্রহ্মকে দর্শন করিবার কথা ছাড়িয়া দিলেন, কারণ তাহাতে তাঁহার যুক্তির বল কিছু কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিনি তাই বলিলেন যে, উপনিষদে এই যে বলা হইয়াছে যে "শ্রোতব্যঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ করা উচিত এবং এই প্রকারে শ্রবণরূপ [illegible] দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে শাব্দ জ্ঞান হইলে পরে তাঁহার বিষয়ে মনন বা সত্যপ্রকাশের অনুকূল আলোচনা করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন বা অবিচ্ছিন্ন [illegible] যুক্ত হইতে হইবে—এই কথা উচিত, [illegible] হইলে, এই প্রকার অর্থবাচী শব্দ প্রয়োগের [illegible] বুঝা যাইতেছে যে উপরোক্ত [illegible] মনন প্রভৃতি বিষয়ে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষের মতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত বা উপনিষদ জ্ঞানের বিধানকর্ত্তা শাস্ত্র।

সিদ্ধান্তপক্ষ পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্যগুলির এক

একটী ধরিয়া উত্তর দিতেছেন। প্রথমত, পূর্ব্বপক্ষ যে বলিয়াছেন যে, বেদান্ত ব্রহ্মসম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিধান করিয়াছে, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্ত-পক্ষ বলিলেন যে বেদান্তে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিধান সম্ভব নহে। সিদ্ধান্তী বলেন যে, যে জ্ঞানের বিষয় তুমি আমি বিচার করিতেছি, সে জ্ঞান যখন পুরুষ-তন্ত্র নহে, পুরুষের অধীন নহে—পুরুষ যখন সেই জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই, তখন সেই জ্ঞান কাজেই নিত্যজ্ঞান হইল। নিত্য যাহা কিছু, তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। সুতরাং এই যে নিত্যজ্ঞান, ইহার সম্বন্ধেও কোন প্রকারে করা, না করা বা পরিবর্ত্তিতরূপে করা, এ সকল কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিধানের অর্থই হইল—ইহা করিও, উহা করিও না, অথবা উহা এপ্রকারে না করিয়া ও-প্রকারে করিও। নিত্যজ্ঞানের সম্বন্ধে যখন কোনপ্রকারে করিবার কোন কথা আসে না, তখন তাহার সম্বন্ধে বেদান্ত বিধান করিতেছে, সে কথা বলাও অযৌক্তিক।

পূর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় কথা এই যে, বেদান্ত যদি জ্ঞানের বিধান করে, তবেই তাহার শাস্ত্রত্ব বজায় থাকে। তাঁহার মতে "শাস্ত্র"পদ "শাস"ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস ধাতুর অর্থ শাসন। শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিধান আসিয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে বিধা-নের অভাব হইলে বেদান্তের শাস্ত্রত্বই থাকিতে পারে না, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে "শাসন" অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধান না থাকিলেই যে বেদান্তকে শাস্ত্র বলিতে পারিব না এমন কোন কথা নাই। "শাস্ত্র" শব্দের ব্যুৎপত্তি যেমন শাস ধাতু হইতে হয়, সেইরূপ শংস ধাতু হইতেও হইতে পারে। শংস ধাতু অর্থ কথন বা বলা। সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে তাঁহার মতে সিদ্ধবস্তু বা নিত্যবস্তু ব্রহ্মবিষয়ে কথন বা প্রকাশ করিয়া বলিবার কারণেই বেদান্তের শাস্ত্রত্ব।

পূর্ব্বপক্ষের তৃতীয় কথা এই যে, বেদান্তে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই সকল উক্তির দ্বারা প্রথমে শ্রবণ করা উচিত, পরে মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য, এই প্রকারে জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, শ্রবণরূপ শব্দজনিত জ্ঞানের পরে যে অনুভবাত্মক মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে, পূর্ব্ব-পক্ষ একথা বলিতে পারে না। শ্রবণের ফল হইল শব্দের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভ। দৃষ্টান্ত—দশজন লোক বসিয়া আছে, তন্মধ্যে একজন এক দুই করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে গণিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু প্রতিবারেই আপনাকে ছাড়িয়া বাকী নয়জনকে গণিতে লাগিল। অবশেষে উপ-স্থিত লোকেরা তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—"তুমিই যে দশম।" এই "তুমিই দশম" এই উক্তি দ্বারা তাহার নিজের দশমত্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। এই দৃষ্টান্তের বলে সিদ্ধান্ত-পক্ষ বুঝাইতে চাহেন যে শ্রবণের ফল বা অর্থ হইল শব্দের সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। উপ-নিষদ্ যে ব্রহ্মকে "শ্রোতব্য" বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে বেদান্তের উক্তিসমূহের সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শ্রবণ করা উচিত বা কর্ত্তব্য, এরূপ বিধানার্থক ভাবে "তব্য" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে বিধানের কথাই আসিতে পারে না। ভাষ্যকারের মতে এখানে "তব্য" প্রত্যয়ের ব্যব-হারের দ্বারা বিধির ছায়ামাত্র প্রকাশ করা হই-য়াছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, বেদান্তে যে "শ্রোতব্য" শব্দের পরে "মন্তব্য" ও "নিদি-ধ্যাসিতব্য" এই দুইটী শব্দ আছে, বিধানের ভাব অস্বীকার করিলে এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি? সিদ্ধান্তীর মতে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব যে অসম্ভব এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান নিরস্ত করিবার জন্যই মনন বা মনে মনে আলোচনা এবং নিদিধ্যাসন বা ধ্যানধারা অবলম্বন করিবে। এই মনন ও নিদিধ্যাসন হইল দুইটী কার্য্য, সুতরাং কর্ত্তৃতন্ত্র—কর্ত্তার অভাবে কার্য্য হইতে পারে না। এই দুইটী কার্য্যের বিধান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রবণরূপ শব্দজনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বেই উক্ত দুইটী কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরে আর আলোচনাদি কার্য্যের সম্ভাবনাই আসিতে পারে না। যখন উপনিষদ্বাক্যে বিধি-নিষেধের কোনই বিধান রহিল না, প্রত্যুত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ প্রকাশক উপদেশমাত্র রহিয়াছে, তখন

কাজেই বলিতে হয় যে বেদান্তসমূহ ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত।

বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী।

(পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

বৌদ্ধযুগে অতি-উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাগণ স্ব স্ব উচ্চ সুরম্য প্রাসাদমধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য ও মহাসুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য কঠোর বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন ও পরহিতানুষ্ঠানাদি সৎকার্য্যে সর্ব্বদা রত থাকিয়া সামান্য মঠে বাস করিতেন। তাঁহারা দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভে মাতোয়ারা হইবার জন্য কোন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। তাঁহারা দক্ষিণ হস্তদ্বারা যখন কাহাকেও কিছু দান করিতেন তখন তাঁহাদের বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া পরহিতব্রতে দীক্ষিত হইতেন। তাঁহাদের অসীম অধ্যবসায় জগতের লোককে জানাইবার জন্যই যেন শাস্ত্রকারগণ "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন", এই মহামন্ত্রটি রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। "চণ্ডী"তে চণ্ড ও মুণ্ড নামক শুম্ভাসুরের দুইটি দূতের নিকটে হিমাচলশোভিনী দুর্গার মুখ হইতে যেরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য উক্ত হইয়াছিল, দেখা যায়, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপই দৃঢ় ছিল। তাঁহারা এ জগতে যে বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইলেও তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাদের সৎ সাহসের নিকটে ভীমপরাক্রম বীরপুরুষগণকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। সংস্কৃত-অভিধানগ্রন্থ-প্রণেতৃগণ কেন যে, নারীমাত্রকে অবলা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার কারণ তাঁহারাই বুঝিতেন, আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহারা মানসবল, সাহসবল, ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবলে বলীয়সী ছিলেন, তাঁহাদিগকে অবলা নামে অভিহিত করা কোন প্রকারেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতমহিলা দেহবলেও যেরূপ বলীয়সী, তাহা রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতির বীরত্বকাহিনীতে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে যাঁহারা কোন কোন মহিলার বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা রাজনন্দিনী মালিনীর বৃত্তান্ত অবগত হইলে অধিকতর বিস্মিত হইবেন। আর, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতের কুলমহিলারা কোন ধর্ম্মের কোন এক শাস্ত্রের অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়াই সেই শাস্ত্রের অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করিতেন না। তাঁহারা অগ্রে নিজের দেশের উন্নতি সাধন করিতেন। তৎপরে পরের দেশের উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক হইতেন। তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানকাণ্ড-শাস্ত্র ও কর্ম্মকাণ্ড-শাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান, গণ, সাহিত্য অলঙ্কার, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অতি উত্তমরূপে পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মূলগ্রন্থ সকল যথাবিধি পাঠ করিতেন। পশ্চাৎ সংগ্রহ গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। পরে ঐ সকল গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসমাজ উপকৃত হইত। তাঁহারা যে ধর্ম্মবিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেন বা বক্তৃতা করিতেন, সেই ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ভাষাটি অগ্রে আয়ত্ত করিতেন। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, গ্রন্থ লিখিতেন। তাঁহারা সৎকার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নিজেরাই অর্থ দান করিতেন। অন্যজাতীয় লোকের নিকটে অর্থ সাহায্য লাভেচ্ছা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহারা এক একটি লক্ষপতি ক্রোড়পতির কন্যা ছিলেন।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে বারাণসী নগরীতে কৃকী নামক একজন হিন্দু স্বাধীন রাজা ছিলেন। মহারাজ কৃকী সনাতনবৈদিকধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সর্ব্বদাই যজ্ঞাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার প্রজারঞ্জনমহিমায় বারাণসী-রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ কৃকীর মালিনী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে তৎকালোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। রাজনন্দিনী মালিনী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পিতার কন্যা হইলেও গোপনে গোপনে বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার

প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সেই শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে এ বিষয় জানিতে পারে নাই। অনেকেই জানিত যে, তিনি হিন্দুরাজার হিন্দু মেয়ে। একদিন তিনি কতিপয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্নে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে দৌবারিক রাজনন্দিনীকে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তিনি তাঁহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে আনয়ন করিয়া উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের পুস্তকবন্ধনের জন্য ক্ষৌমবস্ত্রখণ্ড ও তাঁহাদের পরিধানের জন্য হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহারা রাজনন্দিনীর আদর অভ্যর্থনায় অতিশয় প্রীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে এই ঘটনা রাজা কৃকীর কর্ণগোচর হইল। রাজার উপদেশক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সনাতন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু আপনার কন্যা স্বধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আপনার অনুমতি বিনা প্রাসাদ মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। যদি তাঁহাদিগকে ভোজন করানই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মঠে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই চলিত। আপনার অনুমতি না লইয়া বিধর্ম্মীদিগকে প্রাসাদাভ্যন্তরে আনয়ন করিয়া ভোজন করান ভাল কার্য্য হয় নাই। পিতার অনুমতি ব্যতীত যে কন্যা ঈদৃশ কার্য্য করে, শাস্ত্রে তাহাকে অবাধ্যা কন্যা কহে। রাজনন্দিনী যখন অবিবাহিতা, তখন পিতার আদেশ লইয়া সমস্ত কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে উচিত। আর এক কথা এই যে, এইরূপ কার্য্য করায় তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা প্রকটিত হইয়াছে। তিনি বোধ হয় গোপনে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে সেই দিন দীক্ষিত করিয়াছে। সেই দিন তাঁহাদিগকে অত খাতির করিবার কারণই এই"। রাজার একজন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলিলেন, "আমি ইহা চক্ষে না দেখিলেও গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে, রাজনন্দিনী সেই দিন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এক্ষণে সম্রাট বৌদ্ধ। আর, বৌদ্ধসম্রাটের সাম্রাজ্যবর্দ্ধনের লালসা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনার এই কন্যা যদি বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে আপনার এই স্বাধীন বারাণসীরাজ্য হয় তো অচিরে বিধ্বস্ত হইতে পারে। অতএব ঈদৃশী অবাধ্য কন্যাকে বারাণসীরাজ্য হইতে অতি দূরদেশে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃ। নতুবা আপনার মহা-অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা"। রাজা কৃকী এই প্রকারে স্বীয় সভাসদ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মন্ত্রণা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি রাজ্যনাশভয়ে কন্যাকে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি কন্যাকে চিরনির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজনন্দিনী মালিনী এই আদেশ শুনিয়া মোটেই ভীত হইলেন না। বরং তিনি মহাহর্ষের সহিত ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তিনি রাজাকে এইমাত্র বলিলেন যে, "পিতঃ আমি রাজকন্যা। রাজপ্রাসাদেই মহাসুখস্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হইয়াছি। সুতরাং নির্ব্বাসনে প্রস্তুত হইবার জন্য আমি সাতদিন সময় প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ কৃকী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কারণ, তিনি মনে করিলেন, এই সাত দিনের মধ্যে এই কন্যার দ্বারা রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার উপর কড়া নজর রাখিলেই চলিবে। কাহারও সহিত পত্রব্যবহার যাহাতে না হয়, যাহাতে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রাসাদ মধ্যে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে ভাল বন্দোবস্ত করিলেই চলিতে পারে। এই মনে করিয়া তিনি ভৃত্যবর্গের প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। কোন রূপ কিছু ঘটিলে তাহারা কঠোর দণ্ড পাইবে, ইহা বলিয়া দিলেন। এবং মালিনীর চিরনির্ব্বাসনোপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের জন্য মালিনীর অভিলাষ জানিতে চাহিলেন। মালিনী বলিলেন, "পিতঃ আমি আর কিছুই চাহি না। আমি কেবল এই সাত দিন বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে চাহি। সাত দিন

বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমাকে নির্ব্বাসিত করিবেন। একমুহূর্ত্তও থাকিব না। এই আমার শেষ প্রার্থনা।” রাজা মনে করিলেন যে, বক্তৃতা শুনিতে আপত্তি কি? যত ইচ্ছা তত বক্তৃতা করুক না কেন। উহার বক্তৃতা দ্বারা রাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার তো কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বক্তৃতা শুনিতে দোষ কি? এইরূপ মনে করিয়া রাজা মালিনীকে বক্তৃতা করিতে আদেশ দিলেন। এই যোড়শবর্ষবয়স্কা রাজকুমারী এক সপ্তাহ কালের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ে স্বীয় অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে রাজা, রাজ্ঞী, ভ্রাতা, ভগিনী, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রিগণ, সভাসদ্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী ভট্টসেনা নামক রাজসৈন্য এবং বারাণসী নগরীর প্রায় দশ হাজার অধিবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, বিচারশক্তি, সমালোচনাশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও বুঝাইবার শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় হৃদয় মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার এই লুক্কায়িত শক্তিরূপ অগ্নি এই ঘটনারূপ পবনহিল্লোলে সন্দীপিত হইয়া দেশব্যাপিনী উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করিয়া পৌরজানপদবর্গের অজ্ঞান তিমির-রাশি অপসারিত করিয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে ইতঃপূর্ব্বে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরে “অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ”, এই বৌদ্ধশাস্ত্রীয় মহাবাক্যোপদেশের সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে যজ্ঞে পশুহিংসার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া গো-মেষাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার উপদেশানুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য অনেক লোক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে তিনি এতগুলি লোককে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া সপ্তাহ শেষে পিতাকে বলিলেন, “পিতঃ, এক সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এইবার আমাকে নির্ব্বাসিত করুন। কারণ, আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গকারিণী। আমি আপনার প্রাসাদের আবর্জ্জনা স্বরূপ। কিন্তু পিতঃ, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি কোন দোষই করি নাই। নির্ব্বাণপথের পথিক জ্ঞানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে প্রাসাদমধ্যে ভোজন করাইলে মহাপাপ হয় না। যাহাই হউক, পিতৃ-আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়। আপনি আমার নির্ব্বাসনের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আজ্ঞা আমাকে পালন করিতে হইবে। অতএব আমাকে নির্ব্বাসিত করুন। আমি এইবার নির্ব্বাসিত হইব। অদ্য এক সপ্তাহ শেষ হইল। আর কেন? আমি চলিলাম। আমিও কোলাহলপূর্ণ দুঃখশোকময় অনিত্য তুচ্ছ সুখের আবরণে আচ্ছাদিত নগরীতে বাস করিতে চাহি না। নাগরিক জীবন নাগরিক লোকের হৃদয় ছল-কপটতা ও দ্বৈধভাবে পূর্ণ। সদাই কলুষিত। আমি ঈদৃশ স্থানে বাস করিতে চাহি না। এখানে ভিতরে একভাব, বাহিরে অন্য ভাব। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মালোচনা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে ইহা একটা লৌকিক আচার মাত্র। অতএব নগরীর কোলাহল হইতে দূরে অপসৃত হইয়া শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন বনে আমি তপস্যা করিব। আমাকে নির্ব্বাসিত করুন, আমি আপনার বারাণসী-রাজ্যের স্বাধীনতাহরণে চেষ্টা করিব, এ কথা মনে করিবার আর কোন কারণই থাকিবে না। আপনি সুখস্বচ্ছন্দে পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া রাজ্য ভোগ করুন। আপনার রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে মোটেই উদিত হয় নাই। জ্ঞানী বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন না। যোগদান করা উচিতও নয়। কারণ, ইহা গৃহীর ধর্ম্ম—ত্যাগীর ধর্ম্ম নয় ত্যাগীর কর্ম্ম নয়। যে সন্ন্যাসী রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেয়, রাজনীতি চর্চ্চায় মহা আমোদ অনুভব করে, এবং রাজবিদ্রোহের পক্ষপাতী হয়, সে সন্ন্যাসীই হউক, বা গৃহীই হউক না কেন, সে মহাপাপী। তাদৃশ লোককে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করাই বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। না করিলে রাজাকে বিপন্ন হইতে হয়। ইহা প্রাচীন ভারতের রাজনীতিরই কথা। আমাকে যদি রাজবিদ্রোহকারিণী বলিয়া মনে করেন, তবে আমাকে বিদায় দিন। আমি পিতৃবাক্য পালনার্থ বনে গমন করিতেছি।” এই বলিয়া রাজনন্দিনী মালিনী রাজবাটী

হইতে প্রস্থানোদ্যতা হইলে মহারাজ রুকী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা, তুমি যাইও না। না তুমি আমার কন্যা হইলেও আমার গুরুস্বরূপা। আমার গুরু হইবার জন্য আমার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত। তুমি এই সপ্তাহকালমধ্যে আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আমাদের হৃদয়ে যে উজ্জ্বলতম জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছ, তাহার প্রভায় আমা-দের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে। আমি, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতাভগিনীরা, রাজবাটীর অন্যান্য সমস্ত লোক, রাজসৈন্য, দশসহস্র নগরবাসী, এমন কি, বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী মহামান্য রাজসভাসদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আমরা সক-লেই তোমার নিকটে ঋণী হইয়াছি। তুমি কাশী হইতে অন্যত্র কুত্রাপি চলিয়া গেলে আমরা তোমার নিকটে এই ঋণ পরিশোধ করিব কি প্রকারে? তুমি আমাদের সকলের ধর্ম্মগুরু, নেত্রী, মাতৃস্বরূপা। তুমি তোমার পুত্রকন্যাগণকে ছাড়িয়া কিরূপে যাইবে? তুমি আমাদিগকে বিশুদ্ধ নিষ্কণ্টক ধর্ম্ম-পথ দেখাইয়া দিয়াছ। তুমি এ অবস্থায় আমা-দিগকে ত্যাগ করিলে আমরা স্রোতস্বতী নদীতে কর্ণধারবিহীন নৌকারোহিগণের ন্যায় বিষম সঙ্কটে পড়িব। আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা হইলেও এক্ষণে তোমার শিশুপুত্রস্বরূপ। সবেমাত্র জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা তোমার পর্য্যবেক্ষণাধীন না থাকিলে এ আলোক নিভিয়া যাইতে পারে। তোমার আরো অনেক ব্যাখ্যাদি দ্বারা এই আলো-কটি ক্রমে ক্রমে যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, উজ্জ্বলতম হয়, তদ্বিষয়ে তুমি সাহায্য না করিলে আমাদের গত্যন্তর নাই। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমা-দিগকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। পিতৃবাক্য পালন করা তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক কন্যার অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম। আমি যাইতে নিষেধ করিতেছি। মা, তুমি যাইতে পাবে না। তুমি আমার কথা রাখ। আমার সম্মান রক্ষা কর। তুমি যদি কোলাহল-পূর্ণ নগরীতে থাকিতে না চাও, তাহা হইলে কাশী নগরীর প্রান্তভাগে নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ উপনগরে সারনাথ নামক স্থানে বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া নরনারীগণের কল্যাণ সাধিত কর। বনে গেলে কি হবে মা? বাঘ ভাল্লুকেরা কি ধর্ম্ম কথা শুনে? বনে গিয়া তপস্যা করিলে কেবলমাত্র একলা তোমার নিজেরই ধর্ম্মজীবনের যোগজীবনের উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু ঐখানে বাস করিলে তোমারও ভাল হইবে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীরও মঙ্গল হইবে। নিবিড় বনে বাস করিলে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর কি উপকার হইবে? তাহাদের যাহাতে ত্রিতাপের শান্তি হয়, তোমার তাহাই কর্ত্তব্য। তোমার অমূল্য ধর্ম্মোপদেশে তাহাদের ত্রিতাপের শান্তি হইবে। নরনারীগণের উপকারার্থ ভগবান বুদ্ধদেব স্বয়ং নগর হইতে নগরান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অক্লান্তভাবে অনবরত উপদেশ দিতে দিতে বিচরণ করিতেন। তিনি যদি সমস্ত জীবন নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অতিবাহিত করিতেন, তাহা হইলে এত অসংখ্য নরনারী কি পরিত্রাণ পাইত? কথনই না। তিনি ঐরূপ করিলে ভারতের এত উপকার হইত না। ভারতের সভ্যতার এত খ্যাতি বাড়িত না। এতদিনে ভারত দস্যুভূমিতে পরিণত হইত। ভারত শ্মশানে পরিবর্ত্তিত হইত, চিতাগ্নিতপ্ত শ্মশানে শৃগাল কুকুর সকল যেমন মৃতদেহমাংস ভক্ষণ করিয়া বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করে, তদ্রূপ পশুমাংসলোলুপ যাজ্ঞিকগণ হোমাগ্নিতপ্ত যজ্ঞক্ষেত্রে পশুকুলের ধ্বংস সাধন করিয়া পশুর রক্তনদীর স্রোতে ভারতবর্ষ এতদিনে প্লাবিত করিয়া দিত। ভারতে পশুকুলের প্রলয় সাধন হইত।"

ক্রমশঃ।

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রহরাধিক প্রভাত। স্থান—জমীদারের কাছারী।

(তাকিয়া ঠেসান দিয়া জমিদার ধনদাস রায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় আসীন। দক্ষিণ হস্তে একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। বাম-হস্তে আলবোলার নল টানিতেছিলেন। সম্মুখে জনৈক কর্ম্মচারী। কিয়দ্দূরে হরিচরণ ও রহিমদ্দী দণ্ডায়মান।)

ধন। এত বড় আস্পর্দ্ধা!—এই দু'ব্যাটাকে আমি ভিটেছাড়া করব,—জাহান্নামে দেব—তবে আমার নাম ধনদাস রায়। আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে

জল খায়। আমার সঙ্গে বদ্‌মায়েসী! মার তো ব্যাটাকে পঞ্চাশ জুতো। দেখি কোন্ দাদাঠাকুর—কোন্ বাপ্ তোকে রক্ষা করে!

হরি। কর্ত্তা, আপনি গরীবের মা বাপ্। আপনার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। আমার ছেলে বাঁচবে না; কাল সন্ধ্যাবেলা আমায় ধরে নিয়ে এসেছে, আজও বাড়ী যাইনি। আমার বাছা বুঝি আর বাঁচবে না। কর্ত্তা আপনার পায়ে পড়ি, আমায় একবার ছেড়ে দিন, আমি সত্যি বলছি, একটু দেখেই আবার আসব। একবার ছেড়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি। (পদ ধারণোদ্যত)

বরকন্দাজ। দাঁড়া এখানে। (ধাক্কা মারিল)

ধন। কেন—এখন ডাক তোর দাদাঠাকুরকে।

হরি। একটু জল খাবো। কর্ত্তাবাবু, আমরা আপনার ছাওয়াল, মরে যাবো কর্ত্তাবাবু। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল; একটু জল খাবো।

ধন। জন্মের মত খাওয়াচ্ছি। রোস। ব্যাটা জমীদারীতে এসেছেন কিনা! (রহিমদ্দীর প্রতি) এই রহিম, বল্ সাক্ষ্য দিবি কিনা?

রহিম। এজ্ঞে পাপ হবে। মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবো না।

ধন। এঃ ব্যাটা কি ধর্ম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির রে। পাপ হবে! আমরা মিথ্যা সাক্ষী দিই কি করে?

রহিম। এজ্ঞে আপনাগোর বড় লোকের সয়; আমাগোর সয়না।

ধন। সাক্ষী দিবি না?

রহিম। খোদা কসম। মাপ করুন।

ধন। পারবি না?

রহিম। কিছুতেই না।

ধন। এ সব সেই দাদাঠাকুর ব্যাটা শিখিয়েছে। ব্যাটা ভারী পাজী, ভারী বজ্জাৎ।

রহিম। আহা কর্ত্তা মশাই, দাদাঠাকুরকে কিছু বলো না। দাদাঠাকুর গরীবের মা বাপ।

ধন। র'সো সব ব্যাটাকেই মজা দেখাচ্চি। আগেই এই দাদাঠাকুর এই বজ্জাত ব্যাটাকে জাহান্নামে দেব।

রহিম। কর্ত্তাবাবু, দাদাঠাকুরকে কিছু বলো না। তার কুচ্ছো শুনে আমার চ'কের কোণে পাণি আসচে। আহা এমন দাদাঠাকুর!

ধন। চোপ্ রও। এই দাদাঠাকুর ব্যাটার নাম শুনলেই আমার মাথা খারাপ হ'য়ে উঠে। দেশের জমীদার আমি, আর সব ব্যাটারা গুণ গাইবে দাদাঠাকুরের।

রহিম। তাঁর গুণ গাবো না তো কার গুণ গাবো?

ধন। তবেরে ব্যাটা পাজী! আমার মুখের ওপর এত বড় কথা! র'সো মজাটা দেখাচ্ছি। বল্ সাক্ষী দিবি কিনা?

রহিম। মাপ করুন।

ধন। টাকা পাবি।

রহিম। কর্ত্তা মশাই, আমরা গরীব মানুষ; গতর খাটিয়ে খাই। যে রকম করেই হোক্ দিন চলে যায়। যতদিন দুনিয়ায় আছি, দুনিয়ার মালিক যেন এই হালেই রাখে। এই দোয়া কর। আর বেশি কিছুই চাইনে। আপনি বড় লোক আছেন, থাকুন। আমি ধন-দৌলত চাইনে। টাকা ভালো না; বেশী টাকা হলে তার গরম বরদাস্ত করতে পারব না। যদি জানও যায় তবু মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবো না। আরো দাদাঠাকুরের বিপক্ষে! ইয়া আল্লা!

ধন। পারবিনে? তবে দ্যাখ্, জুতিয়ে চামড়া খসিয়ে ফেলব।

রহিম। আপনি মনিব, যা খুসী তাই কত্তে পারো। মিথ্যা সাক্ষী দিবই না।

ধন। এই কে আছো? এই ব্যাটাকে কয়েদ করে রাখবে, আর পঁচিশ জুতো লাগাবে।

রহিম। সেও বি আচ্ছা। তবু মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবো না। খোদার কাছে তো সাফ্ থাকবো।

ধন। আচ্ছা দেখি খোদা রক্ষা করে কিনা!

রহিম। আচ্ছা দেখো।

ধন। (হরিচরণের প্রতি) হরে, বল জঙ্গল সাফ্ করে দিবি কিনা? আর চাঁদার টাকা দিবি কিনা?

হরি। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল!

ধন। আঃ যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দে।

হরি। ছেলের ব্যামো ভালো হোক। দুই বাবা-ব্যাটায় এসে গতর খাটিয়ে আপনার কাজ করে দেব। আমি গরীব, ছা-পোষা মানুষ। চাঁদার টাকা এখন দেব কোত্থেকে?

ধন। আবার বজ্জাতী! রাখ্, তোর বদমায়েসী বার করে দিচ্চি।

হরি। ঠাকুর জানেন, কোনো বজ্জাতী করি নাই। বাবু খামকা আমার ছেলেকে আমায় দেখতে দিলেন না। আমার তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একটু জল খেতে দিলেন না। আপনার কি মানুষের প্রাণ? আবার দাদাঠাকুরকে মন্দ বলচেন? সে আর আপনি ঢের তফাৎ।

ধন। তবে রে পাজী, আমার মুখের উপর এত বড় কথা! এই বরকন্দাজ, মারতো ব্যাটাকে জুতো, এখনি মার।

(বরকন্দাজ পাদুকা প্রহার করিতে অগ্রসর হইলে, দাদাঠাকুর প্রবেশ করিয়া ধীরভাবে কহিলেন)—

দাদা। খবর্দার! (বরকন্দাজ স্তব্ধ হইল) রায় মশাই, একি? এই বৃদ্ধ গরীব বেচারীর উপর অত্যাচার কেন? আমি বুক পেতে দিচ্চি, এ আঘাত আমার বুকে করুন।

ধন। হুঁসিয়ার দাদাঠাকুর, তুমি কোনো কথা কয়োনা। জানো এ জমীদারের কাছারী? বড় শক্ত যায়গা, এখানে তোমার কোনো বুজরুকী খাটবে না।

দাদা। সব যায়গাই সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের। সবাই আমরা তাঁর দাস। তাঁর শাসন সবারি মান্‌তে হবে।

ধন। উঃ উনি দেখ্‌ছি ভারী বেড়াল-তপস্বী! তুমি বের হও এখান থেকে! তোমায় দেখ্‌লে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। তোমার সঙ্গে যে কথা বলি, এই ঢের। ভারী আস্পর্দ্ধা! ভারী আস্পর্দ্ধা! ছোট লোক, যত সব ছোট লোকের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছেন বুজরুকী কর্ত্তে। জানোনা বড় লোকের মেজাজ? টাকার জোরে যা' ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারি।

দাদা। রায় মশাই, ঐশ্বর্য্যের এত গর্ব্ব! আর সব ছোটো লোক, আর তুমি বড় লোক। কিন্তু জেনো—

গীত।

হবে নামতে ধূলার তলে।
পথে ঘাটে, রৌদ্রে মাঠে,
সবাই যেথায় চলে।
অহঙ্কারে উচ্চাসনে, বসে বসে আপন মনে,
ভাবছো বুঝি তোমার মত নাইকো ত্রিভুবনে,
(ওতে) নিজেরেই যে ছোটো করে তুলছ প্রতিক্ষণে!
(যিনি) রাজার রাজা, তিনিই বেড়ান
ছোটোবড় সবার দলে।
তাঁরেই শুধু মানী জানি, সবারে যে কর্‌বে মানী,
সে নহে মান, এ বেইমানী-ফেরা মানের খোঁজে,
সবার চেয়ে কাঙাল সে যে, সে কিগো তা বোঝে?
মানের গোড়ায় না দিলে ছাই
মান কি মেলে কথার ছলে?

ধন। আরে রাখো, তোমায় আর বক্তিমে কর্‌তে হবে না। তোমার গুণের কথা আমার সব জানা আছে। তুমি এই ছোটলোকগুলোকে নিয়ে' একটা দল পাকাচ্ছ। দেশের বড় লোক আমি। আর সব ব্যাটারা পেছনে হাঁটবে ওঁর। কি তামাসা! দাঁড়াও, তোমাকেও আচ্ছা রকম জব্দ কর্‌ব। যাও এখান থেকে—ভালোয় ভালোয়

...রণ আর রহিমদ্দিকে ছেড়ে দিন।

ধন। তোমার তো বড় সাহস! আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এখনো জেদ্ কর্‌চ? যাও বলছি।

দাদা। ওদের ছেড়ে দিন।

ধন। এঃ—তোমার কথায়?

দাদা। ধর্ম্মের আজ্ঞায়।

ধন। যাও এখান থেকে, ওদের কিছুতেই ছাড়বো না। কিছুতেই না।

দাদা। আমিও না নিয়ে যাবো না।

ধন। কি, আমার বাড়ীতে এসে আমার সাম্‌নে চোখ্ রাঙাবে?

দাদা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানব-ধর্ম্ম।

ধন। কি, আমার অন্যায়? বেয়াকুব, বেল্লিক, পাজী।

দাদা। আমাকে আপনার যা-খুসী তাই বলুন, কিন্তু ওদের ছেড়ে দিন। ভেবে দেখুন, এ ঐশ্বর্য্য কি আপনার চিরদিন থাক্‌বে? একি পরলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌বেন? আজ এই অসহায় দরিদ্রের বুকে যে আঘাত কচ্ছেন, এ আঘাত যে তাঁরি বুকে লেগেছে। তিনি যে দীনের ভগবান! এ ক্রন্দন তাঁরি কাছে পৌঁচেছে! একদিন তার ন্যায়দণ্ডের তলে মাথা নত কর্‌তেই হবে। সেই বিশ্বতশ্চক্ষু সবি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তাঁর কাছে সব সমান। তিনি ধনী কি দীন দেখে বিচার করেন না। এখনো ধর্ম্ম আছে, এখনো চন্দ্রসূর্য্য উদিত হচ্ছে, সাবধান! সাবধান!

গীত।

সাবধান! সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া, ন্যায়ের দণ্ড দীপ্ত রুদ্র মূর্ত্তিমান।
ঐ শোনো তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উছলে,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু-ভীষণ কল্লোলে,
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্দ্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য্যচন্দ্র,
বিদরে আকাশ, স্তব্ধ বাতাস,
শিহরি উঠিছে জগৎ-প্রাণ।
ভ্রূকুটী-কুটিল রক্ত-নেত্রে চিত্রভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরীট গরিমা-দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য্যমণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ, তপ্তরক্ত করিয়া পান,
বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান,
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ
ভেবেছ কি আর পালাইবে কেহ?
এখনো চরণে শরণ লহ নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।

ধন। পাজী, যা ইচ্ছে তাই বল্‌ছ? এই দারোয়ান,

ব্যাটাকে ঘাড় ধরে' বের করে দাও। (দারোয়ানের প্রতি) কিরে ব্যাটা দাঁড়িয়ে রৈলি যে? বে'র করে দে।

দারোয়ান। আজ্ঞে মাপ করুন।

ধন। কি আমার হুকুম অগ্রাহ্য! তুমি আজ হ'তে বরখাস্ত।

দারোয়ান। যে আজ্ঞে; প্রণাম। (প্রস্থান)

ধন। (বরকন্দাজের প্রতি) ওরে তুই মার্, মার্তো হরেকে পঞ্চাশ জুতো; ভাখ্ ব্যাটা (দাদাঠাকুরের প্রতি) পাজী দাঁড়িয়ে দেখ্।

দাদা। রায় মশাই এখনো বল্ছি, ক্ষান্ত হউন। দেখবেন যেন আপনার কোনো অপ্রিয় কার্য্য আমার কর্তে না হয়। নিশ্চয় জান্বেন, অন্যায় কর্তে দেবই না।

ধন। মার জুতো, মার দু' ব্যাটাকেই মার্।

(বরকন্দাজ অগ্রসর হইল)

দাদা। খবর্দ্দার! থামো। না, এর প্রতীকার কর্ত্তেই হোল। (দাদাঠাকুর সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন, সেবাব্রত প্রভৃতি যুবকগণ প্রবেশ করিল। দাদাঠাকুর, সেবাব্রতের দিকে চাহিয়া কহিলেন) এদের নিয়ে এস।

সেবাব্রত প্রভৃতি হরিচরণ ও রহিমদ্দিকে লইয়া দাদাঠকুরের সহিত চলিয়া গেলেন।

ধন। এই, এই, কে আছো ধর্ ধর্ ধর্। একি তোরা সব সংএর মত দাঁড়িয়ে রৈলি? কেউ কিছু করতে পারলি নে? আচ্ছা যাক্—এর প্রতিশোধ যদি না লই তো আমার নাম ধনদাস রায় নয়। (কর্ম্মচারীর প্রতি) এই শোনো—(কর্ম্মচারী শুনিতে পাইল না) ওকি কাঁপ্‌ছ যে! এই শোনো।

কর্ম্ম। এ—এ—এ'— হুজুর।

ধন। এখনি ওর নামে এক মোকদ্দমা সাজাও। ওকে আমি পথের ভিখিরী করে ছাড়্‌ব।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞে।

ধন। রো'সো পাজি। (প্রস্থান)

কর্ম্ম। সাবাস্! একটা মানুষ বটে এই দাদাঠাকুর।

সকলের প্রস্থান।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

সপ্তম প্রকরণ।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শরীর ও শরীরের অধিস্বামী কিংবা অধিষ্ঠাতা—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—ইহাদের বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগৎ ও তাহার মূলতত্ত্ব—ক্ষর ও অক্ষর—ইহাদের বিচার করিয়া পরে আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, ইহা পূর্ব্ব প্রকরণে কথিত হইয়াছে। যোগ-পদ্ধতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার তিন শাস্ত্র আছে। প্রথম ন্যায়-শাস্ত্র ও দ্বিতীয় কপিলসাংখ্য; কিন্তু এই দুই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ এইরূপ স্থির করিয়া বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মস্বরূপের নির্ণয় তৃতীয় প্রকারে করিয়াছেন। তাই বেদান্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্ব্বে, ন্যায় ও সাংখ্যের কল্পনাটা কি, তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক। বাদরায়ণশাস্ত্রের বেদান্তসূত্রে এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হইয়াছে। এই সমগ্র প্রকরণ এখানে উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও ভগবদ্গীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক তাহার বিবরণ এই প্রকরণে ও পূর্ব্ব প্রকরণে আমি দিয়াছি। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সাংখ্য-সিদ্ধান্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, বাদরায়ণ আচার্য্যের (বেসূ, ২, ১, ১২ ও ২, ২, ১৭) উক্তি অনুসারে কোন শিষ্ট ও প্রমুখ বেদান্তী কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার না করিলেও কপিলসাংখ্যশাস্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত মনু-আদি স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে ও গীতা-তেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাই উহাদের বিবরণ প্রথমে পাঠকের জানা আবশ্যক। তথাপি আরম্ভেই এই-টুকু বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যশাস্ত্রের অনেক কল্পনা বেদান্তে পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদান্তের শেষ-সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা পাঠক যেন বিস্মৃত না হন। বেদান্ত ও সাংখ্যের এইরূপ যে সাধারণ কল্পনা তাহা প্রথমে কে আবিষ্কার করে—বেদান্ত না সাংখ্য—এইরূপ এক প্রশ্নও বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারের মধ্যে প্রবেশ করা যাইতে পারে না। উপনিষৎ (বেদান্ত) ও সাংখ্য ইহাদের অভিবৃদ্ধি দুই বৈমাত্র ভায়ের মত এক সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সকল মত সাংখ্য মতের অনুরূপ তাহা উপনিষৎকারেরা স্বতন্ত্র অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছেন, কিংবা তন্মধ্যে কোন সাংখ্যশাস্ত্র হইতে লইয়া এই মত-গুলিকে বেদান্তশাস্ত্রের অনুকূল স্বরূপ প্রদান করি-

য়াছেন, অথবা কাপিল-আচার্য্য আপন মত-অনুসারে প্রাচীন উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলির সংস্কার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন—এইরূপ তিন পক্ষের মত এই ক্ষেত্রে সম্ভবপর। কিন্তু উপনিষৎ ও সাংখ্য উভয়ই প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে উপনিষৎ অধিক প্রাচীন (শ্রৌত),—ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, শেষের অনুমানটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হোক্, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের পরিচয় হইলে, বেদ বেদান্তের বিশেষত গীতান্তর্গত বেদান্তের—তত্ত্বসকল শীঘ্রই আমাদের উপলব্ধি হইবে; এই জন্য, ক্ষরাক্ষর জগতের রচনা সম্বন্ধে এই দুই স্মার্ত্তশাস্ত্রের কি মত, প্রথমে তাহার বিচার করিব।

কোনো বিবক্ষিত কিংবা গৃহীত বিষয় হইতে তর্কের দ্বারা পরে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া বাহির করিতে হইবে, এবং এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি ভ্রান্ত, ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়—এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। অনুমানাদি প্রমাণখণ্ড, ইহা ন্যায় শাস্ত্রের এক ভাগ। কিন্তু ইহা মুখ্য ভাগ নহে; প্রমাণ ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত অনেক বস্তুর, অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের, শ্রেণীবন্ধন বা বর্গীকরণ করিয়া, নিম্ন বর্গ হইতে উচ্চতর বর্গে আরোহণ করিতে করিতে, সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের মূল ভূতবর্গ কিংবা পদার্থ কত, তাহার গুণধর্ম্ম কি, তাহা হইতে পরে অন্য পদার্থাদির উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল এবং এই বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্ন ন্যায়শাস্ত্রে বিচার করা হইয়া থাকে। অধিক কি, এই জন্যই এই শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, শুধু অনুমানখণ্ডের বিচার করিবার জন্য নহে, ইহা বলিলেও চলে। কণাদকৃত ন্যায়শাস্ত্রের আরম্ভভাগ ও পরবর্ত্তী রচনাও এইরূপ। কণাদের অনুযায়ীদিগকে কাণাদ বলা যায়। ইঁহাদের মত এই যে, পরমাণুই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখ্যা ও পাশ্চাত্য আধিভৌতিক শাস্ত্রকারদিগের পরমাণুর ব্যাখ্যা একই প্রকার। পদার্থ বিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হয় না তখন তাহাকে (পরম-অণু) পরমাণু বলে। এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়, তেমনি-তেমনি তাহার মধ্যেই সংযোগের দ্বারা নূতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়। মনের ও শরীরেরও পরমাণু আছে এবং তাহা একত্র হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই পৃথক্ পৃথক্ কিংবা ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর মূল পরমাণুতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাণুতে তিন গুণ, তেজের পরমাণুতে দুই গুণ, এবং বায়ুর পরমাণুতে একটি গুণ আছে। এইরূপ সমস্ত জগৎ প্রথম হইতেই সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণুর দ্বারা পরিপূর্ণ। পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মূল কারণ নাই। সূক্ষ্ম ও নিত্য পরমাণুগণের পরস্পর সংযোগ যখন আরম্ভ হয়, তখন সৃষ্টির অন্তর্গত ব্যক্ত পদার্থ সকল রচিত হইতে থাকে। ব্যক্ত সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে নৈয়ায়িক-প্রতিপাদিত এই কল্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা—'আরম্ভ-বাদ', এবং কোনো নৈয়ায়িক ইহা ছাড়াইয়া কখন যান না। এক জনের সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম লইবার সময় তাহার নিকট আত্মীয়েরা, "পীলবঃ! পীলবঃ! পীলবঃ!" পরমাণু! পরমাণু! পরমাণু! এই কথা তাহাকে বলিবার পর, তাহার মুখ দিয়াও ঐ কথা বাহির হইল! তথাপি অন্য কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণুর সংযোগ হইবার পক্ষে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ এইরূপ মানিয়া, সৃষ্টির কারণপরম্পরার শৃঙ্খলটি পুরা করিয়া লন; এবং ইঁহাদিগকে "সেশ্বরনৈয়ায়িক" বলা হয়। বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়-পাদে, এই পরমাণুবাদের (২, ২, ১১-১৭) খণ্ডন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ এই মতেরও খণ্ডন করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ডাল্টন নামক পণ্ডিত-প্রতিপাদিত পরমাণু-বাদ, ইংরেজি শিক্ষিত পাঠক স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ডাল্টনের পরমাণুবাদকে ডার্বিন নামক প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞের উৎক্রান্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, সেইরূপই প্রাচীনকালে হিন্দুস্থানেও সাংখ্যমত,

কণাদের মতকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়াছে। মূল পরমাণুতে গতি কিরূপে আসিল ইহা কাণাদেরা শুধু যে বলিতে পারে না তাহা নহে, বৃক্ষ পশু মনুষ্য এইরূপ সচেতন প্রাণীদিগের পর-পর উচ্চতর পদবী কি করিয়া হইল ও অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়া আসিল প্রভৃতি এইরূপ আরও অনেক বিষয় এই মতের দ্বারা ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। পাশ্চাত্য দেশে ১৯ শতকে লামার্ক ও ডার্বিন এবং আমাদের দেশে কপিল এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একই মূলপদার্থের গুণসমূহের বিকাশ হইয়া জগতের সমস্ত রচনা হইয়াছে, এই দুই মতের ইহাই তাৎপর্য্য; এবং সেইজন্য পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে এবং এক্ষণে পাশ্চাত্যদেশে পরমাণুবাদ পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। সেইরূপ আবার, পরমাণু অবিভাজ্য নহে, একথাও এক্ষণে আধুনিক পদার্থশাস্ত্রজ্ঞেরা সিদ্ধ করিয়াছেন। আজকাল, যেরূপ সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক পদার্থের পৃথক্‌করণ ও পরীক্ষণ করিয়া অনেক সৃষ্টিশাস্ত্রের প্রমাণ-অনুসারে পরমাণুবাদ কিংবা উৎক্রান্তিবাদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ অবস্থা ছিল না। সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থের উপর ভিন্ন ভিন্ন নূতন নূতন পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়া দেখা, কিংবা তাহাদের অনেক প্রকারে পৃথক্করণ করিয়া তাহাদের মূলধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা, কিংবা সজীব জগতের পুরাতন নূতন অনেক প্রাণীদিগের শারীরিক অবয়ব সমূহের একত্র তুলনা করা, ইত্যাদি আধিভৌতিক শাস্ত্রের অর্ব্বাচীন যুক্তি কণাদের কিংবা কপিলের উপলব্ধ ছিল না। তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখে সেই সময় যে সামগ্রী ছিল তাহা হইতেই তাঁহারা আপন সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন। তথাপি সৃষ্টির অভিবৃদ্ধি কিংবা সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্য শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এবং অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্যে অধিক প্রভেদ নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। সৃষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়াপ্রযুক্ত এই মতের আধিভৌতিক উপপত্তিতে এক্ষণে অধিক সঙ্গতি আছে এবং সেই জন্য আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধিতে মনুষ্যের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনেক লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পরে নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি কি করিয়া হইল এই সম্বন্ধে অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রী, কপিল অপেক্ষা বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই,—ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কপিল সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই পরে যথাস্থানে আমি তুলনা করিবার অভিপ্রায়ে হেকেলের সিদ্ধান্তগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছি। হেকেল এই সিদ্ধান্ত নূতন বাহির করেন নাই; ডার্বিন, স্পেন্‌সর্‌ প্রভৃতি তৎপূর্ব্বের আধিভৌতিক গ্রন্থের প্রমাণ-অনুসারেই আপন আপন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন—এইরূপ তাঁহারা আপন গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। তথাপি এই সিদ্ধান্তগুলি একত্র জুড়িয়া তাহা হেকেলই প্রথমে সংক্ষেপে "বিশ্বের রহস্য" * এই নিজ গ্রন্থে সুবোধ রীতিতে বিবৃত করায়, সুবিধার জন্য হেকেলকেই আধিভৌতিক তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রধান কল্পনা করিয়া তাঁহার মতেরই প্রাধান্য দিয়া এই প্রকরণে ও পরবর্ত্তী প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি। এই উল্লেখ-বাক্যগুলি যে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই সিদ্ধান্তের অধিক বিচার করা যাইতে পারে না। যাঁহারা এই সম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাহেন তাঁহাদের স্পেন্‌সর, ডার্বিন, হেকেল প্রভৃতির মূলগ্রন্থ অবলোকন করা আবশ্যক।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রের বিচার করিবার পূর্ব্বে, 'সাংখ্য' এই শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ আছে ইহা এখানে বলা আবশ্যক। প্রথম অর্থ কপিল-আচার্য্য প্রতিপাদিত সাংখ্যশাস্ত্র হওয়ায়, তাহাই এই প্রকরণে ও ভগবদগীতাতেও একবার (গী, ১৫, ১৬) প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই নামই দিবার রীতি থাকায়, উহার মধ্যে বেদান্তশাস্ত্রেরও সমাবেশ হয়। সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা সাংখ্যযোগ এই শব্দে, সাংখ্যশব্দের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত হইয়া থাকে; এবং পরে এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানীপুরুষদিগকেও (গী. ২, ৩৯; ৩. ৩; ৫. ৪, ৫ ও ১৩, ১৪) 'সাংখ্য' এইরূপ ভগবদগীতাতেও যেখানে বলা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে সাংখ্য অর্থাৎ

* The Riddle of the Universe by Earnest Haeckel এই গ্রন্থের R. P. A. Cheap reprint সংস্করণের আমি সর্ব্বত্র উপযোগ করিয়াছি।

কেবল কপিলসাংখ্যমার্গী এইরূপ অর্থ না হইয়া, আত্মানাত্মবিচারের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানেতেই যাহারা নিমগ্ন থাকে সেই বৈদান্তিককেও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 'সাংখ্য' এই শব্দ 'সংখ্যা' এই ধাতু হইতে বাহির হওয়া প্রযুক্ত তাহার প্রথম অর্থ 'গণনাকারী' এইরূপ হয়; এবং কপিলশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি হওয়াতেই তাহা 'গণনাকারী' এই অর্থে 'সাংখ্য' এই বিশিষ্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পর 'সাংখ্য' অর্থাৎ সাধারণত সর্ব্বপ্রকারের তত্ত্বজ্ঞান এই ব্যাপক অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—এইরূপ শব্দশাস্ত্রজ্ঞদিগের মত। কপিলভিক্ষুকে 'সাংখ্য' বলিবার রীতি প্রথমে দাঁড়াইয়া গেলে, পরে বেদান্তী সন্ন্যাসীকেও ঐ নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে এইরূপ মনে হয়। যাহাই হোক, সাংখ্য শব্দের এই অর্থভেদপ্রযুক্ত পাছে গোলযোগ হয় এইজন্য আমি এই প্রকরণের ইচ্ছা করিয়াই "কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র" এই লম্বাটে নাম দিয়াছি। কণাদন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় এই কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রেরও সূত্র আছে। কিন্তু গৌড়পাদ কিম্বা শারীরকভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহাঁরা এই সকল সূত্র যেহেতু আপন গ্রন্থের প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, অতএব ঐ সকল সূত্র প্রাচীন না হইতে পারে, এইরূপ অনেক বিদ্বানদিগের মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদের ভাষ্য থাকায়, খোদ্ শঙ্করভাষ্যেতেও এই কারিকা হইতেও অনেক কথা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং খৃষ্টাব্দ ৫৭০ এর পূর্ব্বে চিনীয় ভাষায় অনূদিত উক্ত গ্রন্থের ভাষান্তর অধুনা পাওয়া গিয়াছে। * 'ষষ্ঠিতন্ত্র' নামক ষাট প্রকরণের এক তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিস্তৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য (কোন কোন প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়া) ৭০ আর্য্যাশ্লোকে এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, এইরূপ কৃষ্ণ কারিকার শেষভাগে বলিয়াছেন। ষষ্ঠিতন্ত্র গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। তাই কারিকার আধারেই কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি আমি এখানে আলোচনা করিয়াছি। মহাভারতের অনেক অধ্যায়ে সাংখ্যমতের অনেক সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে প্রায়ই বৈদান্তিকমতের মিশল থাকায় শুদ্ধ কাপিলসাংখ্যমতটি কি তাহা স্থির করিবার জন্য অন্য গ্রন্থ দেখা আবশ্যক হয়; এবং এই কার্য্যে সাংখ্যকারিকা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন অন্য গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (গী, ১০,২৬) সিদ্ধদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি—এইরূপ ভগবান গীতায় যে বলিয়াছেন তাহা হইতে কপিলের যোগ্যতা স্পষ্টই দেখা যায়। তথাপি কপিল ঋষি কোথায় ও কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার ঠিকানা নাই। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনৎসুজাত, সন, সনাতন এবং কপিল—ব্রহ্মদেবের এই সাত মানসপুত্র; জন্মিবামাত্রই তাঁহাদের জ্ঞান হইয়াছিল এইরূপ শান্তিপাঠের একস্থানে বর্ণিত হইয়াছে (৩৪০. ৬৭); এবং আর এক স্থানে (সাং ২১৮) কপিলের শিষ্য আসুরি ও আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ (জনককে প্রদত্ত) সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ আবার, শান্তিপর্ব্বে (৩০১, ১০৮, ১০৯) ভীষ্ম, এ কথাও বলিতেছেন যে, সাংখ্যেরা সৃষ্টির রচনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান এক সময় প্রবর্ত্তিত করেন তাহাই "পুরাণে, ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে" দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, "জ্ঞানং চ লোকে যদি যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মাত্মন্"—এই জগতের সমস্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—এরূপ বলিলেও চলে (সভা, শাং,৩০১,১০৯)। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার অধুনা উৎক্রান্তিবাদের কিরূপ উপযোগ করিতেছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে,—

* ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক্ষণে বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধুর গুরু এই ঈশ্বরকৃষ্ণের সমকালীন প্রতিপক্ষ ছিলেন; এবং এই বসুবন্ধুর পরমার্থ কর্ত্তৃক (খৃষ্টাব্দ ৪৯৯-৫৬৯) চিনীয় ভাষায় লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে ঈশ্বরকৃষ্ণের কাল প্রায় খৃষ্টাব্দ ৪৫০ হইবে, এইরূপ ডাক্তার টককসু স্থির করিয়াছেন। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & England. 1905 PP. 33-53. কিন্তু ডাক্তার ভিন্সেণ্ট [illegible] বসুবন্ধুর কালও খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে (প্রায় [illegible]-৩৬০) ধরা হইয়াছে। কারণ সেই গ্রন্থের ভাষান্তর খৃঃ ৪০৪এর মধ্যে চিনীয়ভাষায় হইয়াছে। বসুবন্ধুর কাল এইরূপ পিছাইয়া পড়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণের কালও সেইরূপ প্রায় দ'শো বৎসর পশ্চাৎ অর্থাৎ খৃঃ ২৪০ ধরিতে হয়। Vincent Smith's Early History of India. 3d Ed. P. 328.

উৎক্রান্তিশাস্ত্রেরই অনুরূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্য-শাস্ত্রেরও ন্যূনাধিক অংশ সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া কিছুই আশ্চার্য্য মনে হয় না। গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা জগৎরচনার উৎক্রান্তিতত্ত্ব * অথবা ব্রহ্মাত্মৈক্য, এই রকমের উচ্চ কল্পনা শত শত বৎসরের পর কোন এক মহাত্মার মনে উদয় হইয়া থাকে। তাই, যে সময়ে যে-সাধারণ সিদ্ধান্ত কিংবা ব্যাপক তত্ত্ব প্রচলিত থাকে, তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া নিজের তত্ত্ব-প্রতিপাদন করিবার রীতি সাধারণত সর্ব্বদেশের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

বিবেকতত্ত্ব।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম্, এ, বি এল্)

ইষ্টানিষ্টত্ববোধিকা শক্তির্হি বিবেকো নাম।

যে শক্তির প্রভাবে আমরা ইষ্টকে অনিষ্ট হইতে, হিতকে অহিত হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া সম্যক্ অবধারণ করিতে পারি, তাহারই নাম বিবেক। ইহা নীতি-জগতের আলোকস্বরূপ— ইহার প্রভাবেই আমাদিগের কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়; এবং ইহাই সতত আমাদের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে ইষ্ট কি, আর অনিষ্টই বা কি? নীতির আদর্শ উপলব্ধি না হইলে নীতি-জীবনে আমাদিগের ইষ্টানিষ্টত্ব বুদ্ধি আসিতে পারে না, সুতরাং দেখা যাইতেছে নীতির আদর্শভেদে বিবেকের প্রকৃতিভেদ আসিয়া পড়ে, কারণ বিবেক আমাদিগের ইষ্টানিষ্টত্ববোধ লইয়া আসে এবং নীতির আদর্শ অনুসারেই আমাদের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব নিরূপিত হয়। পথিক যেমন পথ চলিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করিয়া লয়, নীতিজগতেও মানব নীতির আদর্শ বুঝিয়া লইয়া নীতিপথে অগ্রসর হইবার প্রয়াসী হয়।

* উৎক্রান্তিবাদ এই শব্দ Evolution Theory এই অর্থে আজকাল প্রচলিত হওয়া প্রযুক্ত আমি এখানে ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু 'উৎক্রান্তি' এই শব্দের অর্থ সংস্কৃত ভাষায় 'মরণ'। তাই উৎক্রান্তিতত্ত্ব-শব্দ অপেক্ষা গুণ-বিকাস, গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণাম এই সাংখ্য-দিগের শব্দ যোজনা আমার মতে অধিক প্রশস্ত।

বিবেকতত্ত্ব অবধারণ করিতে হইলে প্রথমে নীতিতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ধর্ম্মের তত্ত্ব যেমন 'নিহিতং গুহায়াম্' নীতির তত্ত্ব তদ্রূপ না হইলেও অন্ততঃ বনেষু কীর্ণম্ একথা বলা যাইতে পারে। আবার শুধু বনে নয়, হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীতে নীতির-তত্ত্ব বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কুড়াইয়া লইতে গেলে মহতী আশঙ্কা। আমরা দূর হইতে সেই গহন বনের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিব, যাঁহার আত্মরক্ষার সামগ্রীসম্ভার আছে তাঁহাকেই আমরা সোৎসাহে তত্ত্বসংগ্রহ করিতে উপদেশ দিব।

নীতিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া আসে। আমরা নীতির যে আদর্শ লক্ষ্য করিব তদনুযায়ী মার্গ অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেই মার্গোপদেষ্টাকেই আমরা বিবেক আখ্যা দিব। বিভিন্ন আদর্শাবলম্বীর নিকট বিবেকের তত্ত্ব বিভিন্ন-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মজগতের ন্যায় আমরা নীতিজগতেও "ইদমেব তত্ত্বম্" বলিতে যাইব না, কেবল কোন্ আদর্শ অবলম্বন করিলে কিরূপ শক্তিকে বিবেক বলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিব এবং কোন্ শক্তিকে বিবেক আখ্যা দিলে কি কি দোষ হয় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ গ্রহণ করিলে কর্ম্মের শুভাশুভত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব বিচারের জন্য বিশেষ কোনও সূক্ষ্মশক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে হয় না, যেহেতু এই আদর্শানুযায়ী ইষ্টানিষ্টত্ব স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতির অগম্য নহে—যৎকিঞ্চিৎ সাংসারিক অভিজ্ঞতা থাকিলেই ব্যবসায়াত্মক আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের ক্রিয়াকলাপ পরি-চালিত করিতে পারি। এস্থলে জানিতে হইবে এই ব্যবসায়াত্মক আদর্শ কাহাকে বলে? নিশ্চ-য়াত্মক সুদৃঢ় নিয়মকে আমরা ব্যবসায় বলিয়া থাকি। যদি আমরা বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়ম ও শাসনকে নীতির আদর্শ মনে করি অর্থাৎ যাহা কিছু এই নিয়মের ও শাসনের অধীন ও অনুকূল তাহাই আমাদের ইষ্ট আর যাহা উহার প্রতিকূল ও পরিপন্থী তাহাই অনিষ্ট এইরূপ মনে করি তাহা হইলে কেবল স্থূল জ্ঞান ও অনুমিতির সাহায্যেই আমরা কোন্‌টা ইষ্ট কোন্‌টা অনিষ্ট বুঝিয়া লইতে

পারি। পূর্ব্বে আমরা বিবেকের যে সংজ্ঞা বলিয়া আসিয়াছি তদনুযায়ী এই ইষ্টানিষ্টত্ববোধক স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতিকেই বিবেক বলিয়া জানিতে হইবে। এক্ষণে নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ লক্ষ্য করিয়া স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতিকে বিবেক নামে অভিহিত করা কি কি দোষে দুষ্ট, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

যদি বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়ম ও শাসনই আমাদের নীতিজীবনের পরিচালক হয় তাহা হইলে কূটস্বার্থপরতা নীতির স্থান অধিকার করিবে, সূক্ষ্মদর্শিতা ধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিবে। যদি আমরা নিয়ম ও শাসনের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্যকে যথাক্রমে ইষ্ট ও অনিষ্ট মনে করি এবং তদনুসারে কার্য্যাকার্য্য অবধারণ করিয়া লই, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে আমরা শাসনের অনুকূলে কর্ম্ম করিলে পুরস্কৃত হইব এবং প্রতিকূলে কার্য্য করিলে দণ্ডিত হইব; এই পুরস্কারের আশায় ইষ্টকর্ম্ম কার্য্য এবং এই দণ্ডের ভয়ে অনিষ্ট কর্ম্ম অকার্য্য বলিয়া বিচার করি। এই নিয়ম ও শাসন—যাহাকে ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিয়া আসিতেছি তাহা ঐশ্বরিকই হউক, সামাজিকই হউক, আর রাজকীয়ই হউক যখন আমরা দেখিতে পাই, ইহার প্রতিকূলে কার্য্য করিলে আমাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে আর ইহার অধীন হইয়া চলিলে আমাদের দণ্ডের ভয় থাকিবে না, তখন দণ্ডের ভয় অথবা পুরস্কারের আশাই যে নীতিজীবনের নিয়ন্তা বলিয়া পরিগণিত হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না সুতরাং পুরস্কারের আশারূপ স্বার্থই আমাদিগকে ইষ্ট কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেয় এবং দণ্ডের ভীতিরূপ স্বার্থহানিই অনিষ্ট কর্ম্ম হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করে। তাহা হইলে স্বার্থপরতাই আমাদের নীতি—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আবার ধর্ম্মের সহিত নীতির এরূপ সম্বন্ধ যে নীতি যখন স্বার্থমূলক হইয়া উঠিল, তখন সূক্ষ্মদর্শিতাই যে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞানই আমাদিগকে নীতিপথে চালিত করে এবং সূক্ষ্মদর্শিতাই আমাদিগের কূটস্বার্থবিজড়িত কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা দেয়। ইহাতে নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ অবলম্বনকরা যে সমীচীন নহে ইহাই প্রতিপন্ন হইল। আরও আমরা দেখিতে পাই যে নীতির সহিত মানবপ্রকৃতির গভীর সম্বন্ধ আছে, যেহেতু নীতিপথে চলিলে আমাদের মঙ্গল হয় এবং নীতিপথভ্রষ্ট হইলে আমাদের অমঙ্গল বুঝিতে পারি। নীতি আমাদের অন্তরের সামগ্রী, আমাদের অন্তঃকরণ স্বতই নীতিপথে প্রধাবিত হয়, নৈতিক জীবন আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবসায় বা নিয়ম ও শাসনের সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোনও সম্বন্ধ নাই; ব্যবসায় লৌকিক ইচ্ছাই হউক আর ঈশ্বরেচ্ছাই হউক ইহা কেবল বহির্জগতের সুদৃঢ় নিয়মকলাপ যাহা যুক্তিযুক্তই হউক আর অযৌক্তিকই হউক আমরা পালন করিতে বাধ্য। পরন্তু এই নিয়মকলাপ যাহাকে আমরা ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিতেছি আমাদের পক্ষে শুভ ও উপাদেয় হইতে পারে আবার অনিষ্ট ও অশুভও হইতে পারে সুতরাং এই আদর্শ নিয়মাবলীর উপর আর একটি আদর্শ স্বীকার করিতে হয় যদ্দারা এই নিয়ম ও শাসনের শুভাশুভত্ব পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আদর্শের পথপ্রদর্শক স্থূলজ্ঞান ও অনুমিতিকে বিবেক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইন্দ্রিয়সুখই নীতিজীবনের আদর্শ অর্থাৎ যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়সুখের নিদান তাহাই ইষ্ট আর যাহা উহার পরিপন্থী তাহাই অনিষ্ট। এই মত অবলম্বন করিলেও বিবেক স্থূল পার্থিবজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় কারণ আমরা আমাদের জীবনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়াকলাপ ও তাহার ফলসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়াই কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব নির্ণয় করিতে পারি অর্থাৎ কোন্ কর্ম্ম করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ উপলব্ধ হইবে আর কোন্ কর্ম্মেই বা আমাদের সুখের ব্যাঘাত হইবে তাহা আমরা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা ও স্থূলজ্ঞানকে বিবেক বলিলে কি কি আপত্তি হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সুখই যাঁহারা নীতিজীবনের আদর্শ মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ ব্যক্তিগত সুখ

আর কেহ কেহ বা সার্ব্বজনীন সুখকে আদর্শ বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে আর কেহ কেহ বা পুরুষপরম্পরাক্রান্ত জ্ঞানকে বিবেক আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু মূলতঃ ইঁহাদের সকলেরই একই আদর্শ একই পন্থা।

কেহ কেহ বলেন নীতিজীবনে বহির্জগতের কোনও আদর্শ অবলম্বন করিলে চলিবে না—কোনও বাহ্য আদর্শ অবলম্বন করিয়া আমাদের ইষ্টানিষ্টত্ব ও কার্য্যাকার্য্যত্ব নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্বের প্রকৃত হেতু আমরা বহির্জগতে খুঁজিয়া পাই না, কারণ ইষ্টানিষ্টত্ব কর্ম্মের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি। এই ইষ্টানিষ্টত্ব যে শক্তির প্রভাবে অবগত হওয়া যায় তাহাকে আমাদের অন্তরের অন্তরতম উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। এই উচ্ছ্বাস আমাদের প্রকৃতিগত এবং ইহারই নাম বিবেক। আবার যাঁহারা অন্তরের এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে বিবেক বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে চান, যেমন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা পদার্থের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, তেমনই অন্তরের উচ্ছ্বাস দ্বারাই আমরা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব জানিতে পারি। যেমন প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতেই বিষয়জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তেমনই আমাদের এমন একটি নৈতিক ইন্দ্রিয় আছে, যাহার সহিত আমাদের কর্ম্মের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতেই কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্বস্বরূপ সূচিত হইয়া থাকে। বাহ্য-জগতের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের পদার্থজ্ঞানের সঞ্চার হয়, অর্থাৎ যে পদার্থ আমাদের যে ইন্দ্রিয়ের সহিত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা যেরূপ অনুভূতির উদ্রেক করে, আমরা তদনুযায়ী সেই পদার্থের স্বরূপ জানিতে পারি। তেমনই কর্ম্মের সহিত আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, তদনুযায়ী আমাদের কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই অনুভূতিতে যদি প্রীতির ভাব পাই তবে আমরা তাহার মূলীভূত কর্ম্মটাকে ইষ্ট বলি আর অপ্রীতির ভাব আসিলে আমরা কর্ম্মটাকে অনিষ্ট বলিয়া জানি। তাহা হইলে পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের উপায় আর কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব বিচারের উপায় একই প্রকারের হইয়া পড়িল। যে কর্ম্ম ইষ্ট তাহা আমাদের অন্তঃকরণে একটা প্রীতির উচ্ছ্বাস,—একটা সুন্দর ভাবের অনুভূতি উন্মেষিত করিয়া দিবে আর যাহা অনিষ্ট তাহা অসুন্দর অপ্রীতির ভাবের উদ্রেক করিবেই করিবে। বিবেকশক্তিকে এইরূপ একটা অনুভূতি মাত্র বলিলে কি কি দোষ আসিয়া পড়ে তাহা আলোচনা করিলেই অনুভূতিবাদের দুষ্টত্ব প্রতীত হইবে।

(ক্রমশঃ)

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

অন্নাভাব :—সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অন্নাভাব এবং সাধারণত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্ঘতা নিয়মিত করিবার জন্য বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই হাহাকারের ভাব দেখিয়া আমাদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আমাদের সে সকল জমীদার কোথায় গেলেন যাঁহাদের গৃহে অন্নবস্ত্রসকল যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত থাকিত এবং দরিদ্র প্রজাদের কষ্টের অবস্থায় যথাপরিমাণে বিতরিত হইত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট জমীদারশ্রেণীর সংরক্ষণে মনোযোগ প্রদান করিলে দেশের মঙ্গল এবং প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। বিলাতে জমীদারশ্রেণী সংরক্ষিত আছেন বলিয়াই সেখানে ভাল কাজ, ভাল চিন্তা প্রভৃতি সাধু বিষয় সকল বর্দ্ধিত হয়, ইহা অনেক প্রবীণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অভিমত। জমীদারশ্রেণীর দেশের মধ্যে বিপ্লব প্রভৃতির উপায়ে গোলযোগ আনা কিছুতেই মত হইতে পারেনা, কারণ তাহাতে তাঁহাদেরই ক্ষতি। ইহারই জন্য আমরা চিরস্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী। জমীর উপর প্রত্যেক জমীদারের টান যত বেশী থাকিবে ততই মঙ্গল। যদি সেরূপ টান না থাকে, তবে স্বভাবতই দেশের লোকের কেবল কিসে টাকা বেশী হয় সেইদিকেই ঝোঁক হইবে। তাহাতে গোলযোগ বা অ-গোলযোগের কথা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। এরূপ ভাবের পরিণাম ফল বিষময়—বিপ্লবের দিকে প্রবণতা। অবশ্য কিছুকালের জন্য অস্থায়ী বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্টের লাভজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন দেশের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক নহে, তখন গভর্ণমেণ্টেরও পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইতে পারে না। [illegible] ইংরাজ সংবাদপত্র যে কথায় কথায় [illegible] করেন যে

দেশে কোটী কোটী টাকার রৌপ্য সঞ্চিত আছে, সুতরাং দেশ ধনী—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। দেশবাসী যদি ধনী হইত, তবে আজ তাহারা বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণের অক্ষমতার কারণে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইত না। Statisticsরূপ ভ্রমসাধক যন্ত্র ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে আমরা শতবার বলিব যে এদেশবাসীর ন্যায় দরিদ্র পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ঐ যে দেশের ধনসঞ্চয়ের কথা উক্ত হয়, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মুষ্টিমেয় কতকগুলি বণিকের হস্তেই সেই অর্থ প্রধানত সঞ্চিত আছে। আমরা সেই সকল বণিক সম্প্রদায়কেই, বিশেষত যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বণিক সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, সেই সকল ধনীশ্রেষ্ঠ বণিকগণকে সাম্রাজ্যের এই দুঃসময়ে সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। যাঁহার দশ কোটী টাকা আয়, তাঁহার পক্ষে এক কোটি কেন, পাঁচ কোটি টাকা দিলেও বিশেষ কষ্টকর হইবে না, কিন্তু যাহার আয় মাসে ৩৲ টাকা মাত্র, তাহার পক্ষে দেড় টাকা দূরে থাক, চার আনা বা দুই আনা বা এক আনা দেওয়াও বিশেষ কষ্টকর।

হোলি উৎসব ও মদ্যপান :—আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে বোম্বাই সহরে "সমাজসেবাসমিতির" উদ্যোগে হোলি উৎসবের সময় দুইদিন মদের দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছিল। এরূপ ঘটনার কথা শুনিলেও শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক পল্লীতে মদ্যের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য কি উদ্যোগী যুবক পাওয়া যায় না?

বৌদ্ধমন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে ইউরোপীয়গণ জুতাপায়ে বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্র হইতে যতদূর দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যেন, মন্দিরাধ্যক্ষগণ এ প্রথার বিরোধী। তবে, মন্দিরাধ্যক্ষগণের মধ্যে কেহই যে নানা কারণে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই, সে কথা আমরা বলিতে পারি না। যাই হোক, ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট একটা আদেশ ঘোষণা করিয়াছেন যে বৌদ্ধমন্দিরে ইউরোপীগণের জুতাপায়ে প্রবেশ করা বহু পুরাতন প্রথা—এ পর্য্যন্ত তাহাতে কেহ বাধা প্রদান করেন নাই, সুতরাং এখনও সে প্রথা রহিত হইতে [illegible]। এই আদেশ মোটেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। [illegible] হইলাম যে এতদিন ব্রহ্মে বৌদ্ধগণ ভয়ে হউক বা অন্য যে কোন কারণে হউক, তাহাদের মন্দিরে ইউরোপীয়গণকে জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে নিষেধে সাহস করে নাই, তাই বলিয়া সেই অন্যায় প্রথাকে যে বজায় রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। গবর্ণমেণ্টের ভাবা উচিত যে নানা কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও অন্তরে জাগরণ আসিয়াছে, তাই তাহারা আজ এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই প্রথা রহিত করিতেন, তবে রাজাপ্রজার সম্বন্ধসূত্রে প্রেমের আর একটী গ্রন্থি পড়িয়া যাইত। তাহার বদলে ব্রহ্মগবর্ণমেণ্টের ঐ অযথা আদেশের ফলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই এই বিষয়ে দু'চারটী কথা আমাদিগকে খুলিয়া বলিতে হইল।

বঙ্গের নাবিক—আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে চট্টগ্রাম প্রভৃতির অধিবাসী বঙ্গসন্তানেরা নাবিকের কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গের লাট তাহাদিগকে পদকপ্রদান কালে তাহাদের কর্ম্মকুশলতা এবং সাহস ও বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তো জানি যে বঙ্গসন্তানেরা সাহসে ও বীরত্বে কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। একটী প্রবাদ আছে যে চোরকে ভাল বলিতে বলিতে চোরও ভাল হইয়া যায় এবং ভাল লোককে চোর বলিতে বলিতে ভাল লোকও চোর হইয়া যায়। বাঙ্গালীরা জন্মগ্রহণ অবধি আপনাদিগকে কাপুরুষ দুর্ব্বল প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে হীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধাতা সে অন্যায় সহ্য করিবেন কেন? তাই তিনি আজ বঙ্গসন্তানকে সকল বিষয়ে সাহস ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের পরিচয় প্রদর্শনের অবসর দিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গ জমীদার সভা—আমরা জমীদার সংরক্ষণের পক্ষপাতী, সেই কারণে আমরা এই প্রকার সভা স্থাপনেরও পক্ষপাতী। এই সভার উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে জমীদার সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজারক্ষারূপ ব্রতপালনে যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত দীক্ষিত হইয়া উঠেন তাহার উপায় অবলম্বন করা। আমরা শুনিতে পাই যে অনেক জমীদার স্থির করিয়া বসিয়া আছেন যে প্রজাশোষণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করা এবং সেই টাকা নানাবিধ অসৎকার্য্যে ব্যয় করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু জমীদার সভা যদি প্রজাপালনে জমীদারদিগের স্বার্থ বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং ঐ কার্য্যে জমীদারদের একটা আনন্দের ভাব ঢুকাইয়া দিতে পারেন, তবেই সভার অস্তিত্ব ও জীবন সার্থক।

———

আঁধারে।

(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী)

আপনার অন্ধকারে
আঁধারিয়া রাখে মোরে
একাকী ঘুরে মরি
কণ্টকিত বনে।
দুর্গম এ পথের মাঝে
কেহত আসেনা কাছে
কেহ না সুধায় কিছু মোরে।
নিতান্ত পাগলের মত
ভ্রমিতেছি ইতস্তত ;
আঁধার আসিছে ছেয়ে
হয়ে ঘনীভূত।
প্রেমময় বিধাতার বরে
নিঝরও ত ঝরে গো প্রস্তরে ;
এ দগ্ধ পরাণ পরে
সে ধারা নাই বা যদি ঝরে
তবে পুড়ে যাক ছাই হয়ে,
টুটে যাক্ বাঁধন যত,
চাব না কারো পানে
চির জীবনের মত।
ঘোর আঁধারে উৎস মাঝে
ফুটবে যবে আলো
কণ্টকিত আঁধার বনে
তাই হবে মোর ভাল।
আঁধারে কারো পাবনা দেখা
প্রকৃতি হবে জীবনসখা ;
হাসিয়া কাঁদিয়া কয়ে দুটি কথা
জুড়াব দারুণ মরমব্যথা।
বিশ্বপিতা যিনি
শুনিবেন তিনি
আমার দুঃখের গান,
ডাকিবেন তিনি
চরণে মোরে
গানটী হলে অবসান।

লিঙ্গায়তধর্ম্মে পৌরোহিত্য।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বাসবা বংশগত পৌরিহিত্যপদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে মনুষ্য তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারে শ্রেষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লিঙ্গায়ত গুরু এবং পুরোহিত-গণকে জঙ্গম বলে। এই জঙ্গমশব্দ জানা-অর্থে গম ধাতু হইতে উৎপন্ন। যিনি নিজকে অভ্রান্ত ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে লীন বলিয়া জানেন তিনিই জঙ্গম। ইহা ব্রাহ্মণশব্দের প্রতিশব্দমাত্র। কেহ কেহ বলেন গম-অর্থে যাওয়া হইতে জঙ্গম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নানা দেশে গমন করিয়া লিঙ্গায়ত বা বীর শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন তিনিই জঙ্গম নামে অভিহিত হন।

লিঙ্গায়ত সাধুগণ বলিয়াছেন যে যিনি আত্মাকে সম্যক্রূপে জানিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি কূটস্থ হইয়াছেন তিনিই শিবযোগী। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনিই জঙ্গম হইবার উপযুক্ত। বাসবা বলিয়াছেন "হে জঙ্গমগণ তোমরা জঙ্গম দিগের জাতি স্বতন্ত্র করিয়াছ, অর্থাৎ যাহারা তোমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে জঙ্গম বলিয়া স্বীকার কর, এবং অপরকে নীচ জাতি মধ্যে গণ্য কর ; এইজন্য তোমরা কেবল মাত্র ক্রিয়াশীল লিঙ্গপূজকরূপে পরিণত হইয়াছ, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পার নাই। ইহাই তোমাদের পাপের শাস্তি"। (ভক্তিস্থল ভক্তিবচন ২৮৪)

"যে ব্যক্তি জঙ্গমদিগের মধ্যে জাতিভেদ স্বীকার করে সে নিশ্চয়ই বাহ্যিক পূজক মাত্র। ভক্তের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তরিক উপাসনা, ধ্যান ও আত্মসংযম দ্বারা ভগবানে লীন হওয়া। যদি কোন ভক্ত অবিশ্বাস করে যে অপর একজন কেবল-মাত্র নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া উদ্দেশ্য-পথে উপস্থিত হইতে সক্ষম নহে, তাহা হইলে ইহাই প্র[illegible]ম হইবে যে সে জাত্যভিমান বশতঃ উক্ত স্থানের উপযুক্ত হইতে পারে নাই। যদি জাতি একজনের পক্ষে পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়ার ব্যাঘাতস্বরূপ হয় তবে ইহা সকলের পক্ষেই ব্যতিক্রম উৎপাদন করিবে। সুতরাং এইরূপ সন্দেহ এবং কুসংস্কার লিঙ্গবিশ্বাসীর ধর্ম্মের মূল ছেদন করে মাত্র। "লিঙ্গতে কি কাঠিন্য সম্ভবে ? জঙ্গমে কি জাতিভেদ থাকিতে পারে ?"—ঐ ২৮৫।

"হে পরমেশ্বর আমাকে অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ট জাতি বলিয়া অভিমানজনিত কাজে লিপ্ত [illegible] আমাকে দয়া কর। কাক্যয়ার ভো[illegible]

কণা মাত্র দিয়া আমাকে ধন্য কর"। (এই কক্কয়া কর্ম্মকারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান প্রভাবে শিষযোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জঙ্গম হইয়াছিলেন।)

"আমি যদি সিরিয়াকে বৈশ্য বলিয়া, মাচয়াকে রজক বলিয়া, কক্কয়াকে চর্ম্মকার বলিয়া, চন্নয়াকে মাড় বলিয়া ঘৃণা করি এবং আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবান আমার কপটতা দেখিয়া হাস্য করিবেন।" ঐ ৩৪৫। "অব্য" শব্দ সংস্কৃত আর্য্যশব্দের কন্নাড় ভাষান্তর মাত্র। এই শব্দ মান্যের স্বরূপ জঙ্গমদিগের ও সাধুদিগের প্রতি ব্যবহৃত হয়।

"আমি জঙ্গম বা সাধুদিগের মধ্যে জাতিভেদ করিব না। আমি তাহাদিগের মধ্যে উত্তম, মধ্যম বা অধম নির্ব্বাচন করিব না। জঙ্গম এবং সাধুদিগের মধ্যে কি উচ্চ মধ্যম অধম আছে?"—ঐ ৪০০।

উপরি উক্ত বচন দ্বারা বাসবা বংশাগত পৌরোহিত্যের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই যে, যে ব্রাহ্মণগণের বংশগত পৌরহিত্যের বিরুদ্ধে বীর শৈবগণ এক সময়ে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, অনেকস্থলে লিঙ্গায়ত জঙ্গমগণও আজ সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্মের অভাব থাকিলেও কেবলমাত্র জঙ্গমবংশে জন্মগ্রহণ বশতঃ সাধারণ লিঙ্গায়তগণের উপর প্রভুত্ব করিতে লজ্জিত হন না, এবং অপর নীচবংশীয় জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ভক্তগণকে জঙ্গমের আসনে বসাইতে অস্বীকার করেন। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির মধ্যে যে পরিমাণে জাতীয় পার্থক্য বর্ত্তমান আছে, জঙ্গম ও সাধারণ লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে ততদূর নাই। এখনও জাতিনির্ব্বিশেষে ভক্তগণ জঙ্গমদিগের ন্যায় মান্য পাইয়া থাকেন। লিঙ্গায়তগণ বিশ্বাস করেন যে প্রকৃত জঙ্গম এবং প্রকৃত ভক্ত উভয়েই মুক্তির অধিকারী। তবে জঙ্গম জ্ঞানযোগী এবং ভক্ত কর্ম্মযোগী।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু রায়বাহাদুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাথুরে কয়লা এবং আমার জন্মের কথা বলিতে বলিতে আরো প্রাচীনতর যুগের অনেক কথা মনে পড়িতেছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া তোমাদের কৌতূহল নিবারণ করিব।

তোমাদের বিখ্যাত গণিতবিদ্ পণ্ডিত লা-প্লাস্ (Laplace) বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে এক সময়ে সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি নভোমণ্ডলস্থিত কোন জ্যোতিষ্কেরই পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তোমরা যাহাকে আকাশ বল, তাহা তখন ছিল না; বায়ু ছিল না, স্থল ছিল না, জল ছিল না। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহবেষ্টিত যে সৌরজগতের মধ্যে তোমরা বাস করিতেছ, সেইরূপ সংখ্যাতীত সৌরজগত এখন এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। রাত্রিকালে যে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির বিকাশে গগনমণ্ডল হীরকখচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকটি তোমাদের সূর্য্যের ন্যায় এক একটি সূর্য্য। প্রত্যেক নক্ষত্র নানা গ্রহ উপগ্রহপরিবেষ্টিত হইয়া পৃথক্ সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সূর্য্যরূপে উহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিতেছে। সৃষ্টির আদি যুগে কিন্তু এই অসংখ্য সৌরজগতের একটিরও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তখন অনন্ত মহাব্যোম প্রদেশ প্রচণ্ডতাপসম্পন্ন, মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান, ভাস্বর, কুজ্ঝটিকার ন্যায় এক বাষ্পময় পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

সৃষ্টির ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

এই জ্যোতির্ম্ময় কুয়াসার ন্যায় পদার্থ ইংরাজীতে নেবুলা (Nebula) নামে পরিচিত। আমরা ইহাকে "নীহারিকা" বলিব। এখনো ব্যোমপথে এবং অনেক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে দূরবীক্ষণ সাহায্যে নীহারিকার খণ্ডাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। নীহারিকা দেখিতে নীলাকাশে ভাসমান মধ্যাহ্ন সূর্য্যকরোদ্দীপ্ত শুভ্র তরল মেঘখণ্ডের ন্যায়। মাঝে মাঝে আকাশমণ্ডলে যে ধূমকেতুর উদয় তোমরা দেখিতে পাও, উহাদিগের দেহ অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় এখনো তরলত্ব বা

নীহারিকা-বাদ।

কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ধূমকেতু আজিও নীহারিকার অবস্থায় অর্থাৎ ভাস্বর বাষ্পের আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। পদার্থ বাষ্পাকারে থাকিলে অত্যন্ত হাল্কা হয় এবং উহার একটী সামান্য কণামাত্র বিস্তৃত হইয়া বিপুল স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ধূমকেতু বাষ্পাবস্থায় আছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে কোটী কোটী মাইল বিস্তৃত একটী ধূমকেতুর দেহের ওজন ১০।২০ সেরের অধিক হইবে না। লাপ্লাসের মতে এক সময়ে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডদেহ নীহারিকাময় ছিল। তোমাদের আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমানুয়েল্ কাণ্ট্ও এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

উল্কাবাদ।

আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে নীহারিকা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল উপাদান নহে। তাঁহারা বলেন যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য উল্কাপিণ্ড (Meteors) পুঞ্জীভূত হইয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইয়াছে। সংখ্যা[illegible] উল্কাপিণ্ড আজিও ব্যোমপথে ভ্রমণ করিতেছে এবং দল বাঁধিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদিগের মতে নীহারিকার দেহ অসংখ্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যোমপথে প্রচণ্ড বেগে ভ্রাম্যমান উল্কাপিণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষণে এত অধিক তাপ সমুৎপন্ন হয় যে তদ্দ্বারা উহারা প্রজ্বলিত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করে। তাপ বিকিরণ দ্বারা ক্রমশঃ শীতল হইয়া এবং মাধ্যাকর্ষণের বলে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক উল্কাপিণ্ড একত্রে মিলিত হইতেছে এবং তাহার ফলে গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে এবং আজি পর্য্যন্ত সৃষ্টি-প্রকরণ এই একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ শত সহস্র উল্কাপিণ্ড তোমাদের আকাশের মধ্যে নিত্য প্রচণ্ড বেগে আগমন করিতেছে। রাত্রিকালে দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশপথ পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগের অস্তিত্ব তোমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। ইহাদিগের দেহের সহিত বায়ুমণ্ডলের বিষম ঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া এত অধিক তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় যে উহাদিগের দেহ অগ্নিময় দেখায়। অনেক সময়ে তাপ সংযোগে উহারা জ্বলিয়া যাইয়া একেবারে বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত তোমরা মাঝে মাঝে আকাশে যে নক্ষত্রপাত (Shooting star) দেখিতে পাও, তাহা পতনশীল জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড অথবা দুই বা ততোধিক উল্কাপিণ্ডের সংঘাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেগুলি জ্বলিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয় না, মাধ্যাকর্ষণের বলে তাহারা পৃথিবীর উপরে পতিত হইলে উক্ত ঘটনা "উল্কাপাত" বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে উল্কাপুঞ্জ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবীর কক্ষপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বিস্তর উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর উপর বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। তোমরা এই ঘটনাকে "উল্কাবৃষ্টি" বলিয়া থাক। উল্কাপিণ্ডের দেহ বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গঠিত, লৌহ ইহার একটী বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপাদান। উল্কাপিণ্ডের দেহে লৌহ অনেক সময়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ইংরাজীতে এরূপ লৌহকে "উল্কাপিণ্ডজাত লৌহ" (Meteoric iron) কহে। এই মতে উল্কাপিণ্ডই বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান।

গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাদানের অভিন্নতা।

সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সকলেরই উপাদান এক। তোমাদের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এই সকল জ্যোতিষ্ক হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহা যন্ত্রবিশেষ (Spectroscope) দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া পৃথিবীর দেহ যে সকল মূল পদার্থ (Elements) দ্বারা গঠিত, তাহাদিগের অস্তিত্ব গ্রহ নক্ষত্রাদির দেহেও প্রমাণ করিয়াছেন। এই উপাদান-সমত্বের আবিষ্কার লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সমর্থন করিতেছে। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে তাঁহার মতে এই সকল গ্রহ নক্ষত্র এক সময়ে অনন্ত আকাশব্যাপী নীহারিকার ভাস্বর বিরাট বপুর অন্তর্ভূত ছিল। কালসহকারে উহারা পৃথক্ অস্তিত্ব ধারণ করিয়াছে বটে কিন্তু একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহাদিগের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহাদির জন্ম।

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় তোমাদের পৃথিবীরও পৃথক্ অস্তিত্ব এককালে ছিল না। তখন বন, [illegible] সাগর, সরিৎ, প[illegible] দ্বীপ, উপদ্বীপ, ইহাদের মধ্যে কোনটা[illegible]

অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত না। কেবল এক বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পীয় পদার্থ তোমাদের সৌর-জগতের তাবৎ স্থান অধিকার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিত। বিকিরণ হেতু উহার প্রচণ্ড তাপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং এইরূপে অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া প্রথমতঃ তরলাকার, পরে আরো জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে আরম্ভ হইল। তোমরা জান যে জল উত্তাপ সংযোগে বাষ্পাকার ধারণ করে ঐ বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় তরল জলের আকারে পরিণত হয় এবং অধিক শৈত্য সংযুক্ত হইলে তরল জল ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া কঠিন বরফের আকার ধারণ করে। ঠিক এই একই নিয়মে তাপের অপসারণহেতু বাষ্পময় বিরাট বিশ্বদেহ জমাট বাঁধিয়া প্রথমতঃ তরল ও পরে কঠিন আকারে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের উপরিভাগ একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে; পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ প্রচণ্ড উত্তাপ সংযোগে এখনো তরলাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় আমরা পৃথিবীর গর্ভস্থিত এই তরলাংশকে গলিত ধাতু ও প্রস্তরধারারূপে নিঃসৃত হইতে দেখিতে পাই। চন্দ্রের ভিতর ও বাহির, উভয় প্রদেশই একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে। একসময়ে চন্দ্রের মধ্যেও বহু আগ্নেয় গিরি বিদ্যমান ছিল এবং সেইগুলি অনবরত তরল অগ্নিময় পদার্থ উদ্গিরণ করিত। একসময়ে চন্দ্র তোমাদের পৃথিবীর মত বায়ু ও জল পৃষ্ঠদেশে বহন করিত; এখন চন্দ্রে বায়ুও নাই, জলও নাই, থাকিলেও তাহারা অত্যধিক শৈত্যপ্রযুক্ত কঠিনাবয়ব ধারণ করিয়া আছে। চন্দ্র এখন নির্জীব ও নিষ্প্রভ হইয়া পরের আলো ধার করিয়া তোমাদের আলো যোগাইতেছে। চন্দ্রের প্রভাব এখন পৃথিবীর জোয়ার ভাঁটার উপর এবং তোমাদের কবিকুলের কল্পনারাজ্যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে তাপসংযোগে পদার্থ আয়তনে বড় হয় এবং শৈত্য সংযোগে সঙ্কুচিত হইয়া আকারে ছোট হইয়া যায়। বাষ্পময় বিশ্বদেহ যতই শীতল হইতে লাগিল, [illegible] সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইতে আরম্ভ [illegible] উহার গতিরও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। প্রথম অবস্থায় বাষ্প-দেহের মধ্যে অসংখ্য প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অসংযত ভাবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইত। ক্রমশঃ দেহের বস্তু সঙ্কোচ হইতে আরম্ভ হইল, উহার অসংযত বহুমুখী গতি একটীমাত্র আবর্ত্ত-গতিতে পরিণত হইল এবং বহু বিস্তৃত বাষ্পদেহ ক্রমে একটী অপেক্ষাকৃত ছোট বর্ত্তুলাকার পিণ্ডে পরিণত হইয়া নিজ অক্ষের উপর ব্যোমপথে প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তখনও উহা তরল এবং বাষ্পাবস্থায় রহিয়াছে; এই মহাঘোর আবর্ত্তনের সময় উহার *মধ্যাংশ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং উত্তর প্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপিয়া গেল এবং মাঝে মাঝে উহার স্ফীত প্রদেশ হইতে কিয়দংশ বিচ্যুত হইয়া চক্রাকারে (Rings) উহাকে বেষ্টন করিয়া পৃথক্ ভাবে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের সৌর-জগতে একটী করিয়া আটটী মূল চক্রের সৃষ্টি হইয়াছিল; উহারা ক[illegible] ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এবং চূর্ণ অংশগুলি মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ম্মিলিত হইয়া পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নেপচুন এবং ইউরেনাস্ নামক আটটী গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। সৌরজগতব্যাপী সেই জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থের মধ্যাংশ এখন সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছে এবং বিচ্যুত অংশগুলি হইতে যে গ্রহগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কক্ষপথে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

উপগ্রহদিগের জন্ম।

এই একই প্রণালীতে অনন্তবিস্তৃত মহাব্যোম-প্রদেশে যে কত সৌরজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তোমাদের পৃথিবী সৌরজগতব্যাপী আবর্ত্তনশীল সেই নীহারিকা দেহের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। যখন পৃথিবীর দেহ কঠিন হয় নাই, তখন ঘোর আবর্ত্তনের ফলে উহার দেহ হইতেও একাংশ বিচ্যুত হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে; এক সময়ে পৃথিবী ও চন্দ্র একাঙ্গীভূত ছিল। সুতরাং চন্দ্র পৃথিবীর একটী উপগ্রহ। চন্দ্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। চন্দ্রের ন্যায় বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহগুলির এক বা ততোধিক উপগ্রহ আছে। এই সকল উপগ্রহ একই

নিয়মে গ্রহগণের দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া জন্মলাভ করিয়াছে। উপগ্রহদিগের সাধারণ ইংরাজী নাম সাটেলাইট্ (Satelites)। বৃহস্পতির চারিটী উপগ্রহ। কতকগুলি উপগ্রহ এখনো চক্রাকারে স্বীয় গ্রহকে পরিবেষ্টন করিয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ভ্রমণ করিতেছে। দূর-বীক্ষণ সাহায্যে, শনি গ্রহের উপগ্রহ চক্রাকারে শনিকে সুন্দর ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্ত)

রামপ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, যখন চড়কি দেপাক্, দেপাক্, বলিয়া চড়ক গাছে ঘূরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন "সেন মহাশয় দেখ কেমন সুন্দর ঘূরিতেছে, প্রসাদ তাহাতে হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন 'ভাই! একি এক সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে ঘূরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে।' তাঁহারা কহিলেন 'সে কিরূপ চড়ক ভাই', তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে এই গান ধরিলেন। যথা ঃ—

"ওরে মন চড়কি, ভ্রমণ কর,
এ ঘোর সংসারে।
মহাযোগেন্দ্র কৌতূকে হাসে,
না চিন তাঁহারে।
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে,
মনরে, ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছি তাহারে। ১
ঘরেতে যুবতীর বাক্,
গাজনে বাজিছে ঢাক,
মনরে, ওরে বৃন্দাবলী, ঘোমটা ঢালি,
বাজায় নানা সুরে॥ ২
কাম দীর্ঘ ভারায় চোড়ে,
ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ,
ধন্যরে তোমারে॥ ৩
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ,
বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে মায়া ডোরে বঁড়শী গাথা,
স্নেহ বল যারে॥ ৪
প্রসাদ বলে বার বার,
অসারে জন্মিবে সার।
মনরে, ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি,
ডাকো কেলে মারে॥"৫

এই প্রেমভক্তি পরিপূরিত পীযূষময় সাধু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোহিত হইলেন। আহা! এই স্থলেই তাঁহারদিগ্যেই সাধু সাধু সাধু বলিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিব, যাঁহারা সাধু সাধক সেনের সুধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধাপান করত তৃপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন, অপিচ কি পরিতাপ! আমরা ঐহিক সুখময় অদ্ভুত ভূতকালে ভূতরূপে উক্ত মহাভূতের অলৌকিক কার্য্য সকল সাক্ষাতে দর্শন করিতে পারি নাই, সেইকাল প্রকৃত সত্যকালের ন্যায় কাল ছিল; যদিও এইকাল সেইকালি বটে, তথাচ এ কালের সহিত সে কালের তুলনা কোন মতেই হইতে পারে না, কারণ একাল কিকাল এবং কোন কালে কোন কালের সঙ্গে এই কালের উপমা হইবে তাহারো নিশ্চয়তা করা দুঃসাধ্য হইতেছে। আমরা যে কালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমাদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে, এই কাল রাঙ্গার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে; সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম্ম কোথা? সে কর্ম্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে চালনা কোথা? সে পাণ্ডিত্য কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে অনুরাগ ও উৎসাহই বা কোথা? স্বাধীনতা সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুল-তিলক ভগবান রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিনা। দ্বারকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকুল প্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহিনা। নবরত্ন সভার [illegible]

বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিবনা, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি। ঐ সময়ে যে, যে, ব্যাপার হইয়াছিল বর্ত্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালঙ্কৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম প্রকাশকারী রবিস্বরূপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর করিতেন, গৌরবপূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধনাঢ্য ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত ও কবিদিগে যথাসাধ্য সম্ভবমত সাহায্য করত সম্যক প্রকারেই অনুরাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই, এইক্ষণেও অনেক সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! কেহই তাঁহার দিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার করা দূরে থাকুক, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে এবং কোন কবি কবিত্ব দর্শাইলে, যত্ন পূর্ব্বক তাহাব মর্ম্ম গ্রহণ করা চুলায় পড়ুক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন। সম্প্রতি দেশ কালপাত্র সকলি সমান হইয়াছে, সুতরাং যথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও গুণীর গৌরব প্রকাশ হইতে পারে না, জগদীশ্বর যাঁহার দিগ্যে ধনি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প মহাশয় ব্যতীত প্রায় তাবতেরি ধনি বলিয়া কেবল এক ধ্বনি মাত্র রহিয়াছে, ধনির কার্য্য প্রায় কাহারও নাই, শুদ্ধ ধনীর কর্ম্মই দেখিতে পাই, শাস্ত্রালাপ একবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে কালহরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক সুকাব্য লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না, মনে বড় উল্লাস হইলে এক-রাত্রি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন, [illegible]ওয়ালা, কেলুয়া, ভুলুয়া, সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ অঙ্গভঙ্গি ও রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল,—

'কেন নকিব ডাকছ আমারে।
আমি হাজির আছি হুজুরে॥
কাঁহে বোলাতোঁ হোঁ।
কেঁই কেঁই কেঁই এং এং এং॥'

বাবুরা এই প্রকার সং রং ঢং দেখিয়াও টং শুনিয়া আহ্লাদে আপনারাই জংবাহাদুর সাজিয়া বসেন, পরে মালিনী আসিয়া গান ধরিল।

* * *
* * *
* * *

এইরূপ গীতে আহ্লাদিত হইয়া পেলা দিবার কত ধূম পড়িয়া যায়।

অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ অনেক সম্ভাবিত সৎকর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া গঙ্গাযাত্রার সময়ে এক সখের যাত্রা করিলেন।

* * *

যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য, অধুনা যেমন সময় তেমনি রসিক ও তেমনি গীত হইয়াছে।

* * *
* * *
* * *

কি করা যায়? সকলি কালের ধর্ম্ম, সকলি কালের কর্ম্ম, এই কালের মর্ম্ম বুঝিয়া যিনি মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য হইলেন। সংপ্রতি সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ছলের বাজার ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোনখানেই একখানা ফলের দোকান দেখিতে পাই না। যেখানে সেখানে কেবল দলের আঁটাআঁটী, বলের আঁটাআঁটী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং হতাদর হইয়া পণ্ডিত ও গুণী লোকেরা আপনারাই অভিমানে মনে মনে ম্লান হইতেছেন। যে দেশের লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না সে-দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে না,

গুণগ্রাহী না থাকিলে গুণের বিচার কে করে? যদি ভাগ্যধরেরা এ পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুরাগী ও মনোযোগী হয়েন তবে এই পরাধীন অবস্থাতেও দেশের এত দুরবস্থা হয় না, অনায়াসেই সর্ব্বতোভাবে সুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে, কর্ত্তারা তাহা না করিয়া মোসাহেব নাম ধারী কতকগুলি চমৎকার চিত্ত অবতারদিগ্যে আদরপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, সেই মা লক্ষ্মীর বরযাত্র মহাপাত্র মহাশয়দিগের মহিমার কথা বর্ণন করিতে হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাঁহারা না পারেন ও না করেন এমন কর্ম্মই নাই! আহা! যখন আমরা কোন ধনির সভায় গমন করিয়া তাঁহার সভাসদ্ ও পারিষদ্ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণ সম্পন্ন দেখিতে পাই তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ কত আহ্লাদে স্ফীত হইতে থাকে, আমরা কত সুখী হইয়া সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি। যদি প্রত্যেক স্থানেই এরূপ দেখিতে পাই তবে আর সুখের পরিসীমা থাকে না, এককালেই দুঃখের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এরূপ সুখের স্থল অতি বিরল। দুই এক স্থানে এতদ্রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল সৎকার্য্যের সৎকার্য্যই দেখিতে পাই। যাহা হউক এই স্থলে এ বিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করেনা, যে এক সদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তাহারি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম, সকলে নয়নান্তপাত করুন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের যদিও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই অবস্থান করিতেন যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব, স্ব, প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্ত্তন কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতা সকল লোক মুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গন্য করিতেন। 'বলা কেন চাটা' নামক একজন কীর্ত্তনওয়ালা রামপ্রসাদি কালীকীর্ত্তন গান করিত, ঐ কেনচাটা একদিন কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে গিয়া কালীকীর্ত্তন গান করিয়া মধু বর্ষন করত সকলের চিত্ত হরণ করিল রাজা সেই গানে পুলকিত হইয়া কীর্ত্তনকারীকে কহিলেন 'বলরাম, এতদিন তোমার নাম কেনচাটা ছিল, এইক্ষণে আমি তোমার নাম মধুচাটা রাখিলাম' এতদ্রূপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরাম কহিল, 'মহারাজ' আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজা হইয়া আমার কেন ঘুচাইয়া দিলেন, 'চাটা টুকু' ঘুচাইতে পারিলেন না।' রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তখনি তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন, পরন্তু নবদ্বীপাধিপতির মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাঁহার অধীন হইয়া নিরন্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই কারণ রামপ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয় বাসনা হইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদ্রূপ প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশহরে স্বয়ং আসিয়া নিজ স্থাপিত কাছারি বাটীতে কিছু দিন বাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন, এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন রাজ কৃপায় কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম 'কবিরঞ্জন' রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল। এজন্য তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনা করে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয় হইয়াছিল তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমন সুন্দর

বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রের রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যে খানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালী কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, পূর্ব্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসায় দ্বারা কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এইক্ষনে ও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে ভিক্ষা করিয়া সমূহ সুখে দিনপাত করিতেছে—তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বোধ করি রামপ্রসাদি পদ অদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ সুরের উপদেশ করে এইক্ষণে এমন লোক কেহই নাই, যদি কোন গুণি ব্যক্তি আপনি রাগ সুর প্রস্তুত করিয়া গান করাইতে পারেন, তবে একটা উত্তম কীর্ত্তি স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।"

বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/০ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে নিষ্কররূপে প্রদান করেন, তাঁহার সনন্দ পত্রে লিখিত আছে "গর আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।" পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, এই ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

শ্রাবণ মাসের পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় অনেকের নিকট হইতে অভিযোগ পত্র আসিয়াছে। সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পত্রিকার গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, যন্ত্রালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ হইতে কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান পর্য্যন্ত সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় এইরূপ বিলম্ব ঘটিয়াছে, আশা করি তজ্জন্য ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। নিঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ।

নিবেদন।

কমলাকান্ত-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি আমি কালীভক্ত কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। রামপ্রসাদী পদাবলীর পরই কমলাকান্তের পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় কমলাকান্তের জীবনীকথা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কেহই আলোচনা করেন নাই। রামপ্রসাদের জীবনী লিখিয়া আজ আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্গবাসীর নিকট, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান-বাসীদের নিকট আমার এই প্রার্থনা তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তাহা হইলে আমার ও বঙ্গভাষার পরমোপকার সাধন করা হইবে। শুনিয়াছি ফরিদপুর খানখানাপুরের ভুলুয়া সন্ন্যাসী ও "পল্লীবাসী" সম্পাদক সাধকের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "পল্লীবাসী" সম্পাদককে আমি এ বিষয়ে চিঠি লিখিয়া কোনই উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ বাঙ্গালী সমাজ যে অনুসন্ধান ব্যাপারে উদাসীন ইহা আমি প্রসাদের জীবনী লিখিবার সময় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। নিরুৎসাহ না হইয়া আমি পুনরায় বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইলাম। আশাকরি এবার মিলিত বাঙ্গালী আমাকে কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি।

Po. Ranchi-Sectt.
Govt. Quarter B/20
Dorenda—(B & O.)

নিবেদক—
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১। কমলাকান্তের জন্মস্থান কালনা কি মাতুলালয় চান্না গ্রামে। এই চান্না গ্রাম খানা-জংসনের নিকটবর্ত্তী।

২। ইনি কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর পিতৃবংশের বংশতালিকা কাহারও জানা থাকিলে লিখিবেন।

৩। ইহাঁর জন্ম সন ও তারিখ জানিবার কোন উপায় আছে কিনা?

৪। ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন? ইহাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল কি না?

৫। স্বর্গীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে কমলাকান্ত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানা কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়া করিয়া রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইবেন। আমি বইখানা দেখিয়া তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইব।

৬। কথিত আছে উক্ত মহারাজা বাহাদুর সাধকের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুস্তক আনাইয়া উহা সংগ্রহ করেন। এই মহিলার কোন আত্মীয় জীবিত আছেন কিনা এবং থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। এই পাণ্ডুলিপি এখন কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

৭। কথিত আছে, কমলাকান্ত 'সাধন পঞ্চক' (ষট্‌চক্র নিরূপণ) নামে একখানা গ্রন্থ (বাংলা পয়ারে) লিখিয়াছিলেন। 'সাধন পঞ্চক' যে কমলাকান্তের রচিত ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা।

৮। কমলাকান্তের কত বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়; বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার কমলাকান্ত নাটিকার ১ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'দামোদরের বেলাভূমিতে তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল।' এই চিতাভূমি এখনও নির্ণয় করা যায় কিনা? এই পুণ্যস্থানে কমলাকান্তের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং সেই সময়ে 'কালী সব ঘুচালি লেঠা' এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী সাধকের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল।

৯। কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোনও অপ্রকাশিত জনশ্রুতি কাহারও জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

১০। অপ্রকাশিত কমলাকান্ত পদাবলী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন।

১১। কমলাকান্তের নামের সহি এবং তাঁহার হাতের লেখা থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন, উহা আমি ব্লক করিয়া ছাপাইব।

১২। সাধকের শেষ সঙ্গীত— 'কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি স্মরণ লব।'

এই পদটীর সম্পূর্ণ অংশ কাহারও জানা থাকিলে আমাকে লিখিবেন।

১৩। কোটাল হাটের কমলাকান্তের গৃহের প্রাঙ্গণে যে স্থানে (তৃণশয্যায়) ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থান এখনও নিরূপণ করা যায় কি না?

১৪। কমলাকান্তের তৈল চিত্র পাইবার কোন উপায় আছে কি না?

১৫। কমলাকান্ত নিজেই কি গানগুলি লিখিয়া রাখিতেন, না অপর কেহ গান গাহিবার সময় লিখিয়া লইতেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

১৬। কাল্‌নায় সাধকের কোন চিহ্ন এখনও আছে কি না?

১৭। চান্নাগ্রামের বিশালাক্ষী দেবী কত কালের; ঐস্থানে যে কমলাকান্ত সাধনা করিতেন ইহার কোনও প্রমাণ আছে কি না?

১৮। বঙ্গসাহিত্যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর (১২৬৪ সাল), ৺শ্রীকান্ত মল্লিক (১২৯২ সাল), 'সাধক সঙ্গীত' রচয়িতা (১৩০৬ সাল) ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহ, 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ সাল) লেখক শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। এই কয়জন ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যিক কমলাকান্তের পদাবলীর আলোচনা করিয়াছেন কি না?

১৯। পদাবলী পড়িয়া মনে হয় কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং দক্ষিণাকালী তাঁহার বীজমন্ত্র ছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

২০। 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায়' স্থান নির্দ্দেশ এখনও করা যায় কি না। এই মাঠ কোথায়? চান্নাগ্রামের নিকট কি?

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 462.

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।
৯০১ সংখ্যা ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা ভাদ্র, রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। মাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

MADRAS HARBOUR.

মান্দ্রাজ বন্দর।

জার্ম্মান রণতরী এমডেন মান্দ্রাজ বন্দরকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে.

পর্তুগীজ বন্দর মারমো গোয়ায় পাঁচখানি জার্ম্মান এবং অষ্ট্রিয় বাণিজ্যপোত আটক পড়িয়াছে।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

উদ্বোধন।

আজ আমরা এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি, সেই বিশ্বপিতা পরমমাতা পরমেশ্বরের নাম গান করিবার জন্য। এমন শুভ অবসর আমরা কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিই? ঘরে অনেক সময় নানা অশান্তি নানা অভাব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে, কিন্তু এই উপাসনামন্দিরে সেই সকল অশান্তি অভাব-অভিযোগের কোন কিছুই মনে আসিতে পারে না— সে সমস্তই তো পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই সমস্ত অন্তত একদিনের জন্য এক ঘণ্টারও জন্য পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আত্মার অন্তরে সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিবার চেষ্টা করিব বলিয়াই তো এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি। ইহা যদি স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের এই শরীরের মধ্যে 'আমি' বলিয়া একজন কর্ত্তা আছে, তাহা হইলেই ইহাও না স্বীকার করিয়া উপায় নাই যে এই ব্রহ্মচক্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ওতপ্রোতরূপে এক বিধাতা পুরুষ আছেন। সেই বিধাতা পুরুষ আছেন বলিয়াই আমরাও আছি। সেই বিশ্ব-বিধাতাকে জানিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহাও কি আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে? এই উপাসনা-মন্দিরে সেই চেষ্টার একটা সুন্দর অবসর পাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? এমন অনেকে আছেন যাঁহারা উপাসনামন্দিরে আসিয়া এই অবসর লাভের ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়া উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজন নাই একথা নিতান্ত বালকের উপযুক্ত কথা।

আরও এক কারণে উপাসনামন্দিরে আসা নিতান্ত আবশ্যক। মনুষের মনে ঈশ্বরকে ধরিবার জন্য, তাঁহাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে। অনেক সময়েই আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাকে নানা বিষয়ের ভাবনায়, নানাবিধ মলিন জঞ্জালে আচ্ছাদিত করিয়া রাখি। তখন সেই আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়া যাই, সেদিকে আর আমাদের দৃষ্টি পড়িতে চাহে না। তখন আর অন্তরে সেই আকাঙ্ক্ষার বিমল ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে একটী কথায়, একটী ইঙ্গিতে, একটী ঘটনায় অন্তরের বীণায় সেই আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সহসা কেমন আশ্চর্য্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। কখন্ কোন্ মানবাত্মার অন্তরে কোন ইঙ্গিতে কোন্ কথায় যে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তাহা কে জানে? এক ফলবিক্রেত্রীর "বেলা চলে যায়" এই একটী কথায় বিষয়াসক্ত সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর জীবনে কি যে আশ্চর্য্য ঝঙ্কার উঠিয়াছিল তাহা কাহার অবিদিত আছে? ক্রৌঞ্চবধের উদ্বেজনার ফলে দস্যু রত্নাকর যে কেমন করিয়া মুনি বাল্মীকিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। উপাসনামন্দিরে যে সকল গান হয়, যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়, সেই সকল

গানের ভিতর উপদেশের ভিতর ঝঙ্কার আনয়নের উপযুক্ত ইঙ্গিত প্রচুর পরিমাণে লুক্কায়িত থাকে। সেই ইঙ্গিত ধরিবার জন্যও ব্রহ্মোপাসনায় সকলের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কখন কোন্ ইঙ্গিত আত্মাতে ঝঙ্কার আনয়ন করিয়া আত্মার দেহ মন ও আত্মার সর্ব্ব-অঙ্গকে তড়িৎ-শক্তিময় করিয়া তুলে।

বিবেকতত্ত্ব।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম্, এ, বি এল্)

ইষ্টানিষ্টাববোধিকা শক্তিহি বিবেকো নাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

বিবেক যদি একটা অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নয় তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত আমাদের একটী নৈতিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় যেহেতু ইন্দ্রিয় না থাকিলে কোনও অনুভূতি আসিতে পারে না। আবার যেমন কোনও কোনও ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব হইলেও আমরা মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকি তদ্রূপ এই নৈতিক ইন্দ্রিয়শক্তির অভাবেও আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হয় না অতএব নীতিজ্ঞান আমাদের মনুষ্যত্বের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নহে আমরা অনুভূতিবাদ স্বীকার করিলে এইরূপ উৎকট সিদ্ধান্তে উপনীত হই; আর নীতিজ্ঞান যে অন্তঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস এই পূর্ব্বাভাসের সহিত এই সিদ্ধান্তের কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা অন্তঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস তাহার উন্মেষের জন্য কোনও বহিঃশক্তির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যদি একটী নৈতিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ঐ উচ্ছ্বাস ঐ নৈতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তির প্রভাবেই আমাদের অন্তঃকরণে উদ্বেলিত হয় এই অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। অধিকন্তু যদি নীতিজ্ঞানের জন্য বিশেষ কোনও ইন্দ্রিয় থাকিত তবে আমরা কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব সম্বন্ধে দেশকালগত পার্থক্য দেখিতে পাইতাম না। যেরূপ ইন্দ্রিয়সকলই বস্তুজ্ঞানের উৎপত্তির মূল হওয়াতে আমাদের পদার্থের স্বরূপজ্ঞান সম্বন্ধে দেশকাল গত পার্থক্য দেখা যায় না, পদার্থের আকৃতি ও বর্ণ প্রভৃতি বিষয়জ্ঞানে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব সম্বন্ধেও কোনও বৈষম্য পরিলক্ষিত হইত না। যাহা শুভ্র যাহা মণ্ডলাকৃতি তত্তদ্ বিষয়ে যেমন কোনও দেশে কোনও কালে মতভেদ নাই, সেইরূপ যাহা ইষ্ট তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্রই এবং সকল সময়েই ইষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে এক যুগে যাহা ইষ্ট ছিল অন্যযুগে তাহা অনিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে যাহা অনিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত আজ তাহা ইষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আবার নীতিজ্ঞান অন্তরের উচ্ছ্বাস হইলে নীতিবিষয়ে আমাদের ভ্রান্তিপ্রমাদ সংশোধনের কোনও উপায় থাকিত না এবং আমরা পাপাচরণ করিয়াও এই কর্ম্ম আমরা অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছাস দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করিয়াছি সুতরাং ইহা নীতি-বিগর্হিত হইতে পারে না মনে করিয়া কখনই পাপের প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হইতে পারিতাম না; কিংবা পাপানুষ্ঠানের পর কখনই আমাদের পশ্চাত্তাপ হইত না; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের জীবনে কত সময়ে কত ভ্রান্তিপ্রমাদ ঘটিতেছে যাহা আমরা পরে যুক্তির বিচারে সংশোধিত করিয়া লই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে যাহা অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস তাহাই নীতির আদর্শ নহে, কেবল অনুভূতিই বিবেক নহে, বিবেক তাহার অনেক উচ্চে অবস্থিত। এজন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শুদ্ধ যুক্তি যাহা আমাদের দৈনন্দিন ভ্রান্তিপ্রমাদ সংশোধন করিয়া দেয় তাহাই বিবেক।

যাঁহারা কোনও নৈতিক ইন্দ্রিয়বিশেষের অনুভূতিকে বিবেক না বলিয়া কেবল শুদ্ধ যুক্তিকেই বিবেক বলেন তাঁহাদের মত এই যে আমাদের প্রকৃতিতেই কতকগুলি নীতিসূত্র আছে যাহা আমরা যুক্তিমূলক বুদ্ধির সাহায্যে অবগত হইতে পারি। এই নীতিসূত্রগুলি নিত্য, অক্ষয়, চিরন্তন, স্থিতিশীল, অত্যাবশ্যকীয় এবং স্বতঃসম্ভূত ও স্বতঃসিদ্ধ। শুদ্ধ যুক্তিমূলক বুদ্ধির বা বিবেকের সাহায্যে আমরা নীতিসূত্রগুলি জানিতে পারি সুতরাং আমাদের নীতিজ্ঞান বিষয়ে ভ্রান্তি হইতে পারে না।

বিবেক অভ্রান্তভাবে নীতিসূত্রগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। যেরূপ আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে কিরূপে কি উপায়ে এবং কোন্ বিষয় দেখিতে বা শুনিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিতে হয় না, তদ্রূপ নীতিসূত্রগুলি কি এবং কি উপায়ে পাইতে হইবে, বিবেককে তাহা বুঝাইয়া দিতে হয় না। এই সূত্রগুলি মানবপ্রকৃতিতেই ওতপ্রোতভাবে লুকায়িত থাকে, বিবেক শুধু এই সূত্রগুলি—এই চিরন্তন তথ্যগুলি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়। এই তথ্যগুলি আমাদের মানসচক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবার পর কোনও একটী কর্ম্ম ইষ্ট কি অনিষ্ট তাহা আমরা দেখিয়া লই এবং যদি কোনও নীতিসূত্রের সহিত ঐ কর্ম্মের সমন্বয় থাকে তবে ঐ কর্ম্ম আমাদের ইষ্ট আর যদি সমন্বয়ের অভাব ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবে উহা অনিষ্ট ও অকার্য্য বলি। এক্ষণে বুঝিতে হইবে—বিবেক যদি সকলকেই অভ্রান্তভাবে নীতিসূত্রগুলি দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে নীতিজগতে এত মতভেদ,—কর্ম্মের ইষ্টানিষ্টত্ব সম্বন্ধে এত মতবৈষম্য হইবার কারণ কি? সকলেরই যদি বিবেক অভ্রান্তভাবে নীতির তথ্য বলিয়া দেয়, তবে যাহা সৎ যাহা ইষ্ট তাহা সকলের নিকটই একরূপ হইবে; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সকলের ইষ্টানিষ্টত্বের বিচার একরূপ নহে। এরূপ হইবার কারণ এই যে যদিও বিবেক সকলকেই একইপ্রকার নীতিসূত্র বলিয়া দেয়, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিষয়বিশেষে সেই সূত্র প্রয়োগ করিবার কৌশল ভেদে বিচারের বৈষম্য হইয়া থাকে। নীতির সাধারণ সূত্রগুলি সকলের নিকটই একইরূপে উদ্ভাসিত হয় বটে কিন্তু উহাদের তাৎপর্য্যগ্রহণে সামর্থ্য ব্যক্তিভেদে বিভিন্নপ্রকার। সূত্রগুলি অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস এবং বিবেকগম্য হইলেও উহাদের তাৎপর্য্যবোধ কাহারও প্রকৃতি-সিদ্ধ নহে—সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে বিষয় বিশেষে সাধারণ সূত্রের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করে, সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নীতিজ্ঞানে এত বৈষম্য। আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া নীতিসূত্রগুলির শুভাশুভত্ব আমরা পর্য্যালোচনা করিতে পারি না—শুভই হউক আর অশুভই হউক সূত্রগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এইটাই উচ্ছ্বাসবাদের দোষ বলিতে হইবে—কারণ সূত্রগুলি স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যুক্তিযুক্ত কি অযৌক্তিক তাহা বিচার না করিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, আবার এই বিচার করিতে হইলে আরও উচ্চস্তরে অবস্থিত একটী আদর্শ দেখিয়া লইতে হইবে যদ্দ্বারা ঐ সূত্রগুলি পরীক্ষা করা যায়। আমরা এই আদর্শটীকে আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধন বা আত্মসম্প্রাপ্তি বলিব এবং যে নীতিসূত্র আত্মার এই চরমোৎকর্ষের পরিপোষক তাহাই যুক্তিমূলক আর যাহা ইহার পরিপন্থী তাহাই অযৌক্তিক বলিব। যে শক্তির প্রভাবে এই আত্মসম্প্রাপ্তির আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাহাকেই বিবেক বলিতে হইবে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধন বা আত্মসম্প্রাপ্তি—যে আদর্শের সাহায্যে আমাদের অন্তরে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত নীতিসূত্রগুলির যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় তাহার প্রকৃতি কি?

আমরা জানি যে জীব যদিও সংসারে জড়িত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকে কিন্তু তাহার আত্মা সংসারের ঊর্দ্ধ্বে অবস্থিত, আত্মার গতি সতত ঊর্দ্ধ্বদিকে আত্মা ব্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মেই লীন হইবার জন্য সতত উদ্গ্রীব। আবার আমরা বলিয়া থাকি যে ব্রহ্মই কেবল সৎ আর সকল বস্তুই অসৎ। তাহা হইলে ব্রহ্মই আমাদের ইষ্টতম, আমাদের ব্রহ্মকেই পাইতে হইবে। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে আমাদের আত্মরূপে উদ্ভাসিত স্বপ্রকাশকে জানিতে হইবে, কারণ আত্মাতে ব্রহ্মকে যেরূপ বিকাশপ্রাপ্ত দেখিতে পাই, অন্য কিছুতেই আমরা তেমন পাই না। এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে এই স্বপ্রকাশকে অবগত হওয়ার নামই আত্মসম্প্রাপ্তি। কেবল অনুভূতির দ্বারা চালিত হইয়া আমরা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি না, কারণ অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র। আবার আমরা অনুভূতিকে ছাড়িতে পারি না, কারণ ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোনও কর্ম্মই করিতে পারি না এবং ইন্দ্রিয় থাকিলেই অনুভূতি থাকি-

বেই থাকিবে। যখন আমরা অনুভূতি ছাড়িতে পারিব না, তখন আমাদের যুক্তির বেদীতে অনুভূতির সংস্কার করিয়া লওয়াই আত্মোৎকর্ষসাধনের একমাত্র উপায়। কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা চালিত না হইয়া যদি আমরা আত্মযুক্তি দ্বারা পরিশোধিত অনুভূতিকে ইষ্টানিষ্টত্ব বিচারের জন্য প্রযুক্ত করি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, ইন্দ্রিয়-সুখাবহ সকল অনুভূতিই আমাদের ইষ্টত্ব-নির্ণয়ের উপায় নহে কিংবা দুঃখময় অনুভূতি মাত্রই আমাদের অনিষ্টত্বের নিরূপক নহে। অতএব যে শক্তির প্রভাবে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াত্মক অনুভূতিকে যুক্তির বেদীতে সংশোধিত করিয়া লইয়া ইষ্টানিষ্টত্ব বিচারের উপায়ীভূত করিয়া লইতে পারি, তাহাকেই বিবেক আখ্যা দিতে হইবে—যাহার নির্দ্দেশে অবস্থিত হইয়া আমরা আত্মার চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, চিন্ময় আত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশকে অন্তরে উপলব্ধ করিতে পারি, আত্মসম্প্রাপ্তির উচ্চতম স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া মানব প্রকৃতির পূর্ণত্ব ও ব্রহ্মসাযুজ্যযোগ্যতা চিদাকাশে চিত্রিত করিয়া লইতে পারি।

বেলা যায়।

বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে
দিবানিশি একা বসি
আঁধার ঘরে
শূন্য হিয়ে।
কবে হবে পূর্ণ আশা
সার্থ হবে ভালবাসা
ভেসে যাবে উছল প্রেমে
হৃদয়-তীরে
জননি হে।
কত লোক তো যায় মা চলে
চায় নাকো কেউ বারেক ফিরে—
পথের ধারে কে কোথা পড়ে।
মরণ-ছোঁয়া কেবা ছেলে—
তারেও তুমি যাও না ভুলে;
তারেও তুমি লও মা তুলে
আদর করে
জননি হে॥

বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী।

(পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী)

(পূর্ব্ব প্রকাশের অনুবৃত্ত)

সারনাথ বা মৃগদাব কাশীনগরী হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে। সংসারাসক্ত মূঢ় নরনারীগণের কোলাহলে উহা মুখরিত নহে। ঐ স্থানটী সদাই শান্তিপূর্ণ। তথায়, ত্যাগী বৌদ্ধ যোগিগণ বাস করিয়া তপস্যা করেন। তথায় বৌদ্ধ নারীকুলের কল্যাণ সাধনার্থ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দাও। এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং তাহার স্থায়িত্ব সম্পাদনে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা বহন করিব। তুমি যখন নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন নারীকুলের কল্যাণ সাধন করাই, নারীকুলের হিতসাধনার্থ জীবন সমর্পণ করাই তোমার উচিত কার্য্য। অতএব তোমার জীবনের অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও অবশিষ্ট আছে। সুতরাং তুমি বনে গেলে চলিবে না। বনে বাস করিলে লোক-সমাজের কিছু উপকার সাধিত হইবে না। তুমি গোপনে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া যে এত শক্তি লাভ করিয়াছ, এত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। সেই জন্যই আমি রাজসভার পণ্ডিতগণের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। মা, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তোমাকে এ বিষয়ে বেশী বলাই বাহুল্য মাত্র। তুমি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত কর। শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন সারনাথেই বাস কর। অন্যত্র কুত্রাপি যাইও না। মহারাজ কৃকীর এই আদেশ শুনিয়া সুশীলা বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা পিতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী মালিনী "তথাস্তু" বলিয়া পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। মহারাজ কৃকী সারনাথে দশ হাজার বৌদ্ধ মহিলা ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি বৃহৎ বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। যথাসময়ে উহা নির্ম্মিত হইল। তিনি সেই সমস্ত ছাত্রীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিলেন। মালিনী পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই মঠে ছাত্রীদের অভিভাবিকা হইয়া

বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বহু অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইল। সুন্দররূপে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। মালিনী অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ধর্ম্মপ্রচার ও দানাদি সৎকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া নারীকুলের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃকীও কন্যার এইরূপ সৎকার্য্যে যথেষ্ট আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। জগতে নারীজীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। কাশীর উপনগর সারনাথ নামক স্থানে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে সুশিক্ষাপ্রার্থিনী সদ্ধর্ম্মাবলম্বিনী বৌদ্ধমহিলারা উক্ত মঠে সমাগত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তিশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কাশীর সারনাথ বৌদ্ধমহিলাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইল। দিন দিন সারনাথের সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। কালের করাল কুক্ষিতে সেই সমৃদ্ধি এক্ষণে বিলীন হইয়া গেলেও আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার দর্পণতুল্য সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ডগুলি,—সেই প্রস্তরময় সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুগুলি অদ্যাপি নূতনবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এবং প্রাচীন সুসভ্যতম দেশ ভারতবর্ষের স্থপতিবিদ্যার অমূল্য উজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হন না, সেই বৃটিশসিংহ ভারতসম্রাটের ভূতপূর্ব্ব মহাপ্রতাপ বিদ্বান প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের কৃপায় সারনাথের ঐ প্রাচীন অবশিষ্ট প্রোথিত গৌরব ভূমিমধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়া এক্ষণে দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। লর্ড কর্জ্জনের আদেশে বহু অর্থ ব্যয়ে ভূগর্ভপ্রোথিত ঐ অট্টালিকাদির অংশগুলি উত্তোলিত হইয়া প্রাসাদসম নবনির্ম্মিত গৃহে সুরক্ষিত হইতেছে এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় স্থাপত্যকৌশল ও ভারতীয় সভ্যতা বিঘোষিত হইতেছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় আজ আমরা আমাদের জিনিষ দেখিতে পাইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি। সেইজন্য ও নানা কারণে ভগবানের নিকটে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেছি যে, ভারতসম্রাটের ভারতসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হউক। আমাদের অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার হউক। অধঃপতিত এই দেশের বিলুপ্ত শ্রী পুনরুদীয়মান হউক। আমাদের কলাবিদ্যাদি যেন পুনরায় উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। হে ভগবন্, তোমার নিকটে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তুমি আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদ অবশ্য সফল হইবে।

কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অদ্বৈত মত প্রচারের প্রায় তিন শত বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব মতের এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই স্রোতে অনেক জৈন এবং শৈব বৈষ্ণব মতের কূলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সকল ঔপনিষদ শ্লোকের উপর শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অদ্বৈত মত স্থাপিত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ সেই সকল শ্লোকের বিভিন্ন ভাষ্য দ্বারা অদ্বৈত মত খণ্ডন এবং বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতমত প্রসিদ্ধ করেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীমৎ রামানুজ স্বামীই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মান্দ্রাজের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম নামক স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে শৈবগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কর্ণাট প্রদেশেই আসিয়া তত্রস্থ প্রসিদ্ধ জৈন রাজা বল্লালকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং মেলকোটা নামক স্থানে তাঁহার মঠ স্থাপন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্যাদি রচনা করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তামিল ভাষাতেই পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামানুচার্য্যের তিরোভাবের প্রায় এক শত বৎসর পরে (খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দে) শ্রীমৎ আনন্দ তীর্থ বা মধ্বাচার্য্য কর্ণাটের উলজী নামক স্থানে তাঁহার দ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। তিনি যদিও স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্যাদি লিখিয়াছেন, তথাপি তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কন্নাড়ভাষা ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন।

বৈষ্ণব সাধুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচনা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঐ সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইঁহারাই দাসকবি নামে উক্ত হয়েন। দাসকবিগণের মধ্যে পুরন্দর দাসই সর্ব্বপ্রাচীন

এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন। তৎপরে বেডর * জাতীয় প্রসিদ্ধ সাধক কনক দাসের নাম উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ভিন্ন বরাহ তিমাপ্পা দাস, বিট্‌ঠল দাস, বেঙ্কট দাস, বিজয় দাস, কৃষ্ণ দাস নামক আরও কয়েক জন দাসকবির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধান দাসকবি পুরন্দর দাস এবং কনক দাসের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রদান করিব।

পুরন্দর দাস।

পুরন্দর দাস সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। অহনাবাদ জেলায় পুরন্দরগড় নামক তালুকে পুরন্দর নামক একজন অতি কৃপণ স্মার্ত্ত (শৈব) ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে কখন কাহাকেও একটি কপর্দক মাত্রও দান করিত না। একদিন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করে। পুরন্দর অদ্য নহে কল্য আসিও, প্রাতে নহে সায়াহ্নে, অদ্য আমার অবকাশ নাই ইত্যাদি নানা মিথ্যা বলিয়া তাহাকে প্রতিদিন ফিরাইয়া দিত। ব্রাহ্মণও কিন্তু কথিত মত সময়ে পুনরায় দর্শন দিত। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে পর একদিন পুরন্দর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া এক মুষ্টি মূল্যহীন কৃত্রিম ধাতব পদার্থ লইয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাহ্মণ তাহা না লইয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পুরন্দরের অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক পুরন্দরপত্নীর নিকট যাইয়া বলিল "আমার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কিছু ভিক্ষা দাও।" পুরন্দরপত্নী "আমার নিকট কিছুই নাই। গৃহস্বামীর নিকট যাও" এইরূপ উত্তর করিল। ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিল "তোমার নাসিকায় যে নথ আছে তাহাই আমাকে প্রদান কর।" পুরন্দরপত্নী "আমার স্বামী কখন কাহাকেও এক কপর্দ্দক দান করেন না, আমি না হয় কিছু দান করি" এইরূপ মনে করিয়া ঐ নথটি খুলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই নথটি লইয়া গিয়া পুরন্দর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল "আমাকে এই নথটি বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ দাও।" পুরন্দর সেই নথটি তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার সন্দেহ করত নথটি পেটী মধ্যে স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে "এখন টাকা নাই সন্ধ্যাকালে আসিয়া লইয়া যাইও" বলিয়া ফিরাইয়া দিল। তৎপরে গৃহে গমন পূর্ব্বক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নথ কোথায় ?" তাহার পত্নী উত্তর করিল "খুলিয়া রাখিয়াছি।" ইহা শুনিয়া পুরন্দর অতিশয় রুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ নথ উপস্থিত করিবার জন্য কঠিন আদেশ করিল। ইহাতে পুরন্দরপত্নী যার পর নাই ভীতা হইয়া বিষপানে জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে যেমন সে বিষপাত্র মুখের নিকট আনিল অমনি তন্মধ্যে সেই নথটি দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ সে সেই নথ আনিয়া স্বামীহস্তে সমর্পণ করিল। পুরন্দর নথ লইয়া দোকানে গমন করিয়া দেখিল পেটী মধ্যে নথ নাই! ইহাতে সে যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পত্নীকে এই নথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। পুরন্দরপত্নী যথাযথ সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। এই ঘটনায় পুরন্দরের মনে পশ্চাৎতাপ আসিয়া ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। পরে সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ ভিক্ষা করিতে করিতে পাণ্ডারপুরে বিটবাদেবমন্দিরের নিকট আসিয়া অবস্থান করিল। তৎপরে তাহার অসাধারণ হরিভক্তি দেখিয়া বিজয়নগরের সম্রাট অচ্যুতরায় তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসে। এই স্থানেই খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে পুরন্দরের মৃত্যু হয়।

পুরন্দর দাস ভক্তিমার্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাহার কবিতা শুনিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হয়। তাহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও মধুর, কবিত্বশক্তিও তদ্রূপ অতুলনীয়। অনুবাদের দ্বারা ইহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। আমরা নিম্নে পুরন্দর দাসের কয়েকটি সঙ্গীত ভাষান্তর করিয়া দিলাম।

তোমরা কে মিছরী নেবে গো,
আমার মিছরী নেবে গো,
(আমার) এ মিছরী কভু হয়নিক,
বলদের পিঠে লাদা, গো,

* এই জাতি যাহার ভিন্ন অপর হিন্দু জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

(আমার) এ মিছরী কভু পড়েনিক
বোরার মধ্যে বাঁধা গো,
(আমার) এ মিছরী কভু ধারেনিক
করের ধার রাজার গো,
তবুও ত সে খেতে মধুর,
লাভের হেতু আমার গো।

লও গো মোর মিছরী সবে
এ যে, বড়ই মধুর গো,
যেই খেয়েছে সেই বলেছে
ইহার তুল্য নাইক গো,
(আমার) বিষ্ণু নামের খাঁটি মালের
কোথাও তুল্য নাইক গো।

এ যে, সময়ে হয় না নষ্ট
বয় না মন্দ গন্ধ গো,
(আমার) এ মিছরী দিব বিনামূল্যে
যতই তোমরা চাবে গো,
(আমার) এ মিছরী কভু খেতে নারে
মিছরী খেকো পিপড়ে গো,
(আমার) এ মিছরী যশে ঘোষে লোকে
সকল সহরময় গো।

লও গো মোর মিছরী সবে
এ যে বড়ই মধুর গো,
যেই খেয়েছে সেই বলেছে
ইহার তুল্য নাইক গো,
(আমার) বিষ্ণু নামের খাঁটি মালের
কোথাও তুল্য নাইক গো।

ওগো বাজারে বাজারে ঘুরি
বল কিবা প্রয়োজন গো,
(আমার) মিছরী নাহি বিকয় বেনে
এ যে, হাটে নাহি যায় গো,
(আমার) মিছরী খেতে এতই ভাল
যে রসনা বাখানে গো,
(আমার) মিছরী নিয়ে বারেক দেখ,
এ বিষ্ণু নামের কন্দ গো।

লও গো মোর মিছরী সবে
এ যে বড়ই মধুর গো,
যেই খেয়েছে সেই বলেছে
ইহার তুল্য নাইক গো,
(আমার) বিষ্ণু নামের খাঁটি মালের
কোথাও তুল্য নাইক গো ॥ ১

শুন গো ভগিনী ওগো, শুন মোর বাণী,
খাঁচা ছেড়ে চলে গেছে (মোর) তোতা গুণমণি।
যতনে পুষিনু তায়, শুন গো ভগিনী হায়,
মার্জ্জারে ধরিল তারে, মম অবসাদ গণি।
(আমার) ভালবাসার তোতাপাখী, সতত সাজায়ে রাখি,
মুক্তার শৃঙ্খলে তারে, কোথায় গেল জানিনি।
(ওগো) সজ্জা রঙ্গা তোতা মোর, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তোর,
ফাঁকি দিয়ে উড়ে যাবি, এমন কভু ভাবিনি।
যতনে পালিনু আমি, খাইয়ে তারে নবনী,
উড়ে গেল আচম্বিতে, হাত হতে গো ভগিনী।
প্রাণ খুলে রাম রাম, বল্‌তো সে যে অবিরাম,
তোতা মোর কোমল কায়, ডাকতে কভু ভুলেনি।
(আমার) তোতা ছিল ভিতর ঘরে, নবদ্বার বন্ধ করে,
উড়ে গেল পিঞ্জে ভেঙ্গে, আকাশ পানে এখনি।
খেলিত কমল করে, বস্‌তো মণিবন্ধ পরে,
পুরন্দরের অন্তরঙ্গ, কোথা গেল তোতামণি ॥ ২ ॥

আয়রে ভাই সবে মিলে, মুক্তা নিবি আয়।
সচ্চিদানন্দ রূপ মুক্তা, এনেছি হেথায় ॥
মুক্তা আমার জ্ঞানের সূতায় বাঁধা,
এ যে অমূল্য ধন, মূল্য দিয়ে ভক্তে কেনে সদা,
আয়রে সব ত্বরা করে, কে আছে কোথায় ॥
মুক্তা আমার কভু, রয়না নাকে বাঁধা,
এ যে অমূল্য ধন, থাকেনাক অলঙ্কারে গাঁথা,
কৃষ্ণ নামের মুক্তা মোর, সহজে বিকায় ॥
মুক্তা আমার কেহ ধরিতে না পারে,
এ যে অমূল্য ধন, মূল্য এর নাহিক সংসারে,
পুরন্দরের মহা রত্ন, প্রভু দেবরায় ॥ ৩ ॥

জীবনের কিবা কাজ, যদি না ভজয় হরি।
রসনার কিবা কাজ, যদি না বলয় হরি ॥
ব্রাহ্মণের কিবা কাজ যদি নাহি জানে বেদ।
ক্ষত্রিয়ের কিবা কাজ, যে না জানে ধনুর্ব্বেদ।

সন্ন্যাসের কিবা কাজ যেবা নাহি ছাড়ে রোষ।
ভোজনের কিবা কাজ, বিনা বচন সন্তোষ।
পূজনের কিবা কাজ, বিনা সত্য চিত্তশুদ্ধি।
জপতপে কিবা কাজ, যদি না করে নিত্যসিদ্ধি।
হরিপূজা কিবা কাজ, যদি নাহি একমন।
মন্দিরের কিবা কাজ, বিনা পূজারী উত্তম।
সন্তানের কিবা কাজ, বিনা পিতৃমাতৃস্তুতি।
পুত্রবধূ কিবা কাজ, বিনা শ্বশ্রূ-সেবা-বৃত্তি।
সোদরের কিবা কাজ, যার নাহি ন্যায়জ্ঞান।
নাথকের * কিবা কাজ বিনা ক্রোধ সমাধান।
সন্তানের কিবা কাজ, যেবা মরে বাল্যকালে।
গুরুর কিবা কাজ যদি, নাহি উপদেশ দিলে।
নয়নের কিবা কাজ, নাহি দেখে প্রাণ ভরি।
বিট্‌ঠল নলিনীনাভ, রঙ্গ পুরন্দরের হরি ॥ ৪ ॥

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

সপ্তম প্রকরণ।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাক; কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের অভ্যাস আজকাল প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত এই প্রস্তাবনা করা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে কাপিল সাংখ্য-শাস্ত্রের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি কি তাহা দেখা যাক্। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, এই জগতে নূতন কিছুই উৎপন্ন হয় না; কারণ, শূন্য অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিলই না তাহা হইতে শূন্য ছাড়া অন্য কিছুই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ কার্য্যের মধ্যে যে গুণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা, যাহা হইতে উক্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে অর্থাৎ কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম আকারে অবশ্যই ছিল, এইরূপ নিয়ত বুঝিতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাণাদ ইহাঁদের মতে, এক পদার্থের নাশ হইয়া তাহা হইতে অন্য নূতন পদার্থ প্রস্তুত হয়; উদাহরণ যথা—বীজের নাশ হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের নাশ হইয়া তাহা হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রী ও বেদান্তী ইঁহারা এ মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই-রূপ প্রতিপাদন করেন যে, বৃক্ষের বীজ হইতে যে দ্রব্য হয় তাহা বিনষ্ট না হইয়া তাহাই ভূমি হইতে ও বায়ু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লওয়া প্রযুক্ত অঙ্কুর এই নূতন রূপ কিংবা অবস্থা প্রাপ্ত হয় (বেসূ, শাভা, ২, ১, ২৮ দেখ)। সেইরূপ কাঠ জ্বলিলে তাহারই ছাই কিংবা ধোঁয়া ইত্যাদি রূপান্তর হয়; কাঠের দ্রব্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া ধূম এই নূতন পদার্থ হয় না। "কথমসতঃ সজ্জায়েত"—যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কি করিয়া উৎপন্ন হইবে—এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাং, ৬, ২, ২)। জগতের মূল কারণের প্রতি কথন কথন 'অসৎ' এই শব্দ প্রযুক্ত হয় (ছাং ৩, ১৯, ১; তৈ, ২, ৭, ১); কিন্তু তাহার 'অভাব = নাই' এরূপ অর্থ না করিয়া নামরূপাত্মক ব্যক্ত স্বরূপের কিংবা অবস্থার অভাব ইহাই বিবক্ষিত হইয়া থাকে, এইরূপ বেদান্তসূত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে (বেসূ, ২, ১, ১৬, ১৭)। দুগ্ধ হইতেই দধি হয়, জল হইতে হয় না; তিল হইতে তৈল বাহির হয়, বালুকা হইতে বাহির হয় না; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই এই সিদ্ধান্ত বাহির করিতে হয়। কারণের মধ্যে না থাকা গুণ কার্য্যের মধ্যে স্বতন্ত্র উৎপন্ন হয় এইরূপ যদি স্বীকার করা যায়, তবে জল হইতে দধি কেন হয় না, ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না। সার কথা—যাহা মূলেতে নাই, তাহা হইতে—যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। তাই, যে কোন কার্য্য ধর না কেন, তাহার এখনকার দ্রব্যাংশ ও গুণ মূল কার-ণেই কোন না কোন আকারে থাকা চাই এইরূপ সাংখ্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তেরই নাম 'সৎকার্য্যবাদ'। পদার্থসমূহের জড়দ্রব্য ও কর্ম্মশক্তি চিরস্থায়ী এবং কোন পদার্থের যতই রূপান্তর হোক্ না কেন, শেষে সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমগ্র দ্রব্যাংশের ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রীরাও স্থির করিয়াছেন। উদাহরণ

* 'নাথ' সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী।

যথা—দীপ জ্বলিয়া তৈল বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু একেবারে বিনষ্ট না হইয়া কাজল, ধোঁয়া কিংবা অন্য সূক্ষ্ম দ্রব্যের আকারে উহার অস্তিত্ব থাকে; এবং এই সূক্ষ্ম দ্রব্যসকল একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা এবং তৈল পুড়িবার সময় তাহার সহিত মিশ্রিত হয় যে বায়ু-স্থিত পদার্থ—এই দুয়ের ওজন সমান হইয়া থাকে; এবং এই নিয়ম কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়, ইহা এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রের ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত, এই দুই দেখিতে এক হইলেও সাংখ্যগণের সিদ্ধান্ত এক-পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হওয়া এই একটি বিষয়েরই—অর্থাৎ বিশেষ করিয়া কার্য্যকারণভাবে-রই—বর্ণনা হওয়ায়, অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক ব্যাপক, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কার্য্যের কোন গুণই কারণ বহির্ভূত গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না শুধু নহে, কারণগুলি কার্য্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই কার্য্যের দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির একটুও নাশ না হইয়া পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ একই থাকে. বাড়েও না কমেও না, এইরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা, গণিত-পদ্ধতি অনুসারে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে ইহাই গুরুতর বিশেষত্ব। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে ভগবদ্‌গীতায় "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ"—যাহা মূলে নাই তাহা কখনই অস্তিত্বে আসিতে পারে না—ইত্যাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ২. ১৬), তাহা সৎকার্য্যবাদের মতো দেখিতে হইলেও, নিছক কার্য্যাকারণাত্মক সৎকার্য্যবাদ অপেক্ষা, অর্ব্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত উহার অধিক সাম্য আছে এইরূপ দেখা যায়। উপরে প্রদত্ত ছান্দোগ্য-উপনিষদের বচনের ভাবার্থও তাহাই। সার কথা—সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত বেদান্তীরা স্বীকার করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত, সগুণ সৃষ্টির বাহিরে খাটে না। নির্গুণ হইতে উৎপন্ন সগুণ কিরূপ দেখায় ইহার উপপত্তি বিভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করা আবশ্যক এইরূপ অদ্বৈত বেদান্ত-শাস্ত্রের মত। এই বেদান্ত মতের বিচার পরে অধ্যাত্মপ্রকরণে বিস্তৃতভাবে করা যাইবে। আপাততঃ, সাংখ্য মতবাদের দৌড় কোন পর্য্যন্ত তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য হওয়ায় সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে মানিয়া লইয়া ক্ষরাক্ষর শাস্ত্রে সাংখ্যেরা তাহার কিরূপ উপযোগ করিয়াছে ইহার বিচার করিব।

সাংখ্যমতানুসারে এই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইলে পর, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন পদার্থই ছিল না, উহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়া-ছিল—এই মতটি আপনা-আপনিই খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, শূন্য অর্থে—নাই বুঝায়; এবং যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং জগৎ কোন-না-কোন পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়া থাকিবে এবং এক্ষণে জগতের মধ্যে যে গুণ দেখিতে পাই সেই গুণও এই মূল-পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে, তাহার মধ্যে বৃক্ষ, পশু, প্রস্তর, সোনা, রূপা, হিরা, জলবায়ু প্রভৃতি অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। এবং তাহাদের রূপ ও গুণও বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা কিংবা নানাত্ব চিরস্থায়ী কিংবা মূলগত নহে, সমস্ত পদার্থের মূল-বস্তু একই;—এইরূপ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত। অর্ব্বাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞানী বিভিন্ন দ্রব্যের পৃথক্‌করণ করিয়া প্রথমে ৬২ মূল তত্ত্ব বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ৬২ তত্ত্বও চির-স্থায়ী না হওয়ায়, মূলে একটি কোন পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থ হইতেই সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথ্বী প্রভৃতি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ পাশ্চাত্য পদার্থশাস্ত্রবেত্তারাও এক্ষণে স্থির করায় এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই। জগতের অন্তর্ভূত সমস্ত পদার্থের এই যে মূলীভূত বস্তু তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রকৃতি' বলে। প্রকৃতির অর্থ 'মূলের' এইরূপ হওয়ায়, এই প্রকৃতি হইতে পরে যে সকল পদার্থ হইয়াছে তাহাকে 'বিকৃতি' কিংবা মূলীভূত বস্তুর বিকার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত পদার্থের মধ্যে বস্তু যদি একই হয়, এবং এই বস্তুর মধ্যে গুণও যদি একই হয়, তবে

সৎকার্য্যবাদ-অনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ বাহির হইতে পারে না; এবং পাথর মাটি, জল, সোণা ইত্যাদি জগতের বিভিন্ন পদার্থ দেখিলে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন অনেক গুণ আছে, এইরূপ চোখে পড়ে। তাই পদার্থমাত্রের গুণ প্রথমে নিরীক্ষণ করিয়া,সাংখ্যেরা সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন বর্গ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কারণ, যে কোন পদার্থ ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নির্ম্মল কিংবা পূর্ণাবস্থা এবং তদ্বিরুদ্ধ নিকৃষ্টাবস্থা এইরূপ দুই ভেদ স্বভাবতই আছে এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার দিকে উন্নতি হইবারও তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ নজরে পড়ে। এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধাবস্থাকে সাত্ত্বিক, নিকৃষ্টাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্ত্তক অবস্থাকে রাজসিক এইরূপ বিশেষণ দিয়া, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মূলীভূত বস্তুর মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রারম্ভ হইতেই আছে এইরূপ সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন। অধিক-কি, এই তিন গুণই প্রকৃতি, এইরূপ বলিলেও চলে। এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরম্ভে একইরূপ হওয়ায় প্রথমতঃ প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় থাকেন। এই সাম্যাবস্থা জগতের আরম্ভে হইয়াছিল এবং জগতের লয় হইলে পুনর্ব্বার হইবে। সাম্যাবস্থাতে কোন নড়াচড়া নাই; সমস্ত স্তব্ধ থাকে। কিন্তু পরে এই তিন গুণ কম বেশী হইতে আরম্ভ করিলে, প্রবৃত্ত্যাত্মক রজো গুণের দরুণ, মূল প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিয়া তাহার মধ্যে ন্যূনাধিক্য কিরূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ এই সময় এক সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সাংখ্যেরা তাহার উত্তরে এই বলেন যে, ইহা প্রকৃতিশরীরের মূল ধর্ম্ম (সাং. বা. ৬১)। প্রকৃতি জড় হইলেও, আমরা জন্মিলেই তিনি এই সমস্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বের গুণ জ্ঞাতৃত্ব, তমের ধর্ম্ম অজ্ঞান এবং রজোগুণ প্রবর্ত্তক অর্থাৎ উহা ভালমন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই তিন গুণই কখনই পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত পদার্থের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণেরই মিশ্রণ আছে; এবং এই মিশ্রণ নিয়তই তিনের অন্যোন্যন্যূনাধিক্য অনুসারে হয় বলিয়া মূলবস্তু এক হইলেও গুণভেদে এক মূল বস্তুরই সোণা, লোহা, মাটি, আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি বিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে। যাহাকে আমরা সাত্ত্বিক গুণের পদার্থ বলি, তাহার মধ্যে রজঃ ও তম এই দুই গুণ অপেক্ষা সত্ত্বের বল কিয়ৎ পরিমাণ অধিক থাকায়, তাহার মধ্যে যে রজঃ ও তম সর্ব্বদাই থাকে, তাহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাই আমাদের চোখে পড়ে না এইমাত্র। বস্তুত দেখিতে গেলে, সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণই অন্য পদার্থের ন্যায় সাত্ত্বিক পদার্থের মধ্যেও আছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে; নিছক্ সত্ত্বগুণী, নিছক্ রজোগুণী, কিংবা নিছক্ তমোগুণী এরূপ পদার্থই নাই। প্রত্যেক পদার্থে তিন গুণই সবেগে চলিয়া থাকে এবং এই চাঞ্চল্যের মধ্যে যেগুণ প্রবল হয় সেই অনুসারে প্রত্যেক পদার্থ সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি (সাং। কা। ১২; সভা। অশ্ব।—অনুগীতা—৩৬ ও শাং ৩০৫ দেখ)। উদাহরণ যথা—আমাদের শরীরের মধ্যে রজ ও তম এই দুয়ের উপর সত্ত্বের প্রাধান্য হইলে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সত্য কি, তাহা আমরা জানিতে পারি, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়। এই সময়ে শরীরের মধ্যে রজ ও তম একেবারেই থাকে না এরূপ নহে; তবে কিনা, তাহা দমিয়া থাকায় সজোরে চলে না (গী. ১৪. ১০)। সত্ত্বের বদলে রজোগুণ যদি প্রবল হয় তখন মনুষ্যের শরীরের মধ্যে লোভ জাগ্রত হইয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় এবং সে অনেক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেইরূপ সত্ত্ব ও রজ এই দুয়ের উপর তমের প্রাধান্য হইলে, নিদ্রা, আলস্য, স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীরের মধ্যে উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য, জাগতিক পদার্থের মধ্যে সোনা লোহা পারা ইত্যাদি যে নানাত্ব আছে তাহা প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের পরস্পর চাঞ্চল্যের কিংবা ন্যূনাধিকপরিমাণের ফল। মূল প্রকৃতি এক হইলেও এই নানাত্ব কিরূপে উৎপন্ন হয় ইহার যে বিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। এবং ইহার মধ্যেই সমস্ত আধিভৌতিকশাস্ত্রের সমাবেশ। উদাহরণ যথা—রসায়নশাস্ত্র, বিদ্যুৎশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্র এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান।

সাম্যাবস্থার এই মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ায়, তদন্তর্ভূত সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের পরস্পরবিক্ষোভ হইতে উৎপন্ন যে অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় অর্থাৎ যাহা আমরা দেখি, শুনি, আস্বাদন করি, আঘ্রাণ করি বা স্পর্শ করি, সাংখ্যশাস্ত্রে তাহার নাম—'ব্যক্ত'। ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ; পরে তাহা আকৃতির দ্বারা কিংবা রূপের দ্বারা, গন্ধের দ্বারা কিংবা অন্য কোন গুণের দ্বারা ব্যক্ত হয়। ব্যক্তপদার্থ অনেক হওয়ায় তন্মধ্যে গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল; আবার মন, বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রিয়গোচর অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মের অর্থ এস্থলে ক্ষুদ্র নহে; কারণ, আকাশ সূক্ষ্ম হইয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই, সূক্ষ্ম অর্থে স্থূলের বিপরীত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দুই শব্দের দ্বারা কোন্ বস্তুর শরীরগঠন কিরূপ তাহাই বুঝায়; এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই শব্দের দ্বারা, উক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, ইহাই প্রদর্শিত হয়। তাই, দুই বিভিন্ন পদার্থ উভয়ই সূক্ষ্ম হইলেও তন্মধ্যে একটি ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—বায়ু সূক্ষ্ম হইলেও, স্পর্শেন্দ্রিয় তাহা জানিতে পারে বলিয়া তাহাকে ব্যক্ত বলিয়া মনে করা হয়, এবং সমস্ত পদার্থের মূলবস্তু যে প্রকৃতি তাহা বায়ু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়া প্রযুক্ত, কোন ইন্দ্রিয়ই তাহাকে জানিতে পারে না, অতএব প্রকৃতি অব্যক্ত। প্রকৃতি যদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর না হয় তবে, প্রকৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু অনেক ব্যক্ত পদার্থের অবলোকন হইতে সৎকার্য্যবাদ অনুসারে, সেই সমস্তের মূলরূপটি, ইন্দ্রিয় সমক্ষে প্রতিভাত না হইলেও সূক্ষ্মরূপে তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকিবে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়,—এইরূপ সাংখ্যদের এই প্রশ্নের উত্তর (সাং, কা. ৮); এবং বেদান্তীরা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সময়, এই যুক্তিক্রমই স্বীকার করিয়াছেন (কঠ, ৬, ১২, ১৩ উহার শাঙ্কর-ভাষ্য দেখ)। প্রকৃতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত এইরূপ স্বীকার করিলে, নৈয়ায়িকদিগের পরমাণুবাদ আপনা আপনিই খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ, পরমাণু অব্যক্ত ও অসংখ্য হইলেও, এক এক পরমাণু স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিংবা অবয়ব হওয়াপ্রযুক্ত দুই পরমাণুর মধ্যে কি পদার্থ আছে, এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া যায়। এইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতির মধ্যে পরমাণুরূপ অবয়বভেদ না থাকায়, উহা সর্ব্বদাই একসংলগ্ন কিংবা একই প্রকার অথবা মধ্যে একটুও খণ্ডিত না হইয়া অব্যক্ত রূপে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ও নিরবয়বরূপে নিরন্তর সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরব্রহ্মের বর্ণনা করিবার সময় দাসবোধের মধ্যে (দা, ২০, ২, ৩) শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী এইরূপ বলেন যে,—

জিকড়ে পহাবে তিকড়ে অপার।
কোনীকড়ে নাহি পার ॥
এক জিনসী স্বতন্ত্র। দুসরে নাহী ॥

অর্থাৎ—যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অসীম, কোন দিকেই সীমা নাই; একমাত্র বস্তু স্বতন্ত্র, অন্য কিছুই নাই। এইরূপ বর্ণনা সাংখ্যদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বয়ম্ভূ, একবস্তু হওয়ায় চারিদিকে নিরন্তর নিবিড়ভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আকাশ, বায়ু এই ভেদ পরে হইয়াছে এবং তাহা সূক্ষ্ম হইলেও ব্যক্ত; এই সমস্তের মূলীভূত যে প্রকৃতি তাহা একমাত্র বস্তু ও সর্ব্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত অব্যক্ত। তথাপি বেদান্তীদিগের পরব্রহ্মের মধ্যে ও সাংখ্যদিগের প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কারণ, পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপী নির্গুণ, আর প্রকৃতি জড়রূপী ও সত্ত্বরজস্তমোময়ী অর্থাৎ সগুণ। কিন্তু এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে করা যাইবে। এক্ষণে, সাংখ্যদিগের মত কি, ইহাই আমাদের আলোচ্য। সূক্ষ্ম ও স্থূল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহাদের এইরূপ অর্থ করিলে পর, সৃষ্টির মূলারম্ভে প্রত্যেক পদার্থ সূক্ষ্ম কি অব্যক্ত প্রকৃতির রূপে থাকিয়া, তাহার পর (স্থূল হোক্ বা সূক্ষ্মই হোক্) ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে এই ব্যক্তরূপের নাশ হইলে অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়া গিয়া পুনর্ব্বার অব্যক্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ বলিতে হয়; গীতাতেও এই মতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে (গী, ২, ২৮ ও ৮, ১৮ দেখ)

এই অব্যক্ত প্রকৃতিকে 'অক্ষর', এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে 'ক্ষর' এইরূপ সাংখ্যেরা দ্বিতীয় সংজ্ঞা দিয়াছেন। ক্ষর-অর্থাৎ একেবারে যাহা নষ্ট হয় এইরূপ অর্থে গৃহীত হইবে না, শুধু ব্যক্ত রূপের নাশ এই অর্থই এস্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিনী, বহুধানক, প্রসবধর্ম্মিণী, এইরূপ প্রকৃতির অন্য নামও আছে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মুখ্য মূল, অতএব প্রধান—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া গুণক্ষোভিনী, গুণত্রয়রূপী পদার্থভেদের বীজ তাহাতে আছে বলিয়া বহুধানক, এবং ইহা হইতে সমস্ত পদার্থ প্রসূত হয় কিংবা উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রসবধর্ম্মিণী, প্রকৃতির এই সকল নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতিই মায়া অর্থাৎ মায়িক অবভাস এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমস্ত পদার্থের, 'ব্যক্ত' কিংবা 'অব্যক্ত' কিংবা 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' এইরূপ দুই ভেদ হইলে পর, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে কথিত আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি ইহাদের কোন্‌টিকে কোন্ বিভাগে ফেলিতে হইবে ইহার পরে এই কথা আসিতেছে। ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিয়াদি—ইহারা জড় হওয়া প্রযুক্ত, ব্যক্তের মধ্যে ইহাদের সমাবেশ হয়; কিন্তু মন, অহঙ্কার বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা ইহাদের কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে? য়ুরোপ খণ্ডের আধুনিককালের প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ হেকেল আপন গ্রন্থে এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও আত্মা এ সমস্ত শারীরধর্ম্ম। মনুষ্যের মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া গেলে তাহার স্মরণশক্তি লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রস্ত হয়—ইহা আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের কোন অংশ অসাড় হইয়া গেলেও সেই অংশের মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধর্ম্ম ও আত্মাকে 'ব্যক্ত' এই বিভাগের মধ্যে ফেলা আবশ্যক। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, অব্যক্ত ও জড় প্রকৃতি ইহাদের সম্বন্ধে কি হইবে তাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ এই মূলের অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি ব্যতীত জগতের কর্ত্তা বা উৎপাদক আর কেহই নাই। মূল প্রকৃতির শক্তি বাড়িতে বাড়িতেই তাহাতে চৈতন্য কিংবা আত্মা আসিয়াছে। সৎকার্য্যবাদের ন্যায় এই মূল প্রকৃতির নিয়ম স্থির করা হইয়াছে; এবং তদনুসারে সমস্ত জগৎ ও তার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যও এই নিয়মানুসারে চলিতেছে। আত্মা বলিয়া পৃথক্ পদার্থ নাই শুধু নহে, উহা অবিনাশীও নহে, স্বতন্ত্রও নহে; তবে মোক্ষ কোথা হইতে আসিবে? আমার ইচ্ছানুসারে আমি অমুক কর্ম্ম করিব এইরূপ প্রত্যেকে যে মনে করে তাহা নিছক্ ভ্রম। প্রকৃতি তাহাকে যে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে হইবে। সার কথা—৺ শঙ্করমোরো রানডে কলহপুরী নাটকের আরম্ভের ধ্রুপদে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে—

বিশ্ব সর্ব হেঁ তুরুঙ্গ মোঠা প্রাণীমাত্র কৈদী।
পদার্থধর্ম্মাঞ্চিয়া শৃঙ্খলা ত্যাঁতেঁ কোণি ন ভেদী॥

অর্থাৎ—এই সমস্ত বিশ্ব এক বৃহৎ কারাগার, প্রাণীমাত্রই কয়েদী তাহাতে পদার্থধর্ম্মের যে শৃঙ্খল রহিয়াছে তাহাতে কোন ভেদ নাই এইরূপ সমস্ত সজীব ও নির্জীব সৃষ্টির ব্যবহার চলিতেছে, ইহাই হেকেলের মত এবং একমাত্র জড় ও অব্যক্ত প্রকৃতিই সমস্ত সৃষ্টির মূল হওয়া প্রযুক্ত হেকেল আপন মতের নাম দিয়াছেন—'অদ্বৈত'! কিন্তু এই অদ্বৈত জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হয় বলিয়া আমি উহাকে জড়াদ্বৈত কিংবা আধিভৌতিকশাস্ত্রাদ্বৈত বলি।

(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বহুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী সওদাগরগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত সমুদ্রগামী পোত লইয়া বঙ্গোপসাগর এবং আরব সমুদ্রের তীরস্থ নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত, এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। একসময় দারুনির্ম্মিত অর্ণবপোত সুদূর ইংলণ্ডেও উপস্থিত হইয়াছিল। আজ কাল আমাদের দেশে কাষ্ঠতরীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। অনেক দিনের

কথা নহে, আমাদের বাল্যকালে, আমরা শত শত ছোট বড় নৌকা ভাগিরথী, গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, রূপনারায়ণ, প্রভৃতি নদীবক্ষে যাতায়াত করিতে দেখিতাম। এক্ষণে তাহার শতকরা পাঁচখানিও বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। যে সরস্বতী নদীর বক্ষ দিয়া এক দিন বড় বড় কাষ্ঠনির্ম্মিত জাহাজ অবাধে যাতায়াত করিত, যে নদীবক্ষে তরী ভাসাইয়া শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহলবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থল আজ ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যে ঘরঘরা নদীর নাম লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহার গর্ভ খোদিত করিয়া, অনেক দিনের কথা নহে, কাষ্ঠ জাহাজের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, আজ সেই ঘরঘরার চিহ্ন মাত্রও নাই। কেবল একস্থানে অতি সামান্য অংশ মাত্র ঘুঁঘির খাল নামে বিদিত আছে। কিন্তু সেই এক দিন আর এই এক দিন। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সমুদায় অনিত্য সৃষ্ট পদার্থই এইরূপ নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই নিত্য সত্যকে আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক করিয়া দিতেছে।

যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ বাণিজ্যকারণ এক দেশের লোক অপর দেশে যাতায়াত করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের হেতুস্বরূপ হয়। বাঙ্গালী জাতি দ্বারা যে এইরূপ বাণিজ্য-সংক্রান্ত দেশভ্রমণের জন্য কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই ইহা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয় যদি কোন Research Scholar এ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সময়ে অনেক তথ্য প্রকাশ হইতে পারে। মান্দ্রাজের চিংগলিপট জেলার সেণ্ট টমাস মাউণ্টের (St Thomas Mount) "বাঙ্গালী বাজার" এক সময় একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একটি বিশিষ্ট বাঙ্গালী উপনিবেশের বিষয় পাঠকগণের গোচর করিব। এই উপনিবেশের লোক সংখ্যা প্রায় ১০ সহস্র, তন্মধ্যে প্রায় ৫০০০ পুরুষ এবং ৫০০০ স্ত্রীলোক। সুতরাং এতগুলি বাঙ্গালী সন্তান সন্ততির বিষয় বঙ্গবাসীদিগের অজ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য নহে। এই সম্প্রদায়ের নাম গৌড়-সারস্বত-সম্প্রদায়। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ।

ইঁহারা পূর্ব্বে গোয়া (Goa) অঞ্চলে বাস করিতেন। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক গোয়া অধিকৃত হইবার পরে তত্রস্থ অধিবাসীগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হয়। অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পায়, এবং অনেকে বা দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে প্রায় সমগ্র গৌড়-সারস্বত-সম্প্রদায় পলায়ন করিয়া, সমুদ্র তীরস্থ কারবার, (Karwar) আঙ্কোলা (Ankola), মাঙ্গালোর এবং হলিয়াল, (Haliyal), সূপা (Supa), সির্সি (Sirsi) প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক্ষণে ঐ সকল স্থানেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বাস করিতেছে। অতি অল্প সংখ্যক লোক পুনরায় গোয়ারাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তথায় বসবাস করিতেছে।

উত্তর কারবার জেলার (Gazetteer) গেজেটিয়রে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

According to tradition the founders of the caste called Sharmas were brought with their family god and goddess by Parashuram the sixth incarnation of Vishnu, from Trihotra, the modern Trihut in Bengal to help him in performing ceremonies in honour of his amcestors.

এখানে পরশুরামকে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণপাঠে আমরা অবগত হই যে পরশুরাম, অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বিবাহের পর মিথিলানিবাসী রাজা জনকের ভবন হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অতএব পরশুরাম সম্ভবতঃ অযোধ্যা এবং মিথিলার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন। রামচন্দ্রের বিবাহের পর পরশুরামের কোন অস্তিত্ব

ছিল কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু এই সম্প্রদায়ের নাম গৌড়সারস্বত। শ্রীরামচন্দ্র এবং পরশুরামের সময় বঙ্গদেশের নাম গৌড় ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব আমার বোধ হয় গেজেটিয়র লিখিত পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার নহেন। তিনি তৎকালীন গোয়ারাজ্যের রাজা ছিলেন।

এই রাজা পরশুরাম বঙ্গদেশবাসী বাণিজ্যকারী বণিকগণের নিকট বঙ্গদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের হিতার্থে তিনি যে মহাযজ্ঞের অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন তৎ সম্পাদনার্থ কয়েক জন শর্ম্মা বা দেবশর্ম্মা উপাধিযুক্ত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান গৌড়সারস্বতদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

গেজেটিয়রে লিখিত হইয়াছে যে উক্ত ব্রাহ্মণগণ ত্রিহোত্র—বর্ত্তমান ত্রিহুত জেলা হইতে আসিয়া ছিলেন। আমার মতে ইহাও ঠিক নহে। গৌড় সারস্বত জাতীয় নরনারীর আকৃতি ত্রিহুত জেলার লোক অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণগণের আকৃতির সহিত অধিক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু গৌড় সারস্বত নরনারীর উচ্চারণের ত্রিহুতের নিকটবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মণদিগের উচ্চারণের সহিত অতি আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। আমি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ের নরনারীর সহিত একস্থানে বাস করিয়া দেখিয়াছি যে এই উভয় সাম্প্রদায়িক লোকেদের উচ্চারণের এতদূর সামঞ্জস্য আছে যে যদি একটি ঘরে সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং অপর ঘরে উত্তর বঙ্গের বাঙ্গালীকে রাখিয়া কথাবার্ত্তা করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে যাঁহারা এতদুভয়ের ভাষা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহারা উক্ত ভাষা শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ উভয়কে এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন। এরূপ উচ্চারণ আর কোথাও শুনি নাই। আমার একজন বন্ধুকে এই সামঞ্জস্য দেখাইয়া দেওয়ায় তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব আমার বিবেচনায় এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ উত্তর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

উক্ত গেজেটিয়রে লিখিত আছে—

The memory of the Sharmas survives in figures which are placed before the images of the god Mongesh and the goddess Shantadurga which the Sharmas are said to have brought from Trihut to Goa. These figures are much revered by visitors and by the priests of the temple who pay divine honours, offering them plantains, flowers, cocoanuts and cooked rice. According to the Shenvis the caste god and goddess, Mongesh and Shantadurga, were brought from Bengal. But the Mongesh-mahatmya seems to show that they were local Goa deities whose worship was adopted by the three founders of the class. Again the Shenvis state that their names came from ninety six, the number of the families of the original Bengal settlers.

উপরি উক্ত দেবদেবী সম্বন্ধেও আমার কিছু সন্দেহ আছে। যে সময় সারস্বত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে আসেন তখন সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে তান্ত্রিক পূজার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। অতএব উক্ত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশ হইতে কেবলমাত্র শান্তদুর্গা দেবীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া গোয়া প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। মঙ্গেশদেব বোধ হয় গোয়ারই স্থানীয় দেবমূর্ত্তি। কারণ বঙ্গদেশে মঙ্গেশ দেব নামক কোন দেবতা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ কেহ বলেন মঙ্গেশ লিঙ্গ বঙ্গেশ লিঙ্গের অপভ্রংশ মাত্র।

বাঙ্গালাদেশে আমাদের পুরুষদিগের নামের পূর্ব্বে সম্মানসূচক "বাবু" শব্দ অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গৌড়সারস্বতদিগের মধ্যেও এই "বাবু" শব্দের ন্যায় "বাব" শব্দ সম্মানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সহ্যাদ্রিখণ্ডের মতে সারস্বত ব্রাহ্মণগণের প্রধান কার্য্য দান, প্রতিগ্রহ, যাগ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন। এই গ্রন্থে ইহাদিগকে "দেবশর্ম্মাণঃ" বলা হইয়াছে।

আমার বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে ইঁহারা তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী শক্তিপূজক ছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময় ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্যের

আবির্ভাব কালে কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়েই অথবা পরে মঙ্গেশলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত মঙ্গেশলিঙ্গ এবং শান্তদুর্গা ভিন্ন ইঁহারা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ব্রহ্মরাক্ষস বা ব্রহ্মদৈত্য, গ্রাম্য দেবতা, পঞ্চমাতৃকা, অন্নপূর্ণা, গোপালকৃষ্ণ, রাম সীতা প্রভৃতির এবং সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা দেবতাকে অন্ন-ভোগ প্রদান করেন।

সারস্বত সম্প্রদায়ের বালিকা এবং স্ত্রীগণ আমাদের দেশের ন্যায় গঙ্গা, যমুনা, উষা, শান্তা, কাশী, রুক্মিণী, সত্যভামা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, পার্ব্বতী, জানকী, সীতা, রাধা, লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, উমা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।

বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণগণের কোন সাম্প্রদায়িক গুরু নাই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের এক এক সম্প্রদায়ের এক্ একজন সাম্প্রদায়িক গুরু আছেন। একারণ যখন সারস্বতগণ গোয়া প্রদেশে আগমন করেন তখন স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের সাম্প্রদায়িক গুরু না থাকায় তাঁহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে এই সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক গুরু করিতে বাধ্য হন। অদ্যাবধি তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িক গুরুর অধীন।

এই সম্প্রদায়ের পূজক ব্রাহ্মণগণকে ভট্ট বা ভট্ট-আচার্য্য কহে।

গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণের প্রধান খাদ্য সিদ্ধ বা আতপ তণ্ডুলের অন্ন (অপর ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন বড় একটা ব্যবহার করেন না), তরকারী এবং মৎস্য। শক্তি-উপাসকগণ মাংস এবং মদ্যের দ্বারা শক্তিদেবীর উপাসনা করিয়া প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের জাতিগত বাধা নাই। আজকাল কোকনস্থাদি দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অনেকে মৎস্য মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইতেছেন। বলাবাহুল্য দাক্ষিণাত্যের অপর ব্রাহ্মণগণ মৎস্য মাংস স্পর্শ করেন না।

অনেকেই অবগত আছেন যে দাক্ষিণাত্যে হুঁকায় তামাক খাইবার প্রথা নাই। কিন্তু গৌড় সারস্বতগণের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাবধি কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।

গৌড় সারস্বতগণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

ইহাদিগের পুরুষগণ কাছা ও কোঁচা দিয়া বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্ত্রীগণের ন্যায় কাছা দিয়া ১৬।১৭ কিংবা ১৮ হাত লম্বা সাটি পরিধান করে এবং সধবাগণ মস্তক অনাবৃত রাখে। সিঁথিতে সিন্দুর দিবার পরিবর্ত্তে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের অনুকরণে কপালে কুঙ্কুম এবং হস্তে সধবার চিহ্নস্বরূপ "লৌহের" পরিবর্ত্তে এতদ্দেশীয় প্রথা অনুসারে গলদেশে মঙ্গলসূত্র ধারণ করে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেমন বাঁশের চেটাই দ্বারা সূতিকাগৃহ (আঁতুড় ঘর) গঠিত হইত ইহাদের মধ্যে এখনও সেই প্রথা সংরক্ষিত হইয়াছে।

জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, পুনর্ব্বিবাহ, গর্ভাধান, ও মৃত্যুকালীন প্রথা সমুদায় সম্বন্ধে ইহারা এতদ্দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক দেখি না।

গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণগণ অত্রি, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ শাণ্ডিল্য, বাশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত।

এতদ্ভিন্ন আরও এক সম্প্রদায় সারস্বত ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা কান্যকুব্জ (কনৌজ) হইতে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে কেবলমাত্র "সারস্বত ব্রাহ্মণ" কহে। গোত্র অনুসারে ইঁহারা বাৎস্য, কৌশিক এবং কৌণ্ডিন্য এই তিন ভাগে বিভক্ত।

গৌড় সারস্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি চলিত কথা (proverb) এবং গল্প আমাদের বাঙ্গালা দেশের অনুরূপ। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। কেবলমাত্র একটি গল্প নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"একটা ইঁদুর একদিন চুরি করে বেগুণ খেতে গেছিল। যেমন সে বেগুণ খাবে, অমনি তাহার লেজে একটি কাঁটা ফুটিল। ইঁদুর তখন নাপিতের বাড়ী যাইয়া বলিল "নাপিত ভায়া আমার লেজ হইতে কাঁটা বাহির করিয়া দাও।" নাপিত

যেমন কাঁটা বাহির করিতে গেল অমনি ইঁদুরের লেজটি কাটিয়া গেল। ইঁদুর বলিল "আমার লেজ কাটিয়া দিলে আমাকে ইহার বদলে নরুণ দাও।" নাপিত নরুণ দিল। নরুণ লইয়া যাইতে যাইতে ইঁদুর দেখিল একজন কুমর হাত দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে। ইঁদুর বলিল "হাত দিয়া মাটি খুঁড়িতেছ কেন? এই আমার নরুণ নিয়ে মাটি খোঁড়।" যেমন কুমর নরুণ দিয়া মাটি খুঁড়বে অমনি সেটা ভেঙ্গে গেল। ইঁদুর বলিল "আমার নরুণ ভাঙ্গলে আমাকে হাঁড়ি দাও।" কুমার হাঁড়ি দিল। ইঁদুর দেখিল একজন মালী হাত দিয়া জল ছেঁচছে। ইঁদুর বলিল "আমার হাঁড়ি লইয়া জল দাও।" যেমন মালি হাঁড়ি করিয়া জল ছেঁচবে অমনি হাঁড়ী ভেঙ্গে গেল। ইঁদুর বলিল "আমার হাঁড়ী ভাঙ্গলে আমাকে টোপর দাও।" মালী টোপর দিল। ইঁদুর দেখিল একজন ধুচুনী মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যাচ্চে। সে বলিল "আমার টোপর দাও।" বর টোপর নিল। বিয়ের সময় টোপরটি ভেঙ্গে গেল। ফিরিবার সময় ইঁদুর টোপর চাইল। বর বলিল ভেঙ্গে গেছে। ইঁদুর বলিল "তবে তার বদলে কনে দাও।" বর কনে দিল। তখন ইঁদুর কনে দিয়া একটা ঢাক কিনিল। এবং এই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে বলিতে লাগিল "লেজের বদলে নরুণ পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। নরুণের বদলে হাঁড়ী পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। হাঁড়ীর বদলে টোপর পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। টোপরের বদলে কনে পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্। কনের বদলে ঢাক পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম্।"

আমি ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থানে অনেকদিন বাসও করিয়াছি কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন পূর্ব্বে আর কোথায়ও এইরূপ গল্প শুনিতে পাই নাই। উপরি উক্ত গল্পটিতে 'ইঁদুরের' পরিবর্ত্তে 'শৃগাল' এবং 'লেজের' পরিবর্ত্তে 'নাক' বসাইলে উহা আমাদের দেশের "শৃগালের নাকে কাঁটা ফুটার" গল্পে সঠিক পরিণত হইবে। আমাদের দেশের গল্পটিই অধিকতর যুক্তিপূর্ণ। কারণ বেগুণ খাইতে গেলে নাকেই কাঁটা ফুটে এবং শৃগালেরাই বেগুণ খাইতে যায় ও চুরি করিয়া বেগুণ খায় এইরূপ প্রবাদ আছে।

গৌড়সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি উপরি উক্ত বিবরণ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এ সম্বন্ধে আমি আরও অধিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে আমার বিনীত প্রার্থনা যে আমার বঙ্গদেশীয় বন্ধুগণ যেন এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এতৎ সম্বন্ধে বঙ্গদেশ হইতে কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। তাহা হইলে এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালীর বংশধরগণের সহিত আমরা এক সময়ে নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সক্ষম হইব। বাঙ্গালীর রক্ত যাঁহার অঙ্গে বিন্দুমাত্রও বর্ত্তমান আছে তিনিই আমাদের আদরের ধন। গৌড় সারস্বতগণ অদ্যাবধি আপনাদিগকে বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, আমরাই কেবল তাঁহাদিগকে জানি না!

গান।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ।

(মিশ্র পিলু)

আমার কুটীর তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো—
নূতন করে জাগিয়ো
তোমার মাঝে জাগিয়ো।
অমনি করে বজ্র হেনে
সুখের বাসা দিয়ো ভেঙ্গে
রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি
প্রলয় মাঝে জানিয়ো!
এই সুখে মরে থাকার চেয়ে
মরণ আমার যাক্ না নিয়ে
মৃত্যু মাঝে নবজীবন
ধন্য হব পেয়ে।
আঘাত সে যে পরশমণি
অতুল ধনে করে ধনী—
সেই আঘাতে সুপ্ত-জীবন-
কমল তুমি ফুটিয়ো॥

বঙ্গের বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। দেশের জনসাধারণ এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলের দৃষ্টিই এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত প্রথায় আর কেহই সন্তুষ্ট নহেন—সকলেরই ধারণা, যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নহে—উহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার দিন আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন বসিয়াছে—তাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত বরেণ্যগণের মধ্যে অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবসরে শিক্ষা সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মশক্তির বিকাশই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। সেই হিসাবে শিক্ষাকে আমরা দুই ভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারি। প্রকৃতি কোন বিষয়েই কৃপণ নহেন। মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকৃতির ভাণ্ডার সুসজ্জিত রহিয়াছে। এই প্রকৃতি-রচিত শিক্ষা এক, আর এক শিক্ষা যাহা মানুষ মানুষের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই শেষোক্ত শিক্ষাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়। প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ যে উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইতে পারে এবং মনুষ্যসৃষ্ট প্রণালী হইতে সে শিক্ষা অবনত নয় তাহার উদাহরণ আমরা বড় বড় কবির কাব্যে পাইয়া থাকি। কিন্তু কাব্য এক এবং জীবন অন্য। যাহা কাব্যে সম্ভব তাহা হয়ত জীবনে ঘটে না—বিশেষ বিংশ শতাব্দীর যুগ প্রকৃতির যুগ নয়—আর্ট ইহাকে বিশেষ ভাবে আত্মসাৎ করিয়া তুলিয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল—কিন্তু আর্টের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিল, এবং বর্ত্তমান যুগে সে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে বিশিষ্ট যোগ এবং বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিকে অবহেলা করা মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রধান অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তিও মানুষকে বহুল পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। আর্টের ক্ষমতা যতই অধিক হউক না কেন, উহাকে চিরদিনই প্রকৃতির অনুগামী হইতে হইবে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলে তাহার অপঘাতমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে শিক্ষায় প্রকৃতি অবহেলিত সে শিক্ষা কখনও তাহার চরম উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ "তোতাকাহিনী" নামক গল্পটী শুধু গল্প নয়—উহা এই "থিওরি"টিকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করে। প্রকৃতিকে অবলম্বন না করিলে কোন শিক্ষাই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গরিষ্ঠ দোষ—প্রকৃতিকে দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়াস ইহাতে যথেষ্ট নাই। এই দোষের নিমিত্তই এ শিক্ষা আমাদের নিকট সহজ বলিয়া বোধ হয় নাই—সেই জন্যই বালক বালিকার নিকট ইহা "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের" মত অবতীর্ণ না হইয়া "ঘাড়ের বোঝা"র মত চাপিয়া বসে। এমন শিশু অল্পই দেখা যায় যাহাকে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইতে না হয়—যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া পাঠশালায় গিয়াছে। এই শিক্ষা পুস্তকরাশির মধ্যে নিবদ্ধ—জীবনের সহিত, বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্প। জীবনের সাধ ইহাতে মিটে না—জীবনের সজীবতা, নবীনতা ইহাতে নাই—প্রথার অভ্রভেদী প্রাচীরের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়া ইহা আত্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ শিক্ষাকে আমাদের দূরে রাখিতে হইবে নচেৎ আমাদের মঙ্গল নাই।

বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার জন্মদিবস হইতে প্রায় শত বৎসরের পরে আজ আমাদের নিকট "শিক্ষা" একটী সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বুঝিতে পারিতেছি, ইহারই উপর অন্যান্য সমস্ত সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আছে। শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে জীবনের অন্যান্য কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আজ বাঙ্গালীর জীবন নূতন হইতে নূতনতর সমস্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। এগুলির মীমাংসা হওয়া আবশ্যক এবং মীমাংসা না হইলেও উপায়

নাই। যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় আমাদিগকে ইহার মীমাংসা করিতেই হইবে। শিক্ষা-সমস্যা হইল সেই সমস্যা যাহা এই সকল সমস্যারই ভিত্তি-স্থল। এই ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য সমস্ত সমস্যাগুলিই আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের প্রথম সমস্যা হইল স্বাস্থ্য। ইহার অভাব শিক্ষিতের মধ্যে যেরূপ অধিক পরিমাণে দেখা যায় অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে—সেই সঙ্গে পীড়ার আধিক্যও বাড়িয়া চলিতেছে। শিক্ষিত যুবকের মধ্যে শতকরা বোধ হয় ৮০ জন অজীর্ণ, উদরাময়, ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং নিদারুণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রগণের মধ্যে ক্ষয়-রোগের প্রভাবও নিতান্ত অল্প নহে। অধিকাংশ যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার পর সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় সমস্যা—"অন্ন-সমস্যা"—এই সমস্যা থাকিলে কোনও শিক্ষা বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ কালিদাসের ন্যায় মহাপণ্ডিতও ইহাতে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন; সুতরাং এ সমস্যাটীকে দূর করিতেই হইবে। এই অন্নসমস্যা এখন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ঘরে।

এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালী জীবন জড় স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়াছিল—বহুদিন পরের দাসত্ব করিয়া আমাদের জীবনের উপর একটা আবরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। আজ পাশ্চাত্য জীবিত জাতির সঙ্গে একত্র দাঁড়াইয়া তুলনায় আমাদের জীবনের একটা অস্পষ্ট অভাব চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পর-পদানুলেহন, পর-পদানুসরণ এই ছিল আমাদের শিক্ষার বিষয়। আপন প্রকৃতিতে ইহা দণ্ডায়মান হয় নাই সুতরাং জীবনকেও কোনদিন চিনিতে পারি নাই। আজ বিংশ শতাব্দীর জীবন-যুদ্ধে জীবনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অন্বেষণও আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্মিলনে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই আত্মান্বেষণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আজ এতদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা দেখিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে পদে পদে লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষা উঠিয়াছিল তখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষাবলে ভাল ভাল চাকরী মিলিত, রাজসরকারে সম্মান পাওয়া যাইত, সেই লোভে অনেকে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল। আশা—ইংরাজী শিখিলে চাকরী পাওয়া যাইবে। কিন্তু চাকরী আর কত পাওয়া যাইবে! স্বাস্থ্য হারাইয়া যে বিদ্যালাভ করিলাম সে আমাকে দাস হইতেই শিক্ষা দিল; অন্য কোন ভাবে যে আমি দাঁড়াইব তাহার উপায় রহিল না। জীবনের এই আঘাত বড় আঘাত—এই শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা। জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জাতির অবিরাম সংঘাতে এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে এমনভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে হইবে যাহাতে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি। যদি সামান্য উদরান্নের জন্যই আমাকে পরের উমেদারী করিতে হয় তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা আমার কি করিবে—ইহা আমার নিকট গলগ্রহের মতই মনে হইবে। ফলতঃ শিক্ষার সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকা উচিত। নতুবা শিক্ষা এবং জীবন দুইই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই জীবনের বীজ প্রকৃতির মধ্যে উপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং জীবনকে প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রয়োজন। শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাকৃতিক প্রণালী অবলম্বন যে আমাদের একমাত্র উপায় আমরা এখন ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রচলিত প্রণালীতে শিশুর প্রথম হাতে-খড়ি হইলে তাহাকে "অ, আ", শিখান হইয়া থাকে। এই অ, আ, প্রভৃতি বর্ণ তাহারা কেন শিখে তাহা জানে না—ঐ অর্থহীন শব্দ তাহাদের নবোন্মেষিত জ্ঞানের দ্বারে নিগড়স্বরূপ আসিয়া পড়ে। সুর, শব্দ প্রভৃতি জানিবার ইচ্ছা যখন তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময়ে প্রকৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত প্রথম জগদ্দল পাথর

তাহার বুকের উপর বসান হইল—অর্থহীন অ, আ। শিশু ঐ "অ, আ" করিয়াই গুরু মহাশয়ের বেতের ভয়, বাড়ীতে পিতার তাড়না এবং অধীত গ্রন্থের অভিনব প্রলাপের মধ্যে জীবনের স্বর্ণময় প্রভাত হারাইয়া বসিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে—অতি অল্প দিন পরেই আবার নূতন বর্ণমালা তাহাকে শিখিতে হইবে—তখনও পর্য্যন্ত অ, আ প্রভৃতির প্রয়োজন তাহার উপলব্ধি হয় নাই—অথচ A, B, C, Dর মহিমা না জানিলে নয়—এই ভাবে আমরা যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি তাহা জীবনের নবীনতার দ্বারা সতেজ নয় এবং জীবনের রসের দ্বারাও অভিষিক্ত নয়। ইহার পর কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া একেবারে যখন জীবনের সম্মুখে আসিয়া পড়ি, তখন আপনাকে জীবন-যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং দুর্ব্বল মনে করিয়া হতাশ ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে জীবনটী কাটাইয়া দিই। জীবন ভোগ করা আর ঘটিয়া উঠে না; বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের ইহাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ট্রাজেডি।

আমাদের পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা উভয় শিক্ষাতেই জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় অল্পই হইয়া থাকে। শিশুকে ভূগোল শিখান হয়—হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তরে। সে মানচিত্রে একটী মসী-রেখা দেখে এবং বারংবার উহা আবৃত্তি করে। এই হিমালয় যে ভারতের কি সম্পৎ তাহার আভাস সে প্রাপ্ত হয় না, তাহার কোন চিত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ে নাই; ইহা ভারতীয় জীবনকে কি ভাবে গঠিত করিতেছে তাহার সামান্য মাত্র ছায়াপাতও বালকহৃদয়ে হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। তাহার নিকট হিমালয় একটী অর্থ-হীন শব্দ, যাহার ভার তাহার স্মৃতিকে প্রপীড়িত করিয়া তুলে।

ইতিহাসের অবস্থা আরও শোচনীয়। জীব-নের সঙ্গে যেন তাহার কোনই সম্পর্ক নাই—কতকগুলি রাজা ও সংস্কারকের নাম, যেগুলি শুধু নাম মাত্র, সেইগুলিকে স্তরে স্তরে স্মৃতির মধ্যে সাজাইয়া রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত বাহির করিতে হইবে। ইতিহাসের প্রতি কোন বালকের অনুরাগ নাই; তাহারা জানে ইহা শুধু মুখস্থ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে বুদ্ধদেবের নাম থাকা ছাড়া আর তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল ইহা অধিকাংশ বালক জানে না। বস্তুর সঙ্গে পরিচয় নাই—শিক্ষা চলি-য়াছে। প্রথম শ্রেণীর অনেক ছাত্রও পুস্তকে অধীত বিদ্যা ব্যতিরেকে বাহিরের একটী কথাও জানে না। যখনই সে বাহিরে যায় তাহার শিক্ষক ও অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি তাহাকে প্রকৃতি-শিক্ষা হইতে সাবধান করিয়া আসিতেছে। এই কলিকাতা সহরের অধিকাংশ ছাত্র কবির ভাষা বলিতে গেলে—

"ভোজনে নিপুণ বটে অন্নরুচী ডাল
কিসে জম্মে জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল।"

রাশীকৃত পুস্তকের ভারে প্রপীড়িত অল্পবয়স্ক বালকগণের সাধারণ জ্ঞানের অল্পতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথবা বিস্মিত হইবার বিশেষ কারণ নাই, কেননা শিক্ষাব্যাপারে যে প্রণালী অনুসৃত হইতেছে, ফলও তদনুযায়ী হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সহিত প্রাণের সংযোগ নাই। ইহাই বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে তবেই জীবনের উপযোগী শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হইব। স্বাস্থ্যই জীবনের সমস্ত সুখের মূল ভিত্তি। যে বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সে শিক্ষা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। আমাদের ছাত্রবৃন্দের স্বাস্থ্যের প্রতি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আদৌ দৃষ্টি নাই। একটী প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা থাকার পর বাটীতে ৬।৭ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতে হয়—তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে ১২ ঘণ্টাকাল পুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে হয়—একটী ১৫।১৬ বৎসরের বাল-কের পক্ষে ইহা সহজ ব্যাপার নয়। তাহার উপর পরীক্ষার দুশ্চিন্তা—তৎপূর্ব্বে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি ব্যাপারে কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ আরম্ভ হয়। আজকাল অধিকাংশ কলে-জে ছেলের চোখে চশমা দেখা যায়। অতীব

দুঃখের বিষয় যে পাঠার্থী বালক এত সামান্য বয়সেই ক্ষীণদৃষ্টি হইবে।

আমাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এই কলঙ্কটী সর্ব্বাগ্রে মোচন করিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত পুস্তকের সংখ্যা কমাইয়া প্রকৃতিজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান প্রভৃতির বিষয় নির্দ্দেশ করিলে শিক্ষাও প্রকৃত হয় এবং ছাত্রগণেরও স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। প্রথম সমস্যাটীর মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহা অন্নসমস্যা। মানুষকে আর সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে এই বিষয়ে আর অন্যমত দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের শিক্ষিতগণ কি করিবেন? গভর্ণমেণ্ট আফিস ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে, মার্চ্চেণ্ট আফিসেও আর ন স্থানং তিলধারয়েৎ—ক্রমে জমিদারী বিভাগে ইংরাজী শিক্ষিত কর্ম্মচারীতে পূর্ণ হইয়া গেল—চাকরীর সোণার তরী বোঝাই হইয়া গিয়াছে,

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী
আমারই সোণার ধানে গিয়াছে ভরি"

এখন উপায় কি? ততঃ কিম্—ইংরাজী তর্জ্জমা, ইংরাজী ব্যাকরণ, ইংরাজী ভাষাই শিখিয়াছি—ইংরাজীতে একখানি পত্র লিখিতে পারি বা একটী হিসাব করিতে পারি—ইংরাজের দ্বারে বা ইংরাজের পদাঙ্ক যাহারা অনুসরণ করেন তাঁহাদের দাসত্ব ব্যতিরেকে আর কি উপায় আছে?

যদি দাসত্বের দ্বারা উদরের চিন্তা দূর হইত তাহা হইলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু তাহা হইতেছে না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাংসারিক অবস্থা বর্ণনীয় নয়। খরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তেমন আয় নাই। কোনরূপে সংসারখরচ সঙ্কুলান হয়। ইহার উপর যদি গৃহে অবিবাহিতা কন্যা থাকেন তাহা হইলে আর নিস্তার নাই (আর কন্যা নাই এমন গৃহও বিরল)—সে গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেই হইবে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীগণ বিবাহের সময় অনেক পণ পাইয়া থাকেন—এ কেমন উচ্চ শিক্ষা যাহা বিবাহের ন্যায় গুরুতর ব্যাপারেও কন্যার পিতার—অর্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখে! এ উচ্চ শিক্ষার অর্থ নাই। বাঙ্গালার বরগণ উচ্চশিক্ষার কলঙ্ক! এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে তাঁহারা দেশে নানারূপ কার্য্য পাইতেও করিতে পারেন। অনেক বিষয় আছে যেগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইলে মধ্যবিত্তের এই অন্নাভাব নিবারিত হইতে পারে। অবশ্য ইহার নিমিত্ত প্রথম প্রথম আমাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই অভাব মিটিবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য, এই মন্বন্তরের দিনে কার্পাস প্রভৃতির চাষ এবং সূতা ও বস্ত্রের কল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। কিন্তু শুধু শিক্ষাতেই উহা পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না। এ প্রস্তাব বোধ হয় নূতন নহে, বহুবার ইহা কথিত এবং লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দেশের ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত ধনীগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে উপায় নাই। আমাদের দেশে স্বদেশী যুগ হইতে অনেক বক্তৃতা হইয়াছে, দেশের নাম করিয়া National fund ও গঠিত হইয়াছিল কিন্তু আজ সে fund এর যে কি ফল হইতেছে তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে যাহাতে ঐ সমস্ত বিদ্যালয় হইতে শিক্ষিত ছাত্রগণ এই দেশেই যথেষ্ট কার্য্য পাইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। যাঁহার মূলধন নাই, স্বাধীনভাবে কোনও কার্য্য আরম্ভ করিতে যদি পারিতেছেন না তাঁহারও যেন কার্য্যের অভাব না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হইল—কিন্তু দেশের কোনও সুবিধা তদ্দ্বারা হইল না। B. Sc. ও M. Sc. উত্তীর্ণ উকিল আজকাল যথেষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান দেশের কাজে লাগিল না। এইভাবে আমাদের শিল্প ও কৃষিশিক্ষাও ব্যর্থ হইবে, যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু শুধু শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করি। যাঁহারা ব্যবসাদার, অন্যান্য বিষয়ে যাঁহাদের টাকা খাটিতেছে তাঁহারা যদি অগ্রণী হন—একটী নূতন speculation বলিয়া এই সমস্ত কার্য্য গ্রহণ করেন তবেই একদিন উহা সার্থক হইতে পারে। শিল্প ও

বৃত্তিশিক্ষা দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতেই হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিক্ষা যেন দাসত্বের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আপনার মহদুদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া না বসে।

এই স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি আমাদের সমস্ত শিক্ষার মূলে বিজড়িত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাবলম্বনেই "অন্ন-সমস্যার" মুক্তি। তার পর উচ্চশিক্ষা—উদরান্নের জন্য লালায়িত ব্যক্তির মস্তিষ্কে উচ্চ চিন্তা স্থান পাইতে পারে না। অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্যে অভিনব রসসৃষ্টি, কাব্যকলার সুন্দরতম নৈপুণ্য সাধন, গণিতের উচ্চাঙ্গের সমস্যা পূরণ, দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব মীমাংসা—রোগক্লিষ্ট অন্নচিন্তাক্ষুব্ধ দাসত্বভারাবনত মস্তিষ্কের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে আমরা যে শিক্ষা পাইয়া থাকি, সংসারের চিন্তায় তাহা আমাদের জীবনে কখনই বিকশিত হয় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়া যায়, জীবনে তাহার আর নিদর্শন থাকে না।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত শিক্ষা দিবার এবং বঙ্গসাহিত্যকে M, A পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিবার একটী আন্দোলন শোনা যাইতেছে। যে জাতির মাতৃভাষা ঘৃণিত সে জাতির উদ্ধারের আশা নাই। বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না। বাঙ্গালীর জীবন ও শিক্ষা বাঙ্গালার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট হইয়া বঙ্গভাষার মধ্য দিয়াই সম্যক্ বিকশিত হইবে। আজ যে শিক্ষা আমরা পাইয়াছি ইহা প্রকৃত শিক্ষা নয়—ইহা অনুকরণমাত্র। কিন্তু ইহা একেবারে ব্যর্থ নয়—বিদেশ হইতে প্রাণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আনিয়া ইহা আমাদের চেতনাহীন প্রাণকে চৈতন্যের বিপুল বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গের অন্নাভাব দূর করিয়া আজ বাঙ্গালীকে নানা বিদ্যার আভরণে ভূষিত করিবার দিন আসিয়াছে। পরের জীবনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া আর আমরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব না—কলা, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অভিনব সৃষ্টি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিবার সুদিন উপস্থিত। এখন কেবল পূজাবেদীতে বঙ্গবাণীর উদ্বোধনের জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মায়ের আগমনী সঙ্গীতে যোগদান করিতে হইবে।

আদর্শ

বা

দাদা

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রহিমদ্দীর বাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

রহিমদ্দী উঠানে বসিয়া বেত কাটিতেছিল। তাহার সম্মুখে দুইখানি কাঠাসনে নিধিরাম ও কেনারাম উপবিষ্ট।

রহিমদ্দী। এ দেশে আর থাকা হোল না। এত অত্যাচার!

নিধি। দেশ ছেড়েই বা যাব কোথায়? আর বাপ-দাদার বাস্তভিটে—একি সহজে ছাড়া যায়?

রহিম। না হলে' তো এই অত্যাচার সইতে হবে। এই দ্যাখো, আমি মিথ্যা সাক্ষী দিইনি' বলে, আমায় কয়েদ করে রেখেছে, মেরেছে, বাড়ী লুট করে নিয়েছে। যদি দাদাঠাকুর গিয়ে না পড়তেন, তাহলে সেইদিনই অক্কা পেতে হোত। যদি দাদাঠাকুর মেহেরবাণী করে ছুটো চাল না দিতেন, তাহলে এই কয়দিন উপোস করে থাকতে হোত।

নিধি। দেখি ঠাকুর কি করেন।

কেনা। ঠাকুর গরীবের জন্যে কিছু করেন না।

নিধি। ও কথা বলো না ভাই। ওহে, হরিচরণের কি হোল?

রহিম। আহা তা জানো না? বেচারার ছাওয়ালটি মারা গেল, মরবার সময়ে তাকে একটু দেখতেও পেল না। কাছারী থেকে মার খেয়ে এসে এই কথা শুনে বুড়ো আর ধৈরদাস্ত করতে পারলে না। ভিরমী খেয়ে পড়ল। তারপর দুদিনের জ্বরে মারা গেল।

নিধি। মারা গেল! আহা তবে তার আর কেউ নেই। একেবারে বাড়ী শূন্য?

রহিম। আছে তার ছেলের বৌ। সে এখন দাদাঠাকুরের বাড়ীতে আছে। পোড়াকপালে মানুষগুলো তাতেও কাণাকাণি করে। দাদাঠাকুর দয়া করে আশ্রয় না দিলে বউটীর কি দশাই হোত। দাদাঠাকুরের মত এমন মানুষ কি আর হয়!

কেনা। তুমি বল কি; দাদাঠাকুর কি মানুষ? সে যে দেবতা। তিনিও নাকি বড় বিপদে পড়েছেন।

নিধি। কি বিপদ ?

রহিম। জমিদার তাঁর নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করেছে। বোধ হয় তাঁর জেল হোতেও পারে।

নিধি। তাঁর আর আছে কে ?

রহিম। আছে তাঁর গিন্নী আর একটা ভায়ের মেয়ে। কোনো সন্তান-টন্তান নেই।

নিধি। টাকাকড়ি আছে কেমন ?

রহিম। খুব ভালো অবস্থা ছিল। কিন্তু জমিদার ব্যাটা তাঁর নামে জাল দলিল তৈরী করে, মিথ্যা মোকদ্দমায় ডিক্রী করে তাঁকে এখন ভিকিরী করেছে। এদিকে তো আবার দান করে প্রচুর।

কেনা। আহা এমন মানুষেরো এমন দশা হয় !

রহিম। ঐ বুঝি দাদাঠাকুর আসছেন। এত যে দুঃখ কষ্ট তবু গান গেয়ে তেমনি আগের মতন আমোদ করে বেড়াচ্ছেন।

(গাহিতে গাহিতে দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

গীত।

(ওমা) তুই মা আঁধার ঘরের আলো।
যেমন থাকি তেমন থাকি তোরেই বাসি ভালো।
আকাশ যখন ছেয়ে আসে কালো কাজল মেঘে,
ঝঞ্ঝা যখন আসে ধেয়ে রুদ্র ভীষণ বেগে,
কুঁড়ে যখন যায় গো পুড়ে বাজের আগুন লেগে,
সেই ভয়ের রাতে ও জননী তুমিই কোলে তোলো।
(যখন) ঘিরে আসে দৈন্য লজ্জা দুঃখ থরথর,
সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে আপন যে হয় পর,
সেই শূন্য ঘরে ও জননী তুমিই প্রদীপ জ্বালো॥

(সকলে দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিল)

রহিম। আসুন দাদাঠাকুর। কাঙালের বাড়ীতে মেহেরবাণী করে এসেছেন।

দাদা। ও কথা বলিস্‌নে। ও রকম করলে আমি চলে যাব। তোরা যে আমার আপনার জন। আমার সঙ্গে এতটা সামাজিকতা করতে হবে না। ঈশ্বর এই বুঝে তোদের সঙ্গে এখন একেবারে সমান করে দিয়েছেন—যা একটু তফাৎ ছিল, তা এখন আর নেই। দয়া করে আমায় ভিকিরী করেছেন। বেশ করেছেন! বেশ করেছেন !

গীত।

যখন আমার নাই গো কিছু
ভাব্‌বো তখন তুমি আছ ;
যখন সকল আসবে ফিরে
গেহ।

অনাথ-হারাদের তুমিই রতন
শূন্য ঘরেই তোমার গমন
যারা তোমায় চায় গো কেবল
তুমি তাদের সকল দেছ।
ভিক্ষা করে মানুষ বাঁচে
যাব না মানুষের কাছে
তার আবার কি অভাব আছে
তুমি যারে ভিক্ষা দেছ ?

রহিম। আবার আপনার সব হবে।

দাদা। কি হবে ? কি ছিল ? কি থাকবে বলিস্‌ কিরে ? ঠাকুর আমায় ক্রমে তাঁর বেশী আপন করে নিচ্ছেন। টাকা থাক্‌লে পাছে তাঁকে ভুলে থাকি তাই টাকা কড়ি সব নিয়েছেন। আমি সব হারিয়ে আমার সব পাব। ওরে তাঁর বড় দয়া ! যাক্ সে কথা। ধর এখন এই আট আনার পয়সা নে।

রহিম। না, না, আমার আছে। ও আমি নেব কি জন্যে ?

দাদা। আরে ব্যাটা নে। ঘরে যে চাল নেই তা জানি।

রহিম। দাদাঠাকুর, তুমি যখন দরদ-গলায় "রহিম" বলে ডাকো তখনি দুঃখ কষ্ট সব ভুলে যাই। টাকার কাজ কি ?

দাদা। আরে ধর্ নে।

রহিম। দাদাঠাকুর, আজকাল যে তোমার কিছুই নেই তবু তুমি এখনো আমাদের দিচ্ছ ?

দাদা। আমার কিছু নেই তোকে কে বল্লে ? ওরে ভগবানের রাজ্যে কি কিছুর অভাব আছে ? ওরে তাঁর ভাণ্ডার যে অনন্ত আমি আর কতটুকু নেব ?

গীত।

রাজার ছেলে কাঙাল হয়ে ঘুর্‌বি কোথায়
কাহার দ্বারে ?
কতটুকু পার্‌বি দিতে ? কতই আছে
এ ভাণ্ডারে।
আছে কান্না আছে হাসি
আছে সুখ দুঃখ রাশি
এই প্রকৃতি হবে দাসী চিনিস্‌ যদি আপনারে।
রতনের সেরা রতন
পেয়ে বুঝি পেলিনে মন
পেলে সে অমূল্যধন ঘুচ্‌ত অভাব একেবারে।
থাকিস্‌নে আর আঁখি বুজে
মরিস্‌নে আর মিছা খুঁজে

বাইরে আলো থাকলে কি হয়,
মুদলে আঁখি অন্ধকারে।
দেওয়া হলেই হয় না পাওয়া
তাইতো পেয়েও রয় গো চাওয়া
দুয়ার দিয়ে রইলে ঘরে মলয় হাওয়া লাগে নারে॥

রহিম। তা হলে' আর অভাব কি? আমাকেও তিনিই দেবেন। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবনা। তিনিই দেবেন।

দাদা। এও তো তিনিই দিচ্চেন। এ কি আমি দিচ্চি? আমি কে? আমি কি কিছু দিতে পারি? কার দ্রব্য কারে দেব?

রহিম। না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবনা। আহা কি মিষ্টি কথা শুনলুম—"তাঁর রাজ্যে অভাব নেই, তিনিই দিবেন"—না দাদাঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি আমি কিছুই নেব না।

দাদা। রহিম, রহিম, এমন প্রাণ তোর? তুই যে আমার চেয়ে অনেক বড়! আর একবার তোকে বুকে করি। (আলিঙ্গন)

রহিম। দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, আমার দাদাঠাকুর! কেনারাম, ভাই দ্যাখো দ্যাখো কেমন দাদাঠাকুর।

কেনা। ঠিক্ যা শুনেছিলাম তাই। এমন মানুষ তো আর দেখিনি। এ যে দেব্‌তা!

দাদা। কেরে তুই ব্যাটা? মার্ খাবি, মার্ খাবি। এঃ বক্তিমি কচ্চে (স্নেহে কিল মারিলেন) কেমন দেব্‌তা? আর দেবতা বল্‌বি?

নিধি। ওরে কেনারাম, পায়ে পড়, পায়ে পড়। তোর বরাত ভালো। দাদাঠাকুরের কিল্ খেয়েছিস্। পায়ে পড়।

(নিধিরাম, কেনারাম ও রহিমন্দী দাদাঠাকুরের চরণে প্রণত হইল। দাদাঠাকুর তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া গাহিল)

গীত।

আমায় পাগল করে'দে।
থলি ঝুলি করব উজাড় সবাই লুটে নে।
কি বাতাসে উঠ্‌ছে যে ঢেউ লাগ্‌ছে বুকে এসে
হাল ছেড়েছি যাক্‌না নিয়ে যাবই চলে ভেসে;
একেবারে যাব মেতে হেসে গেয়ে কেঁদে।
জোয়ার যখন আসে জোরে স্রোত যখন ছুটে
ঝড়ের বাতাস মেতে উঠে আকাশ যখন লুটে
তখন তারে কোন্ বাঁধনে রাখ্‌তে পারে বেঁধে॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

রাজা যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ কবীন্দ্র ছিলেন, অজু গোঁসাই আধ পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য-কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্যচ্ছলে তাহারি উত্তর করিতেন।

একদিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন,

"এই সংসার ধোঁকার টাটী।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল,
শূন্যে এত পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা,
অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্যছায়া
অভাবেতে স্বভাব বিটি॥ ১
গর্ভে যখন যোগ তখন,
ভূমে পড়ে খেলেম মাটী।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
দড়ির বেড়ি কিসে কাটী॥ ২
রমণী বচনে সুধা,
সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে,
বিষের জ্বালায় ছটফটী॥ ৩
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,
মা তুমি পাষাণের বেটী॥" ৪

অজু গোঁসাই শ্রুত মাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন,

'এই সংসার রসের কুটি,
খাই দাই বাজস্নে বসে মজা লুটী॥

ওহে সেন নাই জ্ঞান, বুক তুমি মোটামোটা।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিড়ি পেতে দুধের বাটী ॥'

কবিরঞ্জন গান করিলেন,—

"আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু তলেরে মন,
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া,
তায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র,
তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥ ১
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতা মাতায় তাড়্য়ে দিবি ॥
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়,
ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি। ২
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা,
তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে,
জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি ॥ ৩
প্রথম ভার্য্যের সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ,
জ্ঞানসিন্ধুমাঝে, ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হোলে,
কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের
ঠাকুর, মনের মত হবি ॥" ৪

গোঁসাইজী ইহার উত্তর করিলেন,—

"বোলেছে রামপ্রসাদ কবি।
আয় মন বেড়াতে যাবি ॥
তার কথায় কোথায়ও যেও নারে।
সাধকের মনের ভাব সেকি জানেরে ॥"

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে একাম্রকাননে ভগবতীর গো-চারণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন,—

গিরীশগৃহিণী গৌরী, গোপবধূ বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস ॥
সুরভির পরিবার, সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মার বেণু ॥
জগদম্বারে যব পূরে বেণু।
যব পূরে বেণু, ধায় বৎস ধেনু।
উড়ে পদরেণু, রেণু ঢাকে ভানু।
ভাবে ভোর তনু। ইত্যাদি—

গোস্বামী ইহার উত্তর দিলেন,—

"না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে।"

রামপ্রসাদ সেন কহিলেন,—

"কর্ম্মের ঘাট্ তেলের কাট্ আর পাগলের ছাট্ মোলেও যায় না।"

অজু গোঁসাই তখনি উত্তর দিলেন,—

কর্ম্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।

রামপ্রসাদ কহিলেন,—

শ্যামভাবসাগরে ডোবোরে মন,
কেন আর বেড়াও ভেসে ॥

গোঁসাই উত্তর দিলেন,—

একে তোমার কোপো নাড়ী।
ডুব দিওনা বাড়া বাড়ী ॥
হোলে পরে জ্বর জাড়ী।
যেতে হবে যমের বাড়ী ॥

এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজি ও গোঁসাইজির বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন।

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন সেনজি সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না? প্রসাদ তাহার উত্তর ছলে এই গান ধরিলেন,—

যথা—

তারার জমি আমার দেহ,
ইথে কি আর আপদ্ আছে।
ও যে দেবের দেব,
সুকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা ধর্ম্ম বেড়া,
এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কালা চোর কি করতে পারে,
মহাকাল রক্ষক রোয়েছে ॥
দেখে শুনে ছটা বলদ্ ঘরে
হতে বার হোয়েছে ॥ ১
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে,
পাপতৃণ সব কেটেছে ॥ ২

প্রেমভক্তি স্ফূর্ত্তি তায়,
অহর্নিশি বর্দ্ধিতেছে।
কালীকল্পতরুবরে রে ভাই,
চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৩

রামপ্রসাদ সেনের অবস্থাভেদের পদ্য সকল অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্ট রূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগবিরাগী হইয়া সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে গীত ছলে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞান যুক্ত প্রেমভক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী, এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরি মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

রামপ্রসাদ সেনের শক্তিভক্তিবিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বরপুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন "অন্নপূর্ণা" প্রতিদিবসেই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন, আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন, রন্ধন করিয়া দিতেন; এবিষয়ে অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে। যথা—"এক দিবস রামপ্রসাদ সেন বাটীর বেড়াবন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ, বাঁকারী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ বাঁকারী দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বন্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল যে "কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা" স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন, এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপারঘটিত জনরব কত আছে, যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ব্যতীত কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কখনই করেন নাই, কেননা তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন কথা উল্লেখ থাকিত।

ক্রমশঃ।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

আমাদের বাড়ীতে আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইতে, ৪৫ জন ছাত্রের সমস্ত খরচ চালাইতে হইত। অন্য অনেক দানধর্ম্ম অপেক্ষা, বিদ্যার্থীকে দান করা 'উনি' অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, তাই এই উদ্দেশে বেশী বেশী দান হইত। এই সকল ছাত্র যাহারা আমাদের বাড়ীতে থাকিত, উহাদের পাঠাভ্যাস শেষ হইলে,—শাকসব্জী তরকারী কেনা, ব্যাপারী কাপড়ওয়ালা মুদী প্রভৃতির দোকান হইতে আমার কথা মতো জিনিস আনা—এই সব কাজ উহারা করিত। উহাদের মধ্যে যাহারা বেশী চালাক ও অভিজ্ঞ তাহাদের দ্বারা হিসাব লেখা ও বিল চুকাইবার কাজ করাইয়া লওয়া হইত। এই অনুসারে 'উনি' মধ্যে মধ্যে জমাখরচ লিখিবার জন্য তাগিদ করিতেন। কোন জিনিস ধারে আনিবার নিয়ম ছিল না। শ-দুইশো টাকার মাল আনিবার পর, হিসাব পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত, ১০।১৫ দিনের দেনা থাকিয়া গেলে, মাসকাবারে সেই দেনার টাকা চুকাইয়া দিয়া তাহার রসিদ লইতে হইবে, এইরূপ উনি তাগিদ করিতেন। এই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা হইল কিনা, আমার ননদ দেখিতেন। সেই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে "ভট্" এই ডাক নামে কোঙ্কন প্রদেশের এক ছেলে ছিল। লেখার কাজে তার বেশ দক্ষতা ছিল, 'মোড়ী' অক্ষর সে সুন্দর লিখিতে পারিত; সেইজন্য জমাখরচ লিখিবার ভার তার উপরেই দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক মাসের দশ তারিখের মধ্যে লোকজনের মাহিনা ও দোকানদারদিগের বিল চুকাইয়া দিতে হইত। ইদানী কখন কখন চাকরদিগের বেতন দিবার সময়েই দোকানদারদের বিলের টাকাও তাহার হাত দিয়াই পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে, একই দিনে জমাখরচ লিখিবার সুবিধা হইত। কিন্তু কিছুদিন এইরূপ নিয়মে কাজ চলিলে পর, এই ছেলেটির মনে জুয়াচুরী করিবার মৎলব

আসিল। বিল চুকাইয়া দেওয়া ও জমাখরচ লেখা—এই দুই কাজই উহার হাতে থাকায় জুয়াচুরী ঢাকিবার বেশ সুযোগ পাইল। উক্ত 'ভটু' প্রায় দুই মাসের বিলের টাকা আমাদের নিকট হইতে লইয়া খাতায় খরচ লিখিয়াছে এবং বিল চুকাইয়া না দিয়া সে নিজে অসৎ কার্য্যে ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। এই জুয়াচুরী ধরা পড়িবার একটা কারণ ঘটিল:—একদিন আমার ননদ, এক পোয়া 'কাজু'-বাদাম মুদীর দোকান হইতে আনাইয়াছিলেন। মুদী উহা লইয়া আসিলে পর, আমার ননদ তাহাকে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই কাজু ছাড়া আমাদের পূর্ব্বেকার দেনা আর কিছু নেইত? এটাই কেবল ধারে এসেছে?" এই কথা শুনিয়া মুদী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কি? আপনি টাকা পাঠিয়েছিলেন কি? আমার তো গত দুই মাসের টাকা পাওনা আছে।" এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ননদ তাহাকে বলিলেন:—"আমরা কখনই ধার রাখিনে,—একথা তুমি জেনেও দুইমাস কাহাকে না জিজ্ঞাসা করে' চুপ করে' বসে' রইলে কি-করে?' তুমি তোমার দোকানের লোকদের কাছে অনুসন্ধান কর।" মুদী বাহির হইয়া যাইবার পরেই ঐ ছেলেটি বাড়ী আসিল; তখন ননদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি মুদীর টাকা কি চুকিয়ে দেওনি? সে একটুও ইতস্তত না করিয়া একেবারেই বলিল,—"আমি সকলেরই বিলই চুকিয়ে দিয়েছি।" তখন, ভয় পায় এমন কোন কথা তাকে না বলিয়া, ননদ তাকে শুধু বলিলেন—"যা, তোর পড়া অভ্যাস কর্‌গে যা," এবং দানা-ওয়ালা ও কাপড়-ওয়ালার দোকানে চুপি চুপি সিপাইকে পাঠাইয়া সন্ধান লইলেন,—দোকানদারেরা টাকা পাইয়াছে কিনা; উহারা টাকা পায় নাই শুনিয়া তিনি সিপাইকে বলিলেন—"তুই দেউড়ীতে বসে থাক্; কোন কাজের জন্য হরিকে দরজার বাহিরে যেতে দিস্‌নে।" সে দিনটা পরবের দিন; তাই, আহারান্তে দোকানদারদিগকে সম্মুখে ডাকাইয়া আনিয়া মুকাবেলা করিবেন এবং তাহার পর এই কথা "ওঁকে" জানাইবেন এইরূপ আমার ননদ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু হরির মনে সন্দেহ হওয়ায়—"বন্ধুর বাড়ী যেতে হবে, পুস্তক আনতে হবে" ইত্যাদি অছিলা করিয়া সে সদর দরজা দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সিপাইরা তাহাকে যাইতে দিল না। তখন সে "মার্কেটের" প্রাচীরের উপর দিয়া খাসগীবালার বাগানে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। একজন ছাত্র এই কথা ননদের কাছে গিয়া বলিল; কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না দেখিয়া, সে এই খবরটা আমার কাছে আসিয়া বলিল। এই কথা শুনিবামাত্র চারি পাঁচশো টাকার হিসাবের গোল হইতেছে, দিন-দুপুরে একজন লোক প্রাচীরের উপর দিয়া লাফাইয়া পলাইল এবং এত লোকজন ও সিপাই থাকিতে কেহ তাহাকে ধরিতে গেল না এইজন্য আমার এত রাগ হইল যে, আজ পর্ব্বদিন, আহারের পূর্ব্বে এই খবরটা ওঁকে দিলে ওঁর কষ্ট হবে, ওঁর খাওয়া হবে না—এ কথা আমি একেবারেই বিস্মৃত হইলাম, এবং আমি একেবারেই ওঁর নিকট গিয়া এই কথা জানাইলাম। আমার এই অধৈর্য্যের দরুণ আর এক জনের কাছে আমার উচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। "উনি" আমার কথা শুনিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না সত্য, কিন্তু বেশ বোধ হইল, উঁহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছে। কারণ, লিখিবার কাজ চলিতেছিল, তাহা বন্ধ করিলেন এবং আহারের সময় হইয়াছে বলিয়া সিপাই দপ্তর বাঁধিবার জন্য উপরে আসিয়াছিল, তাহাকে উনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই দেউড়ীর সিপাই, চুরী করে' একটা ছেলে পালিয়ে যাচ্ছে, সে কথা তোর খবরে এল না? যা, তার পিছনে পিছনে ছুটে যা, যেখানেই থাক সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আয়; কিন্তু তাকে মার-ধর করিসনে।" এই কথা বলিয়া,—কাছে একটা বই ছিল; সেইটা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি নীচে নামিয়া রান্না ঘরে গেলাম। সিপাই বকড় বকড় করিতে করিতে বাহির হইল:—"কে যাবে কোথায়? আমি এখনি তাকে ধরে আনৃচি"—এই কথা বড়াই করিতে করিতে সিপাই দেউড়ীতে গেল। আমার খুড়-শাশুড়ী ও ননদ ঠাকুরুণ ঘরে ছিলেন তাঁহারা এই কথা শুনিতে পাইলেন। তখন তাহারা সিপাইকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, এরই মধ্যে উপরে এ খবর কে দিলে? সিপাই বলিল,—"কে জানে কে দিলে; বৌ-ঠাকরুণ সেখানে ছিলেন, তিনিই হয়তো বলে থাকবেন, কে জানে। এই কথা শুনিবার পর আর কোথায় আছে!! ননদ বলিলেন, "দেখলে কাকী!! আজ পর্ব্বদিন, এই কথা খাবার আগে জানানো ভাল নয় বোলে আমি এতক্ষণ জানাই নি—না তো,—সে কি আমার কাকা মামা যে, ইচ্ছে করে তাকে পালাতে দিয়েছি? তাই কি, বৌ তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে এই খবরটা দিয়ে এল? আমাদের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক নেই!! আমরা কি কেউ নই!! সে কি মনে করে, একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী সেই? "যে আসে শেষাশেষি, তার ঝাল আরো বেশী"—এ যে দেখি তাই!" এই কথা শুনিয়া খুড়শাশুড়ী রাগে লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন; ওগো, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এই রকমই 'লাগানে' হয়ে থাকে; এই রকম লাগালাগি করে, স্বামীকে খুসী

করবার চেষ্টা। আজ পর্য্যন্ত ওর এ দোষটা দেখি নি। আমি বরং ওর পক্ষ নিয়ে বলতুম, ও অন্য দ্বিতীয়পক্ষ স্ত্রীর মতন নয়; কিন্তু আমার শীঘ্রই সন্দেহটা ঘুচলো! দিনকে দিন এক একটা গুণ বেরুচ্চে, বেশ, বেশ! এতদিন, যতই কিছু বলি না কেন, ওর রাগ হ'ত না; শুধু এখন তা খুবই চলছে! আগে ও জবাব ক'রত না, কিন্তু মুখ গোমসা করে থাকৃত। কিন্তু এখন—বেশ বেশ—খুব ভাল, খুব ভাল! সভার যেতে আরম্ভ করেছেন! ইংরেজি ত শিখছেই! দুচার জন বুড়ী বাড়ীতে আছে; তাদের তাড়িয়ে দেও না. তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। তারপর সাহেব মেম দুজনে বই হাতে ক'রে কেদারায় বোসো। আজকাল দেখি, সে দিনকে দিন মনে করচে, সেই ঘরের গিন্নী। চাকর বাকর তাঁরই তাঁবে আছে। লাভ লোকসান যা হয় যেন সব তারই। ওগো, অত কেঁপে উঠো না। আমরা বেঁচে থাকতে ওসব হতে দেব না! ও রকম লাগালাগি করলে লোকজন টিকবে কি ক'রে? হরি চুরী করেছে সে লোকসান ত আমাদেরই হয়েছে! ওর বাবারা কি সেই লোকসানের টাকা পূরণ করে দেবে? এই রকম লাগালাগি করে দেখনা কি কাণ্ড করে তুলেছে।" এইরূপ খুব রাগিয়া উচ্চৈস্বরে বকিতে বকিতে ঠাকুর-ঘর হইতে মাঝ-ঘরে আসিতেছিলেন। তিনি শেষ কথাগুলা বলিতেছেন, আর "উনি" নীচে নামিতেছেন—এমন সময়পথের মাঝে দুজনের সাক্ষাৎ ঘটিল; দুই তিনটা কথা ও'র কানে আসিয়াছিল। আগেই তাঁর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তারপর, এত কথা তিনি আমাকে অকারণ বলিতেছেন, নিজে স্বকর্ণে শুনিয়া 'ও'র' আর সহ্য হইল না এবং একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া উনি তাঁকে বলিলেন—"সত্য কথা বলৃতে হলে, এই কথা তোমাদেরই আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল; এবং চোরের পক্ষ নিয়ে ঘরের লোকদের নির্য্যাতন করা কেন? ও আমার কাছে বল্‌বে না তো কাকে বলবে?" এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"স্ত্রীর পক্ষ হয়েএতটা বলা কেন? আমি তার গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছাঁকা দিয়েছি নাকি? স্ত্রী যদি তোমার এত আদরের হয়, এত সুকুমার হয়, তুমি ওকে কাছে নিয়ে বোসে থাকো। কিংবা ওকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবী বলে পূজা কর। ইংরাজী পড়ে খুব চালাক হয়েছ তুমি মনে কর, কিন্তু তোমার একটুও বুদ্ধি নেই! আমাদের উপর তোমার যদি বিরক্তি হয়ে থাকে—তাই বলে স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে আমাদের অপমান কোরো না; তার চেয়ে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলনা কেন?" এইরূপ উল্টা চাপ দিয়া কথা বলার—ওঁর যে কখন রাগ হয় না উনিও রাগিয়া একেবারে বলিয়া উঠিলেন—"বেরিয়ে যেতে কে বারণ কচ্চে?" এই কথাগুলি মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র উনি বুঝিলেন, কথাটা বলা ভাল হয় নাই; চুক হইয়াছে, ওঁর গলার আওয়াজ তখনি মৃদু হইয়া আসিল এবং চুকটা শোধরাইয়া লইবার জন্য খুব নম্রভাবে খুড়শাশুড়ীকে বলিতে লাগিলেন; নানারকমে উনি তাঁকে অনেক কথা এইরূপ বলিলেন :—"বাড়ীর মধ্যে তুমিই সকলের বড়; রাগ করে তুমি যাই বলনা কেন, তা আমাদের শোনা উচিত। কখন যদি আমার চুক হয়, আমার কান মলিবার অধিকার কেবল তোমারি আছে। তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই বোলো, কিন্তু সত্য মিথ্যা একবার বিচার করে দেখো। এখন হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে পড়েছে, তারজন্য তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি"। এইরূপ স্পষ্ট করিয়া শেষে বলিবার পর, খুড়শাশুড়ীর রাগ একটু কমিয়া আসিল। বাড়ীর মেয়েদের সহিত সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করা—আমাদের বাড়ীর এই চাল পূর্ব্ব হইতেই আছে। বাড়ীর মেয়েদের মান্য করা উচিৎ, উত্তর দিয়া অমর্য্যাদা করিতে নাই, এইরূপ শ্বশুর মহাশয়ের ও আমার স্বামীর উপদেশ ছিল। আমাদের বাড়ীর মান্য সম্পর্কীয় মেয়েদের অপমানের কথা শোনা একেবারেই অভ্যাস ছিল না। তাই, আমার মান্য আত্মীয়াদের মনে কষ্ট হয় এরূপ কথা যাঁহার মুখে কখনই শোনা যাইত না, মেয়েদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা কখনই উচিত নহে এইরূপ যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার মুখ হইতে স্ত্রীর পক্ষ লইয়া কথা বলিতে শুনিয়া খুড়শাশুড়ীর ভয়ানক অপমান মনে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উপরি কথিত অনুসারে ক্ষমা চাহিবার পর তাঁহার রাগ কমিয়া গেল; তাঁহার সরল অন্তঃকরণ, কিছুদিন পরেই তাঁহার রাগ একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিলেও হয়। কিন্তু ওঁর মনে এই কথাটা বরাবর লাগিয়া রহিল। যখনি এই কথা তাঁর স্মরণ হইত, তখনি তিনি মনে করিতেন—"সেই সময় এতটা ক্রোধের বশীভূত কিরূপে হইয়াছিলাম?" এই সম্বন্ধে বারংবার তাঁহার পশ্চাত্তাপ হইত। খুড়শাশুড়ী ঠাকরুণের মৃত্যুর পর চি-আবা ভাইকে ও আমার ননদকে পুণায় 'উনি' যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও খুব দুঃখের সহিত উপরি-উক্ত গল্পের কথা বলিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আমার খুড়শাশুড়ী ঠাকরুণের প্লেগে মৃত্যু হয়।

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দিদিমার—আশীর্ব্বাদ।

(শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)

অনাম অজানা তুমি, অজানা জগতে আসিয়া
অন্তরের দুর্গ ভেদি, নিলে অন্তর কাড়িয়া।
আচম্বিতে কোথা হতে, তুমি যেন এসে উড়ে,
বসিলে প্রবল বলে, হৃদি সিংহাসন যুড়ে।
কিশল-কোমল তনু, প্রাণটুকু সুকুমার,
সহিতে পার না তুমি, কোন জোর কিম্বা ভার।
অতি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ তুমি, অক্ষম ও নিরুপায়,
বাঁচিতে পারনা হেথা, বিনা সেবা মমতায়
কিন্তু কি যে মহাশক্তি আছে তোমার ভিতর,
তব কান্না-ডাকে মোরা ছুটি আকুল অন্তর,
নিয়ে বুকভরা ক্ষীর, মুখভরা মিষ্ট বোল,
আদরমাখানো হাত, আদরবিছানো কোল!
তোমারে তুষিতে হই আস্ত পাগলের মত;
করি নানা অঙ্গভঙ্গী, চেঁচামেচি করি কত।

পুষিতে তুষিতে তোমা দিই ভাণ্ডার লুটিয়া,
তোমারে বাঁচাতে ব্যস্ত, নিজেরে যাই ভুলিয়া।
সম্রাটেরে তুষি পুষি, হয়ে ভয়েতে বিহ্বল,
দেখি তার অস্ত্র শস্ত্র, আর যত লোকবল।
তাহার হুকুমে করি প্রাণভয়ে প্রাণদান,
এড়াতে পারিলে তারে, আনন্দে করি প্রস্থান।
তোমার অবল বল, এমনি তাহা প্রবল,
তোমারে ছাড়িতে মোরা, কাঁদিয়া হই বিহ্বল।
স্বেচ্ছায় আঁকড়ি তোমা বুকেতে ধরি চাপিয়া,
রাখিতে চাহি তোমায়, শত যাতনা সহিয়া।
প্রবল সম্রাট্ হতে, সমধিক বল তব,
সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী পায় তব কাছে পরাভব॥
অনাম অতিথি তুমি, এসেছ মোদের ঘরে,
একটী সুন্দর নাম পেয়েছি তোমার তরে।
আনন্দে করিব আজি তোমার নামকরণ
নামটী সার্থক করো, লভো সুদীর্ঘ জীবন!

চিত্রপরিচয়।

বর্ত্তমান সংখ্যায় ভারতের দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দরের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল। প্রথমটি মান্দ্রাজ বন্দরের। দ্বিতীয়টি পর্ত্তুগীজ রাজ্যের মার্ম্মগোয়া বন্দরের।

মান্দ্রাজ বন্দর লোক কোলাহলপূর্ণ প্রধান নগরীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া জীবলোকের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর দ্বিতীয়টি পর্ব্বতবনরাজীবেষ্টিত লোক-জন-বর্জ্জিত নিভৃত শান্তিময় স্থান অধিকার করিয়া মঙ্গল-স্বরূপ শান্তিদাতার শান্তিময় ইচ্ছা পরিঘোষণা করিতেছে।

এই দুইটি ছবির মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মরূপ দুইজন নাবিক সকল কোলাহলের আকর-ভূমি ইহলোক হইতে যেন জীবগণকে শান্তিধামে লইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

ভাবুক পাঠকহৃদয়ে এই কবিত্বময় মহাভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিবার মানসে চিত্রগুলি প্রদত্ত হইল।

প. ব.।

একখানি পত্র।

[রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং আমাদের পরম হিতৈষী জনৈক বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা আনন্দসহকারে নিম্নে প্রকাশ করিলাম। আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ যদি এই বন্ধুর ন্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তবে ইহার উন্নতির জন্য আমাদিগকে কিছুমাত্র চিন্তিত হইতে হয় না। তং বোং সং।]

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা এক সময়ে বঙ্গদেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা বাংলা-দেশের সর্ব্বপ্রাচীন মাসিকপত্রিকা।

"আনন্দের বিষয় যে তত্ত্ববোধিনীর উন্নতিকল্পে আজ-কাল বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গ্রাহক অনুগ্রাহক-গণের সাহায্য ব্যতীত ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সম্ভবপর নহে।

"তত্ত্ববোধিনীর গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করিলে অনায়াসে তাঁহাদিগের বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। এজন্য আমার প্রস্তাব এবং একান্ত অনুরোধ যেন তাঁহারা এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়া দেখেন।

"তত্ত্ববোধিনীতে আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহাতে নূতন গ্রাহক সংগ্রহের কতক সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

"আমি তত্ত্ববোধিনীর কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। তন্মধ্যে কয়েকটি নাম এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।"

২৭শে মে, ১৯১৮।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ রাঁচিতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীসুনৃতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাহার পিতামহী তদুপলক্ষে একটী কবিতা রচনা করিয়া পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিলাম। আমরা শ্রীমান্ সুনৃতেন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সংবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধগুলি জনসাধা-রণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। গত ১লা শ্রাবণ তারিখের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শ্রীসত্যানন্দ দাস লিখিত "দুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার" প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। গত ৪ঠা ভাদ্র তারিখের শিক্ষাসমাচার পত্রে ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয়ের লিখিত "চাখড়ির আত্মকাহিনী" উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিবেদন।

কমলাকান্ত-প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি আমি কালীভক্ত কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি। রামপ্রসাদী পদাবলীর পরই কমলাকান্তের পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় কমলাকান্তের জীবনীকথা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় কেহই আলোচনা করেন নাই। রামপ্রসাদের জীবনী লিখিয়া আজ আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্গবাসীর নিকট, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান-বাসীদের নিকট আমার এই প্রার্থনা তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তাহা হইলে আমার ও বঙ্গভাষার পরমোপকার সাধন করা হইবে। শুনিয়াছি ফরিদপুর থানথানাপুরের ভূলুয়া সন্ন্যাসী ও "পল্লীবাসী" সম্পাদক সাধকের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। "পল্লীবাসী" সম্পাদককে আমি এ বিষয়ে চিঠি লিখিয়া কোনই উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ বাঙ্গালী সমাজ যে অনুসন্ধান ব্যাপারে উদাসীন ইহা আমি প্রসাদের জীবনী লিখিবার সময় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি। নিরুৎসাহ না হইয়া আমি পুনরায় বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইলাম। আশা করি এবার মিলিত বাঙ্গালী আমাকে কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি।

Po. Ranchi-Sectt.
Govt. Quarter B/20
Dorenda—(B & O.)

নিবেদক—
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১। কমলাকান্তের জন্মস্থান কালনা কি মাতুলালয় চান্না গ্রামে। এই চান্না গ্রাম থানা-জংসনের নিকটবর্ত্তী।

২। ইনি কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর পিতৃবংশের বংশতালিকা কাহারও জানা থাকিলে লিখিবেন।

৩। ইহাঁর জন্ম সন ও তারিখ জানিবার কোন উপায় আছে কিনা?

৪। ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন? ইহাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল কি না?

৫। স্বর্গীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে কমলাকান্ত পদাবলী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানা কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়া করিয়া রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইবেন। আমি বইখানা দেখিয়া তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইব।

৬। কথিত আছে উক্ত মহারাজা বাহাদুর সাধকের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পুস্তক আনাইয়া উহা সংগ্রহ করেন। এই মহিলার কোন আত্মীয় জীবিত আছেন কিনা এবং থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। এই পাণ্ডুলিপি এখন কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

৭। কথিত আছে, কমলাকান্ত 'সাধন পঞ্চক' (ষট্‌চক্র নিরূপণ) নামে একখানা গ্রন্থ (বাংলা পয়ারে) লিখিয়াছিলেন। 'সাধন পঞ্চক' যে কমলাকান্তের রচিত ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা।

৮। কমলাকান্তের কত বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়; বর্ত্তমান বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার কমলাকান্ত নাটিকার ১ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ''দামোদরের বেলাভূমিতে তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল।' এই চিতাভূমি এখনও নির্ণয় করা যায় কিনা? এই পুণ্যস্থানে কমলাকান্তের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং সেই সময়ে 'কালী সব ঘুচালি লেটা' এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী সাধকের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল।

৯। কমলাকান্ত সম্বন্ধে কোনও অপ্রকাশিত জনশ্রুতি কাহারও জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

১০। অপ্রকাশিত কমলাকান্ত পদাবলী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন।

১১। কমলাকান্তের নামের সহি এবং তাঁহার হাতের লেখা থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন, উহা আমি ব্লক করিয়া ছাপাইব।

১২। সাধকের শেষ সঙ্গীত— 'কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি স্মরণ লব।'

এই পদটীর সম্পূর্ণ অংশ কাহারও জানা থাকিলে আমাকে লিখিবেন।

১৩। কোটাল হাটের কমলাকান্তের গৃহের প্রাঙ্গণে যে স্থানে (তৃণশয্যায়) ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থান এখনও নিরূপণ করা যায় কি না?

১৪। কমলাকান্তের তৈল চিত্র পাইবার কোন উপায় আছে কি না?

১৫। কমলাকান্ত নিজেই কি গানগুলি লিখিয়া রাখিতেন, না অপর কেহ গান গাহিবার সময় লিখিয়া লইতেন, এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

১৬। কাল্‌নার সাধকের কোন চিহ্ন এখনও আছে কি না?

১৭। চান্নাগ্রামের বিশালাক্ষী দেবী কত কালের; ঐস্থানে যে কমলাকান্ত সাধনা করিতেন ইহার কোনও প্রমাণ আছে কি না?

১৮। বঙ্গসাহিত্যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর (১২৬৪ সাল), ৺শ্রীকান্ত মল্লিক (১২৯২ সাল), 'সাধক সঙ্গীত' রচয়িতা (১৩০৬ সাল) ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহ, 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২ সাল) লেখক শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী। এই কয়জন ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যিক কমলাকান্তের পদাবলীর আলোচনা করিয়াছেন কি না?

১৯। পদাবলী পড়িয়া মনে হয় কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং দক্ষিণাকালী তাঁহার বীজমন্ত্র ছিলেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন।

২০। 'ওকগাঁয়ের ডাঙ্গায়' স্থান নির্দ্দেশ এখনও করা যায় কি না। এই মাঠ কোথায়? চান্নাগ্রামের নিকট কি?

Tattwabodhini Patrika   Reg. No. C. 462.

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বাঙ্গলা ১৩২৫। খৃষ্ট ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা আশ্বিন, বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।
ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আমায় রাখো।

বেহাগ।

আমায় রাখো আমায় রাখো।
তুমি গো জননী দিবস রজনী
হৃদয়ে জাগো
হৃদয়ে জাগো।
তোমারে ছাড়িয়া আকুলিত হিয়া
ভ্রমি যে কোথা জানি নাকো
তবু যে মা শুনি তোমারি মধু বাণী—
করুণ স্নেহ স্বরে তুমি ডাকো
তুমি ডাকো।
বিরহ তোমার সহেনাকো আর
প্রাণ চাহে সদা কাছে থাকো
কাছে থাকো।
আর কিবা চাহি বল, চাহি শুধু ক্ষমা কর
অপরাধ মম লাখো লাখো;
তোমারি শীতল কোলে লহগো আমায় তুলে
বারেক মা-গো—
আমার মা-গো।

উদ্বোধন

আমি জানি না আপনাদিগকে কি প্রকারে উদ্বোধিত করিব। কেমন করিয়া, কোন্ কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আপনাদের অনুরাগ, আপনাদের ভগবদ্ভক্তি জাগাইয়া তুলিব তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি নিজেই এ বিষয়ে এতই পশ্চাৎপদ ও হীন যে আপনাদিগকে এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহসেই কুলাইতেছে না। আর, আপনাদিগকে জাগাইয়া তুলিবই বা কি? আপনারা তো নিজেরা উদ্বুদ্ধ হইয়াই এখানে আসিয়াছেন—জাগরণ তো সঙ্গে করিয়াই আপনারা আনিয়াছেন। আপনাদের হৃদয়ে জাগরণ না আসিলে কি আপনারা দূর-দূরান্তর হইতে ব্রহ্মনাম শুনিবার জন্য এই উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইতেন? সমস্ত বাধাবিঘ্ন ও আলস্য পরিত্যাগ করিয়া আজ যে এই উপাসনামণ্ডপে আসিয়াছেন ইহাই তো আপনাদের জাগরণেরই পরিচয়।

অনেকে এখানে আসেন নাই। যাঁহারা এখানে আসেন নাই, তাঁহাদের অনেকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতিকে একটা ফাঁকা ফাঁকা বস্তু বলিয়া ধরেন। তাঁহাদের মতে একেবারেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে যাওয়া অসম্ভব—ধাপে ধাপে উঠিয়া তবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণে তাঁহারা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" অর্থাৎ সাধকদের মঙ্গল বা সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এই বাক্যের বড়ই সমর্থন করেন। যে ভগবানের নাম, যে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলেরই

আত্মাতে সমভাবে বিদ্যমান আছে, সেই ভগবানের, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের আর রূপ কল্পনা করিব কি? এই যে প্রকৃতিতে সকলের জন্য সমানভাবে বাতাস, জল রৌদ্র প্রভৃতির সদাব্রত উন্মুক্ত আছে, এই সকল বাতাস, জল, রৌদ্রের কি আমরা কোন রূপ কল্পনা করিতে পারি? যদি এই একটী কঠিন বস্তুকে বাতাস প্রভৃতির রূপ বলিয়া বর্ণনা করি, তবে তাহা কি অপ্রকৃত কল্পনা হইবে না? তেমনি অনন্তস্বরূপ ভগবানকে একটী কল্পিত রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিলে তাহা কি নিতান্তই অপ্রকৃত হইবে না?

তারপর, আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যখন ব্রহ্মজ্ঞান অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, তখন ব্রহ্মের রূপকল্পনার প্রয়োজন কি? আমারও পূর্ব্বে একটী সংস্কার দাঁড়াইয়াছিল যে সহজে ব্রহ্মের দ্বারে পৌঁছিবার জন্য বুঝি বা তাঁহার রূপকল্পনা আবশ্যক। কিন্তু সে সংস্কার নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল আমি একবার পুরীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটী তিন বৎসরের বালক যখন সমুদ্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "এত জল কে ঠেলিতেছে", তখনই দেখিলাম যে সেই শিশুরও হৃদয়ে ব্রহ্মের একটী মহান ভাব নীরবে কার্য্য করিতেছে। আবার, একজন "নিলুয়া" (যাহারা সাঁতার শেখায় তাহাদিগকে নিলুয়া বলে) তাহার চার পাঁচ বৎসরের বালককে সমুদ্রে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল দেখিলাম। দেখিয়া আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হইল যে— একি করিল! পরক্ষণে দেখি যে সেই বালকটী ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। আমি বাঁচিলাম ভাবিয়া যে বালকটীর প্রাণরক্ষা হইল। তখন সেই নিলুয়াকে এ প্রকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে, সে তাহার পুত্রকে সাঁতার শিখাইবার জন্য এই কাজ করিয়াছিল। আমি অবাক হইয়া ইঙ্গিত করিলাম যে, অতটুকু শিশুকে প্রথমে পুকুরে, পরে নদীতে, সর্ব্বশেষে সমুদ্রে সাঁতার শিখাইতে হয়। তদুত্তরে সে স্পষ্ট বলিল যে নদীতে পুকুরে হাজার সাতার শিখাইলেও সমুদ্রের ভয় যাইবে না, তাই সে একেবারেই সমুদ্রে সাঁতার দিতে শিখাইতেছে। আমার চমক ভাঙ্গিল, পূর্ব্ব সংস্কার নির্ম্মূল হইল। বুঝিলাম যে আমাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্ঞান ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কল্পিত রূপের ভিতর দিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, একেবারেই জীবনের প্রথম অবধিই ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষরূপে ধরিতে হয়।

প্রকৃতই, তাঁহার রূপকল্পনা করিব কি? তাঁহার রূপ প্রকৃতিতে তো ছড়াইয়া আছে। তাঁহার মুকুটে যে চন্দ্র সূর্য্য দিবানিশি জ্বলজ্বল করিতেছে, তাঁহার মুখের হাসি যে শত শত ফুল্ল কমলে, শত শত পুষ্পরাজিতে বিকসিত হইতেছে, তাঁহারই আশ্চর্য্য প্রভা এই যে সমস্ত প্রকৃতিতে বিছাইয়া আছে, যদি তাঁহার রূপ দেখিতে হয় তবে এই সকলেই তো দেখিব। তিনি নিজে নিজের রূপ যেমন দেখাইতেছেন, তাহাই তো দেখিব—আমাদের মনগড়া রূপের মধ্যে তাঁহাকে আনিব কি প্রকারে?

তাই আমরা বলিতে চাই যে আমরা যেন আসলে আলস্যের কারণে রূপকল্পনার দোহাই দিয়া ঈশ্বর হইতে দূরে না সরিয়া যাই। এই উপাসনামন্দিরে তাঁহার পূজার একটী আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে সেই ব্রহ্মোপাসনার সরল পথ অবলম্বন করি। সেই মহান্ পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য যেন তাঁহারই প্রদর্শিত মুক্ত পথ অবলম্বন করি, শত সহস্র কল্পিত রূপের সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট যাইতে চাহিলে অনেক সময়েই প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলি। বাহিরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যেমন তাঁহাকে সহজে দেখিতে পাই তেমনি ভক্তজনদিগের অন্তরে ভক্তির ভিতরে, মানুষের স্নেহ প্রীতি দয়া প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাকে আরও কত সহজে দেখা যায়। শৈশবাবধি শুনিয়া শুনিয়া রূপকল্পনার প্রতি একটা অযথা আস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এখন পরীক্ষা দ্বারা তাহার ভিত্তি বড়ই দুর্ব্বল দেখা যাইতেছে। সেই সংস্কার ছাড়িয়া দিয়া এবার আমাদিগের প্রত্যক্ষভাবে সেই স্নেহময়ী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে হইবে। আসুন সকলে, পিছাইয়া থাকিবার আর সময় নাই।*

* আদিব্রাহ্মসমাজ, ১১ আষাঢ় ১৩২৫।

ভাদ্রোৎসবে ব্রাহ্মসম্মিলন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী গৃহপ্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ঐ পবিত্র দিনটী ব্রাহ্মসাধারণের মাঘোৎসবের দিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬ই ভাদ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত হয়। ঐ দিনটীর গৌরব স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হইয়া থাকে। এ বৎসর আমাদের সুহৃৎ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলিত উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, উক্ত সমাজের সম্পাদক ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়গণের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাঁহারা সকলেই সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভাও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ব্রজগোপাল বাবু প্রভৃতির ইচ্ছাক্রমে ক্ষিতীন্দ্র বাবু ইহার বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিলেন। রামমোহন লাইব্রেরি এই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ আহ্বানপত্রে "অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইবে" এই কথা না থাকিলে লাইব্রেরির হলটি ব্যবহারের জন্য দিবার অক্ষমতা জানাইবার কারণে এবং আহ্বানকারীগণের মধ্যে কেহ কেহ "অসাম্প্রদায়িকভাবে" এই কথাটী আহ্বানপত্রে রাখিবার বিরুদ্ধে দৃঢ় অসম্মতি জানাইবার কারণে লাইব্রেরিহল পাওয়া গেল না। সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় নবনির্ম্মিত ঐ কলেজের সুবিস্তৃত সভাগৃহটী আমাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তিন ব্যক্তির নামে আহ্বানপত্র বাহির করা হইয়াছিল। সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনার প্রস্তাব ও কার্য্যে পরিণতির মধ্যে অবসর এত অল্প ছিল যে বিশেষ চেষ্টা সত্বেও আহ্বানপত্র সকলের নিকট যথাসময়ে পৌঁছায় নাই। তাহার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। উপাসনার সময় সন্ধ্যা ৬॥০টা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহার অনেক পূর্ব্বেই সুবিস্তৃত ঘরটী শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্থানাভাবে অনেককে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় দেড় শত মহিলা ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথম সমবেতভাবে ওঁ পিতানোঽসি প্রভৃতি অর্চ্চনা পাঠ করিয়া উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া যখন মিলিত কণ্ঠে এই অর্চ্চনায় যোগদান করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিভাবের যে কি এক তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বোঝানো অসম্ভব। তাহার পর ভাই ব্রজগোপাল বাবু, আচার্য্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং ক্ষিতীন্দ্র বাবু বেদী গ্রহণ করিলেন। তৎপরে আদিব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুমধুর কণ্ঠে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত "শুভদিন ক্ষণ শুভ এই মাসে" এই সুপ্রসিদ্ধ সময়োপযোগী গান করিলেন। তৎপরে ব্রজগোপাল বাবু স্বল্পাক্ষর ও সারদিগ্ধ কথায় সমাগত ব্রহ্মোপাসকগণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সেই তড়িৎ-সঞ্চারক সুপ্রসিদ্ধ গান "ভাব সেই একে" গীত হইল। তদনন্তর তত্ত্বভূষণ মহাশয় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মন্ত্র অবলম্বনে আরাধনা করিয়া "অসতো মা সদগময়" প্রভৃতি মন্ত্রে তাহার উপসংহার করিলেন। তাঁহার আরাধনাকালীন উপদেশের সার মর্ম্ম আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

তৎপরে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর রচিত "মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে" গানটী রামপ্রসাদ সুরে গীত হইল। গান হইয়া যাইবার পর ক্ষিতীন্দ্র বাবু যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। অবশেষে অতীব করুণ ভাষায় ভাই ব্রজগোপাল একটী প্রার্থনা ও "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" শান্তিবাচন করিলে পর রবীন্দ্রনাথের "একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক" গান গাওয়া হইল। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

উপাসনা অন্তে সকলেই মধ্যে মধ্যে এইরূপ সম্মিলিত উপাসনার আবশ্যকতা ও সার্থকতা স্বীকার করেন।

আমরা ভাবি নাই যে সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনায় সকলে এত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে অগ্রসর হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন প্রতি ভাদ্রোৎসবে এই সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনাকে একটী স্থায়ী অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, তিনি সকল ব্রহ্মোপাসকেরই হৃদয়ে সত্যকার একটা মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও সম্প্রীতি জাগ্রত করিয়া তুলুন।

আরাধনা।

(শ্রীসীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ)

হে স্বপ্রকাশ দেবতা, হে চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, নিজ আলোকে নিজে প্রকাশিত রয়েছ, আবার নিজগুণে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েছ। তুমি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য। তুমি আমাদের চিন্তাস্রোতের, আমাদের স্তবস্তুতির, আধার আশ্রয় হয়ে রয়েছ। উপাসনার ধূপগন্ধ, স্তবস্তুতির সৌরভ, তোমার অতীব প্রিয়। তুমি আমাদের ভক্তি চাও, তাই তুমি তোমার এই পুত্র কন্যাদিগের চিত্তকে তোমার জীবন্ত স্পর্শে জাগ্রত করে তাহাদিগকে তোমার পূজায় প্রবৃত্ত করেছ। তুমি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা, তুমি আলোক, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তুমি চালক, তুমি শিক্ষক, তুমি গুরু, তুমি আচার্য্য, তুমি পথ, তুমি গম্য স্থান। নিজের দীনতায়, নিজের অনীশভাবে মুহ্যমান হয়ে যখন দেখি—অনন্তস্বরূপ তুমি আমার আধার আশ্রয় হয়ে রয়েছ, তখন আশ্বস্ত হই। তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত শক্তি আমার সহায়, তোমার অনন্ত জ্ঞান আমার চালক। আমরা যতই ভ্রমপ্রমাদে পতিত হই না কেন, তুমি সমুদয় সংশোধন করবে জানি। তোমার সহস্র বাহু আমাদের রক্ষক, আমাদের কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই। তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আমাদের পৈত্রিক অধিকার। এই রূপে, হে অনন্ত, তোমার সহিত নিগূঢ় যোগ অনুভব করে সমুদায় শোকের অতীত হই। তোমার আনন্দ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করে। তুমি পূর্ণানন্দ হয়েও যেন আমাদিগকে তোমার আনন্দ না দিয়ে তৃপ্ত নও। আমাদিগকে নিয়েই তোমার পূর্ণানন্দ, আমাদিগকে নিয়ে তুমি সর্ব্বদা ব্যস্ত রয়েছ। এই যে জীবের সঙ্গে তোমার নিত্যলীলা, এতেই তোমার প্রেমের সাক্ষাৎ নিদর্শন পাচ্ছি। এই তোমার অনিমেষ প্রেমদৃষ্টি, এই তোমার মধুর প্রেমস্পর্শ। জীবকে না হ'লে তোমার চলে না, ইহা তোমার এই ব্যবহারে স্পষ্ট দেখ্ছি। তোমাকে পিতা বলে তৃপ্তি হয় না, কোনও পার্থিব পিতা প্রাণের এত কাছে এসে প্রেম দেয় না। তোমাকে মাতা বলেও তৃপ্তি হয় না, কোন পার্থিব মাতা আত্মার এত নিগূঢ় স্থানে এসে স্নেহ জানায় না। পৃথিবীর কোন সম্বন্ধই তোমার এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ কর্ত্তে পারে না। মানব তোমার অতীব প্রিয়, মানবের জন্যই তোমার এই সৃষ্টি। তারই জন্য আকাশ, তারই জন্য বৃক্ষলতা, তারই জন্য ফলপুষ্প, তারই জন্য জল-বায়ু, তারই জন্য শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-দর্শন, তারই জন্য সমাজ ও ধর্ম্মবিধান। এই জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধানে তুমি অদ্ভুত প্রেমলীলা কচ্ছ। তুমি আমাদের সমুদায় চেষ্টা, সমুদায় সংগ্রাম, সমুদায় বিবাদ বিরোধের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত কচ্ছ। তুমি আমাদের চিরসম্বল, তুমিই আমাদের একমাত্র অদ্বিতীয় প্রভু, আমাদের হৃদয় মনের একমাত্র অধিকারী, আমাদের একমাত্র সাধন, একমাত্র সিদ্ধি। তোমার পূর্ণতা, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার মাধুর্য্য, আমাদের প্রতি জনের জীবনে প্রতিবিম্বিত না কল্লে তোমার তৃপ্তি নাই। তুমি আমাদের জন্য, আমরা তোমার জন্য। তোমার পবিত্র চিন্তা আমাদের চিন্তা হবে, তোমার পবিত্র দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টি হবে, তোমার পবিত্র চেষ্টা আমাদের চেষ্টা হবে। আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হব, আমরা প্রত্যেকে তোমার প্রতিমূর্ত্তি হব। আমরা তোমার পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ

করি, তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। তোমার ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পূর্ণ হউক্, পূর্ণ হউক্, পূর্ণ হউক্।

ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ। *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।
তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার।

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া পূজ্যপাদ পিতামহদেব আমার স্কন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় গুরুভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অনেক উন্নত আশাভরসা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, সত্য কথা বলিতে কি, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় যে, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বড়ই আশা ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাইব এবং ব্রহ্মোপাসকদিগের সমবেত চেষ্টার ফলে ব্রহ্মোপাসনাকে কেবল ভারতবাসীর নহে, সমগ্র জগতবাসীর সকল কার্য্যেরই নিয়ামকরূপে অচিরকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজের কেবল তিন শাখার পরস্পরের মধ্যে নহে, প্রত্যেক শাখার উপশাখাসমূহেরও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির একান্তই অভাব ; এতই অভাব দেখিয়াছিলাম যে, জগতে ব্রহ্মোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত দেখা দূরে থাক্, ব্রাহ্মসমাজের জন্মভূমি এই কলিকাতা নগরেই আন্তরিক ব্রহ্মোপাসনা অচিরে বিলুপ্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। এবিষয়ে মহর্ষিদেবের সহিত আলাপ আলোচনা উপস্থিত হইলেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, রাজা রামমোহন রায় কোথায় বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য "বিগতবিবাদং" পরমেশ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিলেন, আর সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মনোমালিন্যের প্রাবল্য দেখিয়া কেবল আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণেরও অনেকে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে আমি প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাখি বলিয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মিলনের আশা আমি কখনই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করি নাই। তাই আজ কয়েক দিন হইল, যখন আমার এক বন্ধু ৬ই ভাদ্র দিবসে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনা ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাইলাম। আমি সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এই মঙ্গল প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম এবং আনন্দের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে তাঁহারা সকলেই আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সম্প্রীতির অভাব দেখিয়া যেরূপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়াছিলাম, আজ সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকদিগের সহিত মিলিতভাবে ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান করিবার অবসর পাইয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলুন; এবং তিনি আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলুন যে আমরা বিগতবিবাদং এর উপাসক হইয়া সত্যসত্যই বিগতবিবাদ হই।

যে দিনে আমরা আমাদের মাতার চরণে সম্মিলিতভাবে হৃদয়ের পূজা নিবেদন করিতে আসিয়াছি, যে দিনে আমরা এক পিতার সন্তান বলিয়া, গুরুভাই বলিয়া পরস্পরকে পরস্পরের বক্ষে টানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়া এখানে আসিয়াছি, সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাদ্রকে আমরা ব্রাহ্ম-

* ৬ই ভাদ্রের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সিটিকলেজের হলে বিবৃত।

সমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গৃহপ্রতিষ্ঠা একটী আনন্দের দিন বটে, কিন্তু ভিত্তি সংস্থাপিত না হইলে গৃহপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হইতে পারে না, তাই গৃহস্থের পক্ষে ভিত্তিস্থাপনের দিনও একটী আনন্দের দিন। সেইরূপ যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা আপনাদিগকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির স্রোতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগবন্ধনের পথ প্রথম প্রদর্শন করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মসমাজ ১১ই মাঘে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ১১ই মাঘও যেমন ব্রাহ্মসমাজের নিকট পবিত্র মহোৎসবের দিন, এই ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বীজ ভারতবর্ষে রোপিত হওয়ায় এই ৬ই ভাদ্রও ব্রাহ্মসমাজের একটী উৎসবের দিন।

এই দিনের পবিত্রভাব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি কি না সন্দেহ। যাঁহারা এই দিনের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার বীজ এদেশে রোপিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে নির্ব্বাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া আসে। আজ ৯০ বৎসর হইতে চলিল, এই দিনে এই দুর্ব্বল ভারতের দুর্ব্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের বীজ রোপিত করিয়া জগতের ভাবসাগরে এমন একটী তরঙ্গ চালাইয়া দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগতকে স্বীয় করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একজন বাঙ্গালী দ্বারা সেই তরঙ্গ প্রথম পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে গৌরব অনুভব করিতেছি। আজ দেখি যে, পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর ভাবতন্ত্রে স্বীয় সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—কিন্তু এই ৬ই ভাদ্রে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের বীজ প্রোথিত না হইলে, জন্মাবধি ব্রাহ্মসমাজের শ্যামল ছায়ায় মুক্ত বাতাসে তিনি লালিত পালিত না হইলে আমরা তাঁহাকে এখনকার রবীন্দ্রনাথ-রূপে পাইতাম কি না সন্দেহ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন দুঃসাধ্য। কিন্তু যে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত শত বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের উপায়স্বরূপ ধর্ম্মমহাসঙ্ঘের কল্পনা নিঃসৃত হইয়াছিল, এই পবিত্র ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মসমাজের বীজ বঙ্গদেশের সরস ভূমিতে উপ্ত হইবার ফলেই আমরা সেই ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লাভ করিয়াছিলাম। যিনি যাহাই কেন বলুন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নব্যযুগে বঙ্গদেশের এবং ভারতের যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজই তাহার মূল। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল আত্মার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা না করিলে ভারতবাসী স্বামী বিবেকানন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীনতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বন্ধন যদি অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া না ফেলিতেন, তবে ভারতবর্ষীয়ের উচ্চতর রাজপদে প্রবেশ লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্দ্রনাথকে অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সম্মুখে উন্নত আশার প্রথম দীপ্ত দীপধারক সুরেন্দ্রনাথকে পাইতাম কি না জানি না; জড় ও জীবের সামঞ্জস্যপ্রকাশক জগদীশচন্দ্রকে অথবা রসায়নবিদ্যায় অন্যতর অগ্রণী প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, নব্যযুগে ভারতের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উন্নতি দেখিতে পাই, এবং ভারতের যে কোন সত্যসুন্দরমঙ্গল ভাব জগতের গাত্রে স্বীয় মঙ্গল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, সেই সকলেরই মূল পত্তনভূমি ব্রাহ্মসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজের বীজরূপে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব যে শুভদিনে, সেই শুভদিন কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন—জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ।

আমাদের দেশে কৃষকেরা বৎসরের মধ্যে প্রথম যে দিন নিজ নিজ ক্ষেত্রে হল চালনা করে, সেই দিনকেই সাধারণত পুণ্যাহ বলা হয়। * আমাদের

* 'পুণ্যাহে লাঙ্গলযোজনং"—পারস্কর গৃহ্যসূত্রে।

শরীর রক্ষার জন্য যে দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যের সংগ্রহচেষ্টার প্রথম দিনকে যে পুণ্যাহ বলা হইবে, ইহা মোটেই অসঙ্গত নহে। ইহা যদি অসঙ্গত না হয়, তবে যে স্বাধীনভাব আত্মার একমাত্র জীবন, সেই আত্মার স্বাধীনতা সর্ব্বপ্রথম যে দিন জনসাধারণের নিকট বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই পবিত্র দিনকে যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত খুবই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

আমাদের দেশে অন্যান্য শুভদিনের ন্যায় পুণ্যাহেরও কার্য্য আরম্ভ হয় ভগবানের পূজা দ্বারা। যিনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে, দুর্ব্বল-সবলনির্ব্বিশেষে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যিনি সকলের পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাঁহারই পবিত্র নাম যখন বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইতে সূত্রপাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহকেও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার পক্ষে সেই ভগবানেরই চরণতলে আমাদের সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর ভক্তিকুসুম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকৃষ্টতর উপায় আছে কি না সন্দেহ। প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীর মনের স্বাভাবিক গতিই ধর্ম্মের দিকে। যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন, ভারতবাসীর অন্তরে একটা ধর্ম্মভাব, ভগবানের প্রতি একটা আত্মনিবেদনের ভাব, প্রকাশ্যভাবে বা অন্তঃসলিলভাবে, সর্ব্বদাই সকল অবস্থাতেই কার্য্য করে দেখা যায়। তাই উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্ব্বাহে প্রত্যেক শুভদিনে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের পূজা করিয়া তবে অন্যান্য শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবানের প্রসাদে আমরা এই পবিত্র দেশে, সত্যধর্ম্মের আদিভুমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ষই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে এবং আবহমান কাল শিক্ষা দিয়া আসিতেছে যে, আমাদের সকল কর্ম্মকেই, আমাদের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্ম্মকেই ভগবৎ-কেন্দ্রক করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতের অধিবাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে প্রতি নিশ্বাসকে ভগবৎ-কেন্দ্রক করিয়া না তুলিলে নিস্তার নাই—রক্ষা নাই; প্রকৃত সুখশান্তি পাওয়া যাইতে পারে না। আমরা স্থির জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য হৃদয়ের দেবতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে পরিণামে বিনাশের পথে নামিতে হয়।

অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারতবাসী এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগত আজ পর্য্যন্ত এই সত্য অন্তরে সম্যক্ ধারণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্কর মহাসমরেরও ফলে পাশ্চাত্যদিগের অন্তরে ইহা সম্যক্ বিস্ফুরিত হইবে কি না সন্দেহ। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, প্রাপ্ত-যৌবন বালক সকল কাজ সকল ঘটনাই আত্মকেন্দ্রক করিয়া দেখে, এবং সেই কারণে প্রধানত নিজের দৈহিক বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মকৃত কার্য্যের সমস্তই ভাল দেখে, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদিগেরও শ্রেষ্ঠত্ব ও সদ্গুণ সমূহের প্রতি তাহার দৃষ্টি অনেক সময়েই অন্ধ থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কঠোর কশাঘাত পাইতে পাইতে তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে থাকিলে সে ক্রমশ আপনার অতিরিক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের মহত্ব উপলব্ধি করে এবং তখন সে আপনাকে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগতও বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কর্ম্ম সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে তুলিতে পরিণামে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ত্তমান মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগত প্রকৃতপক্ষে অন্তর হইতে ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে বিদায় প্রদান করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাসমরের কঠোর আঘাতে এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতের অন্তর হইতে বলদর্প ধনদর্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মূলভাব সকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে আশা আছে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসূ দর্প সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের পথিক করিয়া দিবেন।

আমাদের দেশে পুণ্যাহের সূত্রে দুইটী প্রধান কার্য্য সংসাধিত হয়—রাজা ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন, এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সম্প্রীতিবর্দ্ধন। এই দিনে রাজা প্রজাকে চিনিয়া লয়েন—কোন্ প্রজা রাজভক্ত, কোন্ প্রজা বা রাজভক্ত নহে, রাজা সাক্ষাৎভাবে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। আবার প্রজাও প্রত্যক্ষ ভাবে রাজার পরিচয় পায় যে রাজা প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কি না, রাজা প্রজার সুখদুঃখের কথা শোনেন কি না। রাজাপ্রজার মধ্যে বিরোধ বিবাদ দূর করিবার এমন শুভ অবসর সহজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজেরও এই ৬ই ভাদ্রের পুণ্যাহে আমাদের রাজাকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের দেবতা যিনি, তিনিই যে ব্রাহ্মসমাজেরও রাজা। সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইতে, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে আমাদের বেশী বিলম্ব ঘটিবে না। আমরা যাঁহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পূজার্ঘ্য প্রদান করি, তিনি এক দরিদ্র বঙ্গবাসীর দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বীজ রোপিত করাইয়াইতো তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নানাবিধ স্বরূপের বিষয়ে আমরা অনেক সময়ে আলোচনা করি, আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময়েই তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, আর উপদেশ দিবারও চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার বিগতবিবাদ স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করি বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি? আমরা কয়বার তাঁহার এই স্বরূপের বিষয়ে উপদেশ শুনিতে পাই অথবা উপদেশ দিবার চেষ্টা করি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যদি বিশেষ মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে কখনই বিবাদের সম্ভাবনা আসিতে পারিত না। উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়েন। কথাটীর মধ্যে একটী গভীর সত্য নিহিত আছে। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত যিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত একযোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার নানাবিষয়ক স্বরূপ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ আমরা যদি ব্রহ্মের বিগতবিবাদস্বরূপে তন্ময় হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ হইব, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? রাজা রামমোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটীর বিষয় অন্তরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তিরোভাবের পর তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়া ছিল। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদের উপর তাঁহার এতই বিদ্বেষ ছিল যে একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ দিয়া ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর ভিত্তিই এই করিলেন যে সেখানে এমনভাবে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, "যাহাতে বিবাদের পরিবর্ত্তে লোকসকলের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে।* আমরা যদি সত্যসত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান দিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা ভগবানকে যথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারিবে না। রাজা রামমোহন আমাদিগকে যেভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ বিসম্বাদ নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে এবং তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ সার্থক হইবে।

এই শুভ পুণ্যাহের দিনে আমাদের রাজা, আমাদের হৃদয়ের দেবতার পরিচয় পাইয়া যেমন আমরা কৃতার্থ হইব, তেমনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির পথ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার বর্ষিত আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইতে চাহি। আমরা

---

* "Strengthening the bonds of union—Trustdeed of the Adi Samaj."

প্রত্যেকে মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, তাঁহার সন্তানগণ বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া সম্প্রীতির সহিত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিলে কতদূর সুখী ও আনন্দিত হয়েন। প্রত্যেক মাতা যাঁহার প্রতিনিধি, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে তিনিও কি আনন্দিত হইবেন না? বিবাদবিসম্বাদ আসিবারই বা কারণ কি? বিগতবিবাদং পরমেশ্বর যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মার স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়া বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিতে দেখি যে দুইটী অণু পরমাণুর ভিতর একান্ত সৌসাদৃশ্য নাই, অথচ তাহারা কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে পারে না—প্রত্যেকেই আপনাপন কার্য্য অবিচলিত নিয়মে করিয়া চলিতেছে। প্রকৃতি হইতেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে আমরা কেহই কাহারও সহিত একেবারে সম্পূর্ণ মিল প্রত্যাশাই করিতে পারি না—পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বৃথা বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইব? পিতার সহিত কি পুত্রই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না, হইতে পারে না বলিয়াই কি পিতার সহিত পুত্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? স্বামীর সহিত কি স্ত্রীই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না, হইতে পারে না বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে? ভগবানের সৃষ্টিতে যদি অণুপরমাণুর মধ্যে জীবজন্তুসমূহের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য না থাকিত, তবে তো তাঁহার সৃষ্টিই থাকিতে পারিত না। তাঁহার সৃষ্টিও থাকিবে, সেই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও থাকিবে। আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর ন্যায় পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে বিবাদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন না করি।

ঈশ্বর বিগতবিবাদং বলিয়াই আমাদের মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু আমাদের সেই আত্মার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শত শত ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই। বিগতবিবাদং এর পূজাতে বিবাদ আনিব কেন? শ্রীক্ষেত্রে দেখি, সেখানে শত সহস্র যাত্রী বিশ্বাসের বলে সমস্ত জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে; আর আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রহ্মোপাসক আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং ব্রহ্মের উপাসক, আমাদের মধ্যে কিছুতেই বিবাদ বিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না? ছোটখাটো মান অভিমান আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া এতদিন পরস্পরকে চিনিতে দেয় নাই। সেই সকল মান অভিমান কি পায়ের তলে দলিয়া ফেলিতে পারিব না? এখন চারিদিকেই মিলনের বাতাস উঠিয়াছে, সকলেই সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়া রাখিব? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আসিতে পারে, অভিমানশূন্য হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মায়ের মন্দিরে আসিবার সময় আমরা নির্ব্বিবাদ হইয়া আসিব। এই প্রকার নির্ব্বিবাদভাবে যখন সেই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিব, যখন ভারতের ত্রিশকোটি সন্তান এক হৃদয়ে মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে কি যে অপূর্ব্ব বিরাট সাড়া পড়িবে, তাহা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা নির্ব্বিবাদ হইয়া তাঁহার নাম প্রচার করিতেছি না বলিয়াই লোকের চক্ষে আজ ব্রাহ্মসমাজ দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার ন্যায় সবল আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। আমাদের ভিতর হইতে হিংসা দ্বন্দ্ব চলিয়া যাক, নির্ম্মূল হইয়া যাক। হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দাও, দেখিবে যে প্রাণটা কতদূর হালকা হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতটা সবল হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মন্ তোমার বিগতবিবাদ স্বরূপ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমাদের হৃদয় হইতে হিংসাদ্বেষ বিবাদকলহ বজ্রের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দাও। হে বিগতবিবাদ পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ করিয়াছি। তোমাকেই জীবনের মাঝি করিয়া শত

বিভিন্নতার মধ্যে, শত পার্থক্যের মধ্যেও যেন আমরা তোমার আদেশ সুখে বহন করি এবং তোমার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্মিলিত করিয়া আমরাও যেন বিগতবিবাদ হই। আজ এই শুভ দিনে এই মাতৃপূজা উপলক্ষে তোমাকে একই পিতামাতা জানিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভাল বাসিতে শিক্ষা করি। আজ হইতে যেন এই প্রতিজ্ঞা লইয়া গৃহে ফিরি যে আমরা পরস্পরের হৃদয়ে আঘাত দিবার পরিবর্ত্তে পরস্পরের মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিব। হে হৃদয়ের দেবতা আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মোপাসক নামের উপযুক্ত কর। ওঁ।

"তুমি এস"।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী—মিশ্র-বিভাস।

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না
তুমি এস !
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না
তুমি এস !
জীবন যখন হবে মরু
রইবে না আর একটি তরু
যখন অন্ধ কারা লাগবে ধরা
তুমি এস !
কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে
তুমি এস !
বিফল যখন লাগবে জীবন, মাগবে মরণ
তুমি এস !
ওগো নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে
সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে—
আমার কান্নাজলে পান্নাদোলায়
তুমি এস !
তুমি আমার জীবনে কি
কইতে আমি পারি সে কি
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়
সব উপমা মিথ্যে মেকি !
তুমি আমার জীবনে কি,
আমি বিনে জানবে কে কি—
ওগো তোমার চরণতলে সব বিকা'নু
তুমি এস ॥

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

সপ্তম প্রকরণ।

কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রকারেরা এই জড়াদ্বৈত স্বীকার করেন না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহারা পঞ্চভূতাত্মক জড়প্রকৃতিরই ধর্ম্ম এই কথা তাঁহারা মানেন এবং সেই অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই পরে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রে পরে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না শুধু নহে, যে কেহই হোক্ না কেন, সে যেমন আপন কাঁধের উপর বসিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতির জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন না হইলে 'আমি অমুক জানিতেছি' এই ভাষাও প্রচলিত হইতে পারে না; এবং সৃষ্টিব্যবহার দেখিলে আমি যাহা জানিতেছি, কিংবা দেখিতেছি তাহা আমা-হইতে ভিন্ন—এইরূপ সকলেরই অনুভূতি হয়। তাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তু কিংবা প্রকৃতির দ্রষ্টা ও জড়প্রকৃতি এই দুই পদার্থ মূলতঃই ভিন্ন ভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন (সাং, কা, ১৭)। পূর্ব্বপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা বলা হইয়াছে তাহাই এই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা বা উপভোক্তা হওয়ায় সাংখ্যশাস্ত্রে তাহাকেই 'পুরুষ' কিংবা 'জ্ঞ' (জ্ঞাতা) এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞাতা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহা সত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির এই তিন গুণের বাহিরে অর্থাৎ নির্গুণ, অবিকারী এবং জানা, দেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে না; অতএব জগতে যাহা কিছু ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তৎসমস্ত একমাত্র প্রকৃতিরই কাজ, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। সারকথা—প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন; প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অকর্ত্তা; প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, পুরুষ সাক্ষী;—এইরূপ এই

দুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব এই সৃষ্টির মধ্যে অনাদিসিদ্ধ, স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ এইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; এবং তাহার অনুলক্ষণও ভগবদ্গীতাতে "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"—অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি (গী, ১৩।১৯) এইরূপ প্রথমে বলিয়া পরে "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার প্রকৃতিই করিয়া থাকে, এবং "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" অর্থাৎ পুরুষ সুখদুঃখের উপভোগ ঘটাইবার কারণ,—এইরূপ উহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই অনাদি এই মত গীতায় মান্য হইলেও সাংখ্যদের ন্যায় গীতা এই দুই তত্ত্বকে স্বতন্ত্র কিংবা স্বয়ম্ভূ বলিয়া মানেন না—ইহা মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, গীতাতে ভগবান্ প্রকৃতিকে আপন মায়া বলিয়াছেন (গী, ৭, ১৪ : ১৪, ৩) এবং পুরুষ-সম্বন্ধেও—"মমৈবাংশো জীবলোকে" (গী, ১৫, ৭)—উহা আমারই অংশ, এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব গীতা সাংখ্যশাস্ত্রকেও আগাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সাংখ্যশাস্ত্র পরে কি বলিতেছেন তাহা দেখা যাক্।

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে, অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি), ব্যক্ত (তাহার বিকার) ও পুরুষ—সৃষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের এই তিন বর্গ। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ প্রলয়কালে নাশ হওয়া প্রযুক্ত, মূলে অব্যক্তপ্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্বই বাকী রহিয়া যায়; এবং এই দুই মূলতত্ত্ব অনাদি ও স্বয়ম্ভূ এইরূপ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাহাতে এই দুইটিকে দ্বৈতী (যাহা দুই মূলতত্ত্ব স্বীকার করে) বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে ঈশ্বর, কাল, স্বভাব কিংবা অন্য কোন মূল তত্ত্বই তাঁহারা মানেন না।* কারণ, সগুণ ঈশ্বর, কাল কিংবা স্বভাব এই সমস্ত ব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত অব্যক্ত-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ব্যক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহার সমাবেশ হইয়া থাকে; এবং ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া মানিলে, সৎকার্য্যবাদ-অনুসারে নির্গুণ মূলতত্ত্ব হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় হইতে পৃথক্ সৃষ্টির তৃতীয় মূলতত্ত্ব যে নাই এইরূপ তাঁহারা স্থির-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং দুই মূলতত্ত্ব এইরূপ নির্দ্ধারণ করিলে পর, সেই উভয় হইতে সৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাঁহারা আপন-মতানুসারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, নির্গুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে না পারিলেও, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে যেরূপ গরু বাছুরের জন্য দুধ দেয় কিংবা লৌহ-চুম্বকের সন্নিধানে লৌহে আকর্ষণ শক্তি আইসে, সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীয় গুণসমূহের (সূক্ষ্ম ও স্থূল) ব্যক্ত বিস্তার পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে (সাং, কা, ৫৭)। পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাতা হইলেও, কেবল নির্গুণ হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিকট স্বতঃ কর্ম্ম করিবার কোন সাধন নাই;

* ঈশ্বর কৃষ্ণ একজন পাকা নিরীশ্বরবাদী। ইহার সাংখ্যকারিকাতে মূলবিষয়ের উপর ৭০ আর্য্যা শ্লোক আছে এইরূপ তিনি শেষের উপসংহারাত্মক আর্য্যাতে বলিয়াছেন। কিন্তু কোলব্রুক্ ও উইলসন্ ইঁহাদের ভাষান্তরসহ বোম্বায়ে রা, রা, তুকারাম-তাতা যে সংস্করণ ছাপাইয়াছেন তাহাতে মূলবিষয়ের উপর কেবল মাত্র ৬৯ আর্য্যা আছে। তখন ৭০ আর্য্যা কোন্‌টি এইরূপ উইলসন্ সাহেবের সন্দেহ হইল। কিন্তু ঐ আর্য্যাটি না পাওয়ায় তাঁহার সন্দেহ তাইরূপই রহিয়া গিয়াছে। আমার মতে, এই আর্য্যা এখনকার ৬১ আর্য্যার পরে হইবে। কারণ ৬১ আর্য্যার উপর গৌড়পাদের যে ভাষ্য আছে তাহা এক আর্য্যার নহে, দুই আর্য্যার। এবং এই ভাষ্যের মূল শ্লোকের পদগুলি লইয়া আর্য্যা রচনা করিলে তাহা—

কারণ মীশ্বরমেকে ব্রুবন্তি কালং পরে স্বভাবংবা।
প্রজা কথং নিগুণতো ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ॥

এইরূপ দাঁড়ায়; এবং তাহা অগ্রপশ্চাদ্-গত সন্দর্ভেরও অনুযায়ী। এই আর্য্যা নিরীশ্বর মতের প্রতিপাদক হওয়ায়, কেহ-না-কেহ পরে উহা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু মূল আর্য্যাতে মূঢ়-অনুসন্ধানকারী এই ভদ্র লোকটি সেই আর্য্যার ভাষ্যও ছাঁটিয়া ফেলিতে বিস্মৃত হওয়া প্রযুক্ত ঐ আর্য্যা আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম; তাই এই মূঢ়-অনুসন্ধানকারীকে আমাদের ধন্যবাদ করা আবশ্যক! প্রাচীনকালে কোন কোন লোক স্বভাব ও কালকে এবং বেদান্তী তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়া ঈশ্বর জগতের মূল কারণ—ইহা মানিয়া থাকেন, এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন্ত্র এইরূপ যথা—

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষা মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥

কিন্তু এই তিন মূল কারণই সাংখ্যেরা স্বীকার করেন না ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বর কৃষ্ণ উপরি-উক্ত আর্য্যা, ৬১ আর্য্যার পরে বসাইয়াছেন।

এবং প্রকৃতি কর্ম্মকর্ত্রী হইলেও জড় কিংবা অচেতন হওয়া প্রযুক্ত. কোন্ কাজ করিবে তাহা তাহার জানা নাই। তাই, খঞ্জ ও অন্ধের জুড়ী মেলায়, অন্ধের কাঁধের উপর খঞ্জ বসিয়া দুজনেই যেরূপ পথ চলিতে থাকে, সেইরূপ জড় প্রকৃতি ও সচেতন পুরুষ ইহাদের সংযোগ হইলে, সৃষ্টির কর্ম্ম সুরু হইয়া থাকে (সাং, কা, ২৩); এবং নাটকে যেরূপ প্রেক্ষকদিগের মনোরঞ্জনার্থ কোন নটী এখন এক বেশে, খানিক পরে আর এক বেশে নাচিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য (পুরুষার্থের জন্য) পুরুষ কোন রকম প্রতিদান না করিলেও, প্রকৃতি সত্ত্বরজতমের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা অনেক বেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখে সমান নাচিতে থাকে (সাং, কা, ৫৯)। প্রকৃতির এই নৃত্যে ভুলিয়া মোহবশতঃ কিংবা বৃথাভিমানবশতঃ (গী, ৩, ২৭) প্রকৃতির এই কর্তৃত্ব পুরুষ নিরর্থক আপনার উপর টানিয়া লইয়া সুখদুঃখের জালে আপনাকে যে পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখে, সে পর্য্যন্ত তাহার মোক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যেদিন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক্ ও আমি পৃথক এই জ্ঞান পুরুষের হয় সেইদিন সে মুক্ত হয় (গী, ১৩, ২৯, ৩০; ১৪, ২০)। কারণ, বস্তুত দেখিতে গেলে পুরুষ মূলে কর্ত্তাও নহে, বদ্ধও নহে। পুরুষ স্বতন্ত্র হওয়ায় স্বভাবতই কৈবল্য-অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অকর্ত্তা। যাহা কিছু হয় তাহা প্রকৃতিই করিয়া থাকে। অধিক কি, মন ও বুদ্ধি ইহারাও প্রকৃতিরই বিকার হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধির যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্য্যেরই ফল। এই জ্ঞান তিন প্রকারের;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (গী, ১৮, ২০-২২)। তন্মধ্যে বুদ্ধির সাত্ত্বিক জ্ঞান হইলে, আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ ইহা পুরুষ জানিতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় প্রকৃতির, পুরুষের নহে। পুরুষ নির্গুণ হওয়ায় ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি তাহার দর্পণ স্বরূপ হইয়া থাকে (সভা, শাং, ২০৪৫)। এই দর্পণ যখন সাফ্ থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধি যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ এইরূপ আপনার প্রকৃত স্বরূপ, এই স্বচ্ছ দর্পণে, পুরুষের নজরে আসে ও প্রকৃতি লজ্জিতার ন্যায় হইয়া পুরুষের সম্মুখে আবার নৃত্য বন্ধ করিয়া দেয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, পুরুষ সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার স্বাভাবিক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। কৈবল্য অর্থাৎ কেবলত্ব, একাকীত্ব কিংবা প্রকৃতির সহিত সংযোগ না থাকা এইরূপ অর্থ হওয়ায়, পুরুষের এই নৈসর্গিক অবস্থাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে মোক্ষ (বন্ধন-মোচন) বলে। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতে পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়ে, না—প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়ে এইরূপ এক সূক্ষ্ম প্রশ্ন সাংখ্যেরা উপস্থিত করিয়াছেন। বর অপেক্ষা কনে ঢ্যাঙা কিংবা কনে অপেক্ষা বর বেঁটে ইহা এইরূপ ধরণের প্রশ্ন হওয়ায় তাহা নিরর্থক, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কারণ, দুই বস্তুর বিয়োগ হইলে পর, কে কাহাকে ছাড়িল ইহা দেখার কোন ফল নাই; উভয়ই পরস্পরকে ছাড়ে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন তাঁহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে পুরুষ নির্গুণ, অকর্ত্তা ও উদাসীন হওয়া প্রযুক্ত 'ছাড়া' কিংবা 'ধরা' এই দুই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, তত্ত্বদৃষ্টিতে পুরুষে বর্ত্তিতে পারে না (গী, ১৩৷৩১৷৩২)। তাই, কর্তৃত্ব এই যে প্রকৃতির ধর্ম্ম, সেই প্রকৃতিই পুরুষকে ছাড়িয়া যায়, অর্থাৎ প্রকৃতিও পুরুষ হইতে আপনার মোক্ষসাধন করিয়া লয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন (সাং কা. ৬২ ও গী. ১৩৷৩৪)। সার কথা, পুরুষের মোক্ষ নামে পৃথক্ অবস্থা বাহির হইতে প্রাপ্ত অবস্থা নহে কিংবা পুরুষের মূলগত স্বাভাবিক অবস্থা হইতে ভিন্ন এইরূপ অন্য অবস্থাও নহে। ঘাসের উপরকার ছাল হইতে ভিতরকার শাঁসাল ডাঁটা যেরূপ পৃথক্ কিংবা জলস্থ মাছ যেরূপ জল হইতে পৃথক্ সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সাধারণ কোন ব্যক্তি এই ভিন্নতা বুঝিতে পারে না তাই সংসার-চক্রে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু এই ভিন্নতা যে জানিতে পারে সেই মুক্ত। তাহাকে 'জ্ঞানী' কিংবা 'বুদ্ধ' ও 'কৃতকৃত্য' বলে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে; (সভা, শাং ১৯৪৷৫৮; ২৪৮৷১১ ও ৩০৬-৩০৮ দেখ), "এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ" (গী,

১৫।২০) ইহা গীতাবচনে 'বুদ্ধিমান' শব্দেরও ঐ একই অর্থ। অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপও এই প্রকারেরই (বেসূ, শাং ভা, ১১০৪ দেখ)। কিন্তু পুরুষ স্বভাবত কৈবল্য অবস্থায় আছে এইরূপ কারণ না দিয়া, আত্মা মূলে পরব্রহ্মরূপী হওয়া প্রযুক্ত, পুরুষ আপন মূলের রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানিতে পারাই মোক্ষ এইরূপ সাংখ্য হইতে বিশিষ্ট অদ্বৈত বেদান্তের উক্তি। সাংখ্য ও বেদান্ত ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবর্ত্তী প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইবে।

পুরুষ (আত্মা) নির্গুণ, উদাসীন ও অকর্ত্তা—এই সাংখ্যদিগের মত যদিও অদ্বৈত বেদান্তের সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষ্টা স্বতন্ত্র পুরুষ মূলেতেও অসংখ্য,—পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই আর এক কল্পনা, বেদান্তীরা স্বীকার করেন না। (গী. ৮. ৪ ; ১৩. ২০-২২ ; সভা, শাং, ৩৫১ ; ও বেসূ শাং ভা ২৪১ ; ও বেসূ শাং ভা. ২. ১. ১ দেখ)। উপাধিভেদপ্রযুক্ত জীব পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, বস্তুত সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ বেদান্তীদিগের উক্তি। কিন্তু সাংখ্যদিগের এইরূপ মত যে, যেহেতু প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম মরণ ও সংসার ভিন্ন ভিন্ন, এবং যেহেতু কেহ সুখী, কেহ দুঃখী এইরূপ এই জগতে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব প্রত্যেক আত্মা কিংবা পুরুষ মূলেও ভিন্ন ভিন্ন, এবং তাহাদের সংখ্যা অনন্ত (সাং. কা. ১৮)। প্রকৃতি ও পুরুষ সমস্ত সৃষ্টির এই দুই মূলতত্ত্বই প্রকৃত ; কিন্তু তাহার মধ্যে, পুরুষ এই শব্দের দ্বারা অসংখ্য পুরুষের সমুদায় বুঝায় এইরূপ সাংখ্যদিগের অভিপ্রায়। এই সকল অসংখ্য পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ইহাদের সংযোগ প্রযুক্ত সৃষ্টির সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। প্রত্যেক পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে পর, প্রকৃতি আপন গুণের বিস্তার সেই সেই পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করে, এবং পুরুষ তাহার উপভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের প্রকৃতির খেলা সাত্ত্বিকরূপী হয়, সেই পুরুষেরই (সব পুরুষের নহে) যথার্থ জ্ঞান হয় এবং তাহার প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া সে আপনার মূলের কৈবল্যস্বরূপে উপনীত হয়। কিন্তু তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগের সংসার চলিতেই থাকে। পুরুষ এইরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হইলে পর, সে প্রকৃতির জাল হইতে অবশ্যই একেবারেই মুক্ত হইবে—এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে এইরূপ না হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির বিকার তাহাকে মরণ পর্য্যন্ত ছাড়ে না। এইরূপ হইবার কারণ সাংখ্য এইরূপ বলেন যে, যেরূপ কুমারের চাকা হইতে, কলসি তৈয়ার হইয়া গেলে কলসি বাহির করিয়া লইলেও তাহা কিয়ৎক্ষণ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কৈবল্যপ্রাপ্ত মনুষ্যেরও শরীর কিছু দিন অবশিষ্ট থাকে" (সাং. কা. ৬৭)। তথাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক কিংবা সুখ দুঃখের বাধা হইতে পারে না। কারণ, জড়প্রকৃতির বিকার যে দেহ তাহাও জড় হওয়া প্রযুক্ত সুখই বা কি, দুঃখই বা কি তাহার নিকট দুই-ই সমান এবং পুরুষের সুখ দুঃখ হইবে যদি বলা হয় তবে প্রকৃতির ব্যবহার ও তাহার নিজের ব্যবহার পৃথক্ হওয়ায়, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতিরই—তাহার নিজের নহে এই তত্ত্ব পুরুষ জানিতে পারে এবং প্রকৃতির যতই খেলা হউক না কেন, পুরুষ উদাসীনই থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যে পুরুষের এই জ্ঞান হয় নাই, তাহার জন্মমরণের পুনরাবৃত্তির একেবারে শেষ হয় না ; পরে, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ প্রযুক্ত সে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে কিংবা রজোগুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যোনিতে অথবা তমোগুণের প্রাবল্যে পশুর শ্রেণীতে উৎপন্ন হয় (সাং. কা. ৪৪, ৫৪)। প্রত্যেক পুরুষের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ তাহার বুদ্ধিতে সত্ত্বরজতমের যে উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়াছে, সেই উৎকর্ষাপকর্ষপ্রযুক্ত সেই পুরুষ জন্মমরণচক্রের এই ফল প্রাপ্ত হয়। "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ"—সাত্তিক বৃত্তির পুরুষ স্বর্গে যায়—এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ গীতাতেও উক্ত হইয়াছে (গী. ১৮, ১৮)। কিন্তু এই স্বর্গাদি ফল অনিত্য। জন্মমরণ হইতে যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে কিংবা সাংখ্যদিগের পরিভাষায়, যে ত্রিগুণ হইতে আপনার ভিন্নতা বা কৈবল্য চিরস্থির রাখিতে চাহে,

তাহার ত্রিগুণাতীত হইয়া বিরক্ত (সন্ন্যস্ত) হওয়া ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান কপিলাচার্য্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকলেই এই অবস্থা জন্ম হইতেই পাইতে পারে না। তাই, তত্ত্ববিবেকরূপ সাধনের দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি করিয়া আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ন প্রত্যেকের করা আবশ্যক। এইরূপ প্রযত্নের দ্বারা বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইলে পরে সেই বুদ্ধিরই জ্ঞান, কৈবল্য ও ঐশ্বর্য্য এই গুণ সকল উৎপন্ন হইয়া, মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ, যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থ্য, এইস্থানে এইরূপ অর্থ। সাংখ্য মতানুসারে, ধর্ম্মের গণনা সাত্ত্বিক গুণের মধ্যেই হইয়া থাকে; কিন্তু শুধু ধর্ম্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মাত্র; এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (সন্ন্যাস) দ্বারা মোক্ষ কিংবা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, কপিলাচার্য্য শেষে এইরূপ ভেদ করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে প্রথমে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া উপরে আরও উঠিতে উঠিতে পরিশেষে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক্ ও আমি পৃথক্ এই জ্ঞান যে পুরুষের হইয়াছে সে ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণেরই বাহিরে পৌঁছিয়াছে এইরূপ সাংখ্য বলেন। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সত্ত্ব, রজ ও তম ইহাদের মধ্যে কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন অবস্থা হইতে এই অবস্থা ভিন্ন, এইরূপ স্বীকার করিতে হয় এবং এই অভিপ্রায়েই ভাগবতে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, ভক্তির এই তিন ভেদ করিবার পর, এই তিন গুণেরই বাহিরে উপনীত পুরুষ, নির্হেতুক ও অভেদভাবে যে ভক্তি করিয়া থাকে তাহাকে নির্গুণ ভক্তি এইরূপ চতুর্থ নাম প্রদত্ত হইয়াছে (ভাগ, ৩, ২৯, ৭-১৪)। কিন্তু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন বর্গ অপেক্ষা বর্গীকরণের তত্ত্বসকলের ফাজিল বাড়াইয়া বসা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাই সত্ত্বগুণের অত্যন্ত উৎকর্ষের দ্বারা শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ স্বীকার করিয়া সাংখ্যশাস্ত্রী সাত্ত্বিকবর্গের মধ্যেও তাহার গণনা করিয়া থাকেন; এবং গীতাতেও ঐ পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—যা কিছু সমস্তই এক—এইরূপ যে অভেদাত্মক জ্ঞান তাহা সাত্ত্বিক, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ১৮, ২০); এবং সত্ত্বগুণের বর্ণনা করিবার সময়েই পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনা গীতার ১৪ অধ্যায়ে, শেষে আসিয়াছে। কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রকৃতি ও পুরুষ—ইহা দ্বৈত স্বীকৃত না হওয়ায় গীতাতে প্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিগুণাতীত ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বরাবরই একটু ভিন্ন অর্থে হইয়া থাকে, কিংবা সাংখ্যের দ্বৈতের উপর অদ্বৈত পরব্রহ্মরূপ টোপর স্থায়ীভাবে বসাইয়া রাখা হয়, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। উদাহরণ যথা—সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরুষ ভেদও গীতার ১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (গীতা, ১৩, ১৯-৩৪)। কিন্তু তথায় প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই শব্দ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সমানার্থক। সেইরূপ, ১৪ অধ্যায়ের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় বর্ণনাও (গী, ১৪, ২২-২৭) ত্রিগুণাত্মক মায়া জাল হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাদেরও অতীত, পরমাত্মার জ্ঞাতা সিদ্ধ পুরুষগণের অবস্থা; প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করিয়া পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা যাহারা মানে, সেই সাংখ্যদের অবস্থা ইহা নহে। এই ভেদ, পরে অধ্যাত্মপ্রকরণে আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদও প্রতিপাদ্য হইলেও অধ্যাত্মতত্ত্বসকল বিবৃত করিবার সময় ভগবান, সাংখ্য পরিভাষা ও যুক্তিবাদের পরিভাষার উপযোগ স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিয়া, গীতায় কেবল সাংখ্য-মতই 'গ্রাহ্য, এইরূপ পাঠকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। তাই সাংখ্যশাস্ত্র ও গীতায় তৎসদৃশ সিদ্ধান্ত—ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পুনর্ব্বার এখানে বলা হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে, জগতের মূলভূত পরব্রহ্মরূপী একই তত্ত্ব হওয়ায় তাহা হইতে প্রকৃতি-পুরুষ-সমেত সমস্ত সৃষ্টিই উৎপন্ন হইয়াছে। এই উপনিষদের অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে না ছাড়িয়া সাংখ্যদিগের অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত আমাদের অগ্রাহ্য নহে, এইরূপ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। (বেসূ,

শাং, ভা, ২, ১, ৩); এবং গীতার উপপাদনেও এই নীতির প্রয়োগ হইতে পারে। ইতি সপ্তম প্রকরণ সমাপ্ত।

কি ভয়।

(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী)

যা কিছু আঁক্‌ড়ায়ে থাকি'
ধরে ছিল বুকে,
নিমেষের মাঝে দেখি
সব গেল চুকে।
স্বপ্ন সম লুকাইল
কোন দেশান্তরে,
হে পূর্ণ অপূর্ণ যত
পূর্ণ তব পদ-পরে।
মৃত্যু নাহি জরা নাহি
নাহি নাহি ক্ষয়,
মৃত্যু যে বহে গো হেথা
অমৃতের পরিচয়।
দাও দুঃখ দাও শোক
দাও অশ্রুজল,
তার সাথে দাও প্রভু
ভক্তি সুনির্ম্মল।
জ্বলুক অন্তর-মাঝে
দারুণ বিরহ-শিখা,
এ বিশ্ব হক্ ছারখার—
তুমি যদি থাক প্রাণে
ওহে বিশ্বাধার,
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে লয়
কি ভয় আমার॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত)

(৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

অপিচ এমত জনরব যে, কবিরঞ্জন এক লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটি পদ সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যথা—

"জানিলাম বিষম বড়,
শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
ফুকারে করেদি দাদি,
না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী যার শিবে,
সে দরবারের ভাস্য কিরে মাগো।
ওমা দেওয়ান্ দেওনা নিজে,
আস্থা কি কথার রে॥ ১
লাক্ উকিল করেছি খাড়া,
সাধ্য কি মা ইহার বাড়া (মাগো)
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি,
কান নাই বুঝি মার রে॥ ২
গালাগালি দিয়ে বলি,
কান খেয়ে হয়েছে কালী (মাগো)
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী
করিলে আমার রে॥" ৩

রামপ্রসাদ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদবিন্যাসে বিরত হয়েন নাই, মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহারি কবিতা করিয়াছেন। কবি-রঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। পূর্ব্বে দুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহপূর্ব্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ব্বকালের লোকেরা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক পূজাকরণ কালে সেই পুঁথির উপর ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহারদিগের নিকট হইতে সে পদাবলি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ গোপনেই সর্ব্ব অনুর্য্যাগবিষয়ে যাঁহার গাঢ় সংস্কার আছে, তিনিই এই গীতামৃতের যথার্থ রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইবেন,

নচেৎ অন্যের সাধ্য নহে। এ বিষয় অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ বিশেষ রামপ্রসাদি পদের নিগূঢ়াভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং ইহলোক হইতে তদ্রূপ মনুষ্য প্রায় তাবতেই অপসৃত হইয়াছেন, কেবল দুই এক মহাত্মা আছেন।

রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থার এই গানটী অতি মনোহর।

যথা—

কাজ হারালেম কালের বশে।
মন মজিল রতিরঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন,
করেছিলাম দেশবিদেশে।
তখন ভাইবন্ধু দারাসুত,
সবাই ছিল আমার বশে॥ ১
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাইবন্ধু, দারাসুত,
নির্ধনে বলে সবাই রোষে॥ ২
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি,
ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা,
বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে॥ ৩
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি,
যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল,
অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ৪

বৈরাগ্য ও বিবেক যখন তাঁহার অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিল, বোধ করি তৎকালীন মনের স্বরূপানুরাগেই ঐ গানটী কণ্ঠ হইতে নির্গত করিয়াছিলেন। এই পুরুষের অন্তঃকরণে কাপট্য মাত্র ছিল না, অন্তর বাহির একরূপ ছিল, মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন, তাঁহার উক্তি দ্বারা ও প্রবাদ দ্বারা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অকপটে সত্যপালন পূর্ব্বক ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন, আহা! তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন।

শক্তিভক্তিসূচক উক্তি দ্বারা যুক্তিমতে সকলে রামপ্রসাদ সেনকে শাক্ত বলিতে পারেন, ফলে তিনি শাক্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না যথার্থই ভক্ত ছিলেন, কারণ উপাসনাকল্পে তাঁহার মনে দ্বেষ মাত্রই ছিল না। নিম্নস্থ পদটীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

যথা—

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা,
মা আমার অন্তরে আছ॥
তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া,
কত কাচ্ কাচাও কাচ্॥
উপাসনা ভেদে তুমি,
প্রধানমূর্ত্তি ধর পাঁচ॥
যে পাঁচেরে এক কোরে ভাবে,
তার হাতে কোথা বাঁচ॥ ১
বুঝে ভার দেয় যে জন,
তার ভার নিতে হাঁচ।
যে কাঞ্চনের মূল্য জানে,
সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ॥ ২
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়,
অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে
মনোময়া হোয়ে নাচ॥ ৩॥

রামপ্রসাদ সেনের চিত্তের একাগ্রতা, বিশ্বাসের স্থিরতা ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢ়তা কি পর্য্যন্ত ছিল এই পদের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রস্তাব সাঙ্গ করিলাম।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে তাহা সম্পন্ন হইল না, এজন্য একখণ্ড অধিক প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে আমাদিগের অতিরেক ব্যয় অনেক হইয়াছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে চারি ফার্ম্মা কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, তত্রাচ এ বিষয়ে মনের আক্ষেপ কিছুমাত্র নিবারণ হয় নাই, যেহেতু বিস্তার করিয়া বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না। অতি অল্পেই শেষ করিতে হইল, এ দেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারদিগের তাবতেরি জীবন চরিত লিপিবদ্ধ

করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ করা সুকঠিন হইয়াছে, কারণ সমুদয় ব্যাপার সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত নাই, এবং যাঁহারা এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাঁহারা অনেকেই তদ্বিশেষ অবগত নহেন, যদিও কোন কোন মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্তু আক্ষেপ এই যে, তাঁহারদিগের সহিত আবার আমারদিগের এ পর্য্যন্তই সাক্ষাৎ নাই। যাহা হউক, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ করিয়া দেখিতে হইবেক। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে পারি তাহার ক্রটী কখনই করিব না, ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো কথাই নাই, যদি অর্থব্যয়ের আবশ্যাক করে তাহাতেও সম্ভবমত বিত্তব্যয় অবশ্যাই করিব। এই সঙ্কল্পিত কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কর্ম্মই করা হয়, অতএব সর্ব্বসাধারণকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অস্মদাদিকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন তাহাতে সম্ভাবিত কৃপা বিতরণে কৃপণতা না করেন। তাঁহারদিগের নিকট এতদ্রূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রমসাফল্যজ্ঞানে যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত হইব এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এই স্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। এই দেশহিতকর কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সাধ্যসত্বে কেহ যেন আলস্যপরবশ না হয়েন, ইহাতে আমাদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্ররূপে করুন, তাহাতে হানি কি, যেরূপে হউক, কার্য্য সিদ্ধ হইলেই চরিতার্থ হইব।

এই স্থলে মহাকবি কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম। *

যথা—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া-পাখী হও, করি স্তুতি ॥
অবুতবু গিরিসুতা, পড়লে, শুনলে দুদিভাতি।
ওরে জাননা কি ডাকের কথা,
না পড়লে ঠেঙ্গার গুতি ॥ ১ ॥
কালী কালী, কালী পড় মন,
কালী পদে, রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম,
আত্মজনের কর গতি ॥ ২ ॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে,
বেড়ায়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে, ক'দিন চলে,
কররে চার্ ফলে স্থিতি ॥ ৩ ॥
রামপ্রসাদ বলে, ফলাগাছে,
ফল্ পাবি মন্ শোন্ যুকতি।
ওরে, বোসে মূলে, কালী বলে,
গাছ নাড়া দেও, নিতি নিতি ॥ ৪ ॥

তথা—

আর কাজ্ কি আমার কাশী।
ওরে, কালী পদ, কোকনদ,
তীর্থ রাশি রাশি ॥
ওরে, হৃৎকমলে, ধ্যানকালে,
আনন্দ সাগরে ভাসি।
কালীনামে পাপ কোথা,
মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনল দাহন যথা, করে তুলারাশি ॥১॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান,
পিতৃ-ঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান,
তার গয়া শুনে হাসি ॥ ২ ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি,
বটে সে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥ ৩ ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়,
চিনি খেতে ভালবাসি ॥ ৪ ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে,
করুণা নিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাব্লে এলোকেশী ॥৫॥

মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কিরূপ রসিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ

* এই পদ্যাবলীগুলি ১২৬০ সালের 'প্রভাকরের' ১লা আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রেমভক্তিশালী মহাশয়েরা সহজে তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্রচিত্ত হইবেন, যেহেতু ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেম-ভক্তিরসে পরিপূরিত।

নিরাকারবাদীরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখপূর্ব্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি "কালী"নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক; যথার্থ-ভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয়পক্ষেরি তুল্য হইতেছে, তাঁহারা যেমন তীর্থপর্য্যটনাদি ক্রিয়াকর্ম্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন। অতএব মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন কি প্রকার জ্ঞানী ছিলেন তাহার প্রমাণকরণার্থ এইস্থলে আর একটী পদ প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশপূর্ব্বক তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করুন।

যথা—

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা॥
ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী,
সুখে সাধো সেই লহনা॥
ব্যজনে পবন বাস,
চালনেতে সুপ্রকাশ, মনরে।
ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী,
নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥ ১
কানে যদি ঢোকে জল,
বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল,
ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥ ২
ঘরে আছে মহারত্ন,
ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন,
মনরে, ওরে শ্রীনাথ দত্ত,
কর তত্ত্ব, কলের কপাট্ খোলনা॥ ৩
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি,
বুড়া দাদা দিদ্দিঘাতী, মনরে।
ওরে জনন-মরণাশৌচ
সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা। ৪
প্রসাদ বলে বারে বারে,
না চিনিলে আপনারে,
মনরে, ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে,
মরি কিবে বিবেচনা॥ ৫

এই কবিতার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ যিনি করিবেন তিনিই মহানন্দসাগরসলিলে নিমগ্ন হইবেন। এতদ্দ্বারা কবিরঞ্জনের তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রচুররূপেই প্রকাশ পাইতেছে তিনি ফলভোগ-বিরাগী অর্থাৎ নিষ্কামী হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিভরে সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে পরম পূজনীয় প্রেমময় প্রিয় উপাস্যের উপাসনা করিয়াছেন। সেন সদাত্মা স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যাপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। 'অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী, জনন-মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' এই পীযূষপূরিত পদের নিগূঢ়ার্থ ও ভাব যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবেক, তিনি অত্যন্ত প্রীত হইবেন, রামপ্রসাদী পদ সকল রত্নাকরবৎ, যত্নপূর্ব্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায় ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে। পাঠকগণ অবধান করুন।

যথা—

মায়ারে পরম কৌতুক্, মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি,
অবদ্ধে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার্ এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে, ওরে, মিছামিছি সার ভেবে,
সাহসে বাঁধে বুক॥ ১॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমা ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে, ওরে, কে করে কাহার সেবা,
মিছা সুখ্ দুখ্॥ ২॥
দীপজ্বালে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায়, করে,
মনরে, ওরে, তথনি নির্ব্বাণ করে,
না রাখে একটুক্॥ ৩॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাকো, আপনি আপন দেখো,
মনরে, রামপ্রসাদ্ বলে,
মশারি তুলিয়া দেখ মুখ॥ ৪॥

তথা—

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥

সে যে ভাবের বিষয়,
ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশি-বশীভূত
কর তোমার শক্তি সারে ॥
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী,
ভোর হোলে সে লুকাবে রে ॥ ১ ॥
ষড় দর্শনে দর্শন পেলেনা,
আগম নিগম তন্ত্র ধোরে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ ২ ॥
সে ভাবলোভে পরম যোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বুকে ধরে ॥ ৩ ॥
রামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে,
আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ী
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥ ৪ ॥

তথা—

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল,
শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা
অহঙ্কারে লক্ষ কোটি ॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া
অভাবেতে স্বভাব যিটি ॥ ১ ॥
গর্ভে যখন যোগ তখন,
ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী,
দড়ির বেড়ি কিসে কাটি ॥ ২ ॥
রমনীবচনে সুধা,
সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা মুখে পান কোরে,
বিষের জ্বালায় ছটফটি ॥ ৩ ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে,
আদি পুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,
মা তুমি পাষাণের বেটী ॥ ৪ ॥

তথা—

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গম সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ,
মকরন্দরসে মজ, ওরে মন ভৃঙ্গ ॥ ১ ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভে যেমন,
নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন
বিষয় জানিবে তেমন,
হোলে নিদ্রাভঙ্গ ॥ ২ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে,
উভয়েতে কূপে পড়ে
কর্ম্মিকে কি কর্ম্ম ছাড়ে,
তার কি প্রসঙ্গ ॥ ৩ ॥
এই যে তোমার ঘরে,
ছয় চোরে চুরি করে
তুমি যাও পরের ঘরে,
এত বড় রঙ্গ ॥ ৪ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা,
তোমাতে জন্মিল যেটা
অঙ্গহীন হোয়ে সেটা,
দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৫ ॥

* * * *
* * * *

মহাত্মাবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বিবরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে (১লা পৌষ) যাহা লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই আমাদিগের নিকট সন্তোষসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেনকবি মহাশয় অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন, বহুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশমধ্যে মহল্লোক-দিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা তাঁহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, এ কারণ আমরা দেশবিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে সেনকবি মহাশয়ের গীতাবলী যদ্যপি কাহার নিকট লিখিত থাকে এবং কেহ যদ্যপি তাঁহার জীবনের অন্য কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমরা অতিশয় সন্তোষচিত্তে তাহা প্রকাশ করিব, আমাদিগের এই প্রার্থনানুসারে কোন আত্মীয় বন্ধু যে পত্র

প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

'মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখে আপনি যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার পৌষ-মাসিক প্রথম দিবসীয় অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে অস্মদ্‌গণেরা কি গাঢ় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে লেখনী অসমর্থা, কেননা প্রকাশ্য পত্রে ঐ কবির গুণাবলী এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাঁহার প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ হইবার সম্ভাবনা। ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহী মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র, নব্য সম্প্রদায়মধ্যে তিনি অপরিচিত ছিলেন, যদিও ঐ দলাক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দুই একটী গান জানিতেন, কিন্তু তাহার ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত তাহার সমাদর করিতেন না, যাহা হউক আপনি যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যে মহতী বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও একপ্রকার আপনার কীর্ত্তি, যেহেতুক আপনি সেনকবির গ্রন্থচয়ে পুনর্জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপার যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন অস্মদ্‌গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি। অপিচ তাঁহার মাহাত্ম্য-বিষয়ক আপনার রচনাপ্রবন্ধ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ও অনুসন্ধানকারী এবং বহু মনুষ্যদের সম্মুখে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লান বদনে ব্যক্ত করিলেন শিব-শক্তি-প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কিরূপ, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্ম প্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম? শ্রুত আছি যে কবিবরের মিষ্ট স্বর ছিল না তথাচ তিনি যখন গান করিতেন শ্রোতৃগণের শ্রবণে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত এবং যতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাঁহারা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন। ঐশ্বরিক অনুকম্পা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে? একদা নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সেনকবি সমভি-ব্যাহারে নৌকারোহণে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস রাজা অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাঁহার বাস নৌকাতেই ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মহিমা-সূচক গান করিতেন। এক দিবস সায়ংকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা বায়ুসেবনার্থ তরি আরূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের ধ্বনি শ্রবণে, মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ নৌকা কাহার ও এ গায়ক বা কে? পরে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেনকে স্বথানে আহ্বান করিয়া গান করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, কবিরঞ্জন নবাবের মনোরঞ্জনার্থে একটী খেয়াল ও একটী গজল গাহিলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাদি গীত শুনিতে ইচ্ছা করি না, কালী কালী শব্দে যে গীত আরম্ভ করিয়াছিলা, ঐ গীত আরব্ধ করহ। নবাবের আজ্ঞানুসারে রামপ্রসাদ স্বীয় রচিত ভক্তি-পূরিত একটী শ্যামাবিষয়ক গান আরম্ভ করিলে পাষাণবৎ কঠোরহৃদয় যে সিরাজদ্দৌলা তিনিও নয়ন-নীর নিবারণে অক্ষম হইলেন, পরে গান ভঙ্গ হইলে নবাব তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি তুমি আমার অধীনে থাক, আমি তোমাকে উচ্চপদস্থ করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙ্ক্ষী নহেন এরূপ নবাব গোচর হইলে তেঁই তাঁহাকে আরো অধিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন যে রামপ্রসাদ কিরূপ মনুষ্য ছিলেন, সিরাজদ্দৌলা কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও পাষণ্ড ছিলেন তাহা কাহার অবিদিত এবং তিনিও যে কি প্রকার গুণ-গ্রাহী তাহাও বা কোন জনের অগোচর আছে, অতএব তাঁহাকে বঙ্গীয় ভাষা-গানে বিমোহিত করা ও তাঁহার রসনা হইতে যশোঘোষণা করান দৈববল ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বারা হইতে পারে। সেন-কবির বিষয়ে এবম্প্রকার কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে তাহা সমুদায় প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়, এতাবতা এস্থলে তাহা লেখা অনাবশ্যক। পরন্তু যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি

গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলত, তিনি এক-ঈশ্বরবাদী ছিলেন, পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরের নিকট দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক সকলিই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের হানি হয় না। যথা গোলাপ পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেনকবির কালী নামাদি উচ্চারণ যে মৌখিকমাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে
কি ধর্ত্তে পারে।
অগ্রে কর শশি-বশি, ভূতরে তোর—
শক্তি সারে॥
আছে কোঠার ভিতর চোর কুঠারী,
ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শন পেলে না আগম,
নিগম শাস্ত্র ধরে॥
সে যে ভক্তি রসের রসিক,
সদানন্দপুরে বিরাজ করে।
সে ভাব ল'তে পরম যোগী যোগ করে
যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয়, যেমন লোহাকে
চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে
তত্ত্ব করি যাঁরে॥
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥

শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

[আজ কয়েক মাস যাবৎ বম্বে নববিধান সমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের কাগজপত্রে কিছু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। এরূপ ঘটনায় আমরা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হই নাই। নববিধান সমাজের একটী সম্প্রদায় আছে, যাঁহাদের মত অত্যন্ত খৃষ্টকেন্দ্রক। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভূমি ব্রহ্মকেন্দ্রক। কেহ যদি খৃষ্টের সদ্‌গুণসমূহকে আদর্শ করিয়া স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু খৃষ্টকে অভ্রান্ত গুরুপদে বসাইয়া নিজের জীবনকে খৃষ্টকেন্দ্রক করিয়া তোলাকে আমরা নিশ্চয়ই অসঙ্গত মনে করি। এরূপ ভাবের পরিণামফল অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজা। যে মূলমন্ত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহাকেও আত্মার সমুদয় স্থান অধিকার করিতে দিলে সেই মূলমন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এই কথার স্বপক্ষে খুবই সাক্ষ্য দিতেছে। তং বোঃ সং]

শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত ছিলেন। তিনি কয়েক মাস হইল খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী "The Epiphany" নামক খৃষ্টীয় সংবাদ পত্রে বাহির করিতেছেন। তিনি বলেন যে "কাটিবার প্রদেশে অবস্থানকালীন শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর জীবনী ও তাঁহার বক্তৃতা পাঠের ফলে নববিধান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত হইয়া তাহার একজন প্রচারক হইবার ইচ্ছা আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠে। তৎপূর্ব্বে বেদান্তের ও বিবেকানন্দের প্রভাব আমার ভিতরে বিদ্যমান ছিল। কেশব বাবুর সমস্ত ভাব আমি গ্রহণ করিলাম। তিনি যিশুখৃষ্টকে তাঁহার ধর্ম্মের কেন্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ ভাল লাগিল। ১৯০৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বাবুর সহিত যুক্তিতর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে সক্ষম হইলাম যে ঈশাই নববিধানের প্রাণ। "Asia's message to Europe" বিষয়ক বক্তৃতায় কেশব বাবুও তাহাই বলিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রদ্ধেয় প্রমথ লাল সেনের সহিত আমার কথা হয়। মোক্ষমুলার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে ১৯০০ সালে যে পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি নববিধানান্তর্গত ব্রাহ্মগণকে Anglican church এর সহিত মিলিত হইবার

সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। ঐ পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া প্রমথ বাবু বলেন যে আমি এবং আরও কয়েকজন নববিধানবিশ্বাসী যুবক আমরা ঐ প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলাম। ঐ সময় হইতে পারেখ বলেন আমি নিজেকে কখন হিন্দু কখন খৃষ্টিয়ান্ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করি।

১৯১৪ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে নববিধান সমাজের সংঙ্ঘ হয়। প্রমথ বাবুর সহিত পরে কলিকাতা ও কুচবিহারে দেখা হইলে আমি তাঁহাকে Anglican Church এর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্ব প্রস্তাবের আবার অবতারণা করিতে বলি, এবং নববিধান সমাজকে ঈশাকেন্দ্র করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে The world and the New dispensation পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ দেখি। ঠিক এই সময়ে নববিধান সমাজে কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিবার কথা সর্ব্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ যিনি এই বিষয়ের প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন তিনি বলিলেন যদিও কেশব বাবুর কথানুসারে ঈশা নববিধানের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা হইলেও কার্য্যতঃ কেশব বাবুই নববিধান সমাজের কেন্দ্রস্থানীয়। ইহা হইতে আমার মনে একটু খট্‌কা বাধে।

১৯১৫ খৃঃ অব্দে মাঘোৎসব ঘনাইয়া আসিল। আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি নববিধান সমাজের ভিতরে দুইটি স্বতন্ত্র দল দাঁড়াইয়াছে; একদল কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিতে চান, অপর দল কাহাকেও কেন্দ্র করিতে প্রস্তুত নহেন। আমি বলিলাম কেশব বাবুকে কেন? তিনি নিজেইত ঈশাকে কেন্দ্র করিয়া গিয়াছেন। আমরা কেন তাহা অস্বীকার করি? কিন্তু আমার কথা ভাসিয়া গেল। আমি নিরুপায় হইয়া ক্রমে খৃষ্টিয়ানির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবং উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িলাম।"

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, যে পারেখের ধর্ম্মভাব প্রথম হইতেই খৃষ্টধর্ম্মের অভিমুখীন ছিল। কেশব বাবুর উক্তি তাঁহার এই পথের সহায়ীভূত হইয়াছিল এইমাত্র। কেশব বাবুর অতিরিক্ত খৃষ্টপ্রীতির সম্বন্ধে এই পত্রে অনেকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমরা সেই অপ্রীতিকর কথার পুনরালোচনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। আমরা বিগত তিন বৎসর ধরিয়া নববিধান সমাজের কয়েকজনকে কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিয়া তুলিবার আকুল চেষ্টার ভিতরে অবস্থিত দেখিতেছি। ঐ দলের অনেকেই আবার উহার বিরোধী। যাঁহারা আবার কেশব বাবুকে কেন্দ্র করিতে চান, তাঁহারা উহার অর্থ সকলে সমান ভাবে গ্রহণ করেন না। আমরা শুনিয়াছি ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ যে ভাবে কেশবকেন্দ্রের অর্থ বুঝেন, শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সে অর্থ গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত। আমাদের বোধ হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে মাঘোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্নের আলোচনায় কেশবকেন্দ্র লইয়া বক্তৃতার অবতারণা হইতে দেখিয়াছি।

নববিধান কেশব বাবুরই সৃষ্টি। এ কথা ইতিহাস চিরকালই সাক্ষ্য দিবে। নববিধান প্রচারে যদি কিছু গৌরব থাকে তাহা যখন একমাত্র কেশবচন্দ্রেরই প্রাপ্য, তখন "কেশবকেন্দ্র" ইত্যাকার বাক্যের সাহায্যে ধর্ম্মসমাজের ভিতরে dogmaর সৃষ্টি এবং মতবিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের উৎপত্তির যত অল্প হয় ততই কল্যাণ ইহা বুঝিতে হইবে। একে নববিধান সমাজে বক্তৃতার ভিতরে, ধর্ম্মতত্ত্বের প্রস্তাবের মধ্যে কেশব বাবুর নাম নিতান্ত অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার উপরে "কেশবকেন্দ্র" প্রভৃতি কথার উদ্ভব অদূর ভবিষ্যতে মধ্যবর্ত্তিবাদ আনিয়া ফেলিবে অনেক চিন্তাশীল লোকের এইরূপ আশঙ্কা হয়। মহারাণী কুচবিহার লক্ষ্ণৌসংঙ্ঘে উপস্থিত ছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ, তাঁহার পিতার পবিত্র স্মৃতির উপর তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা, নববিধান সমাজের উপরেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব, সাধারণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রকাশের ফলে যাহাতে ভাবীকালে কেশব বাবুর নাম মলিন না হয়,—নববিধ dogmaর সৃষ্টি না হয় তাহার দিকে আমরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এইখানে আমাদের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুর অভিমুখীন, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, তখন মৃত্যু-অন্তে তাঁহার চিতাভস্ম বোলপুর শান্তিনিকেতনে রাখিবার সংকল্প তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে হইয়াছিল। এ কথা

যখন মহর্ষির কর্ণে পৌঁছিল তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পৌত্রগণকে ডাকিয়া কঠোরভাবে এই আদেশ দেন যে "তোমরা ঐ সংকল্প একেবারে পরিহার কর, একেশ্বরের আরাধনার জন্য আমি বোলপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি। ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজার কোন অংশ লোকে ভ্রমবশতঃ আমার স্মৃতি-মন্দিরে অর্পণ করিতে পারে, আমি তোমাদিগকে সে ব্যবস্থা করিতে দিব না। তোমরা ঐ সংকল্প হইতে একেবারে নিরস্ত হইবে বোলপুরে আমার চিতাভস্ম স্থাপন করিতে পারিবে না, ইহা আমার আমার আদেশ জানিবে"। মহর্ষিকে লোকে আজও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ইহাই আমাদের আক্ষেপ।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্পেশাল জজের জায়গায় বদলী। আর একবার সরকারী কাজে যাত্রা। ১৯৯৩-৮৪।

পুণা ও সাতারা জেলায় প্রবাস।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

এই দুই জিলার সমস্ত তালুকে যেখানে যেখানে কন্সিলিয়েটর ও গ্রাম-মুন্সেফ আছে, সেইখানে আমরা (অর্থাৎ 'উনি') গিয়া এবং অর্দ্ধ দিবস থাকিয়া তাঁহাদের দপ্তর পরীক্ষা করিতাম এবং তাহার পর আবার যাত্রা আরম্ভ করিতাম। আমাদের পূর্ব্বেকার এই পদস্থ কর্ম্মচারীর, এইরূপ নিজে গিয়া দপ্তর পরীক্ষা করিতেন না। এই কাজ তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাঁহারা দুই চারিদিন তালুকের গ্রামে মোকাম করিয়া, আশপাশের গ্রাম-মুন্সফ্ ও কন্সিলিয়েটরদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন এবং দপ্তর লইয়া আসিলে দপ্তর দেখিয়া দিতেন। আমাদের সময়ে ঐরূপ কাজ স্বেচ্ছাধীন না রাখিয়া উনি নিজে ছোটখাটো গ্রামে আসিয়া উঠিতেন। সেই জন্য আমাদের এবং আমাদের সহগামী সমস্ত লোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। দুই এক দিন আমরা গরুর কিংবা মহিষের দুধও পাইতাম না। তরকারীর ত নাম নাই। ৭।৮ খানা বয়েলের গাড়ী ও দুই ঘোড়ার মতো যথেষ্ট ঘাসদানাও পাওয়া যাইত না। সেইরূপ আবার, গ্রামে একটি মাত্র কূপ থাকায় আমাদের ৩০।৪০ জন মানুষ ও জানোয়ারের জন্য জল পাওয়া মুস্কিল হইত। পূর্ব্বকার কর্ম্মচারী এরূপ ছোটখাটো গ্রামে স্বয়ং না গিয়া তালুকের দপ্তর চাহিয়া পাঠাইতেন, এই কথা কারকুনকে (কেরাণী) বলিতে শুনিয়াছিলাম; তাই ওঁকে বলিলাম যে, তালুকের দপ্তর চাহিয়া আনিলেই যদি কাজ চলে, তবে এত কষ্ট করা কেন? তখন তিনি বলিলেন, "সরকার যে আমাকে এই কাজে মনোনীত করিয়াছেন, বেতন লইয়া শুধু আমোদ করিয়া বেড়াইবার জন্য নহে; তালুকের দপ্তর চাহিয়া আনিলে, সেখানকার চালাক চতুর লোকই সম্মুখে আসে এবং আবশ্যক মতো নক্সার রেখা টানিয়া কর্ম্মচারীর সম্মুখে নক্সা আনিয়া ধরে;—ইহাতে চাষাদের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না; তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইয়া তাহাদের বাধাবিঘ্ন দূর করাই, সরকারের মুখ্য অভিপ্রায়; এ কথা কেহ কেহ বোঝে না, তাই অকারণ আলস্য করে। বাকী লোকে অর্থাৎ আমরা নিজে ছোটখাটো গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে পর, গ্রামের গৃহস্থ ও বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়. এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া, সহজেই সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই আমরা ছোটখাটো গ্রামে বেড়াইতে যাই; নতুবা এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে কে চায় বলো?" যাক্।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নস্যের ডিবা হারাইল! ১৯৮৪।৮৫।

এই বৎসরেই ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা সাতারা জিলায় আসিলাম। সেই দিন কোরে-গ্রামে আড্ডা করাই স্থির হইয়াছিল। বয়েল-গাড়ীগুলা রাত্রেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। কেবল আমরা নিত্যানুসারে সকালে উঠিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বাহির হইলাম। রাত্রিতে আড্ডায় আসিয়া পৌঁছিলে যদি সেখানে ভাল জল না থাকিত তবে, পথে কোন নদী বা ভাল মনের মতো জায়গা দেখিয়া সেই খানে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা হইত। কোরে-গ্রামের এদিকে 'বসনা' নদীর ধারে আমরা সবাই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। আজ বিলম্ব হওয়ায় নিকটস্থ ডিবা হইতে আমরা দুজনে কিছু খাবার লইয়া জলযোগ করিয়া বাকি খাবার জিনিস শিপাই ও কোচমানদের দিয়া "ঐখানে গিয়া গা ও ডিবাটা মাজিয়া ঘসিয়া নিয়ে আয়"—এইরূপ আমি বলিলাম। ইতি মধ্যে 'উনি' বলিলেন—"আজ দেরী হইয়া যাওয়াও চলা হয় নাই, তাহা না হইলে আর একটু আগাইয়া যাইতে পারা যাইত। ঐ সকল লোক ফিরিয়া আসিলে, তুমি গাড়ী জুতিয়া শীঘ্র এসো।" এই কথা বলিয়া একটু সামনে আগাইয়া যাইবার পর আমি

একটু আমোদ করিবার জন্য সেখানে ঘোড়ার চাবুক ছিল সেই চাবুক হাতে লইয়া নিকটস্থ এক খাটো আমগাছের তলায় গেলাম ও চাবুক দিয়া গাছে দুই তিন ঘা মারিলাম, তাহাতে ২০। ২৫টা কাঁচা আম পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি হইল না; আরও বেশী পাড়িবার জন্য, খুব জোরে ঘা মারায়, চাবুকের সরু শেষটুকু বালায় আটকিয়া, চাবুকের জোরে বালাটাও উপরে উড়িয়া গিয়াছে তখনি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু উপর দিয়া কোথায় পড়িল তাহা দেখা গেল না। আমি ও সিপাহীরা গাছের নীচে আশে পাশে অনেক খোঁজ করিলাম; কিন্তু যারা খোঁজ করিতেছিল তাহাদের পায়ের নীচে পড়ায়, ভুল করিয়া তাহারা গুঁড়াইয়া ফেলিয়াছে কিংবা গাছের কোথাও আট্‌কাইয়া রহিয়াছে, কে জানে। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও পাওয়া গেল না সত্য! ইতি মধ্যে গাড়ী তৈয়ার হইয়া আসিল। গাড়ীতে চড়িয়া আমি অগ্রসর হইলাম। এখন 'ওঁকে' কি বলিব? বালা হারাইয়াছে শুনিলে উনি কি মনে করিবেন? আমি আম পাড়িবার লোভ করিয়াছিলাম—কাজটা ভাল হয় নাই, এইরূপ আমার অনুতাপ হইল, আর ভয় হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক রেলগাড়ী আসিয়া পড়িল, তবু ওঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল না; আমি ঘাব্‌ড়িয়া গেলাম, এবং আমার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ এই গরমের সময় ওঁর অনেক দুর হাঁটিতে হইল এই জন্য আমার বড় খারাপ লাগিল। কিন্তু উপায় কি? দ্বিতীয় mile-এর রাস্তায় ওঁর সঙ্গে দেখা হইল ও গাড়ীতে বসা গেল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, আজ আমার একটা বড় চুক্‌ হইয়াছে বলিয়া হাতের বালার বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলাম। সমস্ত শুনিবার পর, অনেকক্ষণ পরে ও শান্তভাবে উনি বলিলেন যে, "লোকের আম তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাড়িয়াছিলে, কাজটা ভাল হয় নাই। এরূপ আর কখন করিবে না। তুমি একটু শাস্তি পাও, ও তোমার বরাবর মনে থাকে, এই জন্যই তোমার বালা হারিয়েছে। আমি ঐ বালার খোঁজ করিব না ও নূতন বালাও গড়াইয়া দিব না, তাহা হইলে তোমার মনে থাকিবে।" সচরাচর যে রকম ভাবে বলিয়া থাকেন এই কথা সেইরূপ ভাবেই বলিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গীতে মনে হইল, আমার এ কাজটা তাঁর ভাল লাগে নাই; তাই তাঁর সিধাভাবের কথাতেও আমার বিলক্ষণ শিক্ষা হইল। বেশী রাগ করিবার কোন হেতু নাই বলিয়া আমি সমস্ত দিন আমার নিত্যকর্ম্ম না ভুলিয়া বিষণ্ণচিত্তে করিতে লাগিলাম। রাত্রে খাইতে বসিলে পর, উনি নিত্যানুসারে ব্রাহ্মণকে শুধু ডাকিয়া নহে—হাঁক দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এক কাজ কর, আজ সকালের ৭৫ টাকায় আচার পাতে দেবার জন্য নিয়ে এসো।" সে বেচারা কি-আনিবে? 'কাচুমাচু' মুখ করিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আচার করিবে কে? কাঁচা আমগুলা সকাল হইতে স্থানে স্থানে পড়িয়া ছিল। সকাল হইতে সেই আমগুলি দেখাই যেন আমার শাস্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেহই কিছু বলিতেছে না, আমের আচার কেহই আনিতেছে না দেখিয়া, উনি আমাকে বলিলেও, "অন্য কোন কথা মনে আনো, বালা হারিয়েছে বলে' এতটা খিন্ন হবার দরকার নেই। তোমার মতো আমারও একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আজ দুপরে আমার নস্যের ডিবেটা কোথায় পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে। আমার এক জিনিস হারিয়েছে, তোমারও এক জিনিস হারিয়েছে। তুমি বল্‌বে ডিবেটা দস্তার ছিল, তার আবার দাম কি! মূল্যের বিচার এই সময়ে না করে' কাজে লাগার হিসাবে আমার জিনিসের মূল্য বেশী ছিল; কারণ ঐ ডিবে নইলে যে আমার চলে না—কাজ আট্‌কায়। জিনিস হারাণোতে অনবধানতা ও অমনোযোগিতা এই দোষ দেখা যায়। পুনর্ব্বার এরূপ না হয় সেই চেষ্টা করাই ভাল। কিন্তু উহা হারাইবার দরুন এতটা খিন্ন হবার দরকার কি? হেসে খেলে মনের সুখে থাক্‌বে, তা হলে অন্যেরও ভাল লাগবে।" যাক্‌। ইহার পর হারানো জিনিসের নামও আর আমি মুখে আনি নাই।

নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল বার্‌-এট্‌ ল)

জড়জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে যে "পর্দ্দা" বা ব্যবধান দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইতেছে। জীবজগতে উদ্ভিদ ও প্রাণীবিভাগেরও মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহাও প্রকৃত পার্থক্য বলিয়া প্রতীত হয় না। নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃণাদি নির্ম্মিত বাসার মধ্যে ডিম থাকে। নারিকেল-ছোবড়ার মধ্যে ডিম্বাকার খোল থাকে। ডিমের মধ্যে yolk বা "কুসুম" থাকে, খোলের মধ্যেও "সার" অর্থাৎ নারিকেল থাকে। yolk এর মধ্যে পাখীর "বীজ" অর্থাৎ জীবাঙ্কুর থাকে। নারিকেলের মধ্যেও nutty বা সারাংশের দ্বারা বেষ্টিত "বীজ" বা "বীজাঙ্কুর" থাকে। "কুসুম" দ্বারা "জীবাঙ্কুর" পরিপুষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্রমে

বর্দ্ধিত হইয়া পক্ষীতে পরিণত হয়—তখন shell অর্থাৎ ডিমের খোল ভাঙ্গিয়া যায়। নারিকেলের মুখে যে knob বা "বীজাঙ্কুর" থাকে, তাহা নারিকেলের সারে পরিপুষ্ট হইয়া সেই মুখ বা সহজভেদ্য ছিদ্র দিয়া বহির্গত হয়।

নারিকেলের তিনটি আবরণ। একটী সবুজ ত্বক্। দ্বিতীয়টি ছোবড়া। তৃতীয়টী shell বা খোল। বৃক্ষচ্যুত নারিকেল ফলের এই তিনটী আবরণ ভেদ করিয়া নারিকেলের "জীবাঙ্কুর" জল গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাই নারিকেলের মধ্যে জলের সঞ্চার বা সঞ্চয় পূর্ব্ব হইতেই আবশ্যক হয়। এই জলে নারিকেল চারা ক্রমশ পুষ্ট হইতে থাকে ও বাড়িতে থাকে, বেশী বাড়িলেই shell বা খোলটা আপনা-পনিই ভাঙ্গিয়া যায়। ডিম ভাঙ্গিয়া পক্ষীশাবক নির্গত হইয়াই আপনি খুঁটিয়া খায় (যথা মুর্গির বাচ্ছা) বা মা-বাপরা খাওয়ায়। এ খাদ্য ডিমের ভিতরের সার নহে, ডিমের বাহিরের যাহা উপযোগী খাদ্য, এ তাহাই। নারিকেলের চারাও খোল ভাঙ্গিবার পর পৃথিবী হইতে তদুপযোগী খাদ্য অর্থাৎ জলাদি আহরণ করে। খোল ভাঙ্গি-বার পূর্ব্বে খোলের মধ্যে যে জল-সার তাহাই ব্যবহার করে।

প্রকৃতিমাতা নারিকেলবীজ ও পক্ষীবীজকে একই কৌশলে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। পাখীরা দু'চারটে করিয়া ডিম পাড়ে; তাহার অর্থ—একটা আধটা খারাপ হইলেও ক্ষতি হইবে না। বংশ বৃদ্ধি বা রক্ষার জন্য একটী ফুটিলেই যথেষ্ট। নারিকেলেরও পূর্ব্বে তিনটী করিয়া "বীজাঙ্কুর" হইত—তাহার পরিচয় নারিকেলের তিনটী pits বা depressions অর্থাৎ মুখ। একটী মুখ সচ্ছিদ্র—যাহার মধ্যে ছুরি দিলে খোলের ভিতর হইতে জল নির্গত হয়। তাহারই নীচে দুইটি বন্ধ মুখ—এক কালে এই দুই মুখ বন্ধ ছিল না। প্রত্যেক মুখে একটী করিয়া knob বা বীজাঙ্কুর থাকিত। পূর্ব্বকালে নারি-কেল এইরূপ ত্রি-আবরণে আবৃত ছিল না। তিনটী ছিদ্রই ছিল, তিনটী knobই হইত। নারিকেলের সার ও মিষ্ট জলের জন্য নারিকেলের অনেক শত্রু জুটিল। তন্মধ্যে মনুষ্যের অতিবৃদ্ধপিতামহ বানরেরাই গুরুতর শত্রু। তাহারা নখ দাঁত দিয়া ছিদ্রগুলি খুলিয়া নারিকেলের জল পান করিত ও নারিকেল ভাঙ্গিয়া kernel বা সার খাইত। প্রকৃতিদেবী অনন্যোপায় হইয়া শত্রুদিগের চোখে ধূলা দিবার জন্য একটী মাত্র ছিদ্র রাখিলেন। যে দুইটী বন্ধ হইল সেই দুটিরই উপর প্রথমেই নজর পড়ে। বাঁদরেরা এই দুইটী বন্ধ মুখ নখদাঁত দিয়া খুলিয়া ছেদ করিতে অপারক হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিত। বীজ অর্থাৎ বংশ রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি এই কৌশল অবলম্বন করিলেন।

আবার নারিকেল গাছ ক্রমে উচু হইতে লাগিল—উচু বৃক্ষ হইতে নারিকেল পড়িয়া খোল ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। প্রকৃতি তাই নারিকেলের খোলকে আরো দুইটী আবরণে ঢাকিয়া দিলেন। প্রথমটী ত্বক, আর দ্বিতীটী ছোপড়া, এই ছোপড়া থাকাতে ঝুনা অর্থাৎ বীজ-নারিকেল গাছ হইতে পড়িলেও সহজে ভাঙ্গিতে পারে না। পরে যখন নারিকেল-বীজকে এইরূপ তিন-ফেরা কেল্লার মধ্যে পোরা হইল, তখন সে বীজের ধ্বংসের ভয় আর রহিল না। তাই তিনটী knob বা বীজের যায়গায় একটীই যথেষ্ট হইল। অরক্ষিত অবস্থায় একাধিক বীজের প্রয়ো-জন ছিল কারণ বীজ নষ্ট হইবার ভয় ছিল। এখন আর সেই ভয় রহিল না। তিনটী ছিদ্রের স্থলে এখন একটী ছিদ্র অবশিষ্ট রহিল, দুইটীর কেবল চিহ্ন মাত্র রহিল। বাঁদরকে প্রতারণা করি-বার জন্যই বোধ হয় প্রকৃতি এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন।

কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কৌশলের পর কৌশল পরীক্ষা বা অবলম্বন করিয়া শেষে প্রাকৃতিক নির্ব্বা-চনফলে নারিকেল তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ধনী লোকের এক পুত্র হইলে যেমন সে স্বচ্ছন্দে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে, দশপুত্র হইলে সেরূপ করা অসম্ভব। নারিকেল ফলও bitter experience দ্বারা এই শিক্ষা পাইয়াছে যে, তাহার মধ্যে যে সঞ্চিত খাদ্য আছে তাহা একটী বীজের উপযোগী, তিনটী মাত্র বীজের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাই প্রকৃতিরূপী ধাত্রীএকটী বীজ-কেই 'দুগ্ধ' (coconut milk) পান করান।

জ্ঞানগর্ব্বিত মানব মনে করেন প্রকৃতি তাহারই জন্য ডাবের মধ্যে জল দিয়াছেন—খোলের মধ্যে

পৌষপিটে খাইবার জন্য নারিকেল দিয়াছেন। মানুষের জন্য প্রকৃতির এত মাথাব্যথা ধরেনি। প্রকৃতি নারিকেলের বংশরক্ষার জন্যই নারিকেল ফলে জল ও সার সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বসু রায়বাহাদুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দ্রের বর্ত্তমান অবস্থা। চন্দ্রদেবের জন্মসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা ইতি-পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি। অন্যূন ৫ কোটী ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়েই একাঙ্গীভূত ছিলেন। চন্দ্রদেব পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবার পর একেবারে অধিক দূরে গমন করেন নাই। তোমরা ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছ যে এক বুড়ি ঝাঁট দিতে দিতে যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, অমনি চাঁদ তাহার মাথায় ঠেকিয়া গেল। সে রাগান্বিত হইয়া চাঁদকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্রদেব প্রহারের ভয়ে আকাশের বহু ঊর্দ্ধদেশে পলায়ন করিলেন। সেই অবধি পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে এত অধিক ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। চন্দ্রদেব, উপকথার চাঁদের ন্যায়, পৃথিবীর অত নিকটে না থাকিলেও এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে যে অনেক কাছে ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। চন্দ্র পৃথিবীর এত কাছে থাকিবার জন্য তখন জোয়ার ভাঁটার প্রভাব এখন অপেক্ষা অনেক প্রবল ছিল। তখন জোয়ারের সময় সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়া অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উন্নত হইয়া উঠিত। এখন তোমাদের চান্দ্রমাস ২৭ দিনে হয়, তখন ১½ দিনে এক একটী চান্দ্রমাস হইত। তখন বৎসরের পরিমাণ এখনকার মত ৩৬৫ দিন ছিল না, এক হাজার দিনে এক বৎসর হইত। অধ্যাপক ডারউইনের মতে ৪ কোটী ৭০লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতি এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হইত, যে তখন ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৬½ ঘণ্টা পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ ছিল। চন্দ্রদেব এখন পৃথিবী হইতে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এত দূরে থাকিলেও জননীর স্নেহমমতা একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই তিনি দিবসে এখনো দুই বার জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পুত্রবৎসলা জননীরও সেই সময়ে স্নেহের উচ্ছ্বাসের সহিত বক্ষস্থিত স্তন্যধারা উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং সন্তানকে তাহা পান করাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। মাতা-পুত্রের এই অপূর্ব্ব স্নেহের আদানপ্রদানকে কবিত্বহীন নীরস বিজ্ঞানের ভাষায় তোমরা জোয়ার ভাঁটা বলিয়া থাক।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এক সময়ে চন্দ্রের মধ্যে বহু আগ্নেয় গিরির অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা সদাসর্ব্বদা অগ্নিময় গলিত প্রস্তরাদি উদ্গিরণ করিত। সে সময় তোমাদের জন্ম হয় নাই, তাহা না হইলে দূরবীক্ষণ সাহায্যে তোমরা অনায়াসে চন্দ্রের মধ্যে এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইতে। এখন এই অগ্ন্যুৎপাত চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের গতি এখন মন্দ হইয়াছে এবং আকর্ষণশক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এখন জোয়ার-ভাঁটা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবলভাবে ঘটিতে দেখা যায় না। এখন চন্দ্রদেব কেবল রাত্রিকালে স্নিগ্ধ বিমল অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া বিরহবিধুরা জননীর শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

স্থল ও জলের আবির্ভাব। বাষ্পময় পৃথিবীর বহির্ভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল ; এই অংশই বর্ত্তমান ভূপঞ্জরের আদিস্তর বলিয়া পরিগণিত। শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময়ে ভূস্তরের কোন স্থান উচু হইয়া উঠিল, কোন স্থান বা বসিয়া গেল, আবার অনেক স্থান চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এইরূপে কত স্থানে কত শত গভীর খাতের সৃষ্টি হইল। তাপ ক্রমশঃ আরো যত কমিয়া যাইতে লাগিল, অসীম আকাশমণ্ডলে যে জলরাশি বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল, তাপের অপসারণে তাহা ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকার ধারণ করিল এবং বৃষ্টিরূপে ধরাবক্ষে পতিত হইতে লাগিল। সে বৃষ্টির মাপ ছিল না, তাহার বিশ্রামও ছিল না। অবিরাম বর্ষণ হেতু

মহাগভীর খাতগুলি ক্রমে সাগর মহাসাগরে পরিণত হইল।

যে কোন বস্তুর দুই দিকে চাপ দিলে উহার মধ্যাংশ স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠে এবং উহার উপরিভাগ কুঞ্চিত হইয়া যায়। এই একই নিয়মে ভূপৃষ্ঠের যে সকল স্থান সঙ্কোচনজনিত প্রচণ্ড পেষণে উর্দ্ধদিকে স্ফীত বা মন্দিরের চূড়ার ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিল, তাহারাই দেশ, মহাদেশ অথবা অভ্রভেদী পর্ব্বতমালারূপে এই অসীম জলরাশির উপরে জাগ্রত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্কোচনজনিত উত্থান-পতনরূপ বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন প্রকাণ্ড জলভাগের, অপরদিকে তেমনি স্থলভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বোচ্চ গিরিরাজ তোমাদের জন্মভূমির শিরোমুকুটরূপে বিরাজ করিতেছে, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে সেই মহিমান্বিত অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত বিশালদেহ হিমাদ্রিও এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে কত সমুদ্রচর প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইয়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শৈলরাজি আল্প্‌স্‌ও একসময়ে সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত ছিল। তোমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোণার বাংলা দেশ সেদিন মাত্র সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া মানুষের আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমার জন্মিবার কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে সে সূর্য্যের মুখ প্রথমে দর্শন করিয়াছে। তোমাদের জননী তোমাদের নিকট প্রাচীনা হইলেও তিনি আমার চোখে সেদিনকার মেয়ে বইত নয়!

চন্দ্র পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইবার পর পৃথিবীর আকারের একটু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। উহার একভাগ অতি প্রশস্ত ও অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং এতদুভয়ের মধ্যে একটী গভীর খাতের সৃষ্টি হয়। কালে এই খাত বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইলে পৃথিবীতে প্রথম সমুদ্রের আবির্ভাব হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই প্রথম সমুদ্রই বর্ত্তমান প্রশান্ত মহাসাগর। এইরূপে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এই মহাসাগর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্রশস্তাংশ বিভিন্ন মহাদেশরূপে এবং অপ্রশস্তাংশ জলের মধ্যে কতিপয় দ্বীপরূপে শোভা পাইতে লাগিল। প্রশস্তভাগ হইতে ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়ার প্রায় তাবদংশ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বৃহদংশ গঠিত হইয়াছে। অপ্রশস্ত অংশের মধ্যে জলভাগই অধিক, স্থলের পরিমাণ খুব কম। আবার এই স্থলাংশ কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টিমাত্র। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকার কিয়দংশ এবং মালয় উপদ্বীপ এই অপ্রশস্ত স্থলভাগের অন্তর্গত ছিল।

উত্থানপতন বিপ্লব।

এক সময়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই জলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এই অসীম অনন্ত-বিস্তৃত জলরাশিকে তোমাদের একজন বৈষ্ণব কবি মধুচ্ছন্দে "প্রলয়পয়োধি-জল" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের প্রাচীন ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন যে প্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্না ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই যে এক সময়ে জলমগ্ন ছিল, তাহা স্বীকার করেন না। বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর স্তরের গঠনের তারতম্য দেখিয়া তাঁহারা অনুমান করেন যে স্থল ও জল আদিকাল হইতেই একত্র এক সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবীর আদিম পর্ব্বতসমূহের গঠন দেখিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল পর্ব্বত বহুপূর্ব্বে গঠিত স্থলভাগের ভগ্নকণা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে হেথায় সেথায় জলের উপরিভাগে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে তখন আফ্রিকা মহাদেশ বর্ত্তমান মাদাগাস্কার্ দ্বীপ অপেক্ষা বৃহদাকার ছিল না। তোমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপ অপেক্ষা আয়তনে বড় ছিলেন না। এই সকল দেশের অধিকাংশ স্থলভাগই তখন জলে নিমজ্জিত ছিল।

আবার উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে যে সকল ভূভাগ উন্নত হইয়া পর্ব্বত ও মহাদেশে পরিণত হইয়াছিল অন্য কারণে তাহাদের অনেকেরই অস্তিত্ব হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইল।

কালে এই সকল উচ্চ ভূভাগ বায়ু, বৃষ্টি ও রবি-তাপের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণায় পরিণত হইতে লাগিল এবং পর্ব্বতবাহিনী স্রোতস্বতী দ্বারা প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সাগরগর্ভে আশ্রয় লাভ করিল। আবহমান কালব্যাপী এই "পলি" সঞ্চয়ের ফলে অতল সমুদ্রগর্ভ পুনরায় উচ্চ হইয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। এইরূপে কত পর্ব্বত, কত দেশ, কত মহাদেশ একবার গঠিত হইয়া প্রাকৃতিক ক্রিয়া দ্বারা পুনরায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, আবার কত অদৃশ্য অতলস্পর্শ সমুদ্র-গর্ভস্থিত স্থানও উন্নত হইয়া কোথাও বা জলশূন্য ও জনশূন্য বালুকাময় মরুভূমি, কোথাও বা ঘন-পাদপরাজিবেষ্টিত নিবিড় অরণ্যানী অথবা সমৃদ্ধি-শালী বহুবিস্তৃত জনপদে পরিণত হইয়াছে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে এই ভাঙ্গাগড়া কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে; পৃথিবীর জীবনেতিহাসে এইরূপ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাহার বর্ত্তমান আকার ও উপযোগিতা প্রদান করিয়াছে। সেই বিপ্লবের এখনো শান্তি হয় নাই, পৃথিবীর গঠন এখনো পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। প্রকৃতি দেবীর ভাঙ্গাগড়া কার্য্য এখনো অবিরাম ভাবে চলিতেছে। এখনো এই উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে অথবা ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তর-স্রোতের বিষম চাঞ্চল্যে, ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া কত জনপদ ধ্বংস বা জলমগ্ন হইয়া যাইতেছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা কত দ্বীপ, কত নগর শ্মশানে পরিণত হইতেছে, আবার পর্ব্বত-গাত্রস্খলিত স্রোতোবাহী পলি-পাত দ্বারা কত জলমগ্ন স্থান উন্নত হইয়া পুনরায় মনুষ্যের বাসের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইয়া গিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এখন এই বিপ্লব সেরূপ প্রবলভাবে বা ঘন ঘন সংঘটিত হইতে দেখা যায় না; ইহা তোমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা স্বীকার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

চা পানের অপকারিতা।

(শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে চায়ের প্রচলন বিশেষ-রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে অনায়াসে ২টী পয়সা ব্যয় করিয়া চা খাইয়া থাকে। কলিকাতার প্রতি রাজপথে অসংখ্য চায়ের দোকান বসিয়াছে। এবং প্রতি দোকা-নেই বহু খরিদ্দারের সমাগম হইয়া থাকে। আমার কোন বন্ধু একদিন হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, বহু-বাজার ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের চাএর দোকান গণনা করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান ১১০ খানি হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক দোকান বাদ পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়া সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া বেশ লাভ হইয়া থাকে, নতুবা দোকান উঠিয়া যাইত। এই সমস্ত টাকাই আমা-দের দেশের মধ্যবিত্ত লোক এবং সামান্য ব্যবসায়ী, মুটে, মজুর, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি দিয়া থাকে। যাহাদের চা-বাগান আছে তাহারা এবং চাএর বড় বড় ব্যবসায়ী-গণ প্রথমতঃ বিনা পয়সায় চাএর প্যাকেট বিতরণ করি-তেন, তারপর ক্রমে যখন লোকের নেশা ধরিল, তখন বিতরিত চাএর মূল্য সুদসহ আদায় করিয়া লইলেন। শুধু কলিকাতায় নহে, আমাদের দেশের সকল প্রধান সহরেই এইরূপে চাএর বহুল প্রচলন হইয়াছে। আমি যখন বোম্বাই নগরে গিয়াছিলাম তখন সেখানে অসংখ্য ইরাণী দোকান দেখিয়াছিলাম। ঐ সব দোকানে চা বিক্রয় হইত। সে সময়ে কলিকাতায় চাএর দোকান বসে নাই। বর্ত্তমানে বোম্বাই সহরে চা-বিক্রয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে চাএর একটু উপকারিতা আছে, তাহাতে শরীর ঝরঝরে রাখে এবং উৎসাহ জাগাইয়া তোলে। বাস্তবিক পক্ষে যদিও ঐ গুণ চাএর থাকে তাহা সাময়িক মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক ও কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে দ্বিগুণ অবসাদ আসে, চায়ের প্রভাবটুকু অন্তর্হিত হইলেও শরীরে সেইরূপ অবসাদ আসিয়া থাকে। এ কারণ একবার চা ধরিলে তাহা ত্যাগ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সমস্ত নেশার জিনিষের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে চায়ে dyspepsia আনয়ন করে। কিছু দিন নিয়মিত চা সেবন করিলে পাকযন্ত্রের পূর্ব্বের তেজ থাকে না, উক্ত যন্ত্রস্থ gastric juice পাতলা হয় এবং তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়রাম সৃষ্টি হইয়া থাকে। চাএর এই কুফল একদিনে

অথবা হঠাৎ উপস্থিত হয় না এ কারণ লোকে মনে করে ঐ সব ব্যারাম অন্যান্য কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চা পান যে ঐ সব রোগের এক প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

চা সেবনে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহাতে পরিণামে নানাবিধ দুঃসাধ্য ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। যদিবা শীত-প্রধান দেশে চাএর কোন উপযোগিতা থাকে আমাদের দেশের মত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে চা বিষের মত ক্রিয়া করিয়া থাকে। বহু লোকে চা পান করিয়া তাহার অনিষ্টকর ফল ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে চায়ে তাহাদের অপ্রবৃত্তি হয় নাই। এইটিই চা-পানের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কুফল। পরের অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আমরা যাহা করি তাহার পরিণামফল বিবেচনা করি না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

চা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল আর্থিক ক্ষতি। যে পরিবারে ৪ জন লোক চা পানে অভ্যস্ত, তাহাদের দুবেলা চা পানে অন্ততঃ চারি আনা ব্যয় হইয়া থাকে অর্থাৎ মাসে প্রায় ৮৲ টাকা ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসিক ৮৲ টাকা ব্যয় করা সহজ কথা নহে। ফলে তাহাদের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। এই ভাবে আমাদের দরিদ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে।

চা পানের এতগুলি কুফল। আমাদের জনসাধারণের অবগতির জন্য গৃহে গৃহে চা পানের কুফল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এবং আমাদের দেশের লোকের বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক হিতপথ গ্রহণ করিয়া চা পান একেবারে ত্যাগ করা উচিত।

চা পানের আরও একটি কুফল এই যে বাড়ীর পুত্র-কন্যাগণ সকলেই চা পানে উৎসাহিত হইয়া থাকে। কোন কোন পিতা মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্রকন্যাগণকে চা পান করিতে শিখাইয়া থাকেন। পরিণামে এজন্য তাহাদের সকলেরই নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অনুরোধ দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন এবং বালক বালিকাগণের ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ করিবেন না।

চা পান ত্যাগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সকলেই চাএর বিরোধী হন এই আমার নিবেদন। *

* আমরা লেখকের প্রস্তাব খুবই অনুমোদন করি। তাহার উপর এইটুকু বলিতে চাই যে, যে দিন আমাদের দেশের লোকেরা চা-পান হইতে বিরত হইয়া তাহার খরচটা দেশের দারিদ্র্যমোচনে ব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, সেইদিন দেশের মানসিক বলের পরিচয় পাইব। তং বোং সং।

মহর্ষির জীবনের কয়েকটী কথা।

বাল্য জীবন।

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৎপরে হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে রাজা অতিশয় ভাল বাসিতেন। মধ্যে মধ্যে রাজার সহিত তিনি বেড়াইতে বাহির হইতেন। মহর্ষি বলিয়াছেন—"রাজার মুখমণ্ডলের তেজস্বিতা ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ভাব আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিত—ভাবিতাম উনি একজন বড় লোক।" এই সময় মহর্ষির বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে।

(২) মহর্ষির পিতা সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রাজার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একবার দুর্গাপূজার সময় তাঁহাদের বাটীতে দুর্গা প্রতিমা দর্শনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন—"আবার আমাকেও কেন"। এই কথা শুনিয়া বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে একটী গভীর প্রশ্নের উদয় হইল। প্রতিমা দর্শনের বিষয় বলাতে রাজা ঐরূপ কথা কেন বলিলেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা ব্রহ্মোপাসক, প্রতিমা পূজাতে যোগ দেওয়া উচিত মনে করেন না, তখন হইতেই তাঁহার মন সর্ব্বপ্রথম নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার দিকে আকৃষ্ট হইল। মনে মনে স্থির করিলেন আর প্রতিমার নিকট নমস্কার করিবেন না। তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুদিগকেও নমস্কার করিতে নিষেধ করিলেন।

(৩) রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাওয়ার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; রাজা দেবেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বিদায় কালে সাদরে তাঁহার সহিত হস্তমর্দ্দন করেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলেন—'আপনার এই পুত্র আমার ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করিবে।" রাজার এই ভবিষ্যদ্বাণী বস্তুতঃই কয়েক বৎসরের মধ্যে সফল হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জীবন।

(১) মহর্ষির বয়ঃক্রম এখন ৮৫ বৎসর। দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ বাটীতে বাস করিতেছেন। এই বাটীতে আসিয়া বলিয়াছেন, যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেখানেই দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা।

(২) মহর্ষি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন। তৎপর কিছু বেলা হইলে গৃহের বাহিরে আসিয়া যোড় হস্তে চতুর্দ্দিক মুখ ফিরাইয়া বার বার নমস্কার করেন এবং কিছুকাল ঈশ্বর চিন্তাতে নিমগ্ন থাকেন। প্রতিদিন প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় তাঁহার বাড়ীর পারিবারিক উপাসনার ঘণ্টা পড়ে। বাড়ীর নরনারী সকলে উপাসনাতে যোগদান করেন কি না এবং কে আচার্য্যের কার্য্য করেন ইত্যাদি সংবাদ প্রতিদিন লইয়া থাকেন। ৮ ঘটিকার সময় কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করেন। এখন দুগ্ধ ও বেদানার রসই তাঁহার প্রধান আহার।

(৩) প্রায় প্রতিদিনই প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও যাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হয়েন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও

ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে আলাপ করিয়া থাকেন। উপনিষদ ও হাফেজ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক বলিবার সময় তাঁহার যে প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং মুখশ্রী হয় তাহা বস্তুতঃই দেখিবার জিনিস।

(৪) এই বৃদ্ধবয়সে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা বিষয়ে কত চিন্তা করেন তাহা বর্ণনাতীত। অল্পকাল গত হইল একদিন মহর্ষি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছেন—"যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত পরিষ্কার থাকে, তদ্বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা যত্ন করিবে। ইহাতে যেন কোন দূষণীয় মত স্থান পায় না।" প্রতি বুধবার আদি-ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাতে কোন্ কোন্ গান হইয়া থাকে এবং কি প্রকার গান হওয়া আবশ্যক এবং কে কি বিষয়ে উপদেশ দান করেন তাহারও তত্ত্ব লইয়া থাকেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে কিপ্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং কি ভাবে উক্ত পত্রিকা পরিচালিত হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দান করেন। বাড়ীর ছেলে ও মেয়েদিগকে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি রবিবার নিয়ম করিয়াছেন। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে তজ্জন্য প্রতিদিন অপরাহ্ণে অন্তঃপুরমধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। পারিবারিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সাধনে বৃদ্ধ মহর্ষির নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দর্শন করিলে অবাক হইতে হয়।

(৫) প্রতিবৎসর ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মহর্ষির জন্মদিনে সন্তানসন্ততি জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যখন তিনি উপাসনা করেন, তখনকার সেই দৃশ্য কি মনোহর। তিনি ঐ দিবসে তাঁহার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী হইবার জন্য প্রত্যেকের হস্তে এক এক খানি আশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করেন। চক্ষুর তেজ ও শ্রবণশক্তি হ্রাস হওয়াতে তিনি অপরের সঙ্গে আলাপাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। মহর্ষি এখন অনেক সময় এইরূপ বলেন—পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে সংসার হইতে আমার আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দিকে রাখিবার জন্য আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলিকে ক্ষীণ করিতেছেন। মহর্ষির শরীর এখন অতিশয় দুর্ব্বল কিন্তু কখনও দিবানিদ্রা যান না। যদি কেহ গৃহী যোগী দর্শন করিতে চাহেন, এই বেলা দর্শন করিয়া লউন।

সেবক, পৌষ ১৩০৭।

সমরক্ষেত্র হইতে পত্র।

রণাঙ্গন,
৪ জুন ১৯১৮।

পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী—

আমার প্রণাম জানিবেন। আজ অনেক দিন পরে আপনার পত্র পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম তাহা আর কি লিখিব। আমার আসবার কথায় আপনারা খুব আশান্বিত হয়েছিলেন, কি করব বলুন আপনাদের আশা এখন সফল করতে পারলুম না। পূজার সময় নিশ্চয়ই যাইব জানিবেন—আমার ছুটী অনেক দিন পাওনা হইয়াছে এখন আমি লই নাই, তার কারণ এখন রাস্তার গরমে বড় কষ্ট পেতে হয়, আর প্রায় এক মাস ইজিপ্টে বালির উপর থাকতে হয় তাতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুরা যাঁরা দ্বিতীয় দলে আছেন,তাঁরা তাঁদের কষ্টের কথা লিখেছেন। যাক্; আমি পূজার সময় দেশে যাবার ঠিক করেছি, কারণ অনেক দিন দেশের মহাপূজা দেখি নাই; যদি তার আগে বাড়ী যেতে বলেন—তাহলে আপনার কথামত কার্য্য করিব। আর এক কথা আপনাকে কে বলেছে যে বিবাহ করব বলে বাড়ী যাই নাই? প্রথম কথা—আমার বিবাহের বয়স হয় নাই, দ্বিতীয় কথা—আমি যে দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছি সেটা কি বিবাহের জন্য? মানুষের মনে এতটা নীচতা আসতে পারে? এসেছি এখানে দেশের কাজে—অন্য কথা কি মনে আসতে পারে? আর আমাদের দেশে কি কন্যার অভাব যে আমি এক বিদেশীয়া বিজাতীয়া কন্যাকে মস্তকে করিয়া দেশে যাইব? আমার দেশের চেয়ে বড় পৃথিবীতে কি আর কেউ আছে? এসব দেশ তার পায়ের কাছেও দাঁড়াতে পারে না—আমাদের বরাতই মন্দ—তাহা না হইলে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি হইতাম। আমাদের দেশ—তাতে কত সুখ—কত শান্তি কত তৃপ্তি, এমন দেশ ছেড়ে আমি বিদেশে থাকিব—বিজাতীয়াকে বিবাহ করিব? যে তাহা ভাবিয়াছে—সে জানে না, আমার কাছে দেশ কত পবিত্র, কত মহান্, কত সুন্দর। আর কি লিখিব আপনি আমার বিশ্বাস করেন। ভাল আছি ইতি—

সেবক—সিদ্ধু।

মা আমার।

ভৈরবী।

আমরি মরি কিরূপ ধরি
এসেছ মা—মা আমার!
হৃদয় উজল করি
জ্যোতি অপরূপে ভরি,
বারেক দাঁড়াও
প্রণমি গো মা আমার।

তোমারি ভালে তপন জ্বলে
তোমারি হাসি ফুটে কমলে
তোমারি প্রভা জগতীতলে
প্রণমি গো মা আমার।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা"এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷৹
দশোপদেশ	৷৷৹
মাঘোৎসব	৷৷৹
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ (ভাষা সম্বলিত)	৵৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৷৵৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৵৹
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	৴৹
Trust Deed	৴৹
শ্রেয় ও প্রেয়	৴৹
মাতৃপূজা	৴৹
অকারণ নিরাশা	৴৹
আদি ব্রাহ্মসমাজের সবলতা ও দুর্ব্বলতা	৴৹
আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবনা	৴৹

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵৹
পরলোক ও মুক্তি	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴৹
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	„ 1 „
The Theist's Prayer Book	„ 1 „
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸৹
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৲

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	৷৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸৹
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. „ 4 „
Adi Samaj as a Church	„ 4 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	„ 4 „
The Doctrine of Christian Resurrection	„ 2 „

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷৹
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	৷৷৹
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৷৷৹

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত

রাজা হরিশ্চন্দ্র „	৷৷৹
আঁখিজল „	৷৷৹
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১৷৹
ওঁ পিতা নোঽসি	৷৷৹
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	৷৷৹
বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	৴৹
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	৷৷৹

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

সত্যসুন্দর মঙ্গল	১৲
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	৷৷৹

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

উপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	৷৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৴৹

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷৹
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১৷৹

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত

সনেট পঞ্চাশৎ	৷৷৹

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

আমার খাতা	৸৹
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸৹

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীত পরিচয়	৷৵৹

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত মঞ্জরী	৫৲

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

Life of Dwarka N. Tagore	৷৹

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ৷৹ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০৩ সংখ্যা — ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রচারক।

ব্রাহ্মসমাজ যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজ, ইহা বলিতে গেলে সকল সম্প্রদায়েরই ব্রহ্মোপাসকের প্রাণে উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন আর সহজে কোন ব্রাহ্ম স্বীকার করিতে চাহেন না যে তিনি হিন্দু নহেন। তুমি বলিবে যে তাহা রাজনৈতিক হিসাবে। আমরা বলিব তাহা নহে। মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুস্থানবাসী বলিয়া কি আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়? তাহারা আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিতে অসম্মত হইবে না, কিন্তু তাহারা কখনই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকার করিবে না। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণেরই একটী সমাজ। এই ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণের ভিতর কেহ বা জাতিভেদ মানেন না, আর কেহ বা সমাজের হিতজনক মনে করিয়া জাতিভেদ স্বীকার করেন। ইহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা সত্বেও আমরা বলের সহিত বলিব যে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুদেরই সমাজ। মূর্ত্তি-উপাসক হিন্দুদিগেরই ভিতর কি এইরূপ নানা মতাবলম্বী লোক স্থান পায় নাই? যে ছুঁই-ছুঁই ভাব ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, জাতিভেদের মূল সেহ ছুঁই-ছুঁই ভাব হিন্দুগণ পুরীধামে কেমন সহজে পরিত্যাগ করে। ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফলই হউক বা অন্য যে কোন প্রভাবের ফলই হউক, তাহা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা দেখাইতে চাই যে, অনেকে যে বলেন যে জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের অন্যতর ভিত্তি—সেটী একটী মস্ত ভুল। আসল কথা এই যে, সমাজের নেতা বা ধর্ম্মবক্তাগণের ব্যক্তিগত প্রভাবের উপর সমাজের ভাব অনেকটা নির্ভর করে। বুদ্ধই হউন বা চৈতন্যদেবই হউন, ইঁহাদের কাহারও না কাহারও প্রভাবে পুরীধামে জাতিভেদের প্রভাব বিদূরিত হইতে পারিয়াছিল। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের উপদেশে ও চরিত্রে যদি জ্ঞানের প্রভাব ভক্তির প্রভাব, প্রেমের প্রভাব খুব বেশী মাত্রায় থাকে—এতটা থাকে যে তাঁহাদের কথা উপদেশ জনসাধারণের হৃদয়ে দিবানিশি ঝঙ্কার দিতে থাকিবে, তবেই না ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও জাতিভেদ স্থান পাইতে পারিবে না। কিন্তু জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্মগণ সকলেই একমত হইতে পারুন বা নাই পারুন, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণের সমাজের অতিরিক্ত অন্য কোন সমাজ বলিতে পারিব না।

এখন দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে হিন্দুসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মত প্রবেশ করানো যাইতে পারে। তোমরা মনে কর যে কলিকাতা সহরে বা কয়েকটী বড় বড় সহরে

ঢাকঢোল পিটাইয়া নিজের মত সম্বন্ধে লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা করিলে, তাহা হইলেই তোমাদের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইল। এরূপ বক্তৃতা প্রভৃতির ফলে কাজ একেবারেই যে হয় না, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু ইহার ফলে কাজ আশানুরূপ হয় না। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ তোমার বক্তৃতা শুনিয়া মনে স্থির জানিল যে ব্রাহ্মসমাজের মত ঠিক। কিন্তু যেই তাহারা সেই পল্লীগ্রামের দলাদলির ভিতর মোড়লির ভিতর গিয়া পড়িল, তখন পর্ব্বত-সমান বাধা দেখিয়া বলিল—'কাজ কি বাপু, আমার ঠিক করিয়া—কোন্ ধর্ম্ম ঠিক আর কোন ধর্ম্ম বেঠিক; আমার চুপচাপ করিয়া গতানুগতিকের মত থাকাই ভাল'। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের কথায়, কাজে, চরিত্রে, তোমাদের জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে এমনভাবে চল যে তোমাদের প্রতি নিশ্বাস জনসাধারণেরও হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলিতে পারিবে, তাহা হইলে কি আর প্রচারের ভাবনা ভাবিতে হয়? উপযুক্তমত ঢেউয়ের ঝাঁপ তুলিতে পারিলে যেমন সমস্ত জলটাই ক্রমে কাঁপিয়া উঠে, সেই রকম জনসাধারণের হৃদয়ে প্রেমের ভক্তির জ্ঞানের ঝাঁপ উঠাও, সমস্ত লোক তোমার গোলাম হইয়া পড়িবে।

এই কথাটী এখানে বলার উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের প্রথম উদ্যমের ভুল দেখাইয়া দেওয়া। আমরা শুনিয়াছি যে বঙ্গের উত্তর ভাগে অবস্থিত কোন দেশে একজন ব্রাহ্ম প্রচারক গেলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে ব্রাহ্ম হইলেন। কিন্তু প্রচারক মহাশয়ের ভয় হইল যে পাছে তাঁহারা আবার হিন্দু হইয়া যান। তাই তিনি স্থির করিলেন যে এমন একটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার ফলে সেই নূতন ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুগণ আর ফিরিয়া না লইতে পারে, তাহা হইলেই সেই ব্রাহ্মেরা "জাত-ব্রাহ্মে" পরিণত হইবে এবং ব্রাহ্মদের দলপুষ্টি হইবে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে নূতন ব্রাহ্মদিগকে কুক্কুট সেবন করাইতে হইবে এবং হিন্দুরা যখন পাঁঠা খায়, তখন নূতন ব্রাহ্মদিগকে পাঁঠী খাওয়াইতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাহার ফল আসলে কি ভাল হইল? ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে কয়েকজন ব্যতীত নূতন ব্রাহ্মদের সকলেই বিরাট হিন্দু-সমাজের মধ্যে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়া সেই দেশে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান বিদ্বেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা একবার কোন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গিয়াছিলাম। তথাকার ব্রাহ্ম নেতা আমাদের জন্য এবং অবশ্য নিজেরও জন্য নানাবিধ অখাদ্য কুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু সে সকল খাইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে বেসুরা তান জাগাইয়া তোলা অপেক্ষা ঋষিপ্রদিষ্ট আতপ তণ্ডুলের অন্ন এবং সুবাসপূর্ণ গব্যঘৃত প্রভৃতি সেবন করিয়া যেমন নিজেদেরও উপকার সাধন করিয়াছিলাম, জীবহিংসার পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম, সেইরূপ স্থানীয় লোকদিগেরও শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে সেই স্থানীয় নেতাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মবিদ্বেষ্টা হইয়াছেন। আরও একটী দৃষ্টান্ত দিব। একবার কোন ব্রাহ্মনেতা আমাদের সঙ্গে বিদেশে যাইতেছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানেন না, ইহাই দেখাইবার জন্য "পাণিপাঁড়ে"কে পরিত্যাগ করিয়া এক ভিস্তিকে ডাকাইয়া তাহার মশকের জল পান করিয়া অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সহযাত্রীদিগের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ভাব উত্থিত হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এখন আর সে রকল ভুল করিলে চলিবে না। এখন ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের অপেক্ষা জনসাধারণের অনেকে নানাবিষয়ে অনেক উন্নত হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের মনে ঠিক করিয়া চলা উচিত যে তাঁহাদের উপদেশ কাজ চরিত্র প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক বিষয়ের অণুপরমাণু পর্য্যন্ত নানাভাবে সমালোচিত হইবে। এই কারণে যাঁহাকে তাঁহাকে ধরিয়া প্রচারক সাজাইয়া প্রচার কার্য্যে পাঠানো উচিত নহে। সুদীর্ঘ পরীক্ষার পর যাঁহারা সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হইবেন, যাঁহারা ছয় রিপুর সংযমসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখা যাইবে, তাঁহাদিগকেই প্রচারকপদে নিযুক্ত করা উচিত।

এইবারে দেখা যাউক যে কি উপায়ে প্রচারকদিগের দ্বারা প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। আমরা যতই আলোচনা করিয়াছি ও করিতেছি,

আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বাড়িতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ে বসিয়া যাইতেছে যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত প্রচারপ্রণালীই সকল কালে সকল অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সেই প্রণালীকে অবশ্য প্রত্যেক সময়ের ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য এক আধটু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার আমরা বিরোধী নহি। আমাদের কথা এই যে রামমোহন প্রদর্শিত প্রচারপ্রণালীর মূলতত্ব অবলম্বনে আমাদেরও প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই প্রচারের সর্ব্বপ্রথম মূলমন্ত্র আমাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করা। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তিনটী শাখা যে তিনদিকে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনটী শাখা তিন দিকে বাড়িয়া চলুক তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই এবং হইতেও পারে না। কলিকাতা সহরে এবং কয়েকটী বড় বড় সহরে এই তিনটী শাখার পরস্পরের মধ্যে আংশিক বিরুদ্ধভাব প্রচারিত আছে। কিন্তু মফঃস্বলে সাধারণ লোকের ভিতর ইহার পরিচয় আছে কি না সন্দেহ। এখন যদি মফঃস্বলে তিন শাখার আমরা তিনটী প্রচারক গিয়া নানা উপায়ে, এমনকি, মিথ্যা কথা বলিয়া পরস্পরের বিনাশের উপায় ঠিক করিয়া দিই, তাহা হইলে আমরা ভাবি না যে আমাদের মূল—যাহার কথা বলিয়া এত বড় হইতে পারিয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজেরই অস্তিত্ব একদিন অন্তর্হিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজের এক শাখার কোন প্রচারক অপর এক শাখাকে পৌত্তলিক প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়া গালাগালি করেন। ইহার ফলে অপমানিত শাখার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না; কিন্তু সেই প্রচারক মহাশয়ের নিজের এবং তিনি যে শাখার প্রচারক সেই শাখারই পরিণামে বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভব। তিন শাখা যদি নিজের নিজের শাখার অবলম্বিত সামাজিক মত প্রচার করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু কটুকথায় অপরের অবলম্বিত মতের সমালোচনা করিলে হিংসাদ্বেষ বাড়ে বই কমে না। ফলে যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন হয়। তিন শাখারই একমত হইয়া সত্য সত্য একপ্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের মূলতত্ব প্রচার করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

তার পর উচিত হইতেছে যে আমাদের তিন শাখার প্রকৃত নেতাদের মধ্যে সম্মিলনের উপায় বৃদ্ধি। সময়ে অসময়ে সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে আলাপ আলোচনা করা উচিত। জাতিভেদ প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে তিনশাখার মতভেদ আছে, সে সকল বিষয়ও আলোচিত হইতে পারে; কিন্তু যেই সে আলোচনার মধ্যে এতটুকু বিবাদের সম্ভাবনা বা কটুরসের আবির্ভাব দেখা যাইবে অমনি সে বিষয় আলোচনা বন্ধ করিতে হইবে।

এই প্রকারে আমাদের আপনাদের মধ্যে প্রীতি বাড়িতে থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি জনসাধারণেরও প্রীতি বাড়িবে। তার উপর আমাদেরও উচিত যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি জনসাধারণের প্রীতি ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় সকল অবলম্বন করা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একবার সদ্য সদ্য যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা গৃহীত হয় তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরিষদের নব্যদল বলিলেন—এখনি এক দরখাস্ত করা হউক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, কারণ ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেই সময়ে প্রবীণ সুবিজ্ঞ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাগ্যবশত একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন, অপরদিকে সাহিত্য পরিষদেরও সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ নেতা পাওয়া দুর্ঘট। তিনি বঙ্গভাষাকে গ্রহণ করিবার জন্য দরখাস্ত উপলক্ষে বেশ একটী কথা বলেছিলেন, তাহা আজও আমাদের কানে বাজিতেছে। তিনি বলিলেন যে এ সকল বিষয়ে এরকম জোরজবরদস্তি করিলে বা ব্যস্ত হইলে চলিবে না; বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা গ্রহণ করার কর্ত্তব্যতাও যেমন সত্য, বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে তাহা গ্রহণ করে তাহার যথাযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার কর্ত্তব্যতাও তেমনি সত্য। আমরাও গুরুদাস বাবুর সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ব্রাহ্মসাধারণকে এই কথা বুঝাইতে চাহি যে

আমাদের নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মের পথে ব্রহ্মের পথে পরিচালিত করার কর্ত্তব্যতাও যেমন সত্য, জনসাধারণকেও সেই পথে আকৃষ্ট করিবার উপায় অবলম্বনেরও কর্ত্তব্যতা তেমনি সত্য। একথা বলিলে চলিবে না যে আমরা তো ঠিক আছি, অন্য কেহ আমাদের দলে আসুক বা না আসুক। আমরা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একথা ঠিক বলিয়া মনে করি না। প্রথমত, ঐতিহাসিক দিক দিয়া দেখিলে কখনই ইহা টিকিতে পারিবে না। গীতার সময়, তন্ত্রের সময়, চৈতন্যদেবের সময় কি হিন্দু সমাজ বিস্তৃতি লাভ করে নাই? এই বিস্তৃতি লাভের অর্থই তো এই যে, ঐ সকল সময়ে হিন্দুধর্ম্ম অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর উপধর্ম্মসমূহকে গ্রাস করিতেছিল। ইতিহাসের দিক ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া দেখিলেও বুঝিব যে ব্রাহ্মদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাণের সঙ্গে সজোরে প্রচার না করিলে অন্যায় হয়, অধর্ম্ম হয়। এ বেশ মজার কথা যে, তুমি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়া হৃদয়ে শান্তি পাইলে, অপরের হৃদয়ে সেই শান্তি দিবার কোনই উপায় করিতে চাও না। ইহা স্থির যে, সমাজে থাকিতে গেলেই অপরের সুখে, অপরের স্বাস্থ্যে তোমার স্বাস্থ্য, তোমার সুখশান্তি এবং অপরের দুঃখে কষ্টে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ কষ্ট। তোমার গ্রামে যদি মহামারী লাগে, তবে সেই মহামারীর প্রতিবিধানের উপায় না করিলে তোমার নিজেরও অনিষ্টের আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ তোমার চতুর্দ্দিকে যে সকল অনিষ্টকর উপধর্ম্মসমূহ বিরাজমান, সে সকল ধর্ম্মকে তোমার সত্যধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা না করিলে তোমার সমাজকে নিশ্চয়ই সেই অনিষ্টকর উপধর্ম্মসমূহের সহিত একটা যোগ-সাজোস compromise করিয়া লইয়া বাস করিতে হইবে। মূর্ত্তিপূজা স্বার্থের দিক দিয়া যে কেমন করিয়া প্রচার হইতে পারে তাহার পরিচয় অনেক সময়েই আমরা পাই। আমরা দেখিয়াছি যে পূজারিদের হ্যাপায় পড়িয়া হয়তো এক ব্যক্তি বিশেষ কোন মূর্ত্তির পূজা করিয়া জুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হইল এবং ঘটনাচক্রে কিছু লাভও করিল। তাহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেল যে, সেই দেবতার দয়াতে সে লাভ করিল। তাহার দেখাদেখি আরও একজন সেই দেবতার পূজা করিয়া জুয়া খেলিল বটে, কিন্তু কিছুই লাভ করিতে পারিল না। তাহাতে সে অবশ্য দেবতার উপর কোন দোষারোপ করিল না, আপনার অদৃষ্টেরই উপর দোষ দিতে লাগিল। সে মনে মনে আশা পোষণ করিল, হয়তো বারান্তরে দেবতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন। এই প্রকারে স্বার্থই ভারতে মূর্ত্তিপূজা প্রচারের অন্যতর কারণ হইয়াছে। কিন্তু সত্যধর্ম্ম ঠিক সে ভাবে প্রচার করিতে পারা যায় না। সত্যধর্ম্মের সত্যভাব বুঝাইয়া লোকসকলকে সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে হইবে। কাজেই সত্যধর্ম্মের প্রচার চাই—শিক্ষিত অথচ ভক্তিমান "তৃণ হইতেও সুনীচ" প্রচারকের দ্বারা প্রচার করানো চাই।

প্রচার কি ভাবে করিতে হইবে? প্রচারের মূল নিয়মই হইল—"যেখানে যেমন সেখানে তেমন"। একটা কাটাছাঁটা নিয়ম হইতেই পারে না যে সকল স্থানে সকল অবস্থায় একই ভাবে প্রচার করিতে হইবে। এইখানে প্রকৃতির ভিতর দিয়া দেখা যাক। এই যে গাছপালা জীবজন্তু আছে—ইহাদের জীবনধারণের মূলমন্ত্র হইল ক্ষুধানিবৃত্তি। সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কোন গাছ বা খুব আলগা ভূমির ভিতর দিয়া রস টানে, কোন গাছ বা পাথুরে জায়গা ভেদ করিয়া রস না টানিলে বাঁচিতে পারে না; কোন প্রাণী বা সমস্ত দিনই ঘাসপাতা খাইয়া জীবনধারণ করে, কোন প্রাণী বা কেবলমাত্র মাংস খাইয়াই থাকে। ইহাদের কোনটির প্রকৃতি বদলাইতে গেলে তাহাদের বংশবৃদ্ধি করাইয়া পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিতে হইবে, মনে করিলাম আর হিমালয়জাত গাছকে বাঙ্গালার গাছ করিয়া লইলাম, তাহা হইতে পারে না। সেইরূপ যে সত্যধর্ম্ম মানবমাত্রেরই জীবন, সেই সত্যধর্ম্ম লোককে দিতে গেলে স্থান কাল ও অবস্থা বুঝিয়া উপায় ধরিতে হইবে। হিন্দুদের কাছে বাইবেল কোরাণ দেখাইলে অথবা খৃষ্টান মুসলমানদিগের কাছে বেদ উপনিষদের কথা বলিলে, অশিক্ষিত লোকের কাছে সেক্সপীয়র কালিদাসের কথা, অথবা শিক্ষিত লোকের কাছে দিনরাত্রি গ্রাম্য কথা বলিলে চলিবে

কেন? এইরূপ অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করাকেই আমরা "দেশীয়ভাবে" প্রচার করা বলি। আমরা বিদ্বেষভাবে বলিতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে এই "দেশীয়ভাবে" প্রচার করিবার অভাবেই ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আশানুরূপ শক্তি-শালী হইতে পারে নাই। যে মানবাত্মার স্বাধীনতা সকল মনুষ্যেরই সাধারণ সম্পত্তি, যে পরমাত্মা প্রত্যেক মনুষ্যেরই উপাস্য দেবতা, ব্রাহ্মসমাজ যখন সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই দেবতারই উপাসনার কর্ত্তব্যতা প্রচার করিতেছেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক মনুষ্যেরই হৃদয়ে ঝঙ্কার আনয়ন করিবে বলিয়া আশা করিতে পারিতাম। কেবল অযোগ্য প্রণালী অবলম্বনের ফলেই আমরা সেই ঝঙ্কার আনিতে পারিতেছি না বলিয়া আমা-দের বিশ্বাস। রাজা রামমোহন রায় যে প্রণালী আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা দ্বারা ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষা দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তন, বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার প্রভৃতি "দেশীয় ভাবে" সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে প্রণালী আমরা সকলে সমবেতভাবে অবলম্বন করিলে, আমাদের বেশ মনে হয় যে আমরা অন্তত ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারিতাম। আমরা জানি যে এবিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাই এখানে উল্লেখ করিলাম।

এইভাবে প্রচার কার্য্যের জন্য উপযুক্ত প্রচা-রক রাখিতে গেলে অর্থ আবশ্যক। আমরা যদি ব্রাহ্মসমাজকে সত্য সত্য প্রাণের সহিত ভাল বাসি, যদি সত্যই আমরা চাই যে সকলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করুক, তবে সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহার জন্য টাকা চাই। আমরা কাহাকেও ভয়ানক কষ্ট করিয়া এই টাকা দিতে বলি না। আমরা এই একটী ইঙ্গিত করিতেছি যে যেমন সকল দোকানেই একটী বৃত্তি ধরিয়া লয়—এক টাকার জিনিস কিনিলে দু-এক পয়সা বৃত্তি দিতে হয়, এবং সেই বৃত্তি দ্বারা সময়ে রক্ষাকালী পূজা, বারইয়ারি পূজা প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই রকম যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধু নিজের নিজের আয়ের অতি সামান্য কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অংশও ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিয়া দিয়া মাসান্তে কিম্বা বৎসরান্তে ব্রাহ্ম সমাজে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে যে আশাতীত মহান্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ধরা যাক যে আমি মাসে ৩০৲ টাকা মাহিনা পাই; যদি স্থির করি যে প্রতি টাকায় আধ পয়সা মাত্র ব্রাহ্ম সমাজে দিব, তাহা হইলে আমার অবশ্য আয়ের ১২৮ ভাগের একভাগ মাত্র দেওয়া হইল, আমার তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট হইল না, কিন্তু বৎসরে প্রায় ৩৲ টাকা ব্রাহ্মসমাজ পাইল। এইরূপ সকলে করিলে ব্রাহ্মসমাজের আয়ও যথেষ্ট হইতে পারে এবং ব্রাহ্মসমাজ যথাযোগ্য প্রচারকও নিযুক্ত করিতে পারে। এইরূপ প্রচারকের দ্বারা জনসমাজ যখন বিশেষ উপকৃত হইতেছে দেখিব, তখন আমাদেরও আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না এবং ভগবানেরও নামে জয়ধ্বনি সুবিস্তৃত গগন ভেদ করিয়া দিবানিশি উত্থিত হইবে।

দেহ-রূপান্তর।

(শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী)

নাহি জাতি, নাহি বর্ণ, নাহি গোত্র গাঁই,
মৃত্যুর শীতল স্পর্শে শূন্য সব ঠাঁই;
সর্ব্বত্যাগী রত্নদেহ সমাধি-মগন
চাহিবে না কভু পুনঃ মেলিয়া নয়ন।
অনন্ত নিদ্রার কোলে অনন্ত শয়ানে
যোগাসনে যোগীবর সমাহিত ধ্যানে,
অশরীরী আত্মা থাকে দেহে প্রীতিযোগে
কত স্নেহ ভালবাসা সম্মিলন-ভোগে;
দেহের সৌন্দর্য্য শোভা করিতে বিকাশ,
জীবদেহে পরমাত্মা প্রেমে পরকাশ;
পার্থিব কায়ার মায়া করি পরিহার
আত্মা যায় দিব্যালোকে ছাড়ি দেহভার,
সুকুমার শিশুরূপে নব কলেবরে
আবার নবীন জন্ম লভিবার তরে;
জননীর স্তন্য-সুধা জন্মান্তের স্মৃতি
যখনি অন্তরে জাগে ছাড়ি যায় ক্ষিতি;—
সে-ত নহে মৃত্যু, সে যে দেহ-রূপান্তর,
বিচ্ছেদ মিলন বহি ভ্রমে চরাচর।

চিত্র-দর্শন।

(শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়)

লোকে প্রায়ই এ কথা বলিয়া থাকে যে প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তত এটুকু জ্ঞান বা রসবোধ আছে, যাহার সাহায্যে সে সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যটুকু ধরিতে পারে। অথচ ছবি যে প্রণালীতে দেখা উচিত সে প্রণালীর সঙ্গে আমরা কোনই পরিচয় রাখিতে চাহি না। আমরা মনে করি যে ছবি দেখা খুবই সহজ—তাহার জন্য আবার বিশেষ শিক্ষার কি প্রয়োজন? গাছপালা, বাড়ীঘরদুয়ার মানুষজানোয়ার প্রভৃতি—এ সকল তো প্রতিদিনই দেখিতেছি—ছবিতে তো এই সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি? এই ছবি দেখা তবে কঠিন কিসে? বাস্তবিকই ছবি আঁকা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু ছবি দেখিতে শেখা ও তাহার ভালমন্দ বিচার করা বড়ই কঠিন।

একটা ছবি ঠিক্ রকমে দেখা মোটেই সহজ নয়। সকল ছবি একই দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে ছবি দেখিবার ভিতর আবার এ-দৃষ্টি ও-দৃষ্টি কি—ছবি তো ছবিই? কিন্তু তা নয়। ছবি বলিতে গেলে প্রত্যেক চিত্রশিল্পীর আপনার আপনার বিশেষ ভাষা। তাই সকল ছবি একই দৃষ্টিতে দেখিলে চলে না।

ছবি দেখিবার দুইটী নিয়ম আছে। ছবি দেখিবার সময় সেই দুইটী নিয়ম বরাবর মনে রাখা দরকার। প্রথমত, আমরা নিজে যে চক্ষে প্রকৃতিকে দেখি, সেটা ভুলিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, চিত্রকর নিজে যে ভাবে প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন সেই ভাবটী বুঝিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর তাহা মিশাইয়া লইতে হইবে।

চিত্রকর তাহার নিজের সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি কারিগুরি খাটাইয়া একটা ছবি আঁকিলেন, আঁকিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিলেন। ছবিখানি বোবা নিস্পন্দ ভাবে ঝুলিয়া রহিল। দর্শকদের মধ্যে যাঁহার প্রাণে ছবির বিচিত্রভাব সায় পাইল, তিনি ছবির প্রশংসা করিলেন। যাঁহার প্রাণে ছবির ভাব সায় পাইল না, তিনি ছবির নিন্দা করিলেন। ছবিখানি কাহারও কোন কথার প্রতিবাদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে শিল্প জাজ্বল্যমান. সেটী বোবা নহে, সেটী কথা কহিতে জানে। তাহার ভিতরে একটী গূঢ় ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়। সেই ভাষা বুঝিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

প্রকৃত শিল্প কোন প্রকার প্রশংসার ভিক্ষা-প্রার্থী নহে। প্রকৃত শিল্প কেবল এইটুকু চায় যে যাঁহারা তাহার সংশ্রবে আসিতে চাহেন, তাঁহারা তাহার ভাষার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করুন; কোন্ মূলসূত্র তাহার ভিতরে কার্য্য করিতেছে, সেইটুকু ধরিবার চেষ্টা করুন। দর্শকগণের ছবি সম্বন্ধে কেবল লেনদেনের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহাদের ছবির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি-বিষয়ে অংশীদার হইতে হইবে। ছবির ভাষা বুঝিতে চাহিলে চিত্রকরের ভিতরে আপনাকে প্রবেশ করাইতে হইবে—তাঁহার সহিত পৃথক্ হইয়া থাকিলে চলিবে না। শিল্পীকে সাথের সাথী, অন্ধের যষ্টি করিয়া না লইলে চিত্রের গূঢ় তত্ত্বটীকে, চিত্রনিহিত সেই বোবার ভাষাটীকে কোন মতেই বুঝা যাইবে না। সেই কারণে একটী ছবিকে নিন্দা বা প্রশংসা করিতে গেলে, তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে গেলে কি প্রকার পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে ছবিটী জন্মলাভ করিয়াছে; সেগুলিও মনেতে একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ছবির ভালমন্দ বিচার করিবার পূর্ব্বে ছবি আঁকিবার সাধারণ নিয়মগুলি আমাদের জানা আবশ্যক। সেই সকল সাধারণ নিয়ম বিভিন্ন বিষয়ের—অঙ্কন, বর্ণ, রীতি ইত্যাদি। একটী ছবি দেখিতে গেলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক যে চিত্রকর কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অঙ্কন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিত্রকরের দোষগুণ বিচার করা এত কঠিন যে একরাশ ছবির ভিতর হইতে ভাল ছবি বাছিয়া বাহির করিবার সময় শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীকেও অনেক সময়ে থমকাইয়া যাইতে হয়। চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রসমূহের ভিতর হইতে ভাল ছবি বাহির করিতে বলিলেই এই বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা এই বারে অঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ-ভাবে দুইচারিটি কথা বলিব।

ছবিতে drawing বা রেখাঙ্কন যত নির্ভুল হয় ততই ভাল, একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ভাল ছবি বাছিয়া বাহির করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের দেখা উচিত যে কোন্ ছবিটীর অঙ্কন বা drawingটা নির্ভুল হয়েছে, কোন্ ছবিতে সেই প্রকার নির্ভুল আঁকাটীর ভিতর দৃঢ় হস্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তুলির কাজে একটা স্বাধীনভাব ও আত্মনির্ভরের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অনেক সময়ে বে-ঠিক্ অঙ্কন মহা-চিত্রীদের কাজেও দেখা যায়। অঙ্কনের দোষ হইতে বুঝা যায় যে রেখা-অঙ্কনে সেই মহাচিত্রীদের ভাল হাত ছিল না। তবে তাঁহাদের চিত্রের শিল্প-চাতুর্য্য এত বেশী যে তাহা দ্বারা তাঁহাদের অঙ্কন-দোষ অনেক স্থলেই ঢাকিয়া যায়—কেহ না দেখা-ইয়া দিলে সেগুলি নজরেই পড়ে না।

ভ্যানডাইক (Vandyke)এর চিত্রিত একটী রমণীর চিত্রে (Potrait of a lady) চক্ষু দুইটী দেখিলেই মনে হয় যেন উহার অঙ্কনে দোষ আছে—drawing ঠিক নাই। কিন্তু Vandykeএর ন্যায় মহাচিত্রী যখন ঐ প্রকার আঁকিয়াছেন, তখন কাজেই আমাদিগকে চিত্রকরের পক্ষ হইয়া বলিতে হয় যে চিত্রিত আদর্শে চক্ষের স্বাভাবিক দোষ থাকাতেই তাহা ঐ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

দেহের কোন গঠনে স্বাভাবিক দোষ থাকিলেও তাহা চিত্রে কি ভাবে দেখানো যাইতে পারে, ভ্যালাস্‌ক্যিস (Valaesquis) তাঁহার "বামন" (Dwarf boy) ছবিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ছবিতে চিত্রিত নাক, চোখ, গাল প্রভৃতির গড়ন ও হাবভাব দেখিলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝা যায়।

বটিচেলির (Botticelli) চিত্রিত "বসন্ত" (Spring) ছবিটীর প্রশংসাও আছে, নিন্দাও আছে। মোটামুটি চিত্র হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাতে অনেক দোষ-গুণ পাওয়া যায়। রেখাঙ্কন বা drawing হিসাবে ছবিটী যে বড় সুবিধাজনক তাহা আমার মনে হয় না। শুনিয়াছি যে মূল চিত্রে নাকি রংয়ের বা বর্ণ-ফলনের যথেষ্ট কারিগুরি আছে। রেখাঙ্কন অনেক স্থানে ভ্রমপূর্ণ। ছবিতে কেন্দ্রস্থ central মূর্ত্তিটীই প্রধান। ইহাতে রেখাঙ্কনে দোষ থাকায় ছবির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

আবার এমনও ছবি দেখা যায়, যাহার হয়তো এক অংশে চিত্রকর আশ্চর্য্য গুণপনা দেখাইয়াছেন, কিন্তু হয়তো সেই চিত্রের অপর অংশ অবহেলার পরিচয় দিতেছে। Rebortএর "পরিবার" (Family group) চিত্র দেখ। চিত্রকর ছোট ছেলেদের চিত্রে যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত এই চিত্রেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছবিখানি একটী পারিবারিক চিত্র। ছোট ছেলে তিনটীই এমন সুন্দর আঁকা হইয়াছে যে ইহাদের কাছে মাঝের মূর্ত্তিটী নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এটী চিত্রকরের আলস্য ও অব-হেলার পরিচয় মাত্র।

ছবিতে রেখাঙ্কনের গুণপনা থাকিলে অন্য অনেক দোষ নজরে পড়ে না। Sir Frederick Leighton, Burne, Jones প্রভৃতির ছবিতে রেখাঙ্কন এত সুন্দর যে তাহার গুণে উহাদের চিত্রাঙ্কনের দোষ অনেক সময়ে চাপা পড়িয়া যায়।

এইবারে আমি রং বা বর্ণফলন বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিব। চিত্রের সৌন্দর্য্যের সহিত বর্ণের সম্বন্ধ বলিতে গেলে একটী বৃহৎগ্রন্থ রচনা করিতে হয়। তদ্ব্যতীত সেগুলি বর্ণচিত্রের দ্বারা না বুঝা-ইতে পারিলে বিষয়টী বড়ই নীরস লাগিবে।

ভাল ছবিমাত্রেই রংএর কারিকুরি থাকে। ছবিতে রেখাঙ্কন যেমন একটী প্রধান অঙ্গ, রং ব্যবহারেরও কারিকুরি তেমনি আর একটী প্রধান অঙ্গ। অনেক সময় শিল্পী কোন একটী বিশেষ রং ব্যবহারের ফলে চিত্রের মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। অনেক শিল্পী রংএর কারিকুরি দেখাইবার উদ্দে-শ্যেই ছবি আঁকেন। প্রকৃতিতে যে ভাবে রংএর ব্যবহার দেখা যায়, ছবিতে তাহা অপেক্ষা বেশী বর্ণ ফলানো ঠিক নহে। আমার মতে চিত্রে কতক গুলি জ্বলজ্বলে রং ফলানোর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় শপথ করা ও অভদ্র শব্দের ব্যবহারের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য যেখানে হীরাজহরৎ দেখা-ইতে হইবে সেখানে উজ্জ্বল রং ব্যবহার না করিলে কোন কাজই হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া জ্বলজ্বলে রংসমূহের অযথা ব্যবহারে কোন চিত্রকে লুপ্ত-সৌন্দর্য্য হইতে দেওয়া উচিত নহে। ভাল ছবিতে

যে সকল রং ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির যথাসঙ্গত ব্যবহারে একটী বর্ণসামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে।

বর্ণফলনের সঙ্গে value (প্রকৃতিনৈকট্য), technique (শিল্প কৌশল) ও style (রীতি) বা individualityর (ব্যক্তিগত ভাবের) ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। চিত্রাঙ্কনে value বা প্রকৃতিনৈকট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার অর্থ এই যে প্রকৃতিতে আলো ও ছায়ার যে একটী স্বাভাবিক সুর বা চেহারা দেখা যায়, ছবিতেও কোন সুর বা চেহারা সেই স্বাভাবিক ভাবকে অতিক্রম করিয়া যাইবে না। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল ছায়া সমান গভীর হইবে না অথবা সকল আলো সমান উজ্জ্বল হইবে না। ছবিতে সকল রংএর একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। অযথা বেশী উজ্জ্বল বা অযথা বেশী ছায়া থাকিলে ছবির সুর বা চেহারা (tone) নষ্ট হইয়া যায়। ছবিতে সকল রংএর মাত্রার সামঞ্জস্য থাকা চাই—না থাকিলে ছবির সুরের মাধুর্য্য নষ্ট হয়।

Style বা রীতি কাহাকে বলে? প্রত্যেক ফুলের যেমন নিজের নিজের একটী সুন্দর রূপ বা গন্ধ থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মহাচিত্রীর অঙ্কিত চিত্রে এমন একটী অনির্ব্বচনীয় গুণ থাকে, যেটী আমাদের মনকে বিশেষভাবে সেই চিত্রের প্রতি আকর্ষণ করে। এই গুণটীকেই style বলে। বাঙ্গালায় ইহাকে ছবির রীতি বা ধরণ বা বিশেষত্ব বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরই এক একটী নিজস্ব রীতি বা ধরণ আছে। যেমন প্রত্যেক পাকা হাতের লেখায় একটী নিজস্ব ভাব থাকে, চিত্রসম্বন্ধেও সেইরূপ প্রত্যেক মহাচিত্রীর এক একটী নিজস্ব ভাব পরিস্ফুট হয়। আঁকিবার ধরণ দেখিয়া কোন্ চিত্র কাহার চিত্রিত তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায়। প্রাচীন মহাচিত্রীগণ তাঁহাদের চিত্রিত ছবিতে স্বাক্ষর করিতেন না, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে তাঁহাদের ছবিই তাঁহাদের নাম ঘোষণা করিবে।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে ছবি আঁকিবার রীতি বা ধরণ নানা প্রকার। আমি এখানে প্রধান কয়েকটী রীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এই রীতি আবিষ্কার করিবার জন্য তিনটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়—(১) তুলির কাজ এবং রং ফলাইবার প্রণালী; (২) mannerism পৌনঃপুনিকতা বা মুদ্রাদোষ, এবং (৩) বর্ণ বিশেষের প্রতি পক্ষপাত।

সুনিপুণ শিল্পীমাত্রেই নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিয়াই চিত্রে বর্ণফলন করিয়া থাকেন। সেই প্রণালী ভাল বা মন্দ, সে বিষয়ে সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের উচিত নয়। যে কোন প্রণালী অবলম্বনে হউক চিত্রকর তাহা দ্বারা স্বীয় মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারিলেই তদ্বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই থাকে না। যে বিষয়টা আমি ব্যক্ত করিতে চাহি, সেটা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলেই হইল—সেই ব্যক্ত করিবার জন্য আমি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলাম, তাহাতে কি আসিয়া গেল? যে ছবিতে শিল্পীর এই প্রকার স্ব-রচিত প্রণালীর বিশেষত্ব পাওয়া না যায়, সে ছবি কিছুই নয় বলিলেও চলে। যে ফুলের সুগন্ধে তাহার নিজের বিশেষত্ব না থাকে, সে ফুল কোথায় আদর পাইবে? শিল্পীর বিশেষত্ববিহীন চিত্রে অন্যান্য নানা বিষয়ের কারিগরি থাকিলেও তাহাতে একটী প্রধান বস্তুর অভাব থাকিয়া যায়।

এখন চিত্রে মুদ্রাদোষ কি? যখন কোন চিত্রকর তাঁহার সকল চিত্রেই একটী ভাব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিতে চাহেন, তখনই সেই সকল চিত্রে শিল্পীর মুদ্রাদোষ বা পৌনঃপুনিকতা (mannerism) প্রকাশ পায় বলিয়া আমরা বলি।

এতক্ষণে আমরা চিত্রের রীতি কি এবং সেই রীতি আবিষ্কার করিতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে তাহা বলিয়া আসিলাম। মহাচিত্রীগণের চিত্রসমূহে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের এক একটী বিশেষ রীতি প্রকাশ পায় বলিয়া বর্ত্তমান কালে নব্য শিল্পীগণের মধ্যে একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় যে তাঁহাদের চিত্রগুলিতে কে কত রকম-বেরকমের রীতি প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য কেবল—"একটা নতুন কিছু কর।" তাহার ফলে ছবির

সৌন্দর্য্য রহিল অথবা রহিল না, সেদিকে তাঁহাদের বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। তাঁহারা হয়তো মনে করেন যে আজকালকার চিত্রপ্রদর্শনীতে একটা কোন রকমের নূতনত্ব দেখাইতে না পারিলে তাঁহাদের ছবিগুলি মোটেই আমল পাইবে না। এই অযথা নূতনপ্রিয়তা নব্যযুগের চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অনেকস্থলেই অবগতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অনিষ্টকর প্রভাব নব্যযুগের চিত্রকরগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই বিষম নূতনপ্রিয়তা চিরকাল দাঁড়াইতে পারে না। ইহা নূতনপ্রিয় একদল লোকেরই সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে। ইহার ফলে অজ্ঞ লোকেরা সন্তুষ্ট হইলেও চিত্রশিল্পের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সৌন্দর্য্যবোধ ফুটাইয়া দেওয়া এবং মনোহরত্বের উপলব্ধিকে জাগাইয়া তোলা—সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্য—চিত্রশিল্পের প্রধান লক্ষ্যই হইল সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া তোলা। কোন নবীন চিত্রালোচক ঠিকই বলিয়াছেন যে ছবির একটী অপরিহার্য্য মূল ভিত্তি এই যে প্রত্যেক ছবি যে বাণী বহন করিয়া আনিবে, সেই ছবি সেই বাণী মাত্র ছবির আকারে ব্যক্ত করিবে। এক কথায় বলিতে গেলে সৌন্দর্য্যই সেই অপরিহার্য্য মূল ভিত্তি।

প্রকৃত চিত্রশিল্পীর পক্ষে একটী সুন্দর বস্তু দেখাই যথেষ্ট। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা চিত্রে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সুন্দর বস্তু সর্ব্বত্রই আদরণীয়। "চিত্র সুন্দর হওয়া চাই। চক্ষের আনন্দ হওয়া চাই"। "চিত্রে সৌন্দর্য্য" কি প্রকারে বর্ণনা করিয়া বুঝাইব জানি না। চিত্র সৌন্দর্য্যের অলঙ্কারে ভূষিত না হইলে চিত্তাকর্ষণে অপারক হয়। মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে যে আকৃতি, বর্ণকলন এবং ভাবপ্রকাশ নিখুঁৎ হইলেই চিত্রখানি সুন্দর হইল। নিখুঁৎ শরীরেই নিখুঁৎ আত্মার প্রকাশ হয়।

দুঃখের বিষয়, প্রকৃত শিল্পীর ভিতরে সৌন্দর্য্যবোধ বিশেষভাবে থাকিলেও অনেক সময়ে তিনি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন—তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও শক্তির অভাব হয়। ছবির মর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিবার ইচ্ছাই প্রকৃত চিত্রশিল্পীকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক দূরদৃষ্টি এবং সকল বিষয়ে গভীর দৃষ্টির একটা শক্তি প্রদান করে। চিত্রসমালোচকের কর্ত্তব্য, আলোচ্য চিত্রের প্রাণটুকু অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা এবং দেখা যে চিত্রকর যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার কতটুকু তিনি সত্য সত্য ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন।

যে ব্যক্তি চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহার বাধা, ক্ষমতা, সীমা উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিত্র সত্যসত্য উপভোগ করিতে পারেন। সেই চিত্রের বিষয় যে দর্শক কিছুই জানেন না, তিনি হয়তো "কি সুন্দর" বলিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু যিনি তাহার বিষয় জানেন, তিনি সেই চিত্রপটের সম্মুখে মুগ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। ভাল জিনিসকে ভাল বলিতেই হইবে। কিন্তু ভাল জিনিস কেন যে ভাল, তাহার উত্তর সকলে দিতে পারে না।

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুসূয়া বাইএর পুরাণপাঠ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রায় এই সময়েই অনুসূয়া বাই নামক সংস্কৃতজ্ঞ এক পুরাণব্যাখ্যাত্রী মহিলা পুণায় আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁর পতি ও বৃদ্ধ পিতা ছিলেন। এই পণ্ডিতা রমাবাইএর মতো শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেন এবং পুরাণকথকের ন্যায়, সমস্ত মন্দিরময় শুনা যাইতে পারে এইরূপ উচ্চকণ্ঠে সংহিতা পাঠ করিয়া অর্থ বলিতেন। আমাদের গৃহে এবং অন্য অনেক স্থানে তাঁহার পুরাণপাঠ হইয়াছিল এবং এক দিন, জোসিদিগের মন্দিরে অথবা মহিলাদিগের বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার পুরাণপাঠ হইবে স্থির হইল। সেই সময়, দেবালয়ে যাঁহারা নিত্য আসিতেন সেই মহিলারা এইরূপ চক্রান্ত করিলেন যে, এই সংস্কারক মহিলাদের আজ আমরা বসিতে জায়গা দিব না। সভামণ্ডপের কোন এক স্থানে উহাদের জন্য জায়গা রাখিয়া দিয়া আমরা মন্দির-গর্ভের সম্মুখে বসিব। কাজেই মণ্ডপের মধ্যে উহাদিগকে পুরুষের পাশাপাশি বসিতে হইবে। ওরা যখন কোন সভায় যায়, তখন

পুরুষের সঙ্গে কেদারার পাশাপাশি বসে; কিন্তু এখানে সেরূপ পৃথক্ জায়গা কি করে' হবে? আমার দুই এক জন মৈত্রিনীর নিকট উঁহাদের এই অভিসন্ধির কথা শুনিলাম। প্রাচীনা ও নবীনা সকল রকমের মহিলারই সহিত আমি মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতাম, এই জন্য দুই পক্ষের মধ্যেই আমার মৈত্রিনী ও পরিচিত মহিলা অনেক ছিল। দেবালয়ের মহিলারা আমাদিগকে ভিন্ন স্থানে বসাইবার যে যুক্তি করিয়াছেন তাহা আমার ভাল লাগিল না; একটু অপমানও বোধ করিলাম। দুই এক ঘণ্টা আগে যদি এই কথা জানিতে পারিতাম তাহা হইলে এই সমস্ত মৎলব ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু সেরূপ সময় পাওয়া গেল না। গোড়ায়, দেবালয়ে যাইতেই আমার দেরী হইয়া গিয়াছিল। সেইখানে গিয়া আমি তবে এই সমস্ত জানিতে পারিলাম। কিন্তু দেবালয় লোকে ভরিয়া যাওয়ায়, আর কোন উপায় ছিল না। তাই, পণ্ডিতা রমা-বাই ও আমাদের দলের অন্য মহিলারা যেখানে বসিয়াছিলেন, অনিচ্ছা সত্বেও, সেইখানে তাঁহাদের মধ্যে গিয়া বসিলাম। কিন্তু মনের সন্তোষ ছিল না। তাঁহাদের ওখান থেকে উঠিয়া বাড়ী যাই এইরূপ মনে তোলাপাড়া করিতেছিলাম। সভামণ্ডপের এক-ধারে সংস্কারক পুরুষদের বসিবার জন্য এবং অন্যধারে তাঁহাদের মেয়েদিগের বসিবার জন্য জায়গা করিয়া, তাঁহাদের মধ্যস্থলে অনুসূয়া বাই আপনার জায়গা করিয়াছিলেন। পুরাণপাঠ আরম্ভ হইয়া ১০।২০ মিনিট পরেই আমি রমাবাইর কানে কানে আস্তে আস্তে বলিলাম,—"আজ আমার ভাল লাগ্‌চে না, আমার মাথা ঘুরচে, আমি বাড়ী যাচ্চি।" এই কথা বলিয়া আমি বাড়ী আসিলাম। আমার মনে হইল, আমি যাহা করিয়াছি তাহা ভালই করিয়াছি, এতে আমার তেজস্বিতা দেখান হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া মাঝঘরের সামনের বারণ্ডায় খুড়শ্বাশুড়ী বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট উপরি-উক্ত বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলাম। আমি বলিলাম, দেবালয়ের মেয়েরা দেবালয়ের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে পুরুষদের মধ্যে বসাইবার মৎলব করিয়াছিল। তাই আমার রাগ হইল এবং আমি অধিকক্ষণ না বসিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। যেন আমি খুব ভাল কাজ করিয়াছি এবং সকলেরই তাহা পছন্দ হইবে, এই বিশ্বাস, অহঙ্কারের সহিত এই বৃত্তান্তটা বলিতেছিলাম। খুড়শাশুড়ীর আমার এই কাজটা পছন্দ হইল। তিনি সাবাস্ দিবার স্বরে বলিলেন —"দেখ, এই রকম জেদ্‌ই চাই; তাহা হইলে লোকতঃ ভাল দেখায়, আর লোকেরা নিন্দাও করে না। এখনকার নূতন শিক্ষিত ছেলেরা লৌকিক ব্যবহার বোঝে না। যা-ইচ্ছা তাই করতে বলে। তা করলে আমাদের চল্‌বে কি-করে'? বাড়ীর পুরুষেরা রাগ করলেও দুদিনেই সে রাগ চলে যাবে। তার জন্য ভাবনা কি? পুরুষদের রাগী স্বভাব। যত কিছু রাগ স্ত্রীর উপর ঝেড়ে তারা বিক্রমের কাজ মনে করে।" আমার স্বপক্ষে এইরূপ আরও অনেক কথা মমতার সহিত বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলেন। এই কথা শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ দুই এক ঘণ্টাও টি'কিল না; শুধু তাহা নহে, ধৃষ্টতা করিয়া এরূপ গলদ তারপর আর কখন করি নাই। সন্ধ্যাকালে 'উনি' বাড়ী আসিলে, আমি নিত্য-নিয়মানুসারে কাপড় লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তখন, আগেকার মতো তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আজ কি হয়েছে?" আমি সহজভাবে বলিলাম "কিছুই না, কিছুই হয় নাই।" এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইবার পর, আজ দেবালয় হইতে অছিলা করিয়া বাড়ী আসিবার কথা মনে পড়িল। আমার নিজের মনেই গোলযোগ চলিতেছে, এখন উনি যদি আবার ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন ত আমি কি বলিব? একটা ভাল হইয়াছে— সেই সময় উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং আমার সঙ্গে কথাও কহেন নাই। ছাড়া কাপড় লইবার জন্য আমি নিত্যানুসারে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম; কিন্তু কাপড় আমার হাতে না দিয়া উনি আপনি খুঁটীর উপর রাখিলেন। ওঁর বুট-জুতা খুলিবার জন্য নত হইলাম উনি আমার হাত সরাইয়া দিয়া আপনিই বুট খুলিলেন, আমি আরো ১০।১৫ মিনিট ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু নিত্যানুসারে আমাকে কোন কথা বলিলেন না, কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গেল এবং এতক্ষণ আমি যে গর্ব্ব অনুভব করিতে ছিলাম সে সব কোথায় বিলীন হইল—আমার জিব শুকাইয়া গেল। কারণ ওঁর এইরূপ নিত্য অভ্যাস ছিল যে, নিদেন ১০।১৫ মিনিট আমার সহিত কথা না কহিয়া আর কোন কাজ করিতেন না; বাহির হইতে আসিবার সময় কোন ভদ্র লোক ওঁর সঙ্গে থাকিলে কিংবা জরুরি কোন কাজ থাকিলে, তবেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। কিন্তু সেরূপ ত কিছুই ঘটে নাই, তবে আজ এরূপ হইল কেন? রাত্রে যখন খাদ্যসামগ্রী পাতে দিবার জন্য লইয়া গেলাম, "খাব না" মুখের কথায় না বলিয়া তাহার বদলে হাতের ইশারা করিলেন। এটা আর কেহ লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার ভাল লাগিল না; মনে মনে ভাবিলাম আমার কাজটা যদি ওঁর ভাল না লাগিয়া থাকে তাহা হইলে সকলে জানিতে

পারে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে রাগ করিলেই এক রকম ভাল হইত। কিন্তু এ যে "মুখ টিপে কীল মারা" হইল। রোজ যেমন যাই সেইমত উপরে গেলাম, এবং অন্য দিনের মতো আজও দক্ষিণা প্রাইজ-কমিটি হইতে আগত পুস্তকের যে অংশ পূর্ব্বদিনে পড়া হইয়াছিল, তাহার পর হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহা পড়িবার সময় কোন অশুদ্ধ বাক্য কিংবা শব্দ পাইলে তার উপর চিহ্ন দেও—এইরূপ উনি বলিতেন; কিন্তু সেদিন কিছুই বলিলেন না। পড়িবার সময় আমি ইচ্ছা করিয়া দুই একটা ভুল করিলাম, তবু উনি তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। পড়াটা শেষ হইয়া গেলে, উনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাপড় লইলেন। তখন আমি প্রদীপ দূরে রাখিয়া পুস্তকটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। চাকর ওঁর পায়ে ঘী মালিস করিবার জন্য আসিলে আমি বলিলাম "আজ তোর দরকার নেই, তুই যা;" এইরূপ বলিয়া আমিই ঘী মালিস করিতে লাগিলাম। আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে,—"হয়েছে, আর না"—এইটুকু ওঁর মুখ থেকে বাহির হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ঘী মালিস করিবার পর তখনি ওঁর নিদ্রা আসিল; প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর, দ্বিতীয় পাশ-বালিসের দিকে ফিরিবার সময়, "হয়েছে আর না" এইরূপ বলিয়া অন্য দিন দ্বিতীয় পা-টা বাড়াইয়া দিতেন। কিন্তু আজ নিদ্রার সময়েও কিরূপে তাঁর স্মরণে ছিল কে জানে। কোন কথা কহিলেন না। কেবল, দ্বিতীয় বালিসের উপর উল্টাইয়া পড়িয়া যেন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন এইরূপ ভান করিলেন। এতক্ষণ আমি ঘী মালিস করিতে করিতে ঢুলিতে ছিলাম, ওঁর এই নিদ্রার ভান এবং কথা কহিবার সময় অতীত হইয়াছে লক্ষ্য করিবামাত্র আমারও তন্দ্রা কাটিয়া গেল এবং আমার মন বড় খারাপ হইল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম। নীরব কেন? এমন ত কখন হয় নাই—এই কথা জিজ্ঞাসা করিব এবং যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে একটিবার আমায় যেন ক্ষমা করেন, এইরূপ মন খুলিয়া তাঁহাকে বলিব বলিয়া স্থির করিলাম। কিন্তু শপথ করিয়া বলিতেছি আমার মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না। মন অত্যন্ত ম্রিয়মান হইলেও শিশুকাল হইতে অভিমানী স্বভাব হওয়ায় এরূপ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। এই কথা বলিব বলিয়া হাজার বার মনে মনে স্থির করিলেও, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। এইবার নিশ্চয়ই বলিব মনে করিতেছি এমন সময় তাঁহার জাগরণের অঙ্গচাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম; অমনি আমার জিজ্ঞাসা সেইখানেই রহিয়া গেল। এইরূপ করিতে করিতে সারারাত্রি কাটিয়া গেল। আমাদের দুজনেরই ঘুম হয় নাই। একটু আলো হইবামাত্রই, উনি বাহির হইয়া গেলেন; তখন আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম, যাহা পূর্ব্বে আমার কখনই হয় নাই এইরূপ জবরদস্তি শাস্তি আমার অসহ্য হইল, আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম এবং চোখে ঠাণ্ডা জল দিয়া চোখ ভাল করিয়া মুছিয়া, দেরী হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া চট্ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম সত্য; কিন্তু নীচে গিয়া আদৌ মনে শান্তি পাইলাম না। সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, তবু কেন ক্ষমা চাহিয়া মন খোলসা করিলাম না? মিথ্যা অভিমানভরে মনকে কষ্ট দিয়া কি ভাল করিলাম? এক্ষণে আহারের পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে মনকে খোলসা করিয়া লইব, তখন আমার মন ভাল হইবে, এইরূপ বিচার করিয়া আমি রোজকার মতো গা ধুইয়া কোমিস্থির, ঘোল প্রভৃতি প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু "আমি এখন স্নান-শুচি আছি। আহারের পূর্ব্বে অস্নাত না থাকিলে কিরূপে ওঁর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে? স্নান-শুচি হইলেই ত পরিবেষণ করিতে যাইতে হইবে। এখন কি অছিলা করিয়া স্নান বন্ধ করিব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। কারণ, যে অবধি আমি মধ্যাহ্ন-ভোজনে পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন হইতে ননদ খুড়শাশুড়ী প্রভৃতি সবাই আমার হাতে খাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কড়াক্কর নিয়ম ছিল যে, গা ধুইয়া আসিবার পর, দ্বিতীয় পংক্তি উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত—অর্থাৎ বড় মেয়েদের আহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত—মাঝঘর, রান্নাঘর ও ঠাকুরঘর ছাড়া আমি যেন আর কোথাও না যাই। জলের চৌবাচ্চার দিকে পিছনের দরজায় ও উপরের তালায় গেলে আবার গা ধুইয়া শুচি হওয়া দরকার, তা নৈলে চলিবে না। এই নিয়মের দরুণ, অত্যন্ত ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। এক্ষণে নীচে যাইয়া স্নান করিবার সময় হইয়াছে; এই সময় পেট ব্যথা করিতেছে এইরূপ অছিলা করিয়া একেবারে স্নান বন্ধ করিয়া দিব, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আমি তখনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম;—"আমার ভাল বোধ হচ্চে না; আমি এখনি আসছি; যতক্ষণ না আমি আবার স্নান করে আসি, ততক্ষণ আর কেউ পরিবেষণ করুক,"—এইরূপ আমাদের বাড়ীর অন্য একজন আত্মীয়াকে আমি বলিলাম। এই কথা শুনিয়া আমার ননদ রাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন;—"হাঁ এখন অন্য সবাই পরিবেষণ করুক, তারপর, ঠিক সময়ে বাইসাহেব পিলমোহর নিয়ে আস্তে আস্তে দেওয়ানী চালে আসবেন।" এই সময় অন্য মেয়েরা হাসিতে লাগিল। কিন্তু খুড়শাশুড়ী ঠাকুরণ বলিলেন,—"ওগো তোমরা এ-রকম কেন বলচ? ওকি রোজ পরিবেশন করে না? ও সে রকম দেমাকী

নয়, ও কখন মিথ্যা ভান করবে না। আজ সকাল থেকেই ওর মুখ শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।”

স্ত্রীলোকটি কথা কহিতেই ব্যাপৃত, আমার দিকে তাহার লক্ষ্য নাই—এই সুযোগে পবিত্র স্নান নীচের তলা হইতে আমি উপর তলায় গেলাম। ‘ওঁর’ উঠিবার সময় হওয়ায় তখন দপ্তর বাঁধা চলিতেছিল। আমি নিকটে গিয়া বলিলাম যে, “আমার একটা অপরাধ হয়েছে; আমি এমন কর্ম্ম আর কখন করব না। কাল সন্ধ্যা থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে, কিছুই ভাল লাগচে না।” তখন, কয়েক মিনিট পরে উনি আমাকে বলিলেন—“এই প্রথমবার তুমি নির্ব্বোধের মতো ব্যবহার করেছ, তাতে তোমার কষ্ট ত হবেই. আমারও হচ্চে। আমার আপনার লোক আমার মনের মতো কাজ না করলে, তা কার ভাল লাগে? আমার আপনার লোকের কোন্ জিনিস ভাল লাগে তা একবার জানতে পারলে তাই দৃঢ়রূপে ধরে থাকলে দুজনের মধ্যে কাহারই আর কষ্ট হয় না। এ রকম আর কখনও কোরো না।” ইত্যাদি বলিয়া উনি নীচে স্নান করিতে গেলেন। আমিও অন্য সিঁড়ি দিয়া নীচে গিয়া ওঁর জন্য চাকর যে জল তুলিয়া রাখিয়াছিল, চট্ করিয়া তাহাই একটু গায়ে ছিটা-ইয়া, পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং সেই বিভ্রাট মিটিয়া গেল। পরিবেষণ হইয়া গেলে, এবং পরের পংক্তিতে, বড় মেয়েদের সহিত এক সঙ্গে আমার খাওয়া হইল; তবু সমস্ত দিনটা আমার উদাস ভাবেই কাটিয়া গেল। আমার আচরণটা ওঁর ভাল লাগে নাই, অতএব এরূপ কাজ আর কখনই করিব না, এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিলাম। সমস্ত শাস্তির মধ্যে কথা না কহিবার মতো জবর শাস্তি আর দ্বিতীয় নাই এরূপ আমার দৃঢ় ধারণা হওয়ায়, পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রসঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে দিই নাই এবং ঐরূপ প্রসঙ্গ আর উপস্থিত হয়ও নাই।

ইহার কিছুদিন পরে হিরাবাগে এজুকেশন কমিসনের অধিবেশন হয়। সেই কমিশনের সম্মুখে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাকে ও পণ্ডিতা রমা-বাইকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হয়। পণ্ডিতা রমাবাই স্বয়ং বিদুষী, তাঁহার বলিবার খুব অভ্যাস ও সভা-সাহস থাকায়, তাঁর অভিভাষণ বেশ উতরাইয়াছিল। কিন্তু আমি ভেব্ড়িয়া গেলাম; দশ পাঁচটা কথা কোন রকম করিয়া বলিয়া শেষ করিলাম। তবু কিন্তু এই হিরাবাগে প্রথমবার আমি যে অভিভাষণ করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা এবারকার অভিভাষণ ভাল হইয়াছিল,—এই কথা কখন কখন উনি বলিতেন; তাই জানিতে পারিলাম। এই দুই তিন সভায় সহরের প্রাচীন ও নবীন অনেক মহিলা সমবেত হইয়াছিল এবং মন খুলিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া উনি আমাকে বলিলেন “পরস্পরের সহিত বারংবার দেখা সাক্ষাতের উপলক্ষ্য ঘটিলে এই সকল মহিলাদের মধ্যে বেশ ভালবাসা ও মনের মিল হইবে; উঁহাদের সঙ্কীর্ণতার হ্রাস হইয়া লেখাপড়া শিখিবার দিকে স্বতই টান হইবে; তাই হলুদ কুঙ্কুমের মতো কিংবা পার্টির মতো সম্মিলনের কোন অনুষ্ঠান বৎসরে অন্ততঃ দুই চারিবার করা আবশ্যক; তাতে যে খরচ হইবে তা আমরাই দিব, লোকের কাছে না চাও-য়াই ভাল।” এই কথা অনুসারে কয়েক মাস পরে, দুই চারি জন মৈত্রিনী মিলিয়া, সেই সময়কার গবর্ণরের স্ত্রী লেডি-রের অভ্যর্থনার্থ একটা পার্টি দিলেন। মহিলা-দের পার্টি পুণায় এই প্রথম হইল। এই পার্টিতে হিন্দু মহিলাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী ভিন্ন ঘরে সজ্জিত হইয়াছিল। সেখানে অন্ন প্রভৃতি খাদ্য ছিল না; কেবল ফলফুলরী ও মিষ্টান্ন রাখা হইয়াছিল। তাই, এই বন্দো-বস্ত হিন্দু মহিলাদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিষ্টাচার অনুসারে কোন জিনিস অল্প খাওয়া অপেক্ষা ফল ও মিষ্টান্ন রুমালে বাঁধিয়া ছেলেদের জন্য লইয়া যাইবার দিকে তাহাদের বেশী মনের টান কিন্তু সে দিন ছেলে সঙ্গে আনা মানা ছিল। খাওয়া হইয়া গেলে, হিন্দুরীতি অনুসারে পান সুপারী, হলুদ কুঙ্কুম প্রভৃতি সমস্ত থাকায় আমাদের এই মহিলা-পার্টির ধরণধারণ বিদেশী বলিয়া মনে হয় নাই, বরং সকলের পছন্দই হইয়াছিল। পরে এইখানেই স্মলকজ-কোর্টের জজের জায়গায় ওঁর বদলী হইল। ইহার কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের ফাইনান্স্ কমিটির মধ্যে ওঁর নিয়োগ হইল। এইজন্য উঁহাকে সিমলায় যাইতে হইল। ১৮৮৬ অব্দে চৈত্র মাসে সিমলায় যাত্রা করিবার জন্য আমরা পুণা হইতে বাহির হইলাম।

চা-খড়ির আত্মকাহিনী।

(ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু রায়বাহাদুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পৃথিবীর প্রায় তৃতীয়-চতুর্থাংশ এখনো জলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই অংশ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ইহার বাহিরে বাষ্প (বায়ুমণ্ডল), মধ্যে জল (সাগর মহাসাগরাদি) এবং ভিতরে স্থল (হ্রদ, নদী, সমুদ্রের তলদেশ)। পুনশ্চ পৃথি-বীর উপরি ভাগ শীতল, অভ্যন্তর ভাগ অত্যুষ্ণ। বর্ত্তমান বায়ুমণ্ডল ও জলরাশি এক সময়ে পৃথিবীর

বাষ্পময় দেহের অন্তর্ভূত ছিল। পৃথিবীতে পূর্ব্বে যে পরিমাণ জল ছিল, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে স্থলভাগ দ্বারা শোষিত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এমন এক সময় আসিবে যখন জলের বাকি অংশও সম্পূর্ণ শোষিত হইয়া যাইবে এবং এখনকার চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীও তখন জল এবং বায়ুশূন্য হইয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-দিগের বাসের অনুপযোগী হইবে। সে কিন্তু অনেক দূরের কথা; তার জন্য তোমাদের এখন হইতে কোনরূপ দুর্ভাবনা করিবার আবশ্যক নাই।

পৃথিবীর আদি-গঠন-কালের কথা চিন্তা করিলে মনোমধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের উদ্রেক হয়। মনে কর যেন এক দিগন্তবিস্তৃত লোহিতোত্তপ্ত প্রকাণ্ড কটাহের মধ্যে পুঞ্জীভূত তরল প্রস্তর ও ধাতুরাশি প্রচণ্ডতাপ-সংযোগে রক্তবর্ণ উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বজ্র-নির্ঘোষরবে ফুটিয়া উঠিতেছে; তাহার শতধাবিভক্ত শিখার ঔজ্জ্বল্যে দিঙ্মণ্ডল প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ভীষণ চাঞ্চল্যে অবিরাম বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অগ্ন্যুৎপাত সংঘটিত হইয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ ও উদ্বেলিত হইতেছে। প্রাচীনযুগের সেই ভীষণ হইতে ভীষণতর পৃথিবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিলে কে মনে করিতে পারে যে তিনিই আবার এমন শান্তিময়ী, এমন চিরকল্যাণময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি জীবকে মায়ের মত স্নেহে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য-দান করিয়া লালনপালন করিতেছেন, কে ভাবিতে পারে যে সেই জ্বালাময়ী সংহারমূর্ত্তিধারিণী পৃথিবী পুনরায় ধনধান্যপুষ্পেভরা, আনন্দদায়িনী, অনন্ত-সৌন্দর্য্যশালিনী তোমাদের এই বসুন্ধরায় পরিণত হইবেন!

পৃথিবীর রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তি।

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা তাঁহার নিতান্ত শৈশবাবস্থার কথা। প্রতিমা গড়িতে হইলে প্রথমতঃ যেমন একটী শক্ত বাঁশের "কাঠামো"র প্রয়োজন হয় এবং তাহার উপর খড়, মাটি, খড়ি ও রং স্তরে স্তরে সাজাইয়া যেমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়, সেইরূপ তোমাদের পৃথিবীর বাষ্পময় দেহ জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া তাঁহার "কাঠামো" নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া মৃত্তিকা, ধাতু ও প্রস্তরময় স্তরাবলী উপর্য্যুপরি সজ্জিত হইয়া, মায়ের এখনকার এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে।

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন।

পৃথিবীর বহিরাবরণ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ অনেকানেক কঠিন স্তরের সমষ্টি মাত্র। স্তরগুলি পিঁয়াজের খোসার মত একের উপর অন্যটি অবস্থিত হইয়া ভূ পৃষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশ উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে নিম্নগামী হইয়া স্বল্পগভীর বা গভীর খাতে পরিণত হইয়াছে, কালে তাহাই জলপূর্ণ হইয়া নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে।

ভূ-পৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানের ব্যবধান প্রায় ৪০০০ মাইল। তোমরা যদি ভূ-পৃষ্ঠ খনন করিয়া নিম্নদিকে গমন কর, তাহা হইলে কিছু দূর পর্য্যন্ত এখানকার অপেক্ষা অধিক শীত অনুভব করিবে, কিন্তু বেশী দূর যাইলে শীতের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তাপের আধিক্য অনুভূত হইবে। ১৩০০০ ফিট্ গভীর স্থানের উত্তাপ এত অধিক যে সেখানে জল লইয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ আপনাপনি ফুটিতে আরম্ভ করিবে। পৃথিবীর আরো গভীর প্রদেশ এত অধিক উষ্ণ যে তথায় মৃত্তিকা, প্রস্তর, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি তাবৎ খনিজ কঠিন পদার্থ প্রচণ্ড উত্তাপসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া তরলাকারে অবস্থিতি করিতেছে। আগ্নেয়-গিরির শিখরদেশস্থিত গহ্বর হইতে মধ্যে মধ্যে যে গলিত প্রস্তরধাতুময় পদার্থের স্রোত বাহির হইয়া কত সমৃদ্ধিশালী বহুবিস্তৃত জনপদের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই ভূগর্ভের মধ্যে কিরূপ প্রচণ্ড তাপ সঞ্চিত থাকিয়া প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থকে তরলাকারে পরিণত করিয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস তোমরা পাইয়া থাক।

কোন কোন ভূবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত অনুমান করেন যে এই অত্যুষ্ণ তরল প্রস্তর-ধাতু স্তরের নিম্নে অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্র-স্থানে পুনরায় কঠিন স্তরের সমাবেশ রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে উপরের স্তরসমূহের বিষম চাপে পৃথিবীর কেন্দ্র-সন্নিহিত বহু বিস্তীর্ণ প্রদেশ অত্যুষ্ণতাসত্ত্বেও কঠিন হইয়া গিয়াছে। ইহাঁদিগের মতে পৃথিবীর

উপরিভাগ কঠিন এবং কেন্দ্রস্থলও কঠিন; এই উভয় প্রদেশের ব্যবধানস্থান ভূগর্ভনিহিত প্রচণ্ড তাপসংযোগে দ্রবীভূত ধাতু ও প্রস্তরের স্রোত দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আবার অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বোক্ত বিষম চাপ সংযোগে পৃথিবীর তাবৎ দেহই কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে ভিতরের উত্তাপ উপরের অংশের উত্তাপ অপেক্ষা অনেক অধিক। যদি কোন কারণে ভিতরের চাপ অপসারিত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই স্থানের কঠিন প্রস্তরাদি প্রচণ্ডতাপসংযোগে গলিয়া যায় এবং সেই দ্রবীভূত প্রস্তরধাতুরাশিকে অনেক সময়ে আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

ভূ-স্তরবেষ্টক "প্রস্তর"।

যে সকল বিভিন্ন উপাদান দ্বারা পৃথিবীর স্তর-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তোমাদিগের ভূ-বিদ্যার ভাষায় তাহাদিগের সাধারণ নাম "প্রস্তর" (Rock)। বালি, কাঁকর, বেলে পাথর (Sandstone), চূণ-পাথর (Limestone), মৃত্তিকা, ধাতুময় পদার্থ, পাথুরে কয়লা, জলচরপ্রাণীর কঙ্কাল প্রভৃতি যে কোন পদার্থ দ্বারা পৃথিবীর স্তর গঠিত হইয়াছে, তাহাকেই আমরা এস্থলে "প্রস্তর" বলিয়া উল্লেখ করিব।

"প্রস্তরের" মূল উপাদান।

তোমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী বহু চেষ্টা করিয়া এ পর্য্যন্ত ৮১টী মাত্র মূলপদার্থের (Elements) আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল মূলপদার্থের পরস্পরের সংযোগে ভূ-স্তরের "প্রস্তর" গঠিত হইয়াছে। তবে প্রধানতঃ ১৬টী মূলপদার্থ লইয়াই পৃথিবীর দেহ-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই মূল পদার্থগুলির সর্ব্বপ্রধান অক্সিজেন্ (Oxygen)। ইহা বাষ্পাকারে অমিশ্রিতাবস্থায় বায়ুমধ্যে অবস্থিতি করিয়া তোমাদের জীবন-ধারণ ও অগ্নি-প্রজ্বালনের সাহায্য করিতেছে। ভূ-স্তরের প্রস্তরমধ্যেও অক্সিজেন্ অন্য মূল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্ন যৌগিকের (Compounds) আকারে অবস্থিতি করিতেছে। অক্সিজেনের পরেই সিলিকন্ (Silicon)। সিলিকন্ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া বালুকারূপে (Silica) পৃথিবীর দেহমধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যাহাকে তোমরা সহজ ভাষায় "মাটী" বল, তাহা সিলিকন্, অক্সিজেন্, এবং এলুমিনিয়ম্ (Aluminium) নামক একটী ধাতুর মিলনে গঠিত হইয়াছে। মৃত্তিকা পৃথিবীর দেহের একটী প্রধান উপাদান। আমার দেহ অক্সিজেন্, অঙ্গার (Carbon) এবং ক্যাল্সিয়ম্ (Calcium) নামক অপর একটী ধাতুর সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। চূণ-পাথরের (Limestone) গঠনও তাই, আমাদের উভয়ের মধ্যে উপাদানের পার্থক্য কিছুই নাই। আমরা উভয়েই এক সময়ে মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে অবস্থিতি করিতাম। উত্থানপতন-বিপ্লবের প্রভাবে আমরা উভয়েই অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রতল হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া তোমাদিগের বাসোপযোগী বহু জনপদের সৃষ্টি করিয়াছি; সুতরাং আমিও তোমাদের পৃথিবীর অঙ্গীভূত "প্রস্তর" বিশেষ। আমার অনেকানেক জ্ঞাতিবর্গ এখনো সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করিতেছে; সময়ে হয়ত তাহারাও মাথা তুলিয়া, জল হইতে জাগিয়া উঠিয়া, তোমাদের কার্য্যে জীবনপাত করিবে।

"আগ্নেয় প্রস্তর" ও "পলি-প্রস্তর"।

পৃথিবীর স্তর-গঠক "প্রস্তর" সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর প্রস্তরকে "আগ্নেয় প্রস্তর" (Igneous rock) কহে এবং অপর শ্রেণীর প্রস্তর "পলি-প্রস্তর" (Sedimentary rock) নামে পরিচিত। ইহাদিগের নামই ইহাদিগের উৎপত্তির ইতিহাস স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বাষ্পময় ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া "আগ্নেয়-প্রস্তর"-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন পদার্থ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইলে আকারে ছোট হয় এবং কোঁকড়াইয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইয়া কঠিন হইবার সময়ে বহুদূরব্যাপী প্রবল সঙ্কোচনের চাপ দ্বারা কুঞ্চিত হইয়া কোথাও উন্নত, কোথাও নিম্নগামী হইয়া পড়িল। এই উচ্চাংশসমূহ পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়া আজিও পৃথিবীর বক্ষে বিরাজ করিতেছে। এই উত্থানপতনের সময়ে পৃথিবীর দেহ ভীষণভাবে কম্পিত হইতে থাকে; ইহাকেই তোমরা ভূমিকম্প বলিয়া থাক। এই বিপ্লবের

ফলে কত অতল সমুদ্রতল উত্তুঙ্গ শৈলমালায় পরিণত হইয়াছে, আবার কত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ ভূপৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের মধ্যে "আগ্নেয়-প্রস্তর" বহুল পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আগ্নেয় প্রস্তরই ভূস্তরের আদি ও প্রধান উপাদান।

পলি-প্রস্তরের উপাদান।

ভূ-স্তরনিহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তর "পলি-প্রস্তর" নামে অভিহিত। উত্থান-পতনবিপ্লবের ফলে যখন পর্ব্বতমালা ও উন্নত ভূমির সৃষ্টি হইল, তখন এই সকল উচ্চ স্থান বায়ু, বৃষ্টি ও রৌদ্রের সম্মিলিত ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণায় পরিণত হইল এবং নদনদী সাহায্যে পুনরায় সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ভ করিল। এই সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণার সমষ্টিকে তোমরা "পলি-মাটী" বলিয়া থাক। এই পলি-পতন দ্বারা সমুদ্রগর্ভে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া একটীর পর আর একটী করিয়া স্তর নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে।

জলে যে কোন কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে দ্রব থাকিলে উহা সময়ে সময়ে পৃথক্ হইয়া দানা বাঁধিয়া নীচে থিতাইয়া পড়ে। সমুদ্রের জলে নানাবিধ লাবণিক দ্রব্য সর্ব্বদা দ্রবীভূত থাকে। উহাদের পরিমাণ বেশী হইলে উহারা মধ্যে মধ্যে পৃথক্ হইয়া সমুদ্রতলে থিতাইয়া পড়ে; এইরূপ থিতান পদার্থ দ্বারাও কালসহকারে এক একটী স্তর নির্ম্মিত হইয়া থাকে; ইহাকেও আমরা "পলি প্রস্তর" বলিব।

পুনশ্চ অনেকানেক সমুদ্রচর প্রাণীর দেহ-কঙ্কাল চুণ-পাথর বালুকা বা আমার (চা-খড়ি) দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল প্রাণী যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন তাহাদের কঙ্কালরাশি নিম্নগ হইয়া সমুদ্রতলে আশ্রয় লাভ করে। এই রূপে বিস্তর জীবকঙ্কালের সমষ্টি দ্বারা একপ্রকার "পলি-প্রস্তর" গঠিত হইয়া ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। লাবণিক দ্রব্য, জীবকঙ্কাল বা পর্ব্বতশ্রেণীর উপাদানভেদে পলিমাটীর উপাদানও ভিন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের পলিমাটী দ্বারা গঠিত সমুদ্রতলস্থিত এই সকল স্তরের উপা-দানেরও পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন স্তরটী বা বেলে-পাথর দ্বারা গঠিত, কোনটী বা চুণ-পাথরের, কোনটীর উপাদান বা অন্য রকমের। যুগধর্ম্মে উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে সেই স্তরগুলি কোথাও বা সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া উদ্ভিদ্ ও জীবের বাসোপযোগী ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা ক্ষয়ক্রিয়া দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রক্রোড়ে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

ভূ-স্তর-বিন্যাস।

"আগ্নেয়প্রস্তরের" উপরেই এই "পলিপ্রস্তরের" অবস্থান। ভূপৃষ্ঠ হইতে নিম্নদিকে প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত "পলিপ্রস্তরের" অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্নেই "আগ্নেয়-প্রস্তর"। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া নিম্নদিকে নামিয়া যাইতে পারিলে এই সকল স্তর-বিন্যাস অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু খুব গভীর প্রদেশে যাওয়া অসম্ভব; কারণ তথায় উত্তাপের আধিক্য অত্যন্ত অধিক। তবে কি উপায়ে পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত স্তরা-বলীর গঠন সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে?

উত্থান-পতন-বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর অনেক স্থানে এই সকল স্তর একেবারে উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। যে স্তর নীচে ছিল, তাহা ঠেলিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে,আবার উপরের স্তরগুলি নিম্নগামী হইয়া ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এইজন্য অনেকানেক উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যে আদিম "আগ্নেয় প্রস্তরের" স্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই সকল উৎক্ষিপ্ত "আগ্নেয়-প্রস্তরের" পরীক্ষা করিয়া পৃথিবী গঠনের আদি ইতিহাস কতক পরিমাণে জানিতে পারিয়াছেন।

খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য অনেক স্থলে গভীর খনি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সকল খনির মধ্যে প্রবেশ করিলে ভূপৃষ্ঠের স্তর-বিন্যাস সুন্দরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা বেশী দূরের খবর পাওয়া যায় না। অতি গভীর খনির গভীরতা পৃথিবীর গভীরতার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্র। পর্ব্বতাঙ্গীভূত উৎক্ষিপ্ত "প্রস্তর" স্তরাবলীর পরীক্ষা দ্বারাই পৃথিবীর আদি-গঠন ও জীবনেতিহাস নিরূপিত হইয়া থাকে।

এই এক একটী স্তর পৃথিবীর জীবনেতিহাসের একটী একটী পৃষ্ঠামাত্র। পৃথিবীর জীবন লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী এক একটী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত; এই এক একটী স্তর সেই এক এক যুগের ঘটনাবলীর কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। তোমাদের ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই সকল স্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর দীর্ঘজীবনের কত অচিন্তনীয় রহস্যময় ঘটনার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন্ যুগে পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ বা জীবের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, কোন্ যুগে কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ্ বা কোন্ কোন্ জাতীয় প্রাণী ধরাবক্ষে বিরাজ করিত, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিই বা কিরূপ ছিল, কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ্ সমগ্র উদ্ভিদ্জাতির আদিপুরুষ এবং কোন্ জাতীয় প্রাণী এই অসংখ্য প্রাণীমণ্ডলীর আদি-জনয়িতা, ক্রমবিকাশের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদ্জগতে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, এই সকল স্তরমধ্যে আবদ্ধ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের কঙ্কালরাশি তাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে গ্রন্থের পৃষ্ঠার ন্যায় উদ্ঘাটিত হইয়া নিজ নিজ পূর্ব্বজীবনের পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রকৃতিদেবীর এই বিশাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা বর্ত্তমান উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতের কত গূঢ় রহস্যময় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কত আশ্চর্য্য বৃক্ষলতা পৃথিবী হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, কত অতিকায় অদ্ভুতাকৃতি প্রচণ্ডবলশালী জীব এক সময়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিত এবং সসাগরা ধরণীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, এই সকল ভূস্তরনিহিত কঙ্কালরাশি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের প্রকৃতি, গতিবিধি ও আবির্ভাবের কাল কতক পরিমাণে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তোমরা কোন্ যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলে, তোমাদের আদি পুরুষদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহারা কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের ব্যবহার্য্য গৃহসামগ্রী কিরূপ ছিল, তাহারা আত্মরক্ষা ও শত্রুনিপাতের জন্য কিরূপ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহারা কিরূপে উন্নতির ক্রম-সোপানে উত্থিত হইয়া বর্ত্তমান কালের সুসভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষে পরিণত হইয়াছে, সেই সমুদয় রহস্যময় তত্ত্ব ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া সবিশেষ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এখনো তাঁহারা অক্লান্ত-পরিশ্রম করিয়া উক্ত অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদেরই অনুসন্ধানের ফলে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে জানাইতে বাসনা করিয়াছি।

ভূ-স্তরাবলী পৃথিবীর জীবনেতিহাসের এক একটী পৃষ্ঠা।

এখানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তোমাদিগের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা অদ্ভুত। তাঁহারা অসাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তির বলে নানাবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া একদিকে যেমন অচিন্তনীয় দূর-দূরান্তরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি, আকার, প্রকৃতি ও উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত উদ্ভিদ্ ও জীবজগতেরও অস্তিত্ব এবং জীবনের রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ জগতে জ্ঞানবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল। তোমরা এই জ্ঞানবলের সাহায্যে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছ। কে কবে ভাবিয়াছিল যে মানুষ জলচর প্রাণীর ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে অনায়াসে বাস, বিচরণ, এমন কি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? পুরাণে বর্ণিত আছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া কালীয় নাগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কালে তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল, আর কাহারো পক্ষে নহে। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে মানুষ বার মাস জলের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সে জলের মধ্যে থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। কে কবে মনে করিয়াছিল যে মানুষ বিহঙ্গের ন্যায় ব্যোমপথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া ইন্দ্রজিতের ন্যায় মেঘের আড়ালে থাকিয়া শত্রু সৈন্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে? অতএব দেখা যাইতেছে যে তোমরা বিজ্ঞানবলে প্রাচীনতম যুগের কবিবর্ণিত ঘটনাসমূহ বাস্তব ঘটনাতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছ। তবে দুঃখের বিষয় যে তোমাদের এই অসাধারণ প্রতি-

বিজ্ঞান-শক্তির ব্যভিচার।

বুদ্ধি সদুদ্দেশ্যে ও ধর্ম্মের পথে পরিচালিত না হইয়া অনেক সময়ে অধর্ম্মের পথে, অন্যায় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে ; এক কথায় তোমরা তোমাদিগের এই অদ্ভুত বিজ্ঞানবলের উপযুক্ত ব্যবহার কর না। তোমাদের বিজ্ঞানবল অনেক সময়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া জগতের দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। ইহা বিজ্ঞানবলের ব্যভিচার, ইহাই জাগতিক যাবতীয় অমঙ্গলের নিদান। তোমাদের জাতীয় কবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যা" অতিশয় বিদ্যাবতী ছিলেন, কবি তাঁহাকে "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যার জননী এক স্থানে "বিদ্যার" বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।" তোমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জর্ম্মানজাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই জর্ম্মানগণই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমরে মনুষ্যকুল ও অতুলনীয় কলাশিল্পজাত পদার্থের ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞানবলের যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে অনেক সময়ে সন্দেহ হয় যে বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা জগতের সুখের সমষ্টি বাড়িয়াছে অথবা কমিয়া গিয়াছে? পূর্ব্বপুরুষগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি এবং পরস্পরের ধ্বংসের জন্য যদি বিজ্ঞানশক্তির এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি যত শীঘ্র এ জগত হইতে অন্তর্হিত হয়, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ সকল বিজ্ঞানশক্তির ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত মাত্র, সদ্ব্যবহারের ফল নহে। আমি আশা করি যে এই ভীষণ নরমেধযজ্ঞের অবসান হইলে তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, তোমাদের মতিগতি আবার ফিরিবে। তখন তোমরা তোমাদের প্রতিভা এবং সমগ্র বিজ্ঞানশক্তি মানুষের ও সমস্ত জগতের কেবল মঙ্গল ও সুখশান্তি সাধনের জন্যই নিয়োগ করিবে। (ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

"গুণাগুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব নিবিশন্তি চ"।*
মহাভারত, শান্তি, ৩. ৫. ২৩।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

কাপিলসাংখ্য-অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, জগতের এই যে দুই স্বতন্ত্র মূলতত্ত্ব আছে তাহাদের স্বরূপ কি, এবং দুয়ের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণ ঘটিলে পর, পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতি আপন গুণত্রয়ের যে বাজার বসাইয়া থাকে, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইবে, ইহার বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতির বাজারী লীলা, মরাঠী কবি যাহার ভাবব্যঞ্জক নাম দিয়াছেন "সংসারের খেলা" এবং জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে "প্রকৃতির টাকশাল" বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতির সংসার কি অনুক্রম-অনুসারে পুরুষের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া থাকে ও তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনো বাকী রহিয়া গিয়াছে; এই প্রকরণে সেই ব্যাখ্যা করিব। প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের "রচনা ও সংহার" বলে। সাংখ্যমতানুসারে এই সমস্ত জগৎ বা সৃষ্টি অসংখ্য পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রকৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে নির্ম্মাণ হয়, 'দাসবোধের' দুই তিন স্থানে শ্রীসমর্থ রামদাসস্বামীও তাহার সুরস বর্ণনা করিয়াছেন; এবং সেই বর্ণনা হইতেই "বিশ্বের রচনা ও সংহার" এই নাম আমি গ্রহণ করিয়াছি। সেইরূপ, ভগবদ্‌গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য হইয়া পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে—"ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া" (গী. ১১.২)—ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় (যাহা আপনি) বিস্তারিতরূপে (বলিয়াছেন তাহা) আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন—এই যে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিশ্বের রচনা ও সংহার ক্ষর-অক্ষর-বিচা-

* "গুণ হইতেই গুণ উৎপন্ন হয় এবং গুণেতেই গুণ লয় পায়।"

রেরই এক মুখ্য ভাগ। সৃষ্টির অন্তর্গত অনেক (নানা) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল দ্রব্য আছে ইহা যাহার দ্বারা বুঝা যায় তাহাই জ্ঞান (গী. ১৮. ২০); এবং যাহা দ্বারা একই মূলভূত অব্যক্ত দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত পদার্থসকল কিরূপে পৃথকভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে (গী. ১৩. ৩০) বুঝা যায় তাহাই বিজ্ঞান; এবং ইহার মধ্যে কেবল ক্ষরাক্ষর বিচারের সমাবেশ হয় না, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিষয়সকলেরও সমাবেশ হয়।

ভগবদ্গীতার মতে প্রকৃতি আপন সংসারের কার্য্য স্বতন্ত্ররূপে নির্ব্বাহ করেন না, পরন্তু তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন (গী. ৯. ১০)। সাংখ্যশাস্ত্রের মতে পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণই প্রকৃতির সংসার-কার্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রকৃতি এই বিষয়ে আর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। সাংখ্যের বাক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতি-টাকশালের কাজ আরম্ভ হয় এবং বসন্ত-ঋতুতে যেরূপ পল্লব ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হয় (মভা. শাং. ২৩১. ৭৩; মনু ১. ৩০) সেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া তাহার গুণসমূহের বিস্তার হইতে থাকে। ইহার বিপরীতে বেদসংহিতাতে, উপনিষদে ও স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে প্রকৃতিকে মূল বলিয়া স্বীকার না করিয়া, পরব্রহ্মকে মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহা হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" প্রথমে হিরণ্যগর্ভ (ঋ. ১০. ১২১.১). এবং এই হিরণ্যগর্ভ হইতে কিংবা সত্য হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে (ঋ. ১০. ৭২; ১০. ১৯০); কিংবা প্রথমে জল উৎপন্ন হইয়া (ঋ. ১০. ৮২. ৬; তৈ. ব্রা.১. ১. ৩. ৭; ঐ. উ. ১. ১. ২) তাহা হইতে সৃষ্টি হইল; এই জলেতে এক অণ্ড উৎপন্ন হইবার পর তাহা হইতে ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা হইতে কিংবা মূল অণ্ড হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইল (মনু. ১. ৮. ১৩; ছাং. ৩. ১৯); কিংবা সেই ব্রহ্মাই (পুরুষ) অর্দ্ধভাগে স্ত্রী হইয়াছিলেন (বৃ. ১.৪. ৩; মনু. ১. ৩২); কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই পুরুষ হইয়াছিল (কঠ ৪. ৬); অথবা প্রথমে পরব্রহ্ম হইতে তেজ, জল ও পৃথ্বী (অন্ন) এই তিন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রণে সমস্ত পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল (ছাং ৬. ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে অনেক ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে বেদান্তে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে (বেসূ. ২.৩.১-১৫), আত্মরূপী মূল ব্রহ্ম হইতেই আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিঃসৃত হইয়াছে (তৈ. উ.২.১), কঠ (৩.১১), মৈত্রায়ণী (৬.১০), শ্বেতাশ্বরে (৪.১০; ৬.১৬), প্রভৃতি উপনিষদেও, প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্ত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বেদান্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করিলেও, একবার যখন শুদ্ধ ব্রহ্মোতেই মায়াত্মক প্রকৃতিরূপ বিকার প্রকাশ পায়, তখন পরে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে তাঁহার ও সাংখ্যবাদীর পরিণাম একবাক্যতা হইয়া গিয়াছে, এবং এই কারণেই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১,১০৮,১০৯)। "ইতিহাস. পুরাণ অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যে কিছু জ্ঞান আছে সে সমস্ত সাংখ্য হইতেই আসিয়াছে"—কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদান্তীরা কিংবা পৌরাণিকেরা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ তাহার অর্থ নহে; কিন্তু সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমের জ্ঞান সর্ব্বত্রই এক-প্রকার, এই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। কেবল তাহাই নহে, 'জ্ঞান' এই ব্যাপক অর্থেই, এই স্থানে 'সাংখ্য' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, একথা বলিলেও চলে। কপিলাচার্য্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতি-সহকারে বিবৃত করিয়াছেন, এবং ভগবদ্গীতাতেও এই সাংখ্যক্রম মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এই প্রকরণে তাহারই বিচার করা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত, সূক্ষ্ম একবস্তু-মাত্র এবং চারিদিকে অখণ্ডরূপে পরিপূর্ণ এক নিরবয়ব মূল দ্রব্য হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সাংখ্যদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশের অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রজ্ঞদিগের শুধু গ্রাহ্য নহে, পরন্তু এই মূল দ্রব্যের অন্তর্ভূত শক্তির ক্রমশ বিকাশ হইয়া আসিতেছে এবং এই পূর্ব্বাপর ক্রম কিংবা ধারা ছাড়িয়া মাঝখানে উপরি-পড়ার মতন

হঠাৎ কিছুই নির্ম্মাণ হয় নাই, ইহাও তাঁহারা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন। এই মতকে উৎক্রান্তি-বাদ বা বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে। এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে বিগত শতাব্দীতে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকসমূহে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভূত ও জঙ্গমশ্রেণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ পৃথক্ ও স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তিবাদ বাহির হইবার পূর্ব্বে সমস্ত খৃষ্টানমণ্ডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাই, যখন উৎক্রান্তিবাদ এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিল তখন চারিদিক হইতে উৎক্রান্তিবাদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল এবং অদ্যাপি ঐ আক্রমণ অল্পবিস্তর চলিতেছে। তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল অধিক হওয়ায়, সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে উৎক্রান্তি মতটাই সমস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহ্য হইতে চলিয়াছে। এই মতানুসারে সৌর জগতে প্রথমে একই বস্তুসার সূক্ষ্ম দ্রব্য ভরিয়াছিল; উহার গতি বা উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল; তখন উক্ত দ্রব্যের অধিকাধিক সঙ্কোচ হইয়া পৃথ্বীসমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল এবং সূর্য্যই শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবীও সূর্য্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ণ গোলক ছিল; কিন্তু যেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম হইতে লাগিল সেইখানে সেইখানেই মূল দ্রব্য সমূহের কোন দ্রব্য পাতলা ছিল এবং কোন দ্রব্য ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার নীচে পৃথিবীর কঠিন জড় গোলার সৃষ্টি হইল; এবং পরে, এই সকল বস্তুর সংমিশ্রণে বা সংযোগে সমস্ত সজীব ও নির্জীব সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্যও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে ডার্বিনপ্রভৃতি পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তথাপি আত্মা বলিয়া মূলে পৃথক্ কোন তত্ত্ব স্বীকার করা যাইবে কি, যাইবে না, এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী ও অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাড়িতে বাড়িতে আত্মা ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া জড়াদ্বৈত প্রতিপাদন করেন; এবং ইহার বিপরীতে ক্যাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাত্মজ্ঞানী বলেন যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ায় আত্মাকে এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া মানিতে হয়। কারণ, বাহ্য জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্মা স্বতঃ গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা এই বাহ্য জগৎ হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা বলা,—"আপন স্কন্ধের উপরে আপনি বসিতে পারি" —এই কথার ন্যায় তর্কদৃষ্টিতে অসম্ভব। এই কারণেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সারকথা এই যে, আধিভৌতিক জগৎ-জ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন, জাগতিক মূলতত্ত্বের স্বরূপের বিচার সর্ব্বদাই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নিঃসৃত হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য উৎক্রান্তিমত ও ও সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির প্রপঞ্চতত্ত্ব, এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে না। কারণ, অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও একবস্তুসার মূল প্রকৃতি হইতেই ক্রমে ক্রমে (সূক্ষ্ম ও স্থূল) বস্তুবহুল ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই সমান সম্মত। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখ্যদিগের 'সত্ত্ব, রজ, তম' এই তিন গুণের বদলে অর্ব্বাচীন সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞগণ গতি, উষ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যের পরিমাণ অপেক্ষা উষ্ণতা কিংবা আকর্ষণশক্তির ন্যূনাধিক্যের ধারণা আধিভৌতিকশাস্ত্রদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বোধগম্য হয়। তথাপি "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" (গী, ৩. ২৮) এইরূপ যে গুণত্রয়ের বিকাশ কিংবা গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব তাহা উভয়দিকেই এক। ঘড়ির পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা যেরূপ আস্তে আস্তে খোলা যায়, সেইরূপ সত্ত্ব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা হইলে প্রকৃতির ঘড়ি আস্তে আস্তে খুলিয়া চলিতে

থাকিলে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হইল সাংখ্যশাস্ত্রের কথা ; এই কথায় ও উৎক্রান্তিবাদে বস্তুত কোন ভেদ নাই। তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় গুণোৎকর্ষতত্ত্বকে উপেক্ষা না করিয়া গীতাতে এবং অংশত উপনিষদাদি বৈদিক গ্রন্থেও অদ্বৈত বেদান্ত মতের অবিরোধেই স্বীকৃত হইয়াছে ; এই ভেদ তাত্ত্বিক ধর্ম্মদৃষ্টিতে মনে রাখিবার যোগ্য।

ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বিকাশের ক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যকারের কি মত এখন দেখা যাক্। এই ক্রমকেই গুণোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিণামবাদ বলে কোনও কাজ করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য উক্ত কাজ করিবে বলিয়া আপন বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিংবা তাহা করিবার বুদ্ধি বা সঙ্কল্প তাহার প্রথমে হওয়া চাই, ইহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। অধিক কি, উপনিষদেও এইরূপ বর্ণনা আছে যে, মূল এক পরমাত্মারও আমি বহু হইব—এই বুদ্ধি বা সঙ্কল্প হইবার পর, জগৎ উৎপন্ন হইল (ছাং, ৬,২,৩ ; তৈ, ২,৬)। এই ন্যায় অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতিও আপনা হইতেই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া পরে ব্যক্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া নিশ্চয় করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহা করা বুদ্ধিরই লক্ষণ। তাই প্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। সার কথা, এই যে মনুষ্যের যেরূপ কোন কার্য্য করিবার বুদ্ধি প্রথমে হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি প্রথমে হওয়া চাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রাণী সচেতন হওয়া প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির সহিত সচেতন পুরুষের (আত্মার) সংযোগ প্রযুক্ত, মনুষ্যের ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য, পুরুষের সংযোগ দ্বারা প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্যপ্রযুক্ত হইয়া থাকে ; তাহা শুধু জড় বা অচেতন প্রকৃতির গুণ নহে। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অস্বয়ংবেদ্য শক্তি জড়পদার্থেও আছে এইরূপ না মানিলে, গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা রসায়নক্রিয়ার বা লৌহচুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জড়জগতের স্বেচ্ছানির্ব্বাচনের কার্য্য এ যুক্তি খাটে না। এই কথা অর্ব্বাচীন আধিভৌতিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞও একণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * আধুনিক সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞদিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছা হয় তো অচেতন বা অস্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপনি জানিতে অক্ষম বল,—যাহাই বল না কেন, মনুষ্যের বুদ্ধি ও প্রকৃতির বুদ্ধি, এ উভয়ই মূলে যে একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত তাহা সুস্পষ্ট ; এবং সেইজন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উভয়স্থলে একই প্রকার করা হইয়াছে। এই বুদ্ধিরই—'মহৎ, জ্ঞান, মতি, আসুরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি,' প্রভৃতি অন্য নামও আছে। অনুমান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ (পুংলিঙ্গী প্রথমার একবচন মহান্—বড়) এই নাম, প্রকৃতি একণে বড় হওয়ায় তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই গুণের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত এই নাম দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান্ কিংবা বুদ্ধিগুণ,

* Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will":—Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol II. P. 399, 3rd Ed. Haeckel himself explains this statement as follows:—I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensation and will which may be attributed to atoms, to be unconscious—just as unconscious as the elementary memory, which I in common with the distinguished psychologist Ewald Hering consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances."—The Riddle of the Universe, Chap. IX. P. 63 (R. P. A. Cheap Ed.).

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের মিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায়, প্রকৃতির এই বুদ্ধি দেখিতে এক হইলেও পরে উহা অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারণ, এই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন হইলেও বিচারদৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, উহাদের মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনন্তরূপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন হইতেই প্রত্যেক গুণের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন গুণ অনন্ত হইতে পারে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই বুদ্ধিও প্রকৃতিরই ন্যায় সূক্ষ্ম। কিন্তু পূর্ব্বপ্রকরণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সূক্ষ্ম ও স্থূল, ইহাদের যে অর্থ বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অব্যক্ত নহে—তাহা মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। তাই, এক্ষণে সিদ্ধ হইল যে, 'ব্যক্ত' এই মনুষ্যগোচর বৃহৎ পদার্থবর্গের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং শুধু বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমস্ত বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হয়। এক মূল প্রকৃতি ব্যতীত কোন তত্ত্বই অব্যক্ত নহে।

অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতি এখনও এক বস্তুসারই রহিয়াছে। এই একবস্তুপরতা ভাঙ্গিয়া বহুবস্তুপরতা উৎপন্ন হওয়াকেই 'পৃথকত্ব' বলে। উদাহরণ যথা—পারা জমির উপর পড়িয়া ছোট ছোট গোলায় পরিণত হওয়া। বুদ্ধির পর, এই পৃথকত্ব বা বহুত্ব উৎপন্ন না হইলে একই প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়া সম্ভব নহে। বুদ্ধির পরে উৎপন্ন পৃথকত্ব গুণকেই 'অহঙ্কার' বলে। কারণ, পৃথকত্ব 'আমি-তুমি' এই সকল শব্দের দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; এবং 'আমি-তুমি'র অর্থেই অহংকার,—অহং অহং (আমি আমি) করা। প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার গুণকে ইচ্ছা হয় তো অ-স্বয়ংবেদ্য বা আপনাকে আপনি জানিতে অসমর্থ বল। কিন্তু মনুষ্যে প্রকটী-ভূত অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাথর, জল কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তুসার প্রকৃতি হইতে নির্ম্মিত হয়, ইহাদের জাতি একই। প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য না থাকায় তাহার 'অহং'এর জ্ঞান হয় না এবং মুখ না থাকায় 'আমি পৃথক্ তুমি পৃথক্' এইরূপ স্বাভিমানসহকারে সে নিজের পার্থক্য অন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথকরূপে থাকিবার তত্ত্ব অর্থাৎ অভিমানের কিংবা অহঙ্কারের তত্ত্ব সকল স্থানেই এক। এই অহঙ্কারকেই তৈজস, অভিমান, ভূতাদি, ধাতুপ্রভৃতিও বলা যায়। অহঙ্কার বুদ্ধিরই এক উপভেদ হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি না হইলে অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই অহঙ্কার অন্য একটী গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্ত্তী এক গুণ ইহা সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কারেরও অনন্ত প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা বাহুল্য। এই প্রকারে পরবর্ত্তী গুণসমূহের ও প্রত্যেকের তিন-গুণ অনন্ত-ভেদ। অধিক কি, ব্যক্ত জগতে প্রত্যেক বস্তুর এইরূপ অনন্ত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে; এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই গীতাতে গুণত্রয়-বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত হইয়াছে (গী, অ, ১৪ ও ১৭)।

ক্রমশঃ।

আদর্শ
বা
দাদা ঠাকুর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—বাপীতীর। কাল—পূর্ণিমা রাত্রি।

লক্ষ্মী গাহিতেছিল।

গীত।

তুমি যদি বুকে, থাকো সুখে দুখে
সেই সুখে, দুখে সুখে রব' আমি
সুখের বেদনা উঠিবে শিহরি'
তোমারে চাহিয়া দিবস-যামী।

তোমারি মোহন স্নিগ্ধ দৃষ্টি
করিবে জীবনে অমিয় বৃষ্টি
নূতন রাজ্য করিতে সৃষ্টি
স্বরগ আসিবে মরতে নামি'।

প্রেম-সাগর সোহাগে মথিয়া
হৃদয়-পাত্র পূর্ণ করিয়া
নন্দন-সুধা রাখিব ধরিয়া
অধরে তোমারি দিবস-যামী।

দেহে প্রাণে মনে জীবনে মরণে
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
শ্রবণে মরণে নয়নে বচনে
হয়ে' রব' তব চির-অনুগামী।

বিবেদিতা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিল।

লক্ষ্মী। আঃ এমন সময়ে বাধা দিলে!

নিবে। কি লো, আজ যে খুব গান গাওয়া হ'চ্ছে। বড় আনন্দ দেখা যাচ্ছে!

লক্ষ্মী। কেন, কাঁদব কোন্ দুঃখে?

নিবে। হাস্‌বেই বা কোন্ সুখে?

লক্ষ্মী। ঐ দেখ সবাই হাস্‌চে। ঐ চাঁদ কেমন হাস্‌চে; লতা কেমন দুল্‌চে; ঐ পুকুরের জল কেমন টল্ টল্ করছে; পদ্মের কলিগুলো শিউরে উঠ্‌চে। এমন সময়ে কেবল আমিই বা কোন্ দুঃখে কাঁদব?

নিবে। আ-মর্ বিধবা হয়েছিস্, স্বামীর জন্যে একটু কাঁদ্—তা তো নয়,-মেয়েটার কেবল হাসি আর গান! এ কেমন অনাসৃষ্টি কথা!

লক্ষ্মী। বালাই, পতিহারা হব কেন? আজ যে এই জ্যোৎস্নারাতে আমি অভিসারে এসেছি। ঐ দেখ তিনি চাঁদে থেকে উঁকি দিচ্চেন; পুকুরের জলে ঢেউ হয়ে' খেলা করচেন; ফুল হয়ে হাস্‌চেন। তিনি বাতাস হয়ে আমায় স্পর্শ করচেন। আবার প্রাণে স্থির হয়ে' বসে আছেন। আমি যে আজ এই বিশ্বময় কেবল তাঁরেই দেখ্‌চি। এক "তিনি" আজ লক্ষ "তিনি" হয়েছেন।

নিবে। তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। আচ্ছা, বিধবা হয়েছ বলে কি তোমার প্রাণে কোনই দুঃখ নেই?

লক্ষ্মী। দুঃখ? দুঃখ কারে বল? স্বামী মরলে স্ত্রীর প্রাণে যা হয় তার কথা বল্‌ছ? না, আমার দুঃখ হয় নি। আমার প্রাণে যা হয়েছিল, তা যে কি, তা যে কেমন, তা বল্‌তে পারি না। তাকে দুঃখ বললে কিছুই বলা হোল না। দুঃখের চেয়ে সে অনেক বেশি। উঃ—! (চক্ষু মুছিল)

নিবে। একি তুমি কাঁদছ? এ কথা জিজ্ঞেস্ করে' তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। থাক্ আর ও কথা তুলে কাজ নেই।

লক্ষ্মী। আর আমার দুঃখ নেই। দাদাঠাকুরের সান্ত্বনায় আমার প্রাণ জুড়িয়েছে। ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তাই তিনি করেছেন। আমি তার জন্যে শোক করবার কে? আমি আমার স্বামীকে যতটুকু ভালো বাসি, তার চেয়ে ভগবান্ ভালো বাসেন অনেক বেশি। আরো দ্যাখো. জীবিত থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গে কত ঝগড়া হোত, বিচ্ছেদ হোত। কিন্তু এখন আর কলহ নেই,—বিচ্ছেদ নেই—কেবল মিলন কেবল সোহাগ। দুঃখের কথা বলছ? কি দুঃখ আমার? দাদাঠাকুরের আশ্রয়ে এসে আমার নূতন জীবন লাভ হয়েছে। এখন আমি যখন রোগীর সেবা করি, তখন ভাবি এরাই আমার সন্তান, যখন দেবসেবা করি তখন মনে হয়, আমি তাঁকেই সেবা করছি। বাপ্ ছিল না বাপ পেয়েছি, মা ছিল না মা পেয়েছি; বোন ছিল না বোন পেয়েছি। আর কি দুঃখ আমার?

নিবে। ধন্য তুমি, তোমার শিক্ষা সার্থক হয়েছে। লক্ষ্মী, তুমি একটা গান গাও। তোমার গান শুনতে আমার বড় ভালো লাগে।

লক্ষ্মী গাহিল—

গীত।

বুঝি এত প্রেম, নারিবে সহিতে
তাই অলখিতে গোপনে সহি;
আকুল আবেগ ধরিতে নারিবে
তাই তো নীরবে মরমে বহি।

শুধু আসি যাই, কাঁদি হাসি তাই
মরমের কথা মরমে লুকাই
জানি জানি আমি তোমারেই চাই
তবু তো' তোমার কাঙাল নহি।

মাধবী সমীর হাহাকার সনে
তুমি বয়ে' যাও আপনার মনে
শিহরি পরাণ উঠে যেই ক্ষণে
মধুর আবেশে বিভোর রহি।

নিবে। তোমার সুরে যেন ব্যথা মাখা। ওকি তোমার চোখে জল?

লক্ষ্মী। ও কেমন আমার চোখের দোষ।

নিবে। লক্ষ্মী দিদি, তোমার হিতোপদেশ এখনো সারা হয়নি? জ্যাঠামহাশয় বলেছেন আমাকে আর কিছুদিন পরেই বেদান্ত দর্শন পড়াবেন।

লক্ষ্মী। আমি ভাই নমঃশূদ্রের মেয়ে, অত পড়াশুনা করতে পারি না। আমার এই চরকা ঘুরানো আর রোগী সেবাই ভালো লাগে।

নিবে। আমি কেবল পড়তে আর মেয়েদের পড়াতে ভালো বাসি। আমি কেবল এই-ই করব।

লক্ষ্মী। এ আর ক'দিন চলবে? এই কুন্তী করা খুঁত ভাঁজা, আর মেয়েদের পড়ানো ক'দিন চল্‌বে? বিয়ে হলে তো আর পারবে না। তখন ঘরকন্না করতে হবে।

নিবে। আমি বিয়ে করব না।

লক্ষ্মী। তা কি হয়!

নিবে। কেন হবে না? আমি ব্রহ্মচারিণী হব।

লক্ষ্মী। সে কি কথা? দাদাঠাকুর বলেন, বিয়ে করে সংসারধর্ম্ম করাই ভালো।

নিবে। তা ভালো। কিন্তু তিনি আরো বলেন যে, কতকগুলি পুরুষ আর কতকগুলি মেয়ে অবিবাহিত থাকা ভালো। তারা কেবল জগতের কাজ করবে। সবাই কেবল এক রকম জীবন যাপন করবে এ কেমন কথা?

লক্ষ্মী। কিন্তু মনে রেখো তুমি নারী, শেষ পর্য্যন্ত এ কথা রাখতে পারলে হয়।

নিবে। হোক্ নারী। কিন্তু ভাই নারীজাতির ভিতরেই গার্গী, সুলভা প্রভৃতি নারীগণ জন্মেছিলেন।

লক্ষ্মী। আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীও জন্মেছিলেন। গার্গী সুলভার চেয়ে তাঁরাও কম নন।

নিবে। হাঁ কম নয় বটে। তবে এ দু' রকমেরি প্রয়োজন আছে। সীতা সাবিত্রী সীতা সাবিত্রীরই মত। গার্গী সুলভা আবার গার্গী ও সুলভারই মত।

লক্ষ্মী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা মুস্কিল। ও কি! ও কে?

গাইতে গাইতে পাগলিনীর প্রবেশ।

গীত।

কেন মোর এমন হোল শুকনো আঁখি পাষাণ মন!
কাঁদতে নারি পরাণ খুলে বুকের মাঝে কি বাঁধন।
(বুক ফেটে যায়—যেন পাথর-চাপা গো!)
বুক ফেটে যায় সইতে নারি, কান্না আসে নাই কাঁদন!
কালো মেঘ ছায়ার মতন জুড়ে হৃদয় খানি
নাই গরজন, নাই বরষণ, নাইরে দামিনী
চমকি আপন অন্ধকারে মুদি যদি দু'নয়ন।
অধরের কোণে হাসি উঠে ভয়ে থেমে যায়
শ্বাসের তাপে আপনি পুড়ি জগৎ পোড়ে হায়!
সবাই যখন হাসে খেলে, মলিন হয়ে যায় বদন
নিরালা ঘরের মাঝে, বসি যখন একা
আশে-পাশে কারা যেন দেয় আসি দেখা
ভাব-ভাষাহীন্ শুষ্ক দৃষ্টি স্থির অনিমেষ-লোচন।
নিজের পানে চেয়ে আমি নিজেই শিউরে উঠি
নিজের নিকট থেকে যে চাই করতে নিজে পলায়ন।

নিবে। (পাগলিনীর প্রতি) তুমি কে গা?

পাগ। আমি—আমি—হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট হাস্য)

নিবে। তুমি কোথায় থাকো?

পাগ। যেখানে যখন থাকি।

নিবে। এখন কোথা থেকে এলে?

পাগ। ঐ পুকুরের জলে ডুব দিয়েছিলুম।

নিবে। কেন?

পাগ। জ্বালায়। বড় জ্বালা গো—বড় জ্বালা, মরতে গেলাম, ডুবে মরতে গেল্‌াম পারলুম না। ভয় হ'ল, মরতে ভয় হ'ল। ওঃ! সে কি ভয়! বড় ভয়! বড় ভয়! (কম্পন)

নিবে। কেন, ডুবে মর্‌বে কেন?

পাগ। মর্‌ব না? মর্‌ব না? বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা। সইতে পারি না।

নিবে। কিসের জ্বালা? তোমার কি কোনো ব্যারাম আছে?

পাগ। জানি না ত; বুঝি না। কিন্তু বড় জ্বালা। এ জ্বালা উপরের নয়—ভিতরের। উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল।

নিবে। তোমার কি জ্বালা বল মা। পারি তো জুড়িয়ে দেব।

পাগ। শুন্‌বে? তবে বল্‌ব? হাঁ বল্‌ব, তোমার কাছে বল্‌ব। তোমার কথা বড় মিষ্টি। এমন মিষ্টি কথা তো আর কোথাও শুনিনি। বল্‌ব—তোমার কাছে বলব।

নিবে। বল মা।

পাগ। আমায় তাড়িয়ে দেবে না? ঘেন্না কর্‌বে না?

নিবে। কেন মা, ঘৃণা কর্‌ব কেন? জগতে কেউ ঘৃণার পাত্র নয়।

পাগ। আহা জুড়োলো! একটু জুড়োলো! তবে বল্‌ব? তা বললে এই জ্যোৎস্না নিবে যাবে, এখুনি আঁধার হবে, মেঘ করবে, বাজ পড়বে। উঃ কি ভীষণ! কি ভয়ানক! বলব? তবে বলব।

নিবে। বল না, কিছু ভয় নেই।

পাগ। তবে শোনো। এক যে ছিল কুলীন বামুনের মেয়ে, তার সোয়ামির ছিল আঠারোটা বিয়ে। অনেক বছর কেটে গেল সোয়ামীর সাথে দেখা নেই। মেয়ের বাড়ীর কাছে ছিল এক যাত্রার দলের ছেলে। সে জাতিতে নমঃশূদ্র। মেয়ে তার সঙ্গে চলে গেল কাশীতে। কিছুদিন পরে অভাগিনীর এক ছেলে

হোল। যাত্রার দলের ছেলেটা ছিল ভারী মাতাল, টাকা না পেলে মেয়েটাকে মারত, তার গয়না কেড়ে নিত। দু'দিন পরে সে মেয়েটাকে ছেড়ে গেল। তখন মেয়েটা অরুপায় হয়ে এক ভদ্দর লোকের কাছে ছেলেটাকে বিক্রী করলে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শেষে মেয়েটা পথের ভিখারী হো'ল। তার ব্যামো হোল। কব্‌রেজ ডাক্তারে চিকিৎসা করলে না। শেষটা পাগল হয়ে গেল। কয়েক দিন পাগলা গারদে থেকে সেখান থেকে পালিয়ে এল। শুনলে তো? রূপকথাটা শুনলে তো? এখন তার প্রাণে আগুণ জ্বলচে উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল।

নিবে। দয়াময়কে ডাকো। সব জ্বালা জুড়াবে।

পাগ। ডাকতে পারি নে। ভয় করে, লজ্জা করে, মা, লজ্জা করে। আমি কি তাঁকে ডাকতে পারি।

নিবে। কেন পারবে না? তিনি যে পতিতের বন্ধু, পতিতের প্রতিই তাঁর বেশী দয়া। তোমার চোখের জলে সব পাপ ধুয়ে গেছে। এখন এক মনে তাঁকে ডাকো।

পাগ। ধুয়ে গেছে! সত্যি?

নিবে। হাঁ।

পাগ। আহা, কে মা তুমি আমার বুক জুড়ালে? মা, তুই আমার মা হবি? আমি তোর কোলে থাকব।

নিবে। তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকো।

পাগ। না না, তা যাবো না। কারো বাড়ীতে যাবো না। আমি পাগলী, আমি ডাইনী, তবে যাই, যাই মা এখন যাই। আর একদিন আসব, তোর কাছে এসে জুড়াব।

(দ্রুত প্রস্থান)

নিবে। হায় অভাগিনী! চল দিদি আমরাও বাড়ী যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

ভারতমহিলা ও রাজা রামমোহন রায়।

(রামমোহন স্মৃতিসভায় বিবৃত)

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ)

আজ যে মহাপুরুষের শ্রাদ্ধবাসরে, আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে সমবেত হয়েছি—সর্ব্ব প্রথমে তাঁর উদ্দেশে অন্তরের সভক্তি প্রণাম জানিয়ে আমি আমার কথাগুলি বলব। তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, চরিত্রবল, হৃদয়ের ঔদার্য্য, বিশ্বপ্রাণতা; মানব-মৈত্রী, কতদিকে কত কাজ করেছিল, সে সব বিষয়ে আমার চেয়ে জ্ঞানী ও গুণী অন্য সকলে জানাবেন; তাঁর সহৃদয়তা ও করুণায়, আমাদের বঙ্গনারীগণের জীবনে, যে নব যুগের সৃষ্টি হয়েছে, আমি শুধু সেই কথাটিই জানাব।

জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌বার জন্যে প্রাণী মাত্রেরি, বিশেষ করে মানবমনের প্রাণপণ চেষ্টা আর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা যায়। মরতে আমরা সহজে চাইনে, জীবনে সুখ না থাকলেও, বেঁচে থাক্‌বার সব সার্থকতা চলে গেলেও তবু দেখি মানুষ বেঁচে আছে, বেঁচে থাক্‌তে চায়। তাই মনে হয় জীবনের প্রতি এই অচলা নিষ্ঠা কখনই বৃথা নয়—সংস্কারের মত দৃঢ় এই বাসনার অন্তর্গূঢ় কারণের মর্ম্ম আমরা নিশ্চিত না জানলেও কারণ যে আছে সেটা নিঃসংশয়। যে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচতে দাও—সে তার জীবন পরিণতির মুখে অগ্রসর করে নিয়ে যাক সে পথে বাধা হোয়োনা। তাই প্রাণ-হানি করবার মত মহাপাপ আর নেই—পরকে হত্যা করাত দূরের কথা—আত্মঘাতী হওয়াও এই কারণেই মহাপাপ বলে গণ্য। আবার এও দেখি, জীবন-নিষ্ঠ এই মানুষই জীবনকে তুচ্ছ করে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে অমর হবার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। বিশেষতঃ ধর্ম্মের অনুশাসন বলে মৃত্যু-বিধান যখন প্রচারিত হয়—তখন মানুষ মরতে আর মারতে দ্বিধামাত্র বোধ করে না। এক সময়ে স্বামীর সহিত সহমরণ এ দেশে বিধবা রমণীর পক্ষে জীবনের স্বর্গদ্বার বলেই প্রচারিত হয়েছিল। এই সাহস যিনি করতে পারতেন তাঁর কীর্ত্তি-গৌরবে পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুর, তিনটি কুলই মহিমান্বিত হত, তিনি রমণীসমাজে প্রাতঃস্মরণীয়া হতেন, ফলে তাঁর ভাগ্যে পতি-সহবাসে অক্ষয় স্বর্গলাভ হত। যে মানুষ প্রাণ-ভয়ে ভীত; জীবনের সুখ-সম্ভোগ তুচ্ছ করে, মহত্তর কর্ত্তব্যকে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয় না, আমরা তাকে করুণার চক্ষে দেখলেও প্রশংসা-ভাজন মনে করি না, তার জীবনের অনুসরণ করতে

আমাদের মন সরে না। আবার যে, মুহূর্ত্তে সব পরিহার করে, হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় উঠে জীবন বিসর্জ্জন করতে পারে—তার এই আত্মত্যাগ আমাদের সমস্ত মনকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত করে; সেই মুগ্ধ অবস্থায় কাজটির মধ্যে ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ কোথায় কত খানি কিম্বা কতটুকু আছে কি নেই, সে সব বিচার-বিবেচনা করবার শক্তি, আমাদের থাকে না, এমন কি প্রবৃত্তিও চলে যায়। সহমরণের অনুশাসন, আর আমাদের পূর্ব্ব পিতা-মহীদিগের স্বেচ্ছায় অকুণ্ঠিত চিত্তে সে বিধানের অনুসরণের দৃষ্টান্ত এই ভাবেই সাধারণের মনকে মুগ্ধ করেছিল। ক্রমে অবস্থা এমনি হোল যে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে সহমৃতা না হলে, তার প্রতি বল প্রয়োগ হোত।

এদেশে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, কত যুগ যুগ ধরে এই নিষ্ঠুর নিয়মটি অব্যাহত ভাবে চলে এসেছিল—তার প্রমাণ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ-ইতিহাস হতে জানা যায়। শাস্ত্রকারেরা এর পোষকতা করেছিলেন, জনসাধারণের সম্মতিলাভে সম্মানিত হওয়ায় ইহা ক্রমে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

মৃত্যুর নিকটেই আমরা সাচ্চা আর মেকি পরখ করে নিয়ে থাকি। যেখানে আন্তরিক প্রীতি আছে সেইখানেই মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করে' মৃত্যুকে আনন্দে বরণ করে। স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন, সন্তানের শুভ-কামনায় মাতা মৃত্যুকে গণ্যই করেন না, ভগবদ্ভক্ত তাঁকে লাভ করবার জন্যে সকল কৃচ্ছ্র-সাধন বরণ করে', প্রাণপণ করেন। কথায় বলে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। আর যে প্রিয়-জন-বিচ্ছেদে নারীর জীবনের সমস্ত কল্যাণ ভ্রস্ট, সমস্ত প্রয়োজন নিরর্থক হয়ে যায়—তাঁর জন্যে মরা বড় কথা নয়, বিশেষতঃ এ মরণে যখন ইহ-পরতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মঙ্গলের সম্ভাবনা, তখন পত্নী যে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করবেন তা'তে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। মহাভারতে দেখি ঋষি-শাপের পরিণাম-বশতঃ মহারাজ পাণ্ডু যখন অসময়ে মারা পড়লেন—তখন মাদ্রী সহমৃতা হলেন। তিনি মহারাজের প্রেয়সী মহিষী, লোকান্তরে তাঁর সহবাস স্বামীর পক্ষে অধিকতর সুখের হবে জেনে—কুন্তী সন্তানপালনের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করে বেঁচে রইলেন।

সহমরণ-প্রথা কেন যে প্রচলিত হয়েছিল, এর অর্থ-নৈতিক কিংবা সমাজনৈতিক কোন প্রকৃষ্ট কারণ কি সার্থকতা কালবিশেষে ছিল কিনা জানিনে; কিন্তু এ যে নিষ্ঠুর প্রথা এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ নাই, তখনও ছিল না। কেননা অঙ্গিরা হারীত প্রভৃতি ঋষিরা এ নিয়ম সুসংস্থাপিত করবার চেষ্টা করলেও, ভগবান মনু ব্রহ্মচর্য্য এবং নিষ্কাম ধর্ম্ম-সেবাকেই বিধবা নারীর শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য বলে' নির্দ্দেশ করেছেন। তাই রাজা রামমোহন রায় যখন এই নিষ্ঠুর নিয়ম উচ্ছেদ করবার জন্যে অস্ত্র ধারণ করলেন, তখন শাস্ত্রবিচার করে দেখিয়ে ত দিলেনই যে, একে ধর্ম্মের অনুশাসন-স্বরূপে মেনে নেওয়া চলে না—বরং এটি কাম্য কর্ম্ম বলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ আদর্শ নিষ্কাম-ধর্ম্ম-পালন, তাকে হীন করা হচ্ছে। স্বর্গলাভের লোভে পুণ্য-অনুষ্ঠান করলেও, তার মূল আদর্শটি খাটো হয়ে যায়। এই জন্যে রাজা বল-লেন অনুমরণ-প্রথা শুধু নিষ্ঠুর নয়, এতে জীবনের আদর্শ ছোট হচ্ছে—মানবমনের দৃষ্টি অসীমে প্রসারিত না হয়ে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হচ্ছে। এতে জীবনের মূল্য হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, মানব-আত্মার উন্নতির পথে অন্তরায় উপস্থিত করা হচ্ছে। জীবনের যে আদর্শ শ্রেষ্ঠতম, তাকে স্ত্রী পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান ও প্রাণবান করে রাখাই ধর্ম্মের অনু-শাসন আর সাধনা।

কাজের চেয়ে, যে মনোভাবের প্রেরণায় মানুষ কাজটি করে, সেই মনোভাবের শক্তি অনেক অধিক। কাজ বাহিরের প্রকাশ, নানা বাধা-বিপত্তিতে তা' খণ্ডিত আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়, চোখের উপর যা দেখি, মনের মধ্যে যা আছে তাকে হয়ত সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারে না। তবু মনোভাব যদি অব্যাহত থাকে—তবে মানুষের চেষ্টা কখনই ব্যর্থ হয় না—বারংবার খণ্ডিত হলেও একবার সে অখণ্ড মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়ই। রাজা রামমোহন ঐ যে প্রচার করলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম-ধর্ম্ম, আর স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সে ধর্ম্মের সমান অধিকারী, বেঁচে থাক্‌বার অধিকার কারো চেয়ে কারো কম নয়; বিধবা নারী মরণে পুণ্যতর লোকের অধিকারী হন, তার বেঁচে থাক্‌লে তিনি নিন্দনীয়, এ কথা একেবারে অস্বীকার করে শাস্ত্রপ্রমাণের সঙ্গে যখন দেখিয়ে দিলেন, জীবনের যেটি সবচেয়ে বড় জিনিস তা' পেতে হলে, উভয়কেই এক পথে চল্‌তে হয়—তখন নারীর জীবনের মূল্য কত বেড়ে গেল। দাঁড়াবার জায়গাটুকুও যার ছিল না, সে দেখলে পথ চল্‌বার অধিকারও তার আছে। এই সময় হতে আবার নূতন করে স্ত্রী-শিক্ষার সূত্র-পাত, স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী লোকের আবির্ভাব হয়। এক সময়ে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী; বিদুষী খনা, লীলাবতী; বীরনারী দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সংযুক্তা, জনা; সাধ্বী জানকী, গান্ধারী, সাবিত্রী যে গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন, একদিন তারাও সে মহনীয় স্থান অধিকার করতে পারবে এমন আশাও

মনে স্থান পেলে। আশাই জীবনকে রাখে, জীবনকে গতি দেয়, জীবনকে গড়ে তোলে; তাই আমরাও সম্মুখে চেয়ে আছি, ভারতের পূর্ব্বগৌরবের দিন যখন আবার ফিরে আসবে, তখন আমাদেরি মেয়েরা দেশের পুরুষের কাজের সহায় হবে, জীবনের পথে তা'দের অগ্রসর করে দুঃখ সাধনার দিনে তা'দিগকে উৎসাহিত করবে, তাদের জীবনের আদর্শকে কিছুতেই হীন হতে দেবে না, স্ত্রী স্বামীর, মাতা পুত্রের, ভগ্নী ভ্রাতার সাধনার পথে উত্তরসাধকের কাজ করতে পারবেন, সহায় হবেন, অন্তরায় কখনই হবেন না।

আজ আমাদের এই দেশে তর্পণের তিথি এসেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে, প্রতিদিন মন্ত্রোচ্চারণ করছি। শরতের আকাশে শারদ-শ্রী দেখা দিয়েছে—কোন্ সেই সুমেরুর সুদূর পথ হতে উত্তরের শিশির বাতাস বয়ে আসছে—এ যেন আমাদের পূর্ব্বগতদেরি-স্নিগ্ধ নিশ্বাস—ভরা নদীর গদগদ কণ্ঠে যেন শ্রাদ্ধের অপূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছেঃ—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে, ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্ হউক গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, ঊষা মধু হউক, দ্যুলোক ও ভূলোক মধুময় হউক, সূর্য্য মধুমান হউক, মাতা ও পিতা মধুময় মঙ্গলভাবের অনুকরণ করুন।

আমরাও আজ স্বর্গীয় রাজা রামমোহনের উদ্দেশে বলছি—ওঁ যস্মাদ্বাতি বাতোঽয়ং, সূর্য্যস্তপতি যস্মাৎ। যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে, স দেব স্ত্বাং প্রসীদতু॥ হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন, শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেব স্ত্বাং প্রসীদতু॥

আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তি।

(আধুনিক)

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, বার-এ্যাট-ল)

হিন্দুজাতি জীবন্মৃত হইলেও আজও জীবিত। প্রাচীন গ্রীস, রোম ও অ্যাথেন্স কোথায়? কোথায় ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া ও নিনেভা? কোথায় ঈজিপ্ট ও ইরান্? হায়! সে সব পুরাতন জাতির অস্তিত্ব-গৌরব আর নাই,—আর ভারত—সমসাময়িক ভারত,—এখনো পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনো জীবন্ত জাতির অভিব্যক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না,—তাই আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তিও এখনো অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে, শেষে কোথায় দাঁড়াইবে, কি প্রকার রূপ ধারণ করিবে, কে বলিতে পারে? অতএব আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তির ইতিহাসকে দুই ভাগ বা অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একটী ভাগ প্রাচীন আর একটী ভাগ আধুনিক। "ব্রাহ্ম"বিবাহে আর্য্যবিবাহের ইতিহাসের প্রাচীনাংশের পরিসমাপ্তি।

রোমকেরা যাহাকে বলিত ancestral sacra (অর্থাৎ worship of the dei parentum) বৈদিক ঋষিরা তাহাকে "পিতৃযজ্ঞ" বলিতেন। অধুনা "পিতৃযজ্ঞ" রূপান্তরিত হইয়া "শ্রাদ্ধে" পরিণত হইয়াছে। শ্রাদ্ধের মৌলিক অর্থও, ancestor-worship—"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে।" মৃত পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই শ্রাদ্ধ, তাহাই আধুনিক "পিতৃযজ্ঞ।" Ancestor-worship বা "শ্রাদ্ধের" প্রভাবে পরোক্ষভাবে সর্ব্বপ্রকার দুষণীয় বিবাহ-প্রথা একরকম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম-বিবাহই এক্ষণে সর্ব্ববর্ণের পক্ষে প্রশস্ত। কারণ, ব্রাহ্মোদ্বাহজাত সন্তানগণ ঊর্দ্ধ অধঃ একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করে অর্থাৎ "পুন্নামক * নরক" হইতে উদ্ধার করে। অন্যান্য বিবাহের সন্তান অপেক্ষা এই বিবাহের সন্তানেরা maximum number of ancestors and descendants বা অধিকতম সংখ্যক ঊর্দ্ধ-অধস্তন পুরুষকে উদ্ধার

---

* "পুন্নামনরকাৎ ত্রায়তে "পুত্ত্র"ইত্যুচ্যতে"—"পুত্ত্র"কে double "ত" দিয়ে "পুন্নামনরকে"র ত্রাণকর্ত্তা স্বরূপ দাড় করান হইয়াছে। double 'ত' না দিলে "ত্রায়তে" অর্থাৎ ত্রাণ কার্য্য কেমন করিয়া হইবে? Etymologically "পুত্র" শব্দের single'ত'হওয়া চাই,যাস্কতে single 'ত'ই আছে) Double 'ত' টা "Pious forgery" বা "ধর্ম্ম-জাল" ছাড়া আর কিছুই নহে। "পুন্নামক নরকের" কথাটা কোন রকমে আনা চাই, তাই "পুত্র"কে "পুত্ত্র" করা হইয়াছে। আর একটা প্রমাণ—ঋগ্বেদে 'নরক' নাই—একুশটা নরক পৌরাণিক যুগে কল্পিত হইয়াছিল। দুষ্ট বালককে যেমন 'জুজুর' ভয় দেখাইয়া শান্ত করা হয়, ভয়াবহ নরক সকল কল্পিত করিয়া অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন সাধারণ হিন্দুদিগকে তেমনি ধর্ম্মপথে রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই একই কারণে "রাজদণ্ড" অর্থাৎ রাজনৈতিক দণ্ডও কতকটা "প্রায়শ্চিত্ত" দণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঋষিরা optimists ছিলেন, তাঁহারা নরকের ধার ধারিতেন না। যমলোককেই স্বর্গ (Elysium) মনে করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে একটা চুক্তি বা রফা করিয়া লইতেন—তাঁহাদের সোমরস বা সুরা দিতেন ও নিজেরাও খেতেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে দেবতারা তাঁহাদের শত্রুনাশ করিতে সহায়তা করিতেন, স্ত্রী গরু পুত্র দাস দাসী ধন ও শত বৎসর আয়ুও দান করিতেন।

করে। এ ছাড়া, আবার ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যা দান করিলে কন্যাদাতার স্বর্গ লাভ হইবার সম্ভাবনা; এই বিবাহের এই মন্ত্রটীই তাহার প্রমাণ—"কন্যাং কনকসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং দাস্যামি বিষ্ণবে তুভ্যং ব্রহ্মলোকজিগীষয়া।" "ঔদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী"—অতএব ব্রাহ্মবিবাহ "দ্বিজাতি"দিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগেরই monopoly বা একচেটে ছিল। মনুর সময়ে এই বিবাহের একটা qualification বা কড়ার দাঁড় করান হইয়াছিল—"শ্রুতশীলবতে দানং কন্যায়াঃ" (মনু ৩।২৭); বেদজ্ঞ ব্যক্তিই এই বিবাহ প্রথা দ্বারা দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন। অতএব বেদপাঠে অনধিকার হেতু শূদ্রেরা ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিত না, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগের jus connubium বা ধর্ম্মবিবাহ করিবার অধিকারও একরকম ছিল না। ধর্ম্মবিবাহের স্ত্রীই প্রকৃত পত্নীবাচ্যা।

মনূক্ত qualification "শ্রুতশীলবতে দানং কন্যায়া" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় দৃষ্ট হয় না—শূদ্রদিগের এই "সুবর্ণ-সুযোগ"—অতএব উচ্চবর্ণের অনুকরণেচ্ছু সৎশূদ্রেরা ব্রাহ্মোদ্বাহ-প্রথা অবলম্বন করিতে লাগিল। আজকাল (তদ্‌বিপরীতে প্রমাণ না থাকিলে) সর্ব্ববর্ণের বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া primafacie presumption রূপে পরিগৃহীত হইবে।

স্ত্রীধন কাহার প্রাপ্য কাহার অপ্রাপ্য, তন্নির্ণয়ার্থই আর্য্যব্যবহারশাস্ত্র বা হিন্দু-আইন মন্বনুমোদিত আট প্রকার বিবাহ স্বীকার করে, যেহেতু বিবাহভেদে স্ত্রীধনের স্বামিত্বভেদও হয়। এতদ্দারা ইহা প্রমাণ হইতেছে না, যে এই শাস্ত্রোক্ত আট প্রকার বিবাহের অতিরিক্ত অন্য কোন বিবাহ-প্রথা স্বীকৃত হইবে না। মনু বলেন "আচারো পরমো ধর্ম্মঃ", অর্থাৎ "clear proof of custom overrides the written text of the law"; * দেশ কালজাতিবিশেষে আচারেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এইরূপে হয় বলিয়াই মান্ধাতার আইনেরও উন্নতির আশা করা যাইতে পারে—custom *harmonizes the dead law with the living practice.*

ভারতযুদ্ধের পর অভিজাত রাজন্যবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়াতে নানা বৈদেশিক জাতিরা পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল—শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ, পারসীক, বাহ্লীক, হূন প্রভৃতি নানা জাতির উল্লেখ "মুদ্রারাক্ষসে" দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সব বৈদেশিক জাতির ঘাত-প্রতিঘাতে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও আচারেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল—মহাভারতে ভারতযুদ্ধের যোদ্ধাদিগের তালিকার ন্যায় "দশকুমারচরিতে" এইসব অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সেইরূপ লম্বা-চৌড়া একটী তালিকা প্রদত্ত আছে। ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলামীধর্ম্ম ও খৃষ্টানীধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে কাহার কাহার মতিগতি-ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইহারা কতকটা আর্য্যাচার কতকটা বৌদ্ধ, মুসলমানী বা খৃষ্টানী আচার ও ধর্ম্ম অবলম্বন করিল—বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিকালে তান্ত্রিক-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল—মুসলমানধর্ম্মের প্রভাবে শিখ-সম্প্রদায় ও খৃষ্টান ধর্ম্মের সংস্পর্শে ব্রাহ্মসমাজ, বিশেষত, নববিধান-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

বাহাত্তর সালের তিন আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মাননীয় ষ্টিফেন সাহেব বঙ্গব্যবস্থাসভায় ব্রাহ্মসমাজ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

"It (the Brahmo Samaj) is interesting on many accounts; but, above all, because Brahmoism is at once the most European of Native religions, and the most living of all Native versions of European religion. The orginal founder of the Brahmo body was the well-known Ram Mohun Roy, who founded the sect about forty years ago. Since that time the Brahmos have divided themselves into two bodies, the Adi Brahmo samaj, or the Conservative Brahmos and the [Keshobites or the] Progressive Brahmos The Progressive Brahmos have broken far more decisively with Hinduism than the Conservatives.

অর্থাৎ 'একাধিক বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে, বিশেষতঃ এক বিষয়ে তো করেই—ব্রাহ্মধর্ম্ম একাধারে দেশীয় ধর্ম্মসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় ভাবাপন্ন এবং ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা জীবন্ত দেশীয় ইউরোপীয় সংস্করণ। ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনকর্ত্তা হচ্ছেন সুবিখ্যাত রামমোহন রায়। তিনি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মেরা দুই দলে বিভক্ত হইলেন—আদিব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও কৈশব বা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম;"উন্নতিশীল" ব্রাহ্মগণ "রক্ষণশীল" ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা হিন্দুদিগের সহিত অনেক বেশী পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন।

* এই কথা স্থিরতর থাকিলে সহমরণ অন্যায় প্রথা উঠাইতে পারা যাইত না। ভং সং।

শিখ-সম্প্রদায় মুসলমানধর্ম্ম-প্রভাবে সংস্থাপিত—শিখেরা সর্ব্বজাতিকে তাহাদের দলভুক্ত করিতে পারে। স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ খানিকটা শিখদিগের অনুকরণে খানিকটা বৈদিক সমাজের আদর্শে গঠিত। আর্য্যসমাজ ও শিখদের ন্যায় সর্ব্বজাতিকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া গ্রহণ করে। আর্য্যসমাজ ভারতের একটী বিশেষ ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়। আর্য্যসমাজের লোকসংগ্রহের অন্যতর প্রধান কারণ ইহার বেদমূলকত্ব। বৈদিক কালে ঋষিরা "ব্রাত্যস্তোম" দ্বারা নানা জাতিকে আর্য্যমণ্ডলীর ভিতর গ্রহণ করিতেন। আর্য্যসমাজীরা বেদের দোহাই দিয়া আর্য্য ঋষিদিগের পদানুসরণ করিতেছেন। আর্য্য শব্দও গৌরব-সূচক। আর্য্যধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সর্ব্বধর্ম্মই progressive অর্থাৎ সকল ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী।

বলা বাহুল্য, এই সব দশ আনা পরধর্ম্মী ও ছয় আনা স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি ষোল আনা খাঁটি হিন্দু আইন প্রযুক্ত হইতে পারে না। তথাপি যতদূর সাধ্য ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণ এই অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটা উদাহরণ দি। Kutchee Memon প্রভৃতি জাতিরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের সহিত মুসলমান আইন বা ব্যবহার শাস্ত্র গ্রহণ করিল না। হিন্দু আইন দ্বারা তাহাদের উত্তরাধিকারিতা ও সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাস্বত্ব নির্ণীত হইতে লাগিল। Kutchee Memonদের বিবাহ মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হয়। মনুক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনটাতে ইহা আসিতে পারে না। অথচ হিন্দু আইন দ্বারা স্ত্রীধনাদি নির্ণীত হওয়া চাই। এরূপ অবস্থায়—কি কর্ত্তব্য? ব্রাহ্মাদি বিবাহ হইলে স্ত্রীধনের devolution বা উত্তরাধিকারিতা একরূপ, পৈশাচাদি বিবাহের devolution বা উত্তরাধিকারিতা অন্যরূপ—বিবাহভেদে স্ত্রীধনের অধিকারির ভেদ হইয়া থাকে। Kutchee Memonদের বিবাহ হিন্দু ধর্ম্ম-সম্মত না হইলেও, হিন্দু বিবাহে যাহা শাস্ত্রে দোষণীয় বলা হইয়াছে (যথা শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বিক্রয় করা ইত্যাদি) সে সব দোষ হইতে শূন্য (অর্থাৎ free from all that is reprehensible) এবং ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, Kutchee Memonদিগের মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে বিবাহ হয় তাহাও ব্রাহ্মবিবাহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। অতএব ব্রাহ্মবিবাহে স্ত্রীধনের যেরূপ devolution বা গতি হইবে, Kutchee Memonদেরও ব্রাহ্মসদৃশ বিবাহে স্ত্রীধনের devolution বা গতি সেইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ—"It is the quality and not the form of marriage that decides the course of devoltion. ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণের এই সিদ্ধান্ত। পিছনে দশ আনা বিলাতী ফ্যাসানে, সম্মুখে ছয় আনা দেশী ফ্যাসানে চুল কাটার মত দশ আনা reformed বা heterodox ও ছয় আনা orthodox ভারতবাসীদিগের প্রতি ষোলআনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ হিন্দু আইন প্রযুজ্য নহে—তাই ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণগণ পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি বা শাস্ত্রের অনুস্বার বিসর্গ সমেত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগের স্বত্বাস্বত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া সময়ে সময়ে হাস্যাস্পদমাত্র হয়েন। সম্পূর্ণ orthodox হিন্দু আইন শাস্ত্র প্রযুজ্য নয় বলিয়াই the English Rule of Justice, Equity and Good conscience প্রয়োগ করিবার ও তৎসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রের উদার ব্যাখ্যার ব্যবস্থা চালাইবারও কোন ব্যাঘাত নাই।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আদিব্রাহ্মসমাজ মেডিকেল মিসনের শাখারূপে বোম্বাই অঞ্চলে ধারবার নামক স্থানে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল মিসন স্থাপিত হইয়াছে। এখানে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে হোমিওপাথিক ঔষধ বিতরণ করা হয়। গত জুলাই মাসে যখন এখানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিক প্রথম আরম্ভ হয় তখন এই মিসন হইতে প্রায় ৬০ জন উক্ত রোগাক্রান্ত রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করে। বর্ত্তমান দ্বিতীয় এপিডেমিকে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে এই মিসনটি ক্রমেই জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হয় তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। এই মিসনের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই মিসন দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক শনিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ ও সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। বন্ধুগণ যথাসময়ে উৎসবে যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

বেহালা, ১৮৪০ শক,
১লা কার্ত্তিক।

শ্রীনীলকান্ত মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে]	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ) (পুনর্মুদ্রিত হইতেছে)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ধর্ম্মোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত)	৶০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	⁄০
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	⁄০
Trust Deed	⁄০
শ্রেয় ও প্রেয়	⁄০
মাতৃপূজা	⁄০
অকারণ নিরাশা	⁄০
আদি ব্রাহ্মসমাজের সবলতা ও দুর্ব্বলতা	⁄০
আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবনা	⁄০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄০
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	,, 1 ,,
The Theist's Prayer Book	,, 1 ,,
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৲

	পূর্ণ মূল্য।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. ,, 4 ,,
Adi Samaj as a Church	,, 4 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	,, 4 ,,
TheDoctrine of Christian Resurrection	,, 2 ,,

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত

রাজা হরিশ্চন্দ্র ,,	॥০
আঁখিজল ,,	॥০
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১।০
ওঁ পিতা নোঽসি	॥০
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	॥০
বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	⁄০
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	॥০

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

সত্যসুন্দর মঙ্গল	১৲
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	॥০

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	⁄০

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১।০

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত

সনেট পঞ্চাশৎ	॥০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

আমার খাতা	৸০
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸০

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীত পরিচয়	।৶০

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত মঞ্জুরী	৫৲

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

Life of Dwarka N. Tagore	।০

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। — আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

পুনা
গোদাবরী নদী
তেলুগু দেশ
মান্দ্রাজ
কালিকট
তামিল দেশ
লঙ্কা
কর্ণাটের
মানচিত্র।
কর্ণাটের বর্ত্তমান সীমা

K. P. B.

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সত্যধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম।

বর্ত্তমান যুগে বাহিরে বাহিরে দেখিলে হতাশা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে চাহে বটে যে জনসাধারণ বুঝি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপযোগিতা উপলব্ধি করে না। মনে হয় বটে যে, প্রত্যেক মনুষ্যই যেন একটী-না-একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে থাকিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ করে, শান্তি অনুভব করে। মনের ভিতরে তখন এই সংশয়ও আসে বটে যে, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া লাভ কি? এই সংশয় অমূলক—আমাদের হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখা যায় না। একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বর্ত্তমান যুগের অন্যতর প্রধান লক্ষণই হইল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অনুসন্ধান। তবু যে জনসাধারণ সাম্প্রদায়িকতার ভিতরে থাকিয়া তৃপ্তি লাভ করে, শান্তি অনুভব করে, তাহার কারণ অন্যায় বিভীষিকা ও আলস্য। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আপন সম্প্রদায়ের পাঁচজনে যেরূপ চলিবে সেইমত অনুষ্ঠানাদি করিলেই আর কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না; পাঁচজনে জানিল যে তুমি তাহাদিগের ধর্ম্মমত স্বীকার কর এবং তুমিও আপনাকে প্রবোধ দিলে যে তুমি যথাযুক্ত ধর্ম্মচর্চ্চা কর; তোমার হৃদয়ে সত্য সত্য ধর্ম্মের অধিষ্ঠান হইল কি না, সে কথা না তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, না তুমি নিজে, অনুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ করিলে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের, ধর্ম্মের বহিরাবরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভগবানের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে, আত্মনির্ভর অবলম্বন করিতে হইবে, সাধনা করিতে হইবে। তুমি অপর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন কর বা না কর, তাহা অবান্তর কথা। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী অন্যের নিকটে হৌক বা না হৌক, অন্তত নিজের কাছে হিসাব নিকাশ দিতে দায়ী যে, প্রকৃত ধর্ম্মের কতটুকু তিনি আত্মস্থ করিয়া লইতে পারিলেন; বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মাত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের সাধনায় তিনি কতদূর অগ্রসর হইলেন। এখানে গতানুগতিকতার স্থান নাই, আলস্যের অবসর নাই। এই যে ধর্ম্মসাধনার ফলে বিশ্রামের অভাব হইবে, এই বিভীষিকা এবং তদনুষঙ্গী আলস্যের প্রতি পক্ষপাতই প্রধানত জনসাধারণকে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে পশ্চাৎপদ রাখে।

ধর্ম্মের বহিরাবরণ মানুষের প্রস্তুত, কিন্তু প্রকৃত সত্যধর্ম্ম ভগবৎপ্রেরিত। সুখসম্পদের উত্তাপের ভিতর দিয়া, বিপদ আপদের উর্ব্বর ভূমি ভেদ করিয়া, শোকসন্তাপের শান্তিধারা লাভ করিয়া এই অন্তর্নিহিত সত্যধর্ম্ম মানবহৃদয়ে অভি-

ব্যক্ত হইতে থাকে। এই অভিব্যক্তির আবেগ উপস্থিত হইলে প্রাণের পুরাতন স্তরগুলি একে একে খসিয়া গিয়া নবনব স্তরের জন্মদান করে। সেই আবেগের সম্মুখে কোন বাধাই দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ আবেগের বশেই স্মৃতির অতীত পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সাধকমাত্রেই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ নিবন্ধ করিয়াছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ যোগমূলক অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কেবল এই ভারতবর্ষের সাধকগণ নহে, জগতের বিভিন্ন দেশের সাধকগণও সাধনার ফলে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের একই উন্নতক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন দেখা যায়। পারস্যবাসী জনৈক সাধক (জালাল উদ্দিন) তাঁহার এক উক্তিতে আমাদেরই প্রাণের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"যাঁহার মহিমা চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিত হয় তিনি যখন একমাত্র অদ্বিতীয়, তখন ধর্ম্মও প্রকৃত পক্ষে এক ও অভিন্ন।"

অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই মিলনের ভিত্তিভূমি। এই সত্যধর্ম্ম এক ও অভিন্ন বলিয়া, ইহার অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলনেরও ভাব অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। এই সত্যধর্ম্ম ভগবানের স্বরূপ নবতর মূর্ত্তিতে, মহত্তর মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মানব পুরাতন জীর্ণ সংস্কারসমূহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে, সকল মিলনের মূল ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগের পথে আপনাকে পরিচালিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। তাই আমরা বলিতে চাহি যে বর্ত্তমান যুগ মিলনের যুগ। আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্তমান যুগে সত্যধর্ম্মের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, মিলনের ভাব অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যাহা কিছু, সকলই ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই যে প্রাচীন কালের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসমূহের অনেক প্রথা, অনেক আচার ব্যবহার, অনেক অনুষ্ঠান সমাজরক্ষার জন্য প্রকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে সেগুলি যথাসময়ে সমাজরক্ষার উপযোগী হইলেও পরিণামে তাহাদের অনেকগুলি সমাজকে নানা প্রকারে বিভক্ত করিতে করিতে ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিতেছিল। বর্ত্তমান যুগে আমরা যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহি না—আমরা আর সে 'শতধাবিভক্তের' বিভাগ চাহি না। আমরা চাহি মিলন—একতা; আমরা চাহি, সকলেরই হৃদয়ে একই ভাব ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। পুরাকালের ন্যায় মতভেদের কারণে আমরা ধর্ম্মের নামে অভিশাপ প্রদানে আর অগ্রসর হইব না; তদ্বিপরীতে আমাদের সহিত একমত বা ভিন্নমত, সকলেরই মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের প্রার্থনা জাগাইয়া তুলিব। এই যে এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ নরহত্যা হইতেছে—আপাতত মনে হইতেছে বটে যে বিরোধ বিবাদ মূর্ত্তিমান হইয়া মৃত্যুর হস্ত ধারণ করিয়া জগতসংসারে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু এই মহাবিবাদ, এই মহামৃত্যুর ভিতর দিয়াও যে এক মহামিলনের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। মহাসমরের গগনভেদী অবিশ্রাম কামানগর্জ্জনও ভেদ করিয়া মহামিলনের আনন্দসঙ্গীত আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা যে, এই মহামৃত্যুর সমক্ষেই হৃদয়ের শান্তিপ্রদ অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ স্পষ্টতররূপে উপলব্ধ হইতেছে।

এই মহামিলনের যুগে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম আপনাকে সাম্প্রদায়িকতার সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেই না। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই এখন আর এ কথা বলিতে সাহস করে না যে, সেই ধর্ম্মই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এখন প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই আপনাপন গণ্ডীর সীমা বিস্তৃত করিতে করিতে উদারতর ধর্ম্মের সহিত বিলীন হইতে চাহে। প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নিজ নিজ গণ্ডীর উপরে উঠিয়া এখন বিশ্বমানবের জ্ঞানের উপর প্রেমের উপর আপনাকে দাঁড় করাইতে চাহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব বিশ্বাস মতামত প্রভৃতির স্থানে এখন এক বৃহত্তর মানবধর্ম্ম আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। জগদ্ব্যাপী যে সকল মহাধর্ম্মের শিষ্যসংখ্যা অগণিত, সেই সকল মহাধর্ম্মও আজ আপনাদিগকে মানবের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ঐ বৃহত্তম সত্যধর্ম্মের একদেশ-

মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। যে ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম মানবজাতির ধর্ম্ম, মহা-ধর্ম্মের নেতাগণ আজ সেই ধর্ম্মকেই নিজেদের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Schiller) বলিয়াছেন—"কোন্ ধর্ম্ম আমি স্বীকার করি? তোমরা যে সকল ধর্ম্মের নাম করিবে, তাহাদের কোনটাই আমার ধর্ম্ম নহে। কেন নহে? কারণ আমি ধর্ম্মেরই।" সকল ধর্ম্মের ভিতর যে সার ধর্ম্ম, তাহাই এখন সকলে রাখিতে চাহে, ধরিতে চাহে এবং সেই সার ধর্ম্মকেই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে চাহে। বর্ত্তমান যুগে ব্যবসায় বাণিজ্য বল, রাজনীতি বল, এমন কি বিরোধ বিবাদ সমস্তই নিজ নিজ দেশের, নিজ নিজ জাতির, নিজ নিজ অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক ভাব ধারণ করিবার অভিমুখে চলিয়াছে, কেবল ধর্ম্মই কি একমাত্র স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা এই অসাম্প্রদায়িক সত্য-ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভিত্তি এই চিরসত্য যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি দেশ-কাল অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে।" এই মহাসত্য কোন প্রকার সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে—আবদ্ধ হইতেই পারে না। জগতের সকল ধর্ম্মই এই চিরসত্যের অভিমুখীন হইয়া চলিয়াছে।

কে বলে যে জনসাধারণের পক্ষে এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ধারণ করা সহজ বা সম্ভব নহে? সেই সত্যধর্ম্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক হইলেও এ কথা বলা ঠিক নহে যে সেই সত্যধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব। অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মকে তো আর নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে না—উহা যে প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে সহজরূপে নিহিত রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেখিলে, মানবত্বের দিক দিয়া দেখিলে দেখিব যে সকল মানুষই বস্তুত এক। মানবত্ব প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে অবিনশ্বর ধর্ম্মরূপে জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে আশা-তৃপ্তির বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃত মানবধর্ম্মের উৎসসকল মানবপ্রকৃতিরই অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত। সেই ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ স্রোত জীবনের প্রথম প্রভাতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবপ্রকৃতিকে সিক্ত রাখিয়াছে।

এই সত্য মানবধর্ম্মের উৎসসকল চিরনূতন। এই চিরনূতন উৎসসকল হইতে সেই সত্যধর্ম্ম প্রত্যেক মানবের জন্মাবধি প্রত্যেক মুহূর্ত্তের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নব নব আকারে দেখা দেয়। আলোচনা করিয়া যখন মানবসৃষ্টির মূল খুঁজিয়া পাই না এবং তাহার অভিব্যক্তির শেষও দেখিতে পাই না এবং যখন দেখি যে কোন মানবই অসম্বদ্ধ-ভাবে জন্মগ্রহণ করে না—জগতের বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রতিমানবের সঙ্গে সম্বন্ধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে; যখন দেখি যে কোন মানবই কেবল নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকে না, প্রত্যুত তাহার মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জগতের প্রত্যেক অধিবাসীর এবং জগতের প্রত্যেক অধিবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তাহার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তখন মানবসৃষ্টির আদি হইতে মানবের অন্তর্নিহিত সেই সত্যধর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বাক্য ও মন প্রতিনিবৃত্ত হয়। সেই সত্য মানবধর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে, কারণ মানবের উপরে অনন্ত, মানবের নিম্নে অনন্ত; মানবের বামে অনন্ত, মানবের দক্ষিণে অনন্ত। যে মানব এইরূপে নিজের অগ্রে পশ্চাতে সর্ব্বত্র অনন্তকে দর্শন করেন, তিনিই অমৃতসাগরে অব-গাহন করেন। মানব এখন বুঝিয়াছে যে, আত্মার অন্তরে স্থান ও কালের অতীত, বিভিন্ন অবস্থার অতীত যে সত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়, তাহাই একমাত্র ধর্ম্ম; ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু ধর্ম্মের নামে অভিহিত হয়, সেগুলি ধর্ম্ম নহে, উপধর্ম্ম মাত্র।

অনেকের মত এই যে, স্থান, কাল ও অবস্থার বিভিন্নপ্রকার সমাবেশ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ কথা নিতান্তই ভুল। এ প্রকার সমা-বেশ হইতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আচার ব্যবহার প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাবরণসমূহের উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু মানবসাধারণের অন্ত-র্নিহিত একটী সাধারণ ধর্ম্মের অস্তিত্ব আসিতে

পারিত না। স্থান প্রভৃতির বিভিন্ন সমাবেশের ফলেই যদি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইত, তবে সকল ধর্ম্মের ভিতর একটা মহান একত্ব আসে কোথা হইতে? আসল কথা এই যে, সত্যধর্ম্ম স্থান প্রভৃতি সকল বিষয়ের সর্ব্বপ্রকার সমাবেশের অতীত, কারণ ইহা ধর্ম্মপ্রবর্তক পরমাত্মা হইতে মানবাত্মায় নামিয়া আসিয়াছে। তাই মানবাত্মাই এই সত্যধর্ম্মের উৎস। এই উৎস হইতে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপোষক ভাবসকল, পরমাত্মার সহিত অক্ষয় যোগ-সাধক ভাবসকল নিয়তই উৎসারিত হইতে থাকে।

এই সত্যধর্ম্ম যেমন সমগ্র মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, ইহা তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব। প্রত্যেক মানবাত্মার অন্তরে অনন্তস্বরূপকে স্পর্শ করিবার যে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহারই ভিতর দিয়া ধর্ম্ম প্রধানত বিকাসিত হইতে থাকে। ধর্ম্মের নামে যে সকল বিভিন্ন পন্থা উঠিয়াছে, সেগুলি পন্থামাত্র, সেগুলি আসলে সত্যধর্ম্ম নহে—সত্যধর্ম্ম একই। মানবের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা হইতে যে ধর্ম্মের পরিচয় পাই, সেই ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। পন্থা সকল তর্কবিতর্কের আশ্রয়-স্থান মাত্র—এক পন্থা অপর পন্থার সত্যভাব সকলও স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের মূল লক্ষণই হইল প্রত্যেক মানবের স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইবার অধিকার ও কর্ত্তব্য স্বীকার করা। অনুষ্ঠান, পুরাণকাহিনী প্রভৃতি যে সকল বিষয় ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হয়, সেই সকল বিষয় হইতে পৃথক করিয়া আমরা যখন ভগবৎপ্রদত্ত ধর্ম্মকে আত্মার জীবন বলিয়া উপলব্ধি করি, তখনই আমরা সত্যই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে অবলম্বন করি।

একনিষ্ঠ সাধকগণ ধর্ম্মের যে সকল তত্ত্ব "দৃষ্টি" করিয়া প্রকাশ করেন, সে গুলিকে আমরা নিশ্চয়ই উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিতে পারি না। সেই সকল তত্ত্বই তো তাঁহাদের পরমাত্মাকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা। সেই সকল তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরাও আমাদের আত্মনিহিত ধর্ম্মের বাণী শুনিতে পাই। কিন্তু একটী কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, সেই সকল সাধক তাঁহাদের "দৃষ্ট" সত্য সকল নিজ নিজ অবস্থা, ভাষা প্রভৃতির সীমার ভিতর দিয়াই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরে কালসহকারে যখন তাঁহাদের অবস্থা তাঁহাদের ভাষা আমাদের দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে, যখন আমরা তাঁহাদের ভাষা প্রভৃতি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন তাঁহাদের প্রচারিত সত্য-সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সত্য যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই ভাষাকে জপমন্ত্ররূপে এবং যে অবস্থার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই অবস্থাকে অনুষ্ঠানরূপে উত্তরাধিকার-সূত্রে আঁকড়াইয়া ধরি; অভ্যাসবশত সেই সকল ধর্ম্মের বহিরাবরণই আমাদের প্রিয়তম হইয়া উঠে। জনসাধারণ নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকে এবং ঐ সকল বহিরাবরণ যথাযথ অভ্যাস করিবার অবসর পায় না বলিয়া, সেই সকল বহিরাবরণ নিয়মিত অভ্যাস করিয়া নির্ভুলভাবে অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করিবার জন্য এবং নিজ নিজ বিবেচনামত জনসাধারণকে সেগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য মধ্যবর্ত্তী, অভ্রান্ত গুরু প্রভৃতির আবির্ভাব আবশ্যক হয়। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভগবান ও মানবের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী বা অভ্রান্ত গুরু বলিয়া কোন কিছু দাঁড়াইতে পারে না। ভগবানই একমাত্র আমাদের লক্ষ্য এবং তিনিই একমাত্র আমাদের মধ্যবর্ত্তী ও অভ্রান্ত গুরু। তাঁহাকে আত্মাতে উপলব্ধি করিলে, তাঁহার স্বরূপ অন্তরে দেখিলে এবং তাঁহার বাণী অন্তরে শুনিলে অপর কোন কিছুকেই মধ্যবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়োজনই হইবে না। তখন আমরা তাঁহাকেই ডাকিয়া বলিব —নাথহে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও। বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইবে, সকলেরই ভিতরে আমরা ধর্ম্মের অক্ষুণ্ন সম্বন্ধ দেখিতেছি। যে কোন বিষয়ের যে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইবে, সে সমস্তই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কেন্দ্র হইতে দেখিব। এই দৃষ্টি আমাদের আত্মাতে নিবদ্ধ। তাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম একটা কাল্পনিক বস্তু নহে—ইহা সত্যবস্তু। ধর্ম্মবক্তা, শাস্ত্র প্রভৃতি কোন কিছু দ্বারাই ইহাকে সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। চারিদিকে সত্যধর্ম্মবিষয়ক যে সকল ভাব জাগ্রত

দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে সমগ্র জগতে সত্যধর্ম্মের একটা মহাজাগরণ াবর্ত্তী।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের ভিতর দিয়াও এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন ঐতিহাসিকগণ বুঝিয়াছেন যে, কোন একটী-মাত্র ধর্ম্ম আলোচনা করিলেই ধর্ম্মের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে গেলে সকল খণ্ডধর্ম্মই আলোচনা করিতে হইবে। সমীক্ষিত-ধর্ম্ম বা comparative religion সমস্ত ক্ষেত্র দেখিয়া বিভিন্নাকৃতি খণ্ড-ধর্ম্মসমূহকে একই মূল সত্যধর্ম্মের বিভিন্ন ধারা বলিয়া গ্রহণ করে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ধর্ম্মবক্তাগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের ইতিহাসের উপর দাঁড়াইয়া তাহারই সত্যতা প্রমাণে এবং অপর ধর্ম্মগুলিকে মিথ্যাপ্রমাণে নিযুক্ত থাকিতেন। এখন আমরা কোন ধর্ম্মকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি যে, সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সকল ধর্ম্মের সারধর্ম্ম জগতে শান্তিধারা ঢালিবার জন্য ধীরে ধীরে আপনার মূর্ত্তি প্রকট করিতেছেন। আমরা যেমন কোন ধর্ম্মকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না, তেমনি যতই কেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও ভক্তসংখ্যা-পরিপুষ্ট হউক না, পূর্ব্বতন কোন ধর্ম্মকেই আমরা অভ্রান্ত ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি না। ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ইতিহাসের অতিরিক্ত স্থানে প্রকৃত ধর্ম্মের উৎপত্তি। ইতিহাসের ভিতরে ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা আত্মাতে আসিয়াই উপনীত হই। দেখি যে, জগতের জীবন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে এবং মানবের জাগ্রত আত্মাতে জাগ্রত দেবতা ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমরা বুঝিতে পারি যে, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল বহিরাবরণ লইয়া থাকিলে চলিবে না, সারবস্তু সত্যধর্ম্মকে আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। বিশ্বমানবের আত্মার অন্তরে সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পবিত্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই প্রকারে ইতিহাসের ভিতর দিয়াও আমরা জানিতেছি যে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আমাদের কল্পনামাত্র নহে, কিন্তু সারসত্য বস্তু।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম প্রত্যেক মানবের নিজস্ব ও মানবজাতির সাধারণ ও সহজ ধর্ম্ম, তবে জনসাধারণ সেই সত্য-ধর্ম্মের অনুগামী হয় না কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার দুইটী প্রধান কারণ হইতেছে—সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিলে যে সাধনা করিতে হইবে, যে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার বিভীষিকা এবং জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জ্জনে যে পরিশ্রম আবশ্যক হইবে তৎপ্রতি আলস্য। এই দুইটী ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে—তাহা স্বার্থ। যাঁহারা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা একবার স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া এই সত্যধর্ম্মের পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইতে অগ্রসর হউন, এবং দেখুন যে জনসাধারণ এই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অকুতোভয়ে গ্রহণ করে কি না। যাঁহারা স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া সত্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে সেই সত্য ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন, তাঁহারাও তখন ছুটিয়া আসিয়া সত্যধর্ম্মীগণের সহিত মিলিত হইবেন। ক্রমে ধীরে ধীরে খণ্ডধর্ম্মের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হ্রাস হইবে এবং সেই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই নানা আকারে প্রকারে আমাদের ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবে। তখন জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে খণ্ডধর্ম্মের অন্ধকার দাঁড়াইতে পারিবে না। খণ্ডধর্ম্ম সকল ক্রমে অখণ্ড সারধর্ম্মেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। খণ্ডধর্ম্ম সমূহকে সহসা বিধ্বস্ত করা সংহার করা আমাদের কার্য্য নহে—তাহাদের অন্তর হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে অখণ্ড সারধর্ম্মকে বাহির করিয়া তাহার ভাস্বর জ্যোতি জগতের সম্মুখে ধারণ করাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ধর্ম্মের বহিরাবরণ যে কি প্রকারে সত্যধর্ম্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই আমাদের প্রকাশ করিতে হইবে। এই প্রকারে জনসাধারণের হৃদয় হইতে নানাবিধ অন্ধকার দূর করিতে পারিলেই জনসাধারণ সত্যধর্ম্মের পথিক না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

অতিপ্রাকৃতের প্রতি অযথা আকর্ষণও যে জনসাধারণের সত্যধর্ম্ম গ্রহণের অন্তরায়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অতিপ্রাকৃত বলিয়া

সত্য সত্তা কিছুই নাই—প্রত্যেক ঘটনাই যে প্রকৃতির নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। কেবল আমরা যে ঘটনাকে কোন নিয়মের দ্বারা বুঝাইতে পারি না, বা কি নিয়মে সেই ঘটনা ঘটিল বুঝিতে পারি না, তাহাকেই আমরা অতিপ্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লই। অতিপ্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ অন্যায় নহে—তাহাই সময়ে সময়ে সত্যধর্ম্মের সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু অযথা আকর্ষণ আবার আমাদের মতকে পরাধীনতার বদ্ধ বাতাসে নিমগ্ন রাখিয়া সেই স্বাধীন পুরুষ পরমাত্মা হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়। কোন সাধক কোন একটী বিষয়ে অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলেই আমরা এতই মোহমুগ্ধ হইয়া যাই যে সেই বিকৃত দৃষ্টির দোষে তাঁহার অন্যান্য তত্ত্ববিষয়ক ভ্রান্তিও দেখিতে পাই না—তাঁহার ভ্রমকে আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। এই প্রকারে বিভিন্ন সাধকের অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি অযথা আকর্ষণজনিত পরাধীনতাই মানবসমাজকে বিভাগের পথে অগ্রসর করে। স্বাধীনভাবে প্রকৃতির কার্য্যে নিয়মের সুশৃঙ্খলা দেখিবার চেষ্টা করিলেই তাহার ভিতর একই সত্যের একই ধর্ম্মের কার্য্য দেখিতে পাইব। জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইলে খণ্ডধর্ম্মসকল আর আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তখন ভগবৎপ্রবর্ত্তিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সনাতন ধর্ম্মই আমাদিগকে মহামিলনের পথে লইয়া চলিবে। ঈশ্বরকে এইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিলে কথায় কথায় আর তাঁহার রূপকল্পনার কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশ মিলন চাহিতেছে। অসাম্প্রদায়িক সত্য মানবধর্ম্মকে অবলম্বন করা ব্যতীত প্রকৃত মিলন হওয়া অসম্ভব। অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগের কথা ঘোষণা করিয়া মহামিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মঘোষিত চিরন্তন সত্য যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে", তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রত্যেককে ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। আলস্য পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা ও স্বার্থকে পদদলিত করিয়া এই পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যধর্ম্ম একই ভাবে বসিয়া থাকিবার ধর্ম্ম নহে—তাহা ঈশ্বরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহারই এই জগৎসংসারের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা আকারে প্রকারে অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে।

সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণ যখন এই অবিনশ্বর সত্যধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে একহৃদয় হইয়া উঠিবে, তখন সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কোন অবান্তর বিষয়ে একতার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তখন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিব যে আমরা আমাদের একই পরম পিতার গৃহে আছি এবং থাকিবার চির অধিকারী, সুতরাং তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদকলহের কোনই অবসর থাকিবে না।

কথালাপ।

[ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহোদয় বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই "কথালাপ" লিখিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—"২৫ অগষ্ট, শুক্রবার, ১৮৮২ খৃঃ, সন্ধ্যাকাল। 'প্রথম হইতে জীবনের ঘটনাবলী বলুন', এই বলিয়া আগ্রহ করাতে। মসুরি পর্ব্বত—The Priory." সেই পাণ্ডুলিপি যথাযথ মুদ্রিত হইতেছে।]

"সিমলা পর্ব্বতে একদিন রাত্রে শুয়ে রয়েছি, হঠাৎ বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সকাল বেলা বেড়াতে বের হলেম, মনে করলেম, বুঝি ইদিক উদিক দেখে শুনে বেড়ালে মন ঠাণ্ডা হবে; দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী থেকে বের হলেম, কিছুই হয় না। পেয়ারী বাঁড়ুর্য্যে—আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলুম। এ কথা ও কথা, কই, সে ধড়ফড়ানি কিছুতেই যায় না। তার পরে ঘরে ফিরে যেয়ে কিশোরীকে বল্লুম, আচ্ছা, ঝাপান নিয়ে এস দিকি, বাড়ী যাব, আর দেখি যে বলতে বলতে ধড়ফড়ানি কমে যাচ্চে। তেমনি দেখছি, এখন হয়েছে; এখন বাড়ী যাবার মন হয়েছে, এতকাল

পর্য্যন্ত বিদেশে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখন কেবল র বাড়ী মনে হয়। যখন ঐ রকম কথা কই, তখনই মনটা ঠাণ্ডা হয়, আর কোনও কথাতে ঠাণ্ডা হয় না। আমি এখন একটা খুব কথা পেয়েছি—

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ববস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা
যুক্তঃ যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণ আবেশ্য সম্যক্
সত্যং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

এই প্রয়াণকালে 'ভ্রুবোর্মধ্যে' সেই একটি বিন্দুতে প্রাণকে স্থির রাখচি, অন্য কথায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরবার প্রাক্কালে 'ওঁ সত্যনারায়ণ ব্রহ্ম' কানে শোনাতে শোনাতে গঙ্গায় নিয়ে যায়, তোমরা আমাকে তেমনি এখন আমার এই বিষয়ে সাহায্য করবে।

অক্ষয় বাবু প্রভৃতির কাছে আমার উদাস ভাবের সায় পাওয়া, তা পাইনি। Brown, Stewart প্রভৃতি ইংরাজি philosophy, তা পড়েছিলেম, কিন্তু সে যেন সব পৃথিবীতেই আবদ্ধ—মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আত্মাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় না। মনকে শ্রেণীবদ্ধ কোরে পাঠশালার শিক্ষার মতন শিক্ষা দেয়। রাজনারাণ বাবু আমাকে একটা Fichte পাঠাইয়া দেন, রাজনারাণ বাবুর সে বই * * নিয়ে গেচে, সে বয়ে উপহার-লিপিতে লেখা ছিল,—"My friend, philosopher and guide"। সে বই ঝামাপুকুরের * * ঘোষ আর তার ভাই * * ঘোষ নিয়ে গিয়েছে। এক আলমারী philosophyর বই ছিল; তারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়তে এসে ক্রমে ক্রমে সব নিয়ে গেল। মাঝে সেই * * ঘোষ কি বই টই ছাপিয়ে এখানে আমার কাছে ৯০০৲ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি মনে করলুম, ৯০০৲ টাকা চেয়েছে, আচ্ছা, ওকে ১০০৲ টাকা দিই। বোলে শাস্ত্রীকে টাকা দিতে বলে দিলুম। তার পর মনে পড়লো, ঝামাপুকুরের সেই * * ঘোষ। দুই প্রহর তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ Fichte নিয়ে পড়তুম, সে যেন আমাকে মর্ত্ত্যলোক হ'তে আর একটা রাজ্যে নিয়ে গেল; তার পর Kant যখন পেলুম, তখন আমি ব্যাকরণ বুঝলুম।

আমি অনেক দিন বিদেশে থাকলেম, এখন স্বদেশের জন্য আগ্রহ হয়েছে। সিমলায় অনেক দিন থেকে যেমন মন ধড়ফড় করেছিল, তেমনি মনে হচ্চে, অনেকদিন হ'ল—এখানে আছি। আমি এখন সব পুরাণ গল্প ভুলে গিয়েছি, ভেবে দেখলুম, ভাল মনে পড়ে না। কথায় কথায় মন থেকে আপনাআপনি যা বের হবে, তাই বলব। বর্ত্তমান ভাব জ্বলজ্বল করচে, তাই বলতে পারি।

২৭ আগষ্ট, রবিবার, বৈকাল ৫টা।

সিমলা বেড়াবার গল্প বলতে গেলে গোপাললাল বাবুর বরানগরের বাগান থেকে ধরতে হয়। গঙ্গার উপরে সে বাগান, তোমরা দেখেছ। ভিতরে মস্ত পুকুর ছিল, তার উপরে মেলা রাজহাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়াত, আর সারস পাখী সব বাগানে বেড়িয়ে বেড়াত। সে পুকুরের জল বড় ভাল ছিল না, হাঁসে খারাপ করে দিয়েছিল; তবুও আমি তাতে সাঁতার দিয়ে বেড়াতুম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুঝি সেই বাগানে যাই; সেখানে থেকে মনে মনে সংকল্প কোরেছি, এবার আশ্বিন মাসে পূজার সময় এলে হয়, খুব এক চোট বেরিয়ে পড়ব। ক্রমে সেই আশ্বিন মাস এল। কিশোরীকে দিয়ে কাশী পর্য্যন্ত boat ভাড়া করলেম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বোধ হয়। mutinyর এক বৎসর আগে আর কি। বোট টোট সব ঠিক করেচি, যাবার আগের দিনে বাড়ীতে বিদায় হবার জন্য এসেছি। সেই রাত্রে ৭৷৮ টার সময় আমার শিষ্য প্রতাপ বাবু বিশ্বম্ভর বাবুকে নিয়ে উপস্থিত। কাল সকালে যাব, আজ রাত্রে তোরঙ্গ টোরঙ্গ নিয়ে ওঁরা সব এলেন। বিশ্বম্ভর বাবু, তিনি বীরভূমে এক জন প্রধান লোক; আমার আবার সেই সময় চোখের ব্যামো। আলো দেখবার যো নেই, ঘর অন্ধকার কোরে বোসে আছি, চোখে সবুজ ঠুলি দেওয়া, অথচ আলো দেখতে হবে। এই বিভ্রাট। সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়া তোয়ের করা, বিছানাপত্রের হাঙ্গাম করা, যাবার আগের রাত্রে এমন উৎপাত।

পরদিন বোটে কোরে কাশী চল্লেম। সঙ্গে

এক জন উড়ে বামুন, আর কুবের গোড়োগোয়ালা, লেঠেল, সেই চাকর। বাঁশবেড়েতে গিয়ে মনে হল, কিশোরীকে নিয়ে গেলে হয়। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যাবে? সে অমনি 'হাঁঃ' কোরে উঠলো। তা তাকে সঙ্গে কোরে নিলুম। কিশোরীকে যে গোড়াগুড়ি মনে করেছিলুম নিয়ে যাব, তা না, এখানে এসে মনে হয়ে গেল। আমাদের বোটওয়ালা এমনি যে, গঙ্গায় নেবে একদিন স্নান করচি আর দেখি বোট চোলে গিয়েচে! আমাদের সাঁতার টাতার দিতে একটু গৌণ হয়েছে। আমাদের জমীদারীর বোট—কালাচাঁদ মাঝি—হাজার ধমকধামক কর, নড়েও না চড়েও না। এ কাশী অবধি চুক্তি ভাড়া কি না! ১০টা ১১টা রাত্রি অবধি টেনে যাচ্চে, খারাপ যায়গা টায়গা কিছুই মানে না! আমি খুব খুসী হলুম। তখন adventurous, spirit উদাসীনের মতন চলেছি! মাঝে আমার একটা দাঁড়ী মরে গেল। মোসলমানের কাণ্ড। তার ব্যামো হোতে তাকে বোটের সামনে খোলের ভিতর রাখত। আবার তাতে চট্ টট্ দিয়ে মুড়ে রেখেছে, বাতাস লাগতে দেবে না। আমি বল্লুম, অমন কোরে রাখলে ও যে মোরে যাবে? তা তারা শুনবে না। আর একদিন দেখলেম যে, তাকে লঙ্কামরীচ খাওয়াচ্ছে। তার পরে দেখি, সে সত্যি সত্যি মরেই গেল। আবার পুলিসে খবর দিলে। কেমন কোরে মরলো। তার পরে তাকে গোর দিলে। এই কোরে এক মাসে কাশী গিয়ে পৌঁছুলুম।

এর আগেও একবার কাশী দেখেছিলুম। সেবার ১৪ দিনে ডাকে গিয়েছিলুম। নৌকা যেই কাশীর পারে লাগিল, অমনি নেবেই ডাঙ্গায় চলে গিয়েছি। আর ওদের নৌকায় যাব না; বাড়ীও নেই, কিছুই নেই, হুহু কোরে দৌড়চ্ছি। কিশোরী সঙ্গে চলতে পারছে না। যে দিকে রাস্তা পেলেম, চল্লেম। এই কোরে সিক্রোলের উদিকে গিয়ে দেখলেম, একটা খালি বাগানের মতন পড়ে রয়েছে, তাতে মিস্ত্রীরা একটা বাড়ী তোয়ের করছে, এখনো দরজা টরজা বসানো হয়নি। কার বাড়ী, কি বৃত্তান্ত!—এখানেই থাকব—নিয়ে আয় জিনিস—সেই ঘরেই উঠলেম—কার ঘর ঠিক নেই! সেই উড়ে বামুন খিচুড়ী রাঁধলে। সে কেমন খিচুড়ী রাঁধতো, সব সাদা থাকত, সেই এক রাশ খেয়ে পেট ভরত। বসে আছি, একদিন গেল, দু'দিন গেল, কিছু নেই, খোলা ঘর মেরামত করছে। কেউ নেই; কে আসবে? আমিই যাই,—তাই কম্বল টম্বল দিয়ে পোড়ে থাকতুম। জিজ্ঞাসা পড়া নেই, কার বাড়ীতে আছি। যাদের বাড়ী, তারা শুনতে পেয়েছে যে, কে এসে বাড়ী দখল কোরে নিলে। তারা কেমন কোরে আমার নাম টের পেয়েছে। আপনি গুরুদাস মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্রের ছেলে এসে বল্লে, "মশায়! এখানে এত কষ্ট নিচ্চেন, আমাকে বল্লেন না কেন? পরদা দিতেম তো এর কোরে।" "আমি কি জানি যে, এ আপনার বাড়ী?" দৈবাৎ যার বাড়ীতে ছিলেম, সে আমার পরিচিতের মধ্যে হয়ে গেল। সে সব পরদা টরদা দিয়ে ভাল কোরে দিলে। কিশোরীকে বল্লুম, যাও এখান থেকে, যাও এখান থেকে। আমাদের সব জানতে পেরেছে, তবে বিস্তর দিন থাকা হবে না। আমাদের জানলে টানলে বোলে আমরা চলে গেলুম। সব সুদ্ধ ১০ দিন ওখানে ছিলুম। এই গুরুদাস মিত্রের বাপ হচ্ছে রাজেন্দ্র মিত্র। তার সঙ্গে এর আগেরবার যখন কাশীতে যাই, তখন দেখা হয়েছিল। *

"স্বধর্ম্মের" পরিণতি।

(চট্টগ্রাম নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগবান যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। অনেকে এই "স্বধর্ম্ম" শব্দটীর অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে "স্বধর্ম্ম" বলিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আজ যথাসম্ভব সংক্ষেপে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব এবং এই "স্বধর্ম্মের" পরিণতি কোথায় তাহাও সাধ্যমত বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ধর্ম্ম কি? অমর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, শক্তির বিকাশই ধর্ম্ম। আমার মনে হয়,

* ১৩১৮ সালের শ্রাবণের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।

আমাদের আপনাপন কর্ত্তব্য পালনই ধর্ম্ম। ইহাও একরূপ শক্তির বিকাশ বটে।

জীবনের কর্ত্তব্য দ্বিবিধ; ব্যক্তিগত ও সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য অবস্থাভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য সকল অবস্থাতেই একইপ্রকার।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য কি? সংসারী যিনি, আপন পরিবারের কল্যাণ সাধনই তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। সেইরূপ দেশসেবকের পক্ষে দেশসেবা, ছাত্রের পক্ষে বিদ্যাভ্যাস, পিতামাতার পক্ষে সন্তানবাৎসল্য ও তাহাদের হিতচেষ্টা এবং সন্তানের পক্ষে গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতিই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এক কথায়, যে যেমন, তাহার পক্ষে তাহার উপযুক্ত কাজই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। এখানে অধিকারভেদ সুস্পষ্ট।

সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য কি? যাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হয়, তেমন কর্ম্মই সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য। ষড়রিপু দমন, সত্যভাষণ, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি সেবা, জ্ঞানার্জ্জন ইত্যাদি এ সমস্তই সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য ছোটবড়-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতে পারে। এখানে ছোট কিংবা বড়র, ক্ষুদ্র কিংবা মহতের কোন পার্থক্য নাই।

আমার মনে হয়, এই সার্ব্বজনীন এবং বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যপালনই গীতার উদ্দিষ্ট "স্বধর্ম্ম"। ইহার প্রমাণ, "স্ব" শব্দটী এবং মহাবীর অর্জ্জুনের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতার সময় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ।

স্বীয় বাহুবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ধর্ম্মযুদ্ধে সমাগত ক্ষত্রচূড়ামণি বীরশ্রেষ্ট অর্জ্জুন যখন সাময়িক মোহবশে এই জনপূজ্য ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, যখন তাঁহাকে "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" বলিয়া অনুপ্রাণিত করা আবশ্যক হইয়াছিল, তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"।

যে নিশ্চেষ্টতা বা বৈরাগ্যচর্চ্চা ক্ষত্রিয়বীর পার্থের পক্ষে উপযোগী ও পালনীয় নয়; পরন্তু যাহা তাঁহার ন্যায় শৌর্য্যবীর্য্যশালী আদর্শ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গ্লানিজনক, মায়াচ্ছন্ন অর্জ্জুন সেই "পরধর্ম্ম" আশ্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপরোক্ত উপদেশে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই "স্বধর্ম্ম" পালনের মূল ভিত্তির উপরেই সর্ব্বধর্ম্মসার গীতা প্রতিষ্ঠিত।

সহজ কথায়, যাহার যাহা কর্ত্তব্য, অটল ও অপরাজিত চিত্তে তাহা প্রতিপালন করাই তাহার পক্ষে সর্ব্বথা বিধিসঙ্গত। ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে যাইয়া যদি কাহারও মৃত্যুও ঘটে, তবে তাহাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক—তাহাই তাহার বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে, নিজের কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যের কর্ত্তব্য লইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে "ভয়াবহঃ"—দূষণীয় ও অবিধেয়।

"স্বধর্ম্ম" পালনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ আছে। কিন্তু তাহাতে যথোচিত আত্মতৃপ্তি নাই। কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা মানবজীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে পারে না। সেখানে সজীবতা আছে, সরসতা নাই; উর্ব্বরতা আছে, শ্যামলতা নাই।

ইহার কারণ কি? এই অতৃপ্তির হেতু কোথায়? আমার মনে হয়, শুধু মানবের কেন, সমস্ত বিশ্বেরই অন্তরে এমন একটী অব্যক্ত প্রবল ক্ষুধা লুকান আছে যে, কেবলমাত্র বহির্জগৎ লইয়া কেবলমাত্র বহির্জগতের কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাহা নিঃশেষিত বা নিবৃত্ত হইতে পারে না।

নদী বহিয়া যায়—আপন সুধাধারায় দু'কূল প্লাবিয়া কত তৃষ্ণাতুর শুষ্ক কণ্ঠ স্নিগ্ধ শীতল করিয়া কত রৌদ্রদগ্ধ উষরভূমি সরস ও শস্যশালী করিয়া নদী বহিয়া যায়। তাহার অবিরাম গতির যেমন ত্রুটি নাই, তেমনি তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য বা "স্বধর্ম্ম" পালনেও বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই; কিন্তু তাহাতে তাহার চিরচঞ্চল হৃদয়ের অব্যক্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় কি? তাহার সকরুণ "কুলু" "কুলু" আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তের জন্য কখনও শান্তি লাভ করে কি?

বিশ্বের যে এই মর্ম্মগ্রাসী ক্ষুধা, বুঝিবা একদিন বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বেশ্বর পরমযোগী মহাদেবের কোমল

অন্তরেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাই তিনি সমগ্র ক্ষুধার্ত্ত বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে করুণাময়ী বিশ্বজননীর উন্মুক্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া গভীর আকুলকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্।"

দর্ব্বীপূর্ণ অমৃত চরু হস্তে লইয়া যখন আমাদিগকে দয়াময়ী বিশ্বমাতা আহ্বান করেন, যখন আমাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা প্রকৃত নিবৃত্তি লাভ করে, জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া যখন আমাদের পরিশ্রান্ত প্রাণ পরম ও চরম কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন আমরা অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদের সহিত অপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তিও প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সাগরসঙ্গমে যেমন কল্লোলিনীর সকল ব্যাকুলতা শেষ হইয়া যায়, তেমনিধারা আমাদের অন্তরের উদ্বেল উচ্ছ্বাসও মহাপ্রেমসিন্ধুমিলনে স্থির, ধীর ও প্রশান্ত হয়। তখন আমরা অন্তরের অন্তস্থলে শ্রীভগবানের ত্রিলোকবাঞ্ছিত আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!"

ইহাই স্বধর্ম্মের পরিণতি।

কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব।*

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

[এই প্রবন্ধের সহিত বর্ত্তমান কর্ণাটের মানচিত্র প্রদর্শিত হইল। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে গুর্জ্জর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্য কর্ণাট-সম্রাট্ চালুক্য-বংশের রাজ্যভুক্ত ছিল। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে চালুক্য-রাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের নিম্নার্দ্ধ এবং ব্রাহ্মনী-রাজ্য উত্তরার্দ্ধ অধিকার করিয়াছিল।]

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে কেবল যে নিজের জাতির পুরাণ-কাহিনী, ভাষার ক্রমবিকাশ, প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপর নির্ভর করিতে হইবে তাহা নহে। অপর দেশ অপর ভাষা হইতেও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। কিন্তু যদি ঐ সকল দেশ এবং ঐ সকল ভাষার সহিত নিজের দেশের এবং নিজের ভাষার কিছু গৌণ বা মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে আরও ভাল হয়। এইজন্য আমি কর্ণাট দেশের পূর্ব্ব কাহিনী লইয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি।

আমরা মহাভারতের সময় হইতেই কর্ণাট বা কর্ণাটক প্রদেশের নাম শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কর্ণাট দেশের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে আমাদের অতি অল্পই জানা আছে। কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি মহারাষ্ট্রী, কি বাংলা, কোন ভাষাতেই অদ্যাবধি কর্ণাটের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। এমন কি কন্নাড় ভাষায়ও এরূপ কোন পুস্তক নাই। সেইজন্য আমাদিগকে এই ইতিহাস লিখিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে।

কর্ণাটের ইতিহাস লিখিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। কথিত আছে যে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহামুনি অগস্ত্য সশিষ্য বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণদেশে নেলমঙ্গলস্থ অর্কাবতী নামক নদীর তীরে আসিয়া বাস করেন। তৎপরে গৌতম, কণ্ব, বিভাণ্ডক, দত্তাত্রেয়, জমদগ্নি প্রভৃতি তাপসগণ শ্রীরঙ্গম, মালুর, শৃংগেরী, দ্রোণগিরি প্রভৃতি স্থানে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহাভারতীয় বিরাটরাজার রাজধানী কর্ণাট প্রদেশস্থ বর্ত্তমান ধারবাড় জেলার অন্তর্গত হোঙ্গল নামক স্থানে বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানেই পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। বিরাটরাজ-শ্যালক কীচক পাণ্ডবসহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভীমহস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হোঙ্গল এবং উহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে এখনও অনেক স্থান বিরাটরাজ এবং পাণ্ডবগণের কীর্ত্তি-কলাপের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

তৎপরে বেলারী জেলার অন্তর্গত হম্পী (ভূতপূর্ব্ব বিজয়নগর) নামক স্থানের অনতিদূরে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে সীতার অন্বেষণকারী শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীব, হনুমান ও জাম্বুবানের সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময় তাঁহারা দশাননরথারূঢ়া সীতাদেবী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারাদি নিদর্শনগুলি শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করেন। তৎপরে সপ্ততাল

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

বিদ্ধ করতঃ শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ইহার কিঞ্চিৎ দূরে বর্ত্তমান অনিগুণ্ডী নামক স্থানে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর রাজধানী ছিল। অদ্যাবধি সেই তুঙ্গভদ্রা নদী এই রাজধানীকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর অপর পার্শ্বে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে বালীরাজার মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করা হইয়াছিল। এখনও সেই চিতার স্থান পোড়া কাষ্ঠের ন্যায় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বিজাপুরের অন্তর্গত বাদামী নামক স্থানই ভূতপূর্ব্ব বাতাপি বা বাতাবী নগর। এই স্থানে অগস্ত্যমুনি কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ বাতাবী নামক রাক্ষস নিধন প্রাপ্ত হয়। স্থানীয় লোকে এই ঘটনা স্মরণ করিয়া অগস্ত্যকে বারবার প্রণাম করিয়া থাকে।

এই সকল স্থান যুগযুগান্তর হইতে লোকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু লিখিত প্রমাণাদির অভাবে অনেকে ঐ সকল ঘটনাগুলি অপ্রামাণ্য পৌরাণিক উপন্যাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। সুতরাং আমরা ঐ সকল পুরাণকথার আর অধিক কিছু উল্লেখ না করিয়া তৎপরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাসের বর্ণনা করিব।

ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বকালীন কোন রাজার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। সুতরাং আমাদিগকে চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ৩২১ সালে রাজ্যলাভ করেন। বলা বাহুল্য তিনি আর্য্যাবর্ত্তের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি তাঁহার গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া বেলুগল নামক স্থানে শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। এই বেলুগল বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত।

চন্দ্রগুপ্তের পর রাজা অশোকের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি দাক্ষিণাত্যে বনবাসী নামক স্থানে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করেন। ইহার পর এই স্থানে অশোক-বংশীয় রাজাগণ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদ্বংশীয় শেষ রাজা তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হন। তৎপরে পুষ্যমিত্র সুঙ্গা নামক রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাজাগণ খৃঃ পূঃ ১৮৪ হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৭২ সাল হইতে ২৭ সাল পর্য্যন্ত কণ্ব-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব-কাল বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কণ্ব-বংশ খৃঃ পূঃ ২৭ সালে অন্ধ্রাধিপতি জনৈক নৃপতি কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হয়। ইহার পর খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রবংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

খৃঃ ৩১৯ সালে আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তবংশ স্থাপিত হয়। গুপ্তরাজগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাকে কেহ কেহ ভারতীয় নেপলিয়ন বলিয়া থাকেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ স্বকরায়ত্ব করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করত একাদশটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর শিলাদিত্যবংশীয় রাজা হর্ষবর্দ্ধন ভিন্ন আর কোন উত্তরদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রমণের কথা জানা যায় নাই। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া চালুক্যবংশীয় খ্যাতনামা রাজা পুলকেশী কর্ত্তৃক এরূপ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন যে তাঁহার পর আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন হিন্দু রাজা দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রয়াস পান নাই। রাজা হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ ৬৪৮ সালে পরলোক গমন করেন।

আর্য্যাবর্ত্তের সহিত দাক্ষিণাত্যের সাময়িক সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্যই উপরি উক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল। অতঃপর আমি দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গের কথা বলিব।

খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রকৃত রাজগণ তাঁহাদের রাজধানী পৈথান নগরে রাজত্ব করিতেন এবং পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে বনবাসী নগরে কদম্বা রাজগণের রাজধানী ছিল। এই কদম্বারাজবংশ রাজা অশোকের সমসাময়িক ছিল। Ptolemy তাঁহার ভূগোল গ্রন্থে বনবাসী নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কর্ণাট দেশের বাদামী, ইণ্ডি, (Indi), কলফেরী, মুদগল, পট্টদকল প্রভৃতি আরও অনেক নগরের নাম করিয়া গিয়াছেন। Mr. Buchanan বলেন যে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীস-দেশীয় সওদা-

গরগণ কর্ণাট দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তৎকালে কর্ণাট, কুন্তল, লাট, নাট, আর্য্যক প্রভৃতি নামে বিখ্যাত ছিল।

খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঝুমলনার নামক জনৈক কবি তাঁহার লিখিত অহনামুর গ্রন্থে মহীসুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশের (Oxyrinkas) অক্সিরিঙ্কায় একখানি দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক নাটক পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের নায়িকা একটি গ্রীস-দেশীয়া বালিকা। কোনক্রমে সে হৃত হইয়া ভারত উপকূলে আনীত হয় এবং তৎপরে তাহার সহোদর ভ্রাতা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনা উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থে কতকগুলি ভারতীয় (কন্নাড়) শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বরাহমিহিরও তাঁহার গ্রন্থে কর্ণাট প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কর্ণাটের নৃপতি-মণ্ডলের মধ্যে কদম্বা বংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই বংশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়। সোরবের সন্নিকট-বর্ত্তী স্থান কুন্দুরু নামক নগরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কথিত আছে যে মুকুন্ন নামক জনৈক রাজা অহিচ্ছত্র হইতে ১২০০০ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এই স্থানে "সংস্থান" স্থাপন করেন। এই নগরে ময়ুর-শর্ম্ম নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তৎকালীন দক্ষিণ ভারতে মান্দ্রাজের সন্নিকট কাঞ্চি (বর্ত্তমান কাঞ্জিভরম) নামক স্থান বিদ্যা চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ ইহাকে উত্তর-ভারতীয় কাশীর সমকক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ময়ুর-শর্ম্ম বেদ অধ্যয়ন করিবার মানসে উক্ত কাঞ্চি নগরে গমন করেন। কিন্তু তত্রস্থ পল্লব নামীয় ক্ষত্রিয় রাজা কর্ত্তৃক অবমানিত হওয়ায় তথা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তিনি যার-পরনাই দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হন। তৎপরে ক্ষত্রিয়রাজার ব্রাহ্মণের উপর এতাদৃশ প্রতিপত্তি দেখিয়া ময়ুর-শর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম (শাস্ত্র পাঠ ক্রিয়া কলাপাদি) পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন। পরে শৃঙ্গোলা নামক স্থানে যুদ্ধনীতি বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া কতিপয় ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চি আক্রমণ করেন এবং পল্লবরাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া কদম্বা রাজ্য স্থাপন করেন। এই কদম্বা-রাজগণ খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের অতি অল্প-সংখ্যক শিলা অথবা তাম্র-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই রাজবংশ সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই বংশীয় রাজগণ আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত রাজবংশের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

কদম্বা বংশের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যে আরও একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের নাম গঙ্গাবংশ। ইঁহাদিগের সময় এ দেশে সাহিত্য এবং কলাবিদ্যা বিশেষ রূপে প্রসারিত হইয়াছিল। এই বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কয়েক জন প্রসিদ্ধ কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ চালুক্য বংশের রাজত্ব-কাল হইতে কর্ণাট দেশে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সময় হইতে যে সকল প্রসিদ্ধ রাজ-বংশ কর্ণাট প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা দিগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। চালুক্য	খৃঃ ৫৫০	হইতে	৭৫৩	সাল পর্য্যন্ত।
২। রাষ্ট্রকূট	" ৭৫৩	"	৯৭৩	"
৩। চালুক্য	" ৯৭৩		১১৯০	
৪। কুলাচার্য্য	" ১১৫৬	"	১১৮৩	"
৫। ভৈষাল				
৬। যাদব (দেবগিরি)				

অতঃপর আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য কোন্ কোন্ স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছি তাহার পরিচয় দিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন-কালের লিখিত ইতিহাসাদি না থাকায় প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা অতি সুকঠিন। অনেক সময় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্য করিতে হয়। আমি Indian Antiquary, Eqigraphica Karnatika, Dr. fleet, Dr. Rico, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণের পুস্তকাদি হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনার ফলে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

১। দেশীয় লোক কথা এবং আচার ব্যবহার।
২। শিলা এবং তাম্রলিপি, প্রাচীন মুদ্রাদি।
৩। সাহিত্য এবং ধর্ম্ম-পুস্তকাদি।
৪। কারুকার্য্য এবং বিবিধ শিল্প দ্রব্যাদি।
৫। বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

কর্ণাট প্রদেশ শিলালিপি, তাম্রলিপি পুরাতন মন্দির এবং গুহামন্দিরাদির জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এত অসংখ্য স্থায়ী উপাদান আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল উপাদান হইতে Dr. Fleet, মহীশূর রাজের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ Dr. Rice এবং তাঁহার সরকারী Mr. R. Narasimhacharya, Dr. Bhanderkar প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা "ধারবার বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ" অর্থাৎ সাহিত্যপরিষৎ হইতেও নূতন নূতন খোদিত লিপি, তাম্রলিপি, তালপত্রে লিখিত পুস্তকাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ বড় দিনের ছুটিতে আমি বাদামী, পরেশগড়, শিবমন্দির, মহাকুট প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। আমার বন্ধু মিঃ আলুর প্রভৃতি ঐ সকল স্থান হইয়া আরও কয়েকটি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

রাবণবধের মূল তত্ত্ব।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

রাবণ নিহত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরের অবসান হইয়াছে। হৈমলঙ্কা বীর-শূন্যা। অতিকায়, প্রহস্ত, প্রকম্পন, ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ রাক্ষসগণ রামলক্ষ্মণের নিশিত শায়কাহত হইয়া বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে।

বলদর্পিত দশানন অমরত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া কহিলেন "বর গ্রহণ কর।" রাবণ অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলেন। বিরিঞ্চি তাহা প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। হওয়ারই তো কথা। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেবতাদিগের সাধ্য কি? দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হইবে—সে যত বড় বীরই হউক, আর যত বড় মহাপুরুষই হোক না কেন।

"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যার্থে নানুশোচিতুমর্হসি।
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥
মৃত্যু র্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অতঃপর রাবণ ভাবিলেন যে কৌশল করিয়া অমরত্ব বরটা আদায় করিয়া লইবেন। তিনি কহিলেন যে দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর কাহারও হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে না। কমলযোনি বুঝিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন। দেহসুখ সর্ব্বস্ব মোহান্ধ রাবণ বুঝিল না যে সাধন-জগতে চতুরতা খাটে না। যে মূঢ় সাধন ভজন করিয়া বিনিময়ে ক্ষুদ্র বিষয়-সুখের প্রার্থনা করে তাহার এই দশাই হইয়া থাকে। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু এই প্রকার কৌশল করিয়া অমরত্ব বর আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন; ফল যাহা হইবার তাহা হইল। মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ও চতুরতা করিয়া কহিয়াছিল "আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা"। অবশেষে তাহারাও নিহত হইল। দশানন বরগ্রহণ-কালে তুচ্ছ করিয়া মানবের কথা উল্লেখ করিলেন না। ভাবিলেন যদি দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির অবধ্য হই, তবে মানুষ তো কোন্ ছার!

অবজ্ঞাতঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ
এবং পিতামহাত্তস্মাদ্বরদানেন গর্ব্বিতঃ।

সুতরাং ঘৃণা করিয়া মানুষের কথা কহিলেন না। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে রাবণ ত্রিজগৎ তুচ্ছ করিতে লাগিল। মহান্ অত্যাচারী হইয়া উঠিল। অতঃপর কালবশে সেই মানবের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

যেখানে ঘৃণা সেইখানেই মৃত্যু। যাহাকে তুচ্ছ করা যাইবে, তাহার কাছেই পরাজিত হইতে হইবে। সমদর্শী ভগবানের এ এক অপূর্ব্ব বিধান। জগতে কেহই ছোট নহে। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"। সুতরাং তৃণ লতা গুল্ম মনুষ্য পশু পক্ষী কেহ কাহাকে ঘৃণা করিতে পারে না। পূজায় সম্মানে জীবন আর ঘৃণায় মৃত্যু। যাহাকে ঘৃণা করিলে, তাহাকেই চিনিলে না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সে স্থলে তোমার আত্মার মৃত্যু হইল। ঘৃণায় সমবেদনার অভাব হয়। সমবেদনার অভাব এক বস্তুকে চিনিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়-স্বরূপ। বহুত্ব হইতে একত্বে

যাইতে হইলে, সকল পদার্থকে চিনিতে হইবে। চিনিতে হইলেই সমবেদনা চাই, সমবেদনা অনুভব করিতে হইলেই সে স্থলে সম্মান চাই, সম্মান করিতে হইলেই আত্মানুরূপ বোধ করিতে হইবে। যিনি যে বস্তুকে ঘৃণা করেন, করুণাময় ভগবান তাহার কাছে ঠিক সেই বস্তুরূপে আসিয়া ঘৃণাকারীকে পরাজিত করেন। তাই ভগবান রামরূপে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন করিয়াছিলেন। রামাবতার ও রাবণবধের এই এক মহা তত্ত্ব। জীব, তুমি মনে রাখিও, যখনি তোমার কাহারও প্রতি ঘৃণা আসিবে, মনে করিও সেই পদার্থই তোমার কাছে ভগবানের অবতার-স্বরূপ হইয়া আসিয়াছে। তাহা হইলে আর ঘৃণা থাকিবে না।

ব্রাহ্মণ, তুমি যে চণ্ডালকে ঘৃণা করিতেছ, ঐ চণ্ডাল হইয়া তোমায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তোমার আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এ জগতে ঘৃণার স্থান নাই। উপনিষদ্ কহিয়াছেন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"; শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"। বেদে উক্ত আছে—

যঃ একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।

ঘৃণার মূলে অহঙ্কার। অহঙ্কার বড় প্রবল রিপু। সাধনা করিতে করিতে সকলের পরে অহঙ্কারের লোপ হয়। অহঙ্কার লুপ্ত হইলেই জীব ভগবানে বিলীন হইয়া কৈবল্য, মোক্ষ অথবা নির্ব্বাণ লাভ করে। এই অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জীবন একটা সাধনা। এই অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে তাহাদের তিনযুগে তিন জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পুরাণানুসারে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ বিষ্ণুর দ্বারে দ্বার-রক্ষক ছিলেন। ইহাদের নাম ছিল তখন জয় এবং বিজয়। একদা সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ হরিচরণ দর্শনাশায় বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হন। ইহারা দেখিতে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের মত। জয়-বিজয়-নামক দ্বাররক্ষকদ্বয় অহঙ্কারবশে ইঁহাদিগকে অবমানিত করিয়াছিলেন। তাই ঋষিগণ এতদুভয়ের সংশোধন-মানসে কৃপাপূর্ব্বক অভিশাপ প্রদান করেন। কৃপাই তো বটে। ঋষিগণ ভাবিলেন, ইহারা আর কতকাল দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে। পরিতুষ্ট করিয়া শ্রীহরি-সাযুজ্য লাভের উপায় করিয়া দিলেন। ঋষিগণ কখনো ক্রুদ্ধ হন না। তাঁহারা নিষ্ঠুর নহেন। সর্ব্বজগতের কল্যাণ বিধানই তাঁহাদের কার্য্য। অধিকারপ্রমত্ত জয়বিজয় তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু কহিলেন তোমরা আমার শত্রুরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তোমাদের উদ্ধার করিব। অর্থাৎ অহঙ্কারই ভগবানের শত্রু। আমার আমিত্বকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে না পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না। জীব তাহা নিজের চেষ্টায় পারে না। জীবের যতই সাধনাভিমান থাকুক না কেন, তাহা পারে না। বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তী দ্বাররক্ষক জয় বিজয় পর্য্যন্ত পারেন নাই। ভগবান কৃপা করিয়া স্বয়ং জীবের অহঙ্কারকে দমন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকেন। জীবের কর্ত্তব্য কেবল সাধনাভিমান ত্যাগ করা। সাধন করিতে করিতেই সাধনাভিমান বিদূরিত হইবে। সাধনের প্রয়োজনীয়তা এই জন্য যে, তাঁহাকে সাধন করিয়া পাওয়া যাইবে।

শ্রুতি কহিয়াছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।

এ তত্ত্ব ভাগবদ্ধর্ম্মে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরির ব্যাপার এ তত্ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যখন যশোদা নিজের চেষ্টায় কিছুতেই গোপালকে বন্ধন করিতে পারিলেন না, তখন—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ বিস্রস্তকবরস্রজঃ
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ব-বন্ধনে।

এই জয় বিজয় অভিশাপগ্রস্ত হইয়া, সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ, অতঃপর দ্বাপরযুগে দন্তবক্র ও শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিযুগের এই কৃপালাভ, ভাগবদ্ধর্ম্ম এবং সহজ সাধনের বিরাট আয়োজন পূর্ব্ববর্ত্তী তিন যুগ ধরিয়া চলিয়াছে। তাই ভাগবদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ চারিযুগের ভিতরে কলি-

যুগকেই শ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়া থাকেন। তিনযুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া এই অহঙ্কারকে নিপীড়নপূর্ব্বক জীবের জন্য এই সর্ব্বমঙ্গলময় ভাগবদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ভাগবদ্ধর্ম্মে ঘৃণার স্থান নাই। তাঁহারা বলেন—"ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—" ভাগবদ্ধর্ম্মে অহঙ্কারের অবকাশ নাই। তাঁহারা বলেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা"।

জীব, তুমি অহঙ্কার ও ঘৃণাবশে রাবণের মত এমন কঠোর জীবন-সাধনা ব্যর্থ করিও না। ভগবানের সঙ্গে কৌশল করিয়া কেনা বেচার সাধনা করিও না। হনুমানের মত তাঁহার নিত্যদাস হও। চৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"। এই অমৃতময়ী বাণীই তোমার সাধনার মুলমন্ত্র হৌক্।

কম্মাড় সাহিত্য।

কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি।

পুরন্দর দাস।

অহং জ্ঞান পরিহরি, ভেদাভেদ ত্যাগ করি,
জ্ঞানের সলিলে কর স্নান।
পিতা মাতা ভক্তি স্নান, বন্ধন মোচন স্নান,
হরিধ্যান গঙ্গা কর স্নান।
ভবিষ্যত চিন্তাস্নান, পরস্ত্রী অলোভ স্নান,
নিন্দা বিসর্জ্জন কর স্নান।
চৌর্য্য-বৃত্তিহীন স্নান, পর-তত্ত্ব-জ্ঞান স্নান,
আত্ম-জ্ঞান গঙ্গা কর স্নান।
পরহিতজ্ঞান স্নান, অন্যায়বর্জ্জন স্নান,
হরিনাম গঙ্গা কর স্নান।
সজ্জন প্রীতির স্নান, অপ্রীতি ত্যাগের স্নান,
অকিদোষজ্ঞান কর স্নান।
বেদ অধ্যয়ন স্নান, সত্য মিথ্যা জ্ঞান স্নান,
সাধু-সঙ্গ গঙ্গা কর স্নান।
আছে যত জল স্নান, পুরন্দর ধ্যান স্নান,
পুণ্যময় গঙ্গা কর স্নান ॥ ৫ ॥

সত্য-দেবতায় ছেড়ে, মিথ্যা-দেবে পূজা করে,
তারে মূর্খ সর্ব্বলোকে কয়।
রমণী ত্যজিয়া যায়, পর হস্তে ধন দেয়,
আত্মীয়কে ঋণ দেয়, মূর্খ বলি জান তায়,
মহামূর্খ অপরে মজায়।
উদর পুরিতে হায়, সন্তান বিকায়ে যায়,
শ্বশুরের ঘরে রয়, মূর্খ নিজে গালি দেয়,
মহামূর্খে ভক্তি নাহি রয়।
মহিষ শাবক-হীন, দোহে মূর্খ অতি দীন,
বিনা দ্রব্যে দেয় ঋণ, ব্যস্ত রহে রাত্র দিন,
মহামূর্খ জননী নিন্দয়।
নিত্য-পূজা নাহি করে, গুরুভক্তি নাহি ধরে,
হরি কথা শুনিবারে, মূর্খে না বাসনা সরে,
মহামূর্খ অলস সঙ্গে রয়।
উপকার লভি দীনে, অপকার প্রতিদানে,
পরনিন্দা শুনি কানে, মূর্খ নাশে নিজ জনে,
মহামূর্খ ভক্তে না দেবায় ॥ ৬ ॥

দাস কর হে আমায়, ওহে প্রভু দয়াময় হে,
তুমি বেঙ্কট রমণ, হৃদয়ের ধন, সহস্র নাম ধ্যেয় হে!
পাপ ইচ্ছা নিবারয়, পাপ চিন্তা নাশ কর হে,
পরাও আমারে নাথ, নিজ কৃপাগুণে, তব করুণা-
কবচ হে।
করাও আমারে প্রভু, তব পদসেবা-রত হে,
সাজাও কবরী মোর, ভয়হারী তব অভয়
কুসুমদামে হে।
কাঁদিয়ে মাগিছে দাস, দাও অটল ভকতি হে,
দিবস রজনী করি, গুণ গান তব, যায় সকলি
বৃথায় হে।
কেন বা বিলম্ব কর, তব ধ্যানে মগ্ন কর হে,
বঙ্কিম নয়নে কেন, নিখিল রঞ্জন, হের আমার
পানে হে!
পতিত পাবন দেব, তুমি পতিতের সখা হে,
শরণাগত আশ্রয়, অনাথ বৎসল, ওহে ভুলনা
আমায় হে।
ধুয়ে দিয়ে পাপ তাপ, মোরে মুক্তি দিতে হবে হে,
কৃপাময় কৃপা কর, গুরুপুরন্দর, ডাকে বিট্‌টল
তোমায় হে ॥ ৭ ॥

"ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।"

দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়ভ্রমণ তাঁহার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর কি উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা তাঁহার হিমালয়ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর বিবৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে।

হিমালয়ভ্রমণের পূর্ব্বে ও পরে ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বলিলে সে সকল উপদেশ বুঝায় না। হিমালয়প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনের পরেই কেশবের আগমনে উৎসাহিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন এবং যে ব্যাখ্যানগুলি "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" নামক পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেইগুলিই বিশেষভাবে "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্মসাহিত্যে এই ব্যাখানগুলি বাস্তবিকই অত্যুচ্চ আসনের অধিকারী—ধর্ম্মসাহিত্যে এগুলি অপূর্ব্ব সামগ্রী। প্রাণ হইতে সরলভাবে নিঃসৃত ও সরল ভক্তিরসে আপ্লুত ব্রহ্ম বিষয়ক ব্যাখ্যান জগতের ধর্ম্মসাহিত্যে অতীব বিরল।

দেবেন্দ্রনাথ আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৭৮২ শকের ১১ শ্রাবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ মাঘের মধ্যে এই সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কেশবের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগ এত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে আমরা দেবেন্দ্রনাথকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি যে, বেদীতে বসিয়া সম্মুখে কেশবকে সমাসীন দেখিলে তবে তাঁহার হৃদয় খুলিয়া যাইত, যাহা কিছু তাঁহার বলিবার থাকিত, তাহা অতি সহজেই হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিত। এই ব্যাখ্যানগুলি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তখন রেখাক্ষর বর্ণমালার ন্যায় কোন প্রকার সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ভাবিত হয় নাই, কিন্তু বক্তৃতা লিপিবদ্ধকরণে হেমেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ যে কোন ব্যাখ্যান বা উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ প্রভৃতি এই প্রকার লিপিবদ্ধকরণে হেমেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ থাকাতে আমরা দেবেন্দ্রনাথের মুখ-নিঃসৃত অনেক বাণী সঞ্চিত দেখিতে পাই। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান নিঃসৃত হইয়াছে এবং যিনি সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের সকলের সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়কেই আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি।

১৭৮৯ শকের কার্ত্তিক মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে এই ব্যাখ্যানের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কতদিন আমরা সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আপনার হৃদয়-বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কতদিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় মুমূর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তৎশ্রবণদ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশবিদেশে উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে।"

"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" রাজনারায়ণ বসু মহোদয় বলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ। উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষুসমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।

দেবেন্দ্র বাবু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু বক্তাবা তাঁহার নিকট উক্ত ব্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন নিমিত্ত এবং অন্যান্য কারণ জন্য কতই উপকৃত, তাহা বলা যায় না।"

"বর্ত্তমান সময়ে যিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন, তিনি যেমন বিদ্যাসাগরের লিখিত ভাষা অবলম্বন করেন; যিনি কোন প্রাকৃতিক তত্ত্ব বর্ণনা করেন, তিনি যেমন অক্ষয়কুমারের লিখনপ্রণালীর অনুসরণ করেন; তেমনি যিনি এক্ষণে ধর্ম্মবিচার, ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যা বা ঈশ্বরের প্রেম-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, তিনি কাশীবাসী হউন বা সমুদ্রপারে অবস্থান করুন, তাঁহাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাক্যাবলী গ্রহণ করিতে হয়।" (সমীরণ, শ্রাবণ ১৩০২)

এই ব্যাখ্যানগুলি মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজে বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিবসে দেবেন্দ্রনাথ যেমন একদিকে ব্যাখ্যান সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তেমনি এই বৎসর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া বিশেষভাবে উপনিষদের ভাব সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের যত্নে ও উৎসাহে যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, যখন অনেক পরিবারের লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক পৌত্তলিক অনুষ্ঠান পরিত্যাগে উদ্যোগী হইতে লাগিলেন, তখন অবধি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধীপক্ষেরও পুনরাবির্ভাব হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রও নীরব থাকিবার লোক ছিলেন না। আমরা যতদূর জানি, সেই সময়ে তাঁহারই পরামর্শমত ব্রহ্মোপাসকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল এবং সে বিষয়ে কতকটা সাফল্যও দেখা যাইতে লাগিল।

একদিকে কেশবের ব্রহ্মবিদ্যালয়, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান, এই উভয়ের ফলে উপাসনাদিবসে ব্রাহ্মসমাজে এত শ্রোতৃসমাগম হইতে লাগিল যে সকলের স্থান সংকুলান হইত না। সেই কারণে ব্রাহ্মদিগের জন্য কতকগুলি আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইত। এই সকল নির্দ্দিষ্ট আসনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীগণের নিকটে পূর্ব্ব হইতে নিদর্শন-পত্র সংগ্রহ করিতে হইত। ইহার অবান্তর ফল হইল এই যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ব্রাহ্ম কাহারা কতগুলি, তাহার কতকটা আভাসও পাওয়া যাইত।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই ব্যক্ত গুণ মূল সাম্যাবস্থ প্রকৃতিতে উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির একত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার অনেক পদার্থ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সূক্ষ্মত্ব অদ্যাপি বজায় আছে। অর্থাৎ নৈয়ায়িকদিগের সূক্ষ্ম পরমাণু এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ অহঙ্কার উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি অখণ্ড ও নিরবয়ব ছিল। নিছক্ বুদ্ধি ও নিছক্ অহঙ্কার—বস্তুতঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ। তাই প্রকৃতির দ্রব্য হইতে উহারা পৃথক্ থাকে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। আসল কথা এই যে, যখন মূল ও নিরবয়ব একই প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন হয়, তখন উহারই বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাত্মক ব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার যখন মূল প্রকৃতিতে অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আসে তখন পরে উহার বৃদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, মনুষ্যপ্রভৃতি সেন্দ্রিয় প্রাণীগণের সৃষ্টি; এবং দ্বিতীয়,—নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি। এই স্থানে ইন্দ্রিয়শব্দে "ইন্দ্রিয়বান্ প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়ের শক্তি" এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ, সেন্দ্রিয় প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড় অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টিতে হইয়া থাকে, এবং এই প্রাণীদিগের আত্মা 'পুরুষ' নামক পৃথক্ বর্গের ভিতরেই পড়ে। তাই সাংখ্যশাস্ত্রে সেন্দ্রিয় জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্মা ছাড়িয়া

কেবল ইন্দ্রিয়েরই বিচার করা হইয়াছে। জগতে সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ থাকা সম্ভব না হওয়ায় অহঙ্কার হইতে দুয়ের অধিক শাখা বাহির হইতে পারে না ইহা বলিতে হইবে না। তন্মধ্যে নিরিন্দ্রিয় পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়শক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়-জগতের সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এবং নিরিন্দ্রিয় জগতের তামসিক অর্থাৎ তমোগুণের উৎকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এইরূপ নাম আছে। সারকথা এই যে, অহঙ্কার আপন শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই এক সময় সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া একদিকে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া ইন্দ্রিয়-জগতের মূলভূত এগারো ইন্দ্রিয় এবং অন্যদিকে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়া তাহা হইতে নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্মত্ব অদ্যাপি বজায় থাকা প্রযুক্ত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তত্ত্বও সূক্ষ্ম হইয়াই থাকে। *

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহাদের তন্মাত্র, অর্থাৎ মিশ্রণ না হইয়া প্রত্যেক গুণের পৃথক্ পৃথক্ অতিসূক্ষ্ম মূলস্বরূপ—নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলতত্ত্ব এবং মন-সমেত এগারো ইন্দ্রিয় সেন্দ্রিয় জগতের বীজ। এই বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রপ্রদত্ত উপপত্তি বিচার করিবার যোগ্য বিষয় যে, নিরিন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব পাঁচই বা কেন এবং সেন্দ্রিয় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব এগারোই বা কেন মানা আবশ্যক হয়। অর্ব্বাচীন সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞানী জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও বায়ুরূপী তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থসমূহের বর্গীকরণ ইহা হইতে ভিন্ন। সাংখ্য বলেন যে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান মনুষ্যের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে; এবং এই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রচনায় এইরূপ কিছু বিশেষত্ব আছে যে, এক ইন্দ্রিয়ের একই গুণ জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে। চোখে আঘ্রাণ হয় না, কানেও দেখা যায় না; এবং ত্বকের মিষ্ট-তিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব্দ জ্ঞান হয় না; নাক শাদা-কালো বুঝিতে পারে না। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাঁহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয় এইরূপ যদি স্থির হইয়া থাকে, তবে জগতের সমস্ত গুণ ইহা অপেক্ষা অধিক স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, পাঁচ অপেক্ষা অধিক গুণ যদি কল্পনা করাও যায় তাহা হইলে তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ হইতে পারে। উদাহরণ যথা—শব্দ, এই গুণ একই হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙ্গা, চেরা, মধুর কিংবা সঙ্গীতশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে নিষাদ, গান্ধার, ষড়্জ ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশাস্ত্র অনুসারে কণ্ঠ্য, তালব্য ওষ্ঠ্য প্রভৃতি এক শব্দেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। রস কিংবা রুচি ইহারা বস্তুত এক হইলেও তাহারও—মধুর, টক্, নোন্‌তা, ঝাল, তিতো কিংবা কষা ইত্যাদি অনেক ভেদ হইয়া থাকে; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, সাদা, কালো, সবুজ, নীল, হল্‌দে, তাঁবাটে এইপ্রকার রূপও অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। সেইরূপ আবার মিষ্টতা এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধর, তাহাতেও আখের মিষ্টতা ভিন্ন, দুধের ভিন্ন, গুড়ের ভিন্ন, চিনির ভিন্ন, এইরূপ তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে; এবং পৃথক্ পৃথক্ গুণের ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ যদি ধর—এই গুণবৈচিত্র্য অনন্তপ্রকারে অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, পদার্থসকলের মূল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই অধিক হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় পাঁচই এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই বোধগম্য হয়। এইজন্য, কেবলমাত্র শব্দগুণের কিংবা কেবলমাত্র স্পর্শগুণের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ অর্থাৎ অন্য

* ইংরাজি ভাষায় এই অর্থই সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়—

The Primeval matter (*Prakriti*) was at first *homogeneous*. It *resolved* (*Buddhi*) to unfold itself, and by the *Principle of differentiation* (*Ahankara*) became *heterogeneous*. It then branched off into *two* sections—one *organic* (*Sendriya*) and the other *inorganic* (*Nirindriya*). There are *eleven* elements of the organic and *five* of the inorganic creation. *Purusha* or the observer is different from all these and falls under none of the above categories.

গুণের মিশ্রণরহিত পদার্থ আমাদের নজরে না আসিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ কেবলমাত্র রূপ, কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এইরূপ মূল প্রকৃতির পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম তন্মাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন। পঞ্চতন্মাত্র কিংবা তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে উপনিষৎকারেরা কি বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি।

নিরিন্দ্রিয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়া উহাতে পাঁচটিমাত্র সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব আছে এইরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এবং যখন সেন্দ্রিয় জগৎ দেখি, তখন পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই এগারোর অধিক ইন্দ্রিয় কাহারও নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। স্থূল দেহে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় স্থূল প্রতীত হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে কোনপ্রকার সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব না থাকিলে ইন্দ্রিয়সমূহের বিভিন্নতার যথোচিত কারণ বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক উৎক্রান্তিবাদে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছে। এই মতে আদিম ক্ষুদ্রতম গোলাকার জন্তুর ত্বক্‌ই একমাত্র ইন্দ্রিয়; এবং এই ত্বক্ হইতে অন্য ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। উদাহরণ যথা—মূল-জন্তুর ত্বকের সহিত আলোকের সংযোগ হইলে পর চোখ হইল ইত্যাদি। আলোকাদির সংযোগে স্থূল ইন্দ্রিয়াদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে,—আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তত্ত্ব সাংখ্যদিগেরও গ্রাহ্য। মহাভারতে (শাং. ২১৩, ১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাবের এইপ্রকার বর্ণনা আছে:—

শব্দরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ।
রূপরাগাৎ তথা চক্ষুঃ ঘ্রাণং গন্ধজিঘৃক্ষয়া॥

অর্থাৎ "প্রাণীর আত্মায় শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিনিবার ইচ্ছায় চোখ, এবং গন্ধ আঘ্রাণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হয়" কিন্তু সাংখ্যেরা এইরূপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভাব প্রথমে হইলেও, মূল-প্রকৃতিতেই যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইবার নৈসর্গিক শক্তি না থাকে তবে সজীব জগতের অন্তর্ভূত অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীটের চর্ম্মের উপর সূর্য্যালোকের মতই আঘাত বা সংযোগ হউক না, তাহার চোখ—এবং চোখ শরীরের এক বিশিষ্ট অংশ—কোথা হইতে আসিবে? ডার্বিণের সিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুযুক্ত এবং দ্বিতীয় চক্ষুহীন—এই দুই প্রাণী সৃষ্ট হইলে পর, জড়জগতের যুঝাযুঝি বা ঝটাপটিতে চক্ষুযুক্ত প্রাণী অধিককাল টিকিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। কিন্তু নেত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার উপপত্তি, পাশ্চাত্য আধিভৌতিক সৃষ্টিশাস্ত্র বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয় মূল এক ইন্দ্রিয় হইতেই পরে পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহঙ্কার প্রযুক্ত প্রকৃতির বহুত্ব আরম্ভ হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচ সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিয়া এগার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কিংবা গুণ, মূল প্রকৃতিতেই যুগপৎ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়া পরে তাহা হইতে স্থূল সেন্দ্রিয় জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক কাজ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গৃহীত সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া বুদ্ধির সম্মুখে নির্ণয়ার্থ স্থাপন করে; এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যোগে ব্যাকরণাত্মক কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত নির্ণয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজে প্রয়োগ করে—এইপ্রকারে উহা উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রকারের কাজ করিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে। উপনিষদেও ইন্দ্রিয়াদির প্রাণ এই নাম দেওয়া হয়; এবং সাংখ্যদিগের মতানুসারে উপনিষৎকারদিগেরও এই মত যে, এই প্রাণ পঞ্চ মহাভূতাত্মক না হইয়া পরমাত্মা হইতে পৃথক উৎপন্ন হইয়াছে (মুণ্ড, ২. ১. ৩)। এই প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা উপনিষদে কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদের এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা করিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এগারই সিদ্ধ হয়, বেদান্তসূত্রের ভিত্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহাই স্থির করিয়াছেন (বেসূ, শাংভা, ২. ৪. ৫, ৬); এবং গীতাতে "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ" (গী, ১৩. ৫)—ইন্দ্রিয় দশ এবং এক অর্থাৎ এগার—এইরূপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব

এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত এই দুই শাস্ত্রেই কোন মতভেদ নাই।

সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই যে, সেন্দ্রিয় জগতের মূলভূত এগার ইন্দ্রিয়শক্তি বা গুণ সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়; এবং নিরিন্দ্রিয় জগতের মূলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্য হইতে ক্রমান্বয়ে স্থূল পঞ্চমহাভূত (ইহার 'বিশেষ' এইরূপ নামও আছে) এবং স্থূল নিরিন্দ্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই পদার্থসমূহের সহিত যথাসম্ভব এগার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সেন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্ট হয়।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত তত্ত্বসমূহের ক্রম—যাহার বর্ণনা এতক্ষণ করা হইয়াছে—নিম্নপ্রদত্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে—

ব্রহ্মাণ্ডের বংশবৃক্ষ

পুরুষ (উভয়েই স্বয়ম্ভূ ও অনাদি) প্রকৃতি (অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(নির্গুণ; পর্য্যায় শব্দ—জ্ঞ, দ্রষ্টা ইত্যাদি)। (সত্ত্ব রজ তম গুণী; পর্য্যায়শব্দ—প্রধান অব্যক্ত, মায়া, প্রসবধর্ম্মিণী ইত্যাদি)

মহান্ কিংবা বুদ্ধি (ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(পর্য্যায় শব্দ—আসুরী, মতি, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি)

অহঙ্কার (ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম)
(পর্য্যায়শব্দ—অভিমান, তৈজস, ইত্যাদি)

(সাত্ত্বিক জগৎ অর্থাৎ ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়) (তামস অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয় জগৎ)

পাঁচ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন পঞ্চতন্মাত্র (সূক্ষ্ম)

বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত (স্থূল)

স্থূল পঞ্চ-মহাভূত ও পুরুষ ধরিয়া সর্ব্ব-সমেত ২৫ তত্ত্ব। ইহার মধ্যে মহান্ কিংবা বুদ্ধি হইতে পরবর্ত্তী ২৩ গুণ—মূল প্রকৃতির বিকার। কিন্তু তাহার মধ্যেও এই প্রভেদ যে, সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও পাঁচ স্থূল মহাভূত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার; এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়, ইহারা কেবল শক্তি বা গুণ; এই ২৩ তত্ত্ব ব্যক্ত ও মূল প্রকৃতি অব্যক্ত। এই ২৩ তত্ত্বের মধ্যে সাংখ্য আকাশে দিক্ ও কালের সমাবেশ করিয়া থাকেন। প্রাণকে পৃথক্ স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সুরু হয় তখনই উহাদিগকেই সাংখ্য প্রাণ বলেন (সাং, কা, ২৯)। কিন্তু বেদান্তী এ মত স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন (বেসূ, ২. ৪. ৯)। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যেরা যেরূপ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্র, বেদান্তীরা তাহা না বলিয়া, উভয়কে এক পরমেশ্বরেরই দুই বিভূতি বলিয়া মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্ত ইহাদের মধ্যে এই ভেদ বাদে বাকী জগদুৎপত্তিক্রম উভয়েরই গ্রাহ্য। উদাহরণ যথা—মহাভারতের অনুগীতায় 'ব্রহ্মবৃক্ষ' কিংবা 'ব্রহ্মবন'—ইহাদের যে দুইবার বর্ণনা আছে (মভা, অশ্ব. ৩৫. ২০—২৩; ও ৪৭. ১২-১৫) তাহা সাংখ্যদিগের তত্ত্ব অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে—

> অব্যক্তবীজপ্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্।
> মহাহংকারবিটপ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥
> মহাভূতবিশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্।
> সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ ॥
> আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
> এনং ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ তত্ত্বজ্ঞানাসিনা বুধঃ ॥
> হিত্বা সঙ্গময়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্।
> নির্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ "অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার বীজ, বুদ্ধি (মহান্) যাহার স্কন্ধ, অহঙ্কার যাহার মুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্দ্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সূক্ষ্ম মহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) যাহার বড় বড় শাখা এবং বিশেষ অর্থাৎ স্থূল মহাভূত যাহার ছোট ছোট ডাল-পালা, এইরূপ সদা-পুষ্পপত্রধারী ও শুভাশুভফলধারী, সমস্ত প্রাণীমাত্রের আধারভূত পুরাতন বৃহৎ ব্রহ্মবৃক্ষ। ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়া, ও টুকরা টুকরা করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর সঙ্গময় পাশকে ছিন্ন করিবেন এবং মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।" সংক্ষেপে এই ব্রহ্মবৃক্ষই "সংসারের লীলা" কিংবা প্রকৃতির বা মায়ার 'প্রপঞ্চ'। ইহাকে 'বৃক্ষ' বলিবার রীতি অতি প্রাচীনকাল ঋগ্বেদের কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে; ইহাকেই উপনিষদে 'সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ'

বলা হইয়াছে (কঠ, ৬, ১)। কিন্তু বেদে এই বৃক্ষের মূল (পরব্রহ্ম) উপরে এবং শাখা (দৃশ্য জগতের বিস্তার) নীচে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখ্যদিগের তত্ত্ব, ইহাদিগকে একত্র জুড়িয়া গীতায় অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, ১ ও ২ শ্লোকসম্বন্ধীয় আমার টীকাতে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

বিজয়-সঙ্গীত।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

ধন্য আজি হে ভারত রাজন্ বিজয়ী মহান্ বীর।
শান্ত উদার প্রকৃতি তোমার সতত সুশীল ধীর॥
ধর্ম্ম তোমার সদা সহচর সতত সকাশে রয়।
জগত্‌বাসীরে দেখাইলে তুমি "যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥"
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥
সদর্পে দলিয়া জর্ম্মান্‌দলে প্রচারি ধর্ম্মের মহিমা।
দেখালে হে তুমি জগত্‌বাসীরে ন্যায়ের শুদ্ধ গরিমা॥
শান্তি তুমি স্থাপিলে জগতে মহান্ কষ্ট নিবারিয়া।
শান্ত আজি হে অশান্ত জগত্ তব দত্ত শান্তি পাইয়া॥
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥
দীর্ঘ চারিটী বরষ অতীত প্রলয় প্রচারি জগতে।
এসেছিল রাহু মহাযুদ্ধ-রূপে পৃথিবীবাসীরে গ্রাসিতে॥
তাড়ায়ে রাহুরে ভৈরব বিক্রমে প্রচারি ধর্ম্মের জয়।
শান্ত তোমার মহান্ বিক্রম জগতে প্রচার হয়॥
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥
রক্ষ ভগবন্ মোদের মহান্ শান্ত উদার রাজারে।
বাড়াও তাঁহার মহান্ বিজয় করুণা তোমার সঞ্চারে॥
শান্তি তুমি দাও জগ-বাসীগণে দুঃখ-ভয় সদা নাশিয়ে।
শান্ত রাজার মহতী শান্তি দাও জগজনে জানায়ে॥
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া।
শুনাও চারণ জগত্‌বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া॥

রাণাডের-স্মৃতিকথা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফায়নান্‌স্ কমিটিতে নিয়োগ—১৮৮৬ অব্দ।

সিমলাযাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমরা পুণা হইতে বাহির হইয়া, আহমদাবাদে, ওঁর মিত্র প্রোঃ-বাবাসাহেব কাণবটের গৃহে প্রথমে আড্ডা করিলাম। এই সময়ে, ওঁর প্রাণপ্রিয় মিত্র রাও বাহাদুর শঙ্কর পাণ্ডুরং পণ্ডিত, কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি সরকারের নারাজি-বশতঃ বেকার অবস্থায় ছিলেন। সিমলায় যাইবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়া, তাঁহাকে ওঁর সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাছাড়া এই সময়েই, ভাবনগরের এক ধনশালী ও উচ্চবংশীয় নাগর গৃহস্থ হরিপ্রসাদ সন্তকরাম দেশাই ওঁর ও পণ্ডিতের মিত্র হওয়ায় সিমলাদর্শনোদ্দেশে, নিজের ছেলেপুলে ও চাকর-বাকর সঙ্গে লইয়া ভাব-নগর হইতে অহমদাবাদে আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে আমরা সকলে মিলিয়া যাত্রা করিলাম। আমরা সবশুদ্ধ প্রায় ৪০। ৫০ জন ছিলাম। আমাদের মধ্যে আমরা দু'জন, ননদ, বাবা ভাউজী; ঝী, ব্রাহ্মণ ও এক চাকর এই তিনজন ভৃত্য এবং ওঁর মিত্র—রাও বাহাদুর পণ্ডিত; বাকী—দেশাইদের মধ্যে ভাইসাহেবের পরিবার, দুই মেয়ে ও দুই চাকর, অনেকগুলি মেয়েমানুষ, ভাইসাহেব, ভাই-সাহেবের চার ছেলে, বাড়ীর খাস্ কবিরাজ; আরও কতকগুলি নিকট আত্মীয় ও বাকী চাকর-বাকর: অহমদাবাদ হইতে বাহির হইয়া, দ্বিতীয় আড্ডা হইল জয়পুরে। আহারাদির পর, আমরা সবাই তত্রত্য প্রসিদ্ধ ম্যুজিয়ম দেখিতে গেলাম। সেখানে অনেক মিস্ত্রি কারিগর, সাদা মার্ব্বেল পাথরের কাজ—দেবতা-দিগের খুব সুন্দর মূর্ত্তি, পক্ষী ও জীবজন্তুর চিত্র, চৌকোণ, অষ্টকোণ বাদামী ও গোল ছোট ছোট বাক্স, জরির কাজ, থালা বাসন এইরূপ অনেক তরোবেতরো শিল্পকাজ তৈয়ারী করিতে ছিল; তৈরী-হওয়া জিনিসগুলা তাকের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। তন্মধ্যে, লক্ষ্মীনারায়ণের এক মূর্ত্তি, ছোট হাল্কা ও সুন্দর হওয়ায়, আমার ননদের ভারী পছন্দ হইল এবং তিনি উহা লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ মূর্ত্তি আনিয়া দেওয়া হইল। সেখান হইতে আমরা রাজপ্রাসাদ ও সরকারী বাগান দেখিতে গেলাম। যাইতে যাইতে সহরের যে যে অংশ নজরে পড়িল সেই সব দেখিয়া বাসায় আসিলাম এবং রাত্রির গাড়ীতে, অম্বালায় যাইবার জন্য যাত্রা

করিলাম অম্বালা পর্য্যন্ত রেল ছিল। সেইখানে পৌছিয়া, টঙ্গায় চড়িয়া কাল্কায় গেলাম। কাল্কায় 'উড়িয়া গার্ডেন' নামক এক দ্রষ্টব্য বড় বাগান আছে। উহা দেখিবার জন্য আমরা কালিকায় থামিলাম। এই সময় বেলা ১১।১২টা হইয়াছিল। উপন্যাসে কোন উদ্যানের যেরূপ বর্ণনা থাকে, সেইরূপ এই বাগানের দৃশ্য বড়ই মনোহর। প্রথমতঃ, আমাদের তিন দিনের প্রবাস হইতে সেই উদ্যানে. ঘোর গ্রীষ্মের সময় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ফল-পুষ্পে সুশোভিত বাগান, বৃক্ষের শীতল ছায়াতে এবং স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ চৌবাচ্চার উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় আমাদের নিকট উহা আরো রমণীয় হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ চিত্তপ্রফুল্লকর সেই প্রদেশের বিভিন্ন রঙের, সুন্দর গঠন ও সুন্দর আকারের, মধুর কণ্ঠ বিহঙ্গ; কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র চড়াইয়ের মতো পক্ষী খুব উচ্চ ও মিহি গলায় শিস্ দিতেছে; তাহাদের শিস্ ও মঞ্জুল কলধ্বনিতে আমাদের প্রবাসের সমস্ত শ্রম অপনীত হইয়া মন আনন্দে পূর্ণ হইল। এই বাগানে পিয়র নামক ফলের গাছই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই সবুজ ফলগুলায় এক দিক্ লাল হওয়ায়, সিঁদুরে-আমের মতো দেখাইতেছিল। আম-গাছের মতো এই গাছে খুব পাতা; গাছগুলা বেশ ছত্রাকার ও খাটো। এই সময় ফলের মৌশম হওয়ায়, গাছগুলা ফলভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। মাটীতে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ফল পাড়া যাইতে পারিত। মনে হইত যেন ফলের চেয়ে পাতা কম। চৌবাচ্চার কাছে যেরূপ করিয়া তাহার উপরে বিচিত্র রংএর ও গন্ধের ফুলের লতা চড়ান হইয়াছে। মোটের উপর বাগানটি খুবই ভাল, এবং চিরকাল মনে থাকিবার মতো। উদ্যানটি দেখিয়া আবার আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। রাত্রি ৮টায় সিমলায় আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে যে-বাঙ্গলা ভাড়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের হিন্দু পরিবারের অন্তর্গত ৩০।৪০ জন লোক বেশ থাকিতে পারে। এই বাঙ্গলা অর্কীর রাজার;—পুরাতন গোরস্থানের নিকটে। বাঙ্গলাটা দুই-মহল ও বড় হওয়ায়, দেশাই ও আমাদের পরিবার মণ্ডলীর বেশ সংকুলান হইয়াছিল। এই বাঙ্গালার একতালায় অর্কী রাজার গোমস্তা থাকিতেন। সিমলার হাওয়া খুবই উত্তম এবং জলও বেশ মিঠা। কিন্তু প্রচুর নহে—বস্তীর পরিমাণে বড়ই কম; তাই দেখা যাইত, সেখানকার পাহাড়ী লোক কাঠের টবে বসিয়া স্নান করিতেছে এবং সেই জলেই সদরা (লম্বা জামা) ও ইজার ধুইতেছে। সেখানকার স্ত্রীলোকদিগের পোষাক—তুলা ভরা ইজার, গাত্রে সদরা ও মাথার উপর তিন চার হাত লম্বা ওড়না। হাতে পায়ে গলায় ও মাথায় রূপা, পিতল ও মণির নানা প্রকার গহনা। উহারা অনেকগুলি বেণী বাঁধিয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেয়—বরফ পড়িতে আরম্ভ করিলে এই সব লোক আশের পর্ব্বতের তলদেশে ও আশপাশে অবস্থিতি করে। পুরুষদের পোষাক—লঙ্গোটী, সদরা এবং মাথায় জড়াইবার চার পাঁচ হাত লম্বা কাপড়ের টুকরা এই মাত্র। ইহাদের মজবুত গঠন, রং গৌর ও সুকুমার। ইহাদের মধ্যে অনেকে, বেহারা কিংবা মজুরের কাজ করে। উহাদের ভিতর, চার পাঁচ কিংবা ততোধিক ভায়ের এক স্ত্রী গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। অবস্থা অনুকূল হইলে. আরও এক স্ত্রী গ্রহণ করিলেও চলে। আমাদের আচার ও নীতিসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ উহারা মানে না। আমরা যে সময়ে ছিলাম সেই সময় আমাদের বাঙ্গলার আসপাশে কুলীলোকের অনেক বসতি ছিল। সন্ধ্যাকালে উহাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের কম্পৌণ্ডে বসিবার জন্য আসিত। তাহাদের সহিত সহজভাবে কর্থাবার্ত্তা কহিয়া, এই কথা আমি জানিয়াছি। আমাদের দক্ষিণী লোকদিগের সম্বন্ধে সেখানকার লোকেরা শুধু নহে, য়ুরোপীয়ন লোকেরাও বেশী কিছু জানে না, এইরূপ দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে আমাদের বাঙ্গলার আমরা সবাই বেড়াইতে বাহির হইলে পর, আমাদের দলের ১০।১৫ জন লোক চার পাঁচ জন চাকর এবং ৪।৫ খানা "জিনরিকে"র (হাত গাড়ী) ২০।২৫ জন কুলী থাকিত। এক এক জিনরিকের চার-জন করিয়া কুলী। এইরূপ সবশুদ্ধ অনেক লোক জমা হইত। সেই সময়কার সিমলার রাস্তা অতিশয় সংকীর্ণ, তেড়াবাঁকা ও উঁচু-নীচু ছিল। তাই, আমাদের সমস্ত লোক সবাই একসঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলে রাস্তা লম্বালম্বি ভরিয়া যাইত, সেই জন্য নূতন কোন দর্শক এইরূপ মনে করিত যে, ইহারা কোন এক রাজার অনুচরবৃন্দ। এইরূপ অবস্থায় আমাদের সহিত কোন সাহেবের রাস্তায় সাক্ষাৎ হইলে, সাহেব আমাদের চাপরাশীকে (সেখানকারই লোক) জিজ্ঞাসা করিতেন, "ইয়ে কাঁহাকা রাজা হ্যায়?" তাহাতে চাপ্রাশী উত্তর দিত—"পুণার"। শুধু "পুণা" শব্দে কোন পরিচয় লাভ হইত না। একটু মুস্কিলে পড়িয়া চাপ্রাশী আবার বলিত—"পুণা সাতারার রাজা"। তখন সাহেব "হাঁ" বলিলে, সে মনে করিত সাহেব এইবার ঠিক্ বুঝিয়াছেন। আমরা সিমলায় চারমাস ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমাদের একটুও বিরক্তি বোধ হইত না। সকাল ও দুপর বেলায় আমরা আপন আপন কাজে ব্যাপৃত থাকিতাম। সন্ধ্যাকালে ৫টা বাজিলে, স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলিয়া

কখনও 'জক্কোর' উপর (এই পাহাড়ের চূড়ায় বানরের যে স্থান আছে তাহা রামদাস স্বামীর স্থাপিত এইরূপ কথিত আছে এবং সেখান হইতে, বরফে ঢাকা হিমালয়ের শিখর-মালা দেখা যায়—মনে হয় যে, রূপার রস গড়াইয়া পড়িতেছে)। কখন 'কুসুমতি' পাহাড়ের উপর ও কখন এখানে সেখানে বেড়াইতে যাইতাম। সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পর, ৯টা রাত্রি পর্য্যন্ত ওঁর-কাছে ইংরেজী পড়িয়া শুনাইবার ভার পণ্ডিতের উপর ছিল; এই কাজ তিনি বেশ প্রীতির সহিত করিতেন; কিন্তু বাহির হইতে আসিয়া কিয়ৎকাল পরেই—"মাথা ব্যথা করচে", "বড় খিদে পেয়েছে" এইরূপ বলিয়া, পড়া বন্ধ করিয়া, হাত মুঠা করিয়া ছোটো ছেলের মতো বসিতেন। ইহা দেখিয়া "ওঁর" হাসি পাইত। এবং বুঝাইবার মতো আদরের স্বরে উনি তাঁহাকে বলিতেন, "এরূপ করা কি ভাল? তৃতীয় স্তম্ভটা পর্য্যন্ত পড়। তার পর আমরা খেতে উঠ্‌ব। এখনো তোমার ছেলে-মানুসি গেল না ছোট ছেলের মতো তোমার কতই বাহানা"। ইত্যাদি বলিবার পর, পণ্ডিত হাসিয়া নীরবে আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন। কিন্তু একটু পরেই প্রত্যেক বাক্যের উপর কিছু না কিছু টীকাটিপ্পনী ও ঠাট্টাতামাসা করিয়া নিজেও হাসিতেন এবং ওঁকেও হাসাইতেন। এইরূপ ভাবে ৯টা পর্য্যন্ত, ঠাট্টাতামাসা, ইংরেজী-পঠন হইবার পর, আহারে বসিতেন। খাইতে বসিলেই বা কি হইবে? প্রথমতঃ ত তাঁহার ক্ষুধা হইত না; সেই জন্য প্রত্যেক জিনিস হাতে লইয়া, কখন ভাল, কখন খারাপ বলিয়া হাসিয়া ও টীকা করিয়া, খাওয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, কোনরূপে সময় কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার মনের অভিপ্রায় এই ছিল—আজ যে আমি আহার করিলাম না,—ইহা যেন "ওঁর" নজরে না পড়ে। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি ভাত খাইতে বড় একটা ভাল বাসিতেন না। কিন্তু নিয়মমতো যে লুচি (পুরী) থাকিত তাহাও খাইতেন না, কেবল মুখভঙ্গী করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। "উনি" সেই সময় কিছু বলিতেন না, কিন্তু ইহা ওঁর নজর এড়াইত না। সেই জন্য যে দিন তিনি খাইতেন না সেই দিন উনি তাঁহাকে বলিতেন—"থামো উঠো না, আজ যতটা তোমার খাওয়া উচিত তুমি তা খাওনি। লুচী নেও, কিংবা দুধ খাও—তার পর উঠো"। ঠিক্ সময়ে ধরা পড়িয়াছেন দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, "এতক্ষণ যে চেষ্টা করলুম, সব বৃথা হল"। একদিন এইরূপ তাঁহার খাওয়া হয় নাই; তাই "উনি" দুধ খাইবার জন্য তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "দিদিমণি পাশে ছিলেন বলে' আপনাকে সাম্‌নে নিয়ে চুপ্‌করে বসে ছিলুম, তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি। কিন্তু একটা জিনিসও ভাল হয়নি; তবে আর খাব কি? তখন আমি বলিলাম;—"কোন্ কোন্ জিনিস খারাপ হয়েছে একবার বর্ণনা কর—তাতেই অনেকটা সময় কেটে যাবে। কোনো রকমে সময় কাটান চাই—এই না? তোমার খিদে ছিল না—এ আর বল্‌তে হবে না!!" এই কথায় পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি আমাকে বলতে বলচ আমি বলচি। এর দরুন যদি কেউ রাগ করে, আমাকে দোষ দিও না। বলব আর কি? কোশিম্বিরটা টক্ হয়েছে, তরকারী সুস্বাদ হয় নি; ভাজী একটু ভাল হয়েছে কিন্তু তাও আবার বেশী তেলা, ও আমি খেতে পারিনে। "আমটী"তে পেঁয়াজ কম। লুচী বেশী কালো পড়েছে। মুরব্বা নুন হয়েছে। আঁব বেশী পেকে গেছে। তবে আর খাব কি?!!" উনি বলিলেন,—"নুন্‌টা লোন্‌তা নয়, লঙ্কার ঝাল নেই—একথা বলতে ভুলে গেলে কি করে'? হ্যাঁ, সব জিনিসই খারাপ হয়েছে আমি স্বীকার করচি; আচ্ছা তুমি শুধু দুধই খাও"। এইরূপ বলিবার পর, তিনি অগত্যা দুগ্ধ পান করিয়া উঠিলেন। আমাদের সিমলায় আসিবার পূর্ব্বে, পণ্ডিতের উপর সরকার হইতে অকারণ অত্যাচার হইয়াছিল। এই অত্যাচার কেমন?—না, সাপ মনে করে মাটিতে বাড়ী মারিবার মতো। পুর্ণায় যে দিন ফিমেল হাইস্কুলের উদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই দিন শ্রীমন্ত সয়াজীরাও গায়কোয়াড় এই অনুষ্ঠান-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং লীওয়ার্ণর প্রভৃতি সেই সময়কার উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরাও ছিলেন। শ্রীমন্ত গায়কোয়াড় অন্যত্র যাইতে হইবে বলিয়া ঐ সভার কার্য্য সমাপ্ত হইবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে উঠিয়া গেলেন। শেষে যে গান হইবার কথা ছিল সেই গানের পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন—ইহাই লীওয়ার্ণর সাহেবের অসন্তোষের কারণ হইল। কিন্তু রাঃ-বাঃ পণ্ডিত এই হাইস্কুলের মুরুব্বিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনিই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম শেষ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া আগেই গান কমাইয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য লীওয়ার্ণর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই ব্যাপারের মূলে রাজদ্রোহের বীজ আছে এইরূপ তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন এবং সর্ষপকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিয়া, ৩।৪ দিনের মধ্যেই পণ্ডিতকে সস্পেণ্ড করিলেন। ইহা লীওয়ার্ণরের স্বভাবের অনুরূপই হইয়াছিল; কিন্তু রা-বা পণ্ডিতের এবং তাঁহার মিত্র যে উনি—ওঁরও এইজন্য অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতই অভিমানী ও গরম-মেজাজী ছিলেন; অকারণে মানহানি হওয়ায় তাঁর মনে বড়ই আঘাত

লাগিয়াছিল। সর্ব্বদাই ইহা চিন্তা করিতেন বলিয়া তাঁহার মাথা ব্যথা করিত; আহারের দিকে লক্ষ্য থাকিত না; তাঁকে বিষণ্ণ দেখাইত। তাঁহার এই অবস্থা উনি জানিতেন বলিয়া, পণ্ডিতের মন যাহাতে ব্যাপৃত থাকে, খুসী থাকে, তার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেন। প্রতিদিন, যাহাতে তিনি আমোদ পান এইরূপ কথাবার্ত্তা উনি তাঁহার সহিত কহিতেন। দুপুরের সময় দুই তিন বার উনি তাঁর ঘরে গিয়া বসিতেন। ৫।১০ মিনিট তাঁহার সহিত কথা কহিয়া পুনর্ব্বার নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইতেন। দুইচার ঘণ্টা ইনি যে তাঁকে একাকী চিন্তা করিতে দিতেন না, ইহাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বৈকালে তাঁহার ঘরে বসিয়াই জলযোগ করিতেন ও চা খাইতেন। ফায়নান্‌স কমিটির যে দিন বৈঠক হইত সেই দিন সেখানে গিয়া পণ্ডিতকে লিখিবার কাগজ দিয়া রাখিতেন এবং সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিলে পর, পণ্ডিতের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে ও লাটনের সরলত্বসম্বন্ধে নিরর্থক কিছু না-কিছু ঠাট্টা করিয়া তাহাকে হাসাইতেন এবং আমি যখন সেখানে যাইতাম, "তুমি আজ কি কি করিলে তার হিসাব দেও" ইত্যাদি উনি তাঁহাকে বলিতেন। পণ্ডিতের ধারণা ছিল,—আমাদের আমোদ দিবার জন্যই উনি ঐরূপ বলিতেন; তাই, তিনি উদাসীন নহেন,—আনন্দেই আছেন—এইরূপ দেখাইতেন; ঠাট্টা তামাসা করিতেন, হাসিতেন; মাথা ব্যথা করিলেও, তাঁহার ঘরে উনি গেলে, চট্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া তাঁহার কিছুই হয় নাই, শুধু শুধু আল্‌সেমি করিয়া বসিয়া আছেন, এইরূপ দেখাইতেন। পাছে তাঁর সম্বন্ধে উনি কিছু খারাপ মনে করেন, কিংবা উদ্বিগ্ন হন,—এরূপ কোন প্রসঙ্গ যাতে না হয় তজ্জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। পণ্ডিতের মন যাহাতে অন্য কোন চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, এই মনে করিয়া উনি একদিন সন্ধ্যাকালে কথায়-কথায় সহজভাবে মাধবরাও কুন্থের কথা পাড়িলেন এবং তাঁহার ধারণাশক্তি সম্বন্ধে ও ঐকান্তিক বিদ্যানিষ্ঠা সম্বন্ধে খুব বর্ণনা করিয়া বলিলেন যে, আমাদের সকলের মধ্যে কুন্থের ধারণাশক্তি ও স্মরণশক্তি সব চেয়ে বেশী। এই কথাটা পণ্ডিতের তেমন ভাল লাগিল না, কিন্তু তবু তিনি কিছুই বলিলেন না। তখন উনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুন্থের গুণের প্রশংসা তোমার বুঝি ভাল লাগ্‌চে না? তখন পণ্ডিত একটু আবেশের সহিত বলিলেন, তাঁর এমনই কি গুণ আছে? ভাল লাগ্‌বার মতোই বা কি আছে? নূতন কিছু শিখ্‌ব মনে করলে আপনি কি শিখ্‌তে পারেন না? তখন "উনি" বলিলেন যে, "আমার এখন অনেক কাজ। আমার কথা ছেড়ে দেও। কিন্তু তুমি ফ্রেঞ্চ শিখছ কি? সত্যি এখনও যদি তোমার শেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে, এখানে শেখ্‌বার লোক আছে। তুমি যদি প্রস্তুত থাকো ত শেখো। তবে কি না, যিনি শেখাবেন তিনি হচ্চেন একজন মহিলা! তাঁর বাঙ্গলায় তোমাকে রোজ যেতে হবে। তিনি তোমার বাড়ী আস্‌বেন না। তিনি যেখানে থাকেন সেই পাহাড়টার নাম "কুসুমতী হিল্"। দেখ তুমি যদি শ্রম স্বীকার করতে পার ত এখনি লেগে যাও। তোমাকে আমি এই সুযোগটা দেখিয়ে দিলুম।" পণ্ডিত কিছুই বলিলেন না; কেবল একটু হাসিলেন। তার পর, খাবার সময় হইয়াছে বলিয়া আমরা সবাই খাইতে গেলাম। সকালে উঠিয়া চা-খাইবার সময় পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি ফ্রেঞ্চ শিখ্‌বার কিছু সুবিধা আছে?" তখন উনি বলিলেন যে, "বাঃ তুমি কি মনে করচ তোমাকে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম? এই দেখ, তাঁর নাম ও ঠিকানার চিঠি আমার পকেটে আছে। কাল যদুনাথ বাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে, এই কথা জান্‌লেম।" তার পর দিন হইতে পণ্ডিত সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত সেই মহিলার বাড়ী সত্য সত্যই ফ্রেঞ্চ শিখিবার জন্য যাইতে লাগিলেন এবং "ওঁর" অনুমান অনুসারে এই নূতন আসক্তির দরুন পণ্ডিতের মনের বিষণ্ণতা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে মনে হইল। তা ছাড়া সেই সময়কার ভাইসরয় লর্ড ডফ্‌রিনের সহিত দুই চারিবার সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ায় পণ্ডিতের মন অনেকটা ভাল মনে হইল। যাক্। সবশুদ্ধ সিমলার চারি মাস আমাদের সবারই, বিশেষত "ওঁর" ও শঙ্কররাওর বেশ কাটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা ফিরিয়া আসিবার পর, সিমলা-প্রবাসের বর্ণনা লিখিতে আমাকে উনি বলিলেন; কিন্তু আমার লেখা আসে না, এবং যদি কিছু লিখি তার উপর লোকে টীকা-টিপ্পনী করিবে এই ভয়ে কিছুই লিখিলাম না। রাস্তায় একদিন পণ্ডিতকে দেখিতে পাইয়া উনি বলিলেন,—তুমি সিমলা প্রবাসের কথা লিখ্‌ছ, কিন্তু কুসুমতী পাহাড়ের মেম সম্বন্ধে কিছু লিখো না। এইটুকু শুধু সহজভাবে লিখো সিমলায় এক পণ্ডিতানী মেম্‌কে রাখা হয়েছিল। পণ্ডিত অমনি বলিয়া উঠিলেন, "শেখ্‌বার জন্য" বলো। এ রকম অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কেন বল্‌চ? ওরকম করে আমার নামে অপবাদ এনো না; ওরকম বল্লে, আমাদের লোকেরা এ কথা সত্যিই মনে করবে।" সিমলায় ৪ মাস হইয়া গেলে, ফায়নান্‌স কমিটিকে মান্দ্রাজে যাইতে হইবে বলিয়া, সেই সঙ্গে আমাদেরও যাইতে হইবে। তাই, আমরা আবার পুণায় যাত্রা করিলাম। প্রথমে সিমলায় যাইবার সময় ত্বরা থাকায়, পথের প্রসিদ্ধ তীর্থ ও সহরগুলি দেখিবার অবকাশ পাই

নাই ; তাই ফিরিবার সময় প্রত্যেক তীর্থক্ষেত্র ও নগরে দুই এক দিন থাকিয়া তাহা দেখিয়া যাইব এই উদ্দেশে তিন সপ্তাহের ছুটি লওয়া হইয়াছিল। সিমলা হইতে যাত্রা করিয়া হরিদ্বারে যাইবার জন্য, নীচে নামিবার সময় পথে কাল্কা ও অম্বালা এই দুই স্থানের মধ্যে খুবই রাত্রি হইল। সেই সময় রাস্তার উপরেই এক চালা-ঘর দেখা গেল ; সেখানে টাঙ্গা দাঁড় করাইয়া নিকটে জলের অনুসন্ধানে দুই একজন গেল। সেই চালাঘরে গিয়া মোমবাতী জ্বালাইয়া আমরা এদিক ওদিক দেখিতেছি—সেখানে এক আবড়ো-খাবড়ো ঘরাঞ্চির মতো একটা বেঞ্চি ছিল। আমরা দুই জন ও পণ্ডিত সেইখানে গিয়া বসিলাম। যারা জল আনিতে গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিলে তাহাদের অবকাশ হওয়ায় আমি জলযোগের পাত্র ও ঝুড়ি আনিবার জন্য চাকরদের আদেশ করিলাম এবং এখানকার সেখানকার নানা কথা বলিতে লাগিলাম। পণ্ডিত বলিলেন, আজ তুমি জলযোগের জন্য কি করিয়াছ! আমার বড় খিদে পেয়েছে। তা থেকে ঠাট্টা সুরু হইল ; উনি বলিলেন—"এই নির্জ্জীব পদার্থে তোমার ক্ষুধা শান্তি হবে না"। পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা কতকটা সত্যি" ; নির্জ্জীব সজীবের কথা কিছু মনে না করলেও এই বামুনে খাদ্যের চেয়ে সেই খাদ্যের স্বাদ ও রুচি বেশী তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহারা কোন কিছুর স্বাদ পায় নি আমার বিবেচনায় সেই সব লোক অতি দুর্ভাগ্য।" তাহাতে উনি চট্ করিয়া উত্তর দিলেন যে "তোমার এই সৌভাগ্য তোমারই থাক্। ঐ রকম সৌভাগ্য লাভে ইচ্ছা যেন আমাদের জন্ম জন্মান্তরেও না হয়"। এইরূপ অনেক ঠাট্টার পর পণ্ডিত বলিলেন—"এই কথা বলায় যদি এতই বিরক্ত হয়ে থাকেন তাহা হইলে আপনি যে বিলেত যাবেন বলে' মনে করচেন তার কি হবে?" 'উনি' বলিলেন—"সেখানে এমন একটি দল আছে যারা ও-পদার্থ ছোঁয়ও না। কিন্তু ও কথা কেন বলচ? আমাদের দুধভাত ও দাল-ভাতের সুবিধা করে নিয়ে তবে আমরা যাত্রা করব। যদি সময়-মতো দুধ পাওয়া না যায়, নিদেন ভাতের উপর ছোলার ডা'ল দিয়ে'নেব। আস্বাদ-বৈচিত্র্যের জন্য আমাদের অনেক জিনিসের দরকার নেই।" যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, জল লইয়া আমাদের লোকজন টাঙ্গার কাছে আসিল। এক্ষণে জলযোগ করিবার পূর্ব্বে জায়গাটা ঝাড়িতে হইবে বলিয়া পুনর্ব্বার বাতী জ্বালান হইল এবং ঝাড়িবার মতো কিছু আছে কিনা ভৃত্য এদিক্ ওদিক বাতী লইয়া দেখিতে লাগিল। পণ্ডিতের নজর সেই দিকে যাওয়ায় তিনি হোহো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "ওহে! এ শুধু চালা-ঘর নয়—এটা কসায়ের দোকান"। উনি জিজ্ঞাসা করিলেন :—"এটা তোমার কেন মনে হল?" তিনি বলিলেন—"কেন মনে হল? এই দেখুন একটা আস্তো কাঠের কুঁদো।" এই কথা বলিয়াই হাসিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া "এখানে কোন জিনিস্ বার কোরো না" বলিয়া উনি একেবারে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তার পর, রাস্তার ও-ধারে খোলা জায়গায় আমরা জলযোগ করিতে বসিলাম। শঙ্কররাও এই সুযোগ পাইয়া মধ্যে মধ্যে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"কসায়ের দোকান"—শুধু এই শব্দ মাত্র শুনেই বিদ্যুতের ধাক্কা লাগ্‌বার মতো একদম উঠে এদিকে এলেন যে—ব্যাপারটা কি?" ইত্যাদি অনেক বোল-চাল ও ঠাট্টা করিতে করিতে আমাদের জলযোগ হইল। তার পর আমরা ষ্টেশানে আসিলাম এবং গাড়ীতে যাত্রা করিয়া সকালে ৭।৮ টার সময় হরিদ্বারের ষ্টেশনে অর্থাৎ সহারানপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থপরিচয়।

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন :—ডাক্তার—শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু প্রণীত—এই পুস্তিকাখানি প্রত্যেক পল্লীবাসীর পাঠ করা উচিত। পল্লীগ্রামে বাস করিতে হইলে কি উপায়ে নির্ম্মল বায়ু সেবন করা যায়, নির্ম্মল জল পান করা যায়, কিরূপ খাদ্যে দেহ পুষ্ট হয় ও কিরূপ ভাবে বিশ্রাম, ব্যায়াম করিলে ও কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহার সঙ্কেত ইহাতে করা হইয়াছে। পুস্তিকায় কতকগুলি সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তিকার মূল্য যেমন "আগাগোড়া পড়িবার অঙ্গীকার" স্থির করা হইয়াছে সেইরূপ ইহার প্রচার পল্লীগ্রামে বেশী হইলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামের প্রত্যেক মাইনর স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বিতরণের জন্য কয়েক খণ্ড করিয়া প্রতিবৎসর প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। Some practical Hints to improve the Diatory of the Bengalis—by Chuni Lall Bose I. S. O., M. B., F. C. S. Rasayanacharya. ডাক্তার চুণিবাবু বাঙ্গালীর আহারসম্বন্ধে এই পুস্তিকাখানিতে যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন সে গুলি তাঁহার অভিজ্ঞতা ও বহু-দর্শিতার ফল। এই ক্ষুদ্র

পুস্তিকাখানিতে অনেক খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা করিয়াছেন এবং কি খাদ্যে কিরূপ পুষ্টিকর পদার্থ আছে তাহাও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বুঝাইয়াছেন। ডাল, ঘৃত প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের গুণ ও রাসায়নিক তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে যথাসম্ভব বলা হইয়াছে। এই পুস্তিকাটী প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পাঠ করা উচিত।

The milk supply of Calcutta its Hygienic commercial and Social Aspects :—by Chuni Lall Bose I. S. O. M. B. R. C. S.—পুস্তকাখানি প্রত্যেক গৃহস্থের বিশেষতঃ প্রত্যেক কলিকাতাবাসীর পাঠ করা উচিত। ইহাতে শৈশবাবধি মানব-জীবনে দুগ্ধের উপকারিতা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বুঝান হইয়াছে। এই পবিত্র খাদ্য কলিকাতায় কি ভাবে সরবরাহ করা হয় ও কি ভাবে গোয়ালারা ব্যবসায়ের জন্য বিকৃত করে এবং কি উপায়ে গৃহস্থগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে সহজে তাহা ধরিতে পারে তাহা বিশেষ রূপে বলা হইয়াছে। কি উপায়ে বিকৃত দুগ্ধ বিক্রয় না হয় এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে কি উপায়ে বাজারে পবিত্র দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। উপরোক্ত দুইটী পুস্তিকা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে সাধারণের অধিকতর উপকারে আসিত বলিয়া মনে হয়।

দান প্রাপ্তি।

বালীগঞ্জ ২১ নম্বর ষ্টেসন রোড্ নিবাসী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲ টাকা এবং পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৲ টাকা আদি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

কলিকাতা ৪৯ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট-নিবাসী—শ্রীমতী সুখদা নাগ তাঁহার স্বামী ডাক্তার আর, কে, নাগের আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহার স্বামীর আত্মার কল্যাণ বিধান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন।

নিবেদন।

অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকা বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রেসম্যান ও কম্পোজিটরগণ সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। আশা করি তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

নিঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে]	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ) (পুনর্মুদ্রিত হইতেছে)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
যশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত)	৵০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	৴০
Trust Deed	৴০
শ্রেয় ও প্রেয়	৴০
মাতৃপূজা	৴০
অকারণ নিরাশা	৴০
আদি ব্রাহ্মসমাজের সবলতা ও দুর্ব্বলতা	৴০
আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবনা	৴০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	„]
The Theist's Prayer Book	„]
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	৲

	পূর্ণ মূল্য।
স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P, „ 4 „
Adi Samaj as a Church	„ 4 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	„ 4 „
TheDoctrine of Christian Resurrection	„ 2 „
আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত	
রাজা হরিশ্চন্দ্র „	॥০
আঁখিজল „	॥০
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১।০
ওঁ পিতা নোঽসি	॥০
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	॥০
বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	৴০
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	॥০
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	
সত্যসুন্দর মঙ্গল	১৲
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	॥০
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	
উপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৴০
শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত	
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১।০
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত	
সনেট পঞ্চাশৎ	॥০
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত	
আমার খাতা	৸০
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸০
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	
গীত পরিচয়	৷৵০
শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	
সঙ্গীত মঞ্জরী	৫৲
শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত	
Life of Dwarka N. Tagore	।০

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 462

৯০৫ সংখ্যা ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা মাঘ, বুধবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। { আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ঊনবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ।
পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।
৯০৫ সংখ্যা। ১৮৪০ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

গান।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

ওরে ও মন! আনন্দে থাক্,
আনন্দময়ের নিকেতনে,—
মায়ের কোলে ক্ষুদ্র শিশু
রহে যেমন ফুল্ল মনে।
মুক্ত এই বিশ্বভাণ্ডার
সবার তরে রাত্রিদিন,—
যার রে যাহা পাওনা আছে,
পাচ্ছে সে তা' বিরামহীন!
ওরে ও মন! প্রাপ্য যা' তোর
রয়েছে ঠিক রাজার দ্বারে,
পাবি তা' তুই চাবার আগে,—
বঞ্চিত কে করতে পারে?
কেন রে তবে ভাবিস্ বৃথা,
কাঁদিস্ কেন অকারণে,—
হেসে খেলে বেড়ারে তুই
গানের সুরে ত্রিভুবনে!

ঈশ্বরকে জানা আর না জানা।

(বালকদের জন্য)

অনেক হাজার বৎসর আগে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল তলবকার। নামটা হয়তো তোমাদের মনের মতো হয় নি। কিন্তু ঋষিদের যুগে এই রকম বেঢপ গোছের নাম অনেক দেওয়া হোত। এই তলবকার ঋষি ঈশ্বরকে জানা সম্বন্ধে বড় উঁচুদরের কথা বলে গেছেন—কথাটী দুটী লাইনে বলে গেছেন, কিন্তু সেই দুইটী লাইনেরই কি গভীর ভাব—সে ভাবটী ভাল করে আয়ত্ত করতে চাইলে সমস্ত জীবনেও পারা যায় কিনা সন্দেহ। ঋষির কথাটী ঋষিরই ভাষায় বলব, তারপর তার মানে বাঙ্গলা ভাষায় বলব, তাহলেই তোমাদের মনে কথাটী বেশ বসে যাবে। সেই কথাটী হচ্চে:—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

এর মানে হচ্ছে—"আমি ঈশ্বরকে ভাল করে জেনেছি তা মনে করি নে। আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমনও নয়, আর জানি যে এমনও নয়। 'আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমনও নয়, আর জানি যে এমনও নয়' এই কথার ঠিক ভাব আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।" কি সুন্দর কথা—কি গভীর ভাবের কথা বল দিকিন? এর ভাবটা কি বুঝতে পারলে? ভাবটা হচ্ছে এই যে, আমরা ঈশ্বরকে একেবারে পুরোরকম জানতে পারিনে—এমন কথা বলতে পারিনে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে, সমস্তই জেনেছি, তাঁর বিষয় জানবার বাকী কিছু নেই; কিন্তু তাই

বোলে যে তাঁর বিষয় একেবারে কিছুই জানতে পারিনে, তাও নয়।

ঈশ্বরের বিষয় ঠিকভাবে আলোচনা করলে এই রকমই মনে হয় বটে। কিন্তু যে রকম গভীর জ্ঞান হোলে এই ভাবটা মনে আসে, সকলের মনে সে জ্ঞান হয় না। তলবকার ঋষির মনে সেই গভীর জ্ঞান ফুটে উঠেছিল বোলেই তিনি ঐ কথাটা বলতে পেরেছিলেন। আর, সত্যি কথা বলতে কি, ঋষিদের সময়ে সকল ঋষিরই মনে যে এই গভীর জ্ঞানের কথা প্রকাশ পেয়েছিল, তাও নয়। তা যদি হোত তাহলে ঈশ্বরকে জানা নিয়ে ঋষিদের মধ্যে দুটো দল দেখতে পেতুম না। ঈশ্বরকে জানা যায় কিনা এই বিষয় নিয়ে এখনও যেমন দুটো দল আছে, তখনও সেই রকম দুটো দল ছিল দেখতে পাওয়া যায়। একদল বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, পরকাল আছে এবং বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি জড় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। আর এক দলের মত এই ছিল যে, হাত চোখ নাক কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিকে জানা বা অনুভব করা যায় না, তখন সেই সমস্ত বিষয় যে আছে অথবা তাদের বিষয় যে কোন কিছু জানা যায়, সে কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে না।

ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বলে যাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উপনিষদ যাঁরা করেছেন সেই সব ঋষিরা, আর, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার ঋষিরা, যাঁরা উপনিষদের ঋষিদের মত মেনে চলতেন। যাঁরা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বলে বিশ্বাস করতেন না, সেই দলের প্রধান নেতা ছিলেন চার্ব্বাক মুনি। এইজন্য চার্ব্বাক মুনির মতকে নাস্তিক মত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা অনুভব করা যায় না, এমন কিছুই ন অস্তি অর্থাৎ নাই) বলা হয়। আর, মনে হয় যে এক সময়ে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতিও এই দলের আর একজন প্রধান লোক ছিলেন। চার্ব্বাক বৃহস্পতির শিষ্য বলে প্রসিদ্ধ— আমাদের দেশের শাস্ত্রে এই কথায় উল্লেখ আছে এবং কিম্বদন্তীতে এই কথা চলেও এসেছে। তার উপর দেখা যায় যে, চার্ব্বাক তাঁর নিজের মতের সপক্ষে জোর দেবার জন্য কয়েক জায়গায় বৃহস্পতির কথাও উঠিয়েছেন। এ সত্ত্বেও আমাদের মনের ভিতর একটা খটকা আসে যে, বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু হয়ে সত্যিই কি নাস্তিক মত প্রচার করেছিলেন? দেবতারা যে আস্তিক বলে প্রসিদ্ধ; তাঁরা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বোলে খুবই বিশ্বাস করতেন। তাঁরা যে একজন নাস্তিককে নিজেদের গুরু বোলে স্বীকার করবেন, তা তো সহজে মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, হয়তো বৃহস্পতি অতিবুদ্ধির ফলে যৌবনের প্রথম বয়সে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"র নেশায় নাস্তিক মতের পক্ষপাতী হয়েছিলেন এবং সেই মত খুব প্রচারও করেছিলেন। নাস্তিক মতগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ ও যুক্তির উপর বেশীর ভাগ দাঁড় করানো যায় বোলে সেগুলো সাধারণের কাছে খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বোলে মনে হয়। এই রকম মনে হয় যে, বৃহস্পতির নাস্তিক মতগুলো এক সময়ে ভারতবর্ষের অনেক জায়গা ছেয়ে ফেলেছিল। চার্ব্বাক বোধ হয় বৃহস্পতির সেই সময়ের শিষ্য ছিলেন। পরে যখন বৃহস্পতি জ্ঞানের গভীর সাগরে ডুব দিলেন, তখন আর তিনি নাস্তিক থাকতে পারলেন না; বরঞ্চ নাস্তিকতার অসারতা বুঝতে পেরে ঘোর আস্তিক হয়ে দাঁড়ালেন। এই সময়ে বোধ হয় যে, দেবতারা বৃহস্পতির জড়বিজ্ঞানসম্বন্ধে এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞানসম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্য দেখে তাঁকে নিজেদের গুরু করে নিলেন।

বৃহস্পতি যখন দেবতাদের গুরু ছিলেন, তখন যে তিনি নাস্তিক ছিলেন না, তার আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রবাদ আছে যে, দেবতাদের শত্রু অসুরদের ভোলাবার জন্যই বৃহস্পতি নাকি নাস্তিক মত প্রচার করেছিলেন। হয়তো বৃহস্পতি অসুরদের কাছে কোন কাজের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু অসুরেরা হয়তো তাঁকে সে কাজ দেয় নি; তাই খুব সম্ভব বৃহস্পতি অসুরদের প্রতাপে ভয় পেয়ে মুখে কিছু বলতে সাহস করেন নি, কিন্তু মনে মনে সেই রাগ পুষে রেখেছিলেন। বৃহস্পতি যে রকম বুদ্ধিমান ছিলেন, তাতে এ মনেই করতে পারিনে যে তিনি নাস্তিকতার অবশ্যম্ভাবী কুফল বুঝতে পারেন নি। তিনি জ্ঞানের পথে যখন খুব এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই ঠিক বুঝেছিলেন যে

ঈশ্বর নেই, পরকাল নেই, এই রকম নাস্তিক মত ধরে চলে কিছুতেই ভাল হোতে পারে না, বরঞ্চ সর্ব্বনাশই হয়।

কেন যে নাস্তিকমতের ফলে ভাল না হোয়ে সর্ব্বনাশ হয়, তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে এখানে একটা সহজ কারণ তোমাদের কাছে বোলে রাখব মনে করছি। ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, পরকাল নেই, এ রকম মতের উপর দাঁড়ালে প্রত্যেক মানুষই স্ব-স্ব-প্রধান হোয়ে উঠবে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বোলে আমরা বাপমাকে ভক্তি করি, তাঁদের শাসন মানি; কিন্তু যদি ঈশ্বরই না থাকেন, তবে তাঁরা কারই বা প্রতিনিধি, আর কেনই বা আমরা তাঁদের কথা মানব? সমাজেরই বা বাঁধন মানতে যাব কেন? এই রকমে কোন কিছুরই বাঁধন থাকে না, যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে চাবে। কাজেই একটা বাঁধন থাকলে লোকের এবং সমাজের যে সংযম থাকে, সেটা থাকতে পারে না,তখন মানুষও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, সমাজও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে—সমস্তই নষ্ট হবার দিকে ছুটে যায়।

এখন, বৃহস্পতি এই তত্ত্বটা ভাল কোরে বুঝতে পেরে অসুরদের কাছে ঐহিক সুখের লোভ দেখিয়ে নাস্তিক মত ভাল কোরে প্রচার করেছিলেন বোলে মনে হয়। এর ফলে অসুরদের পতনও যে হয়েছিল তাও আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে দেখি। এই সমস্ত আলোচনা কোরে দেখলে মনে হয় না যে বৃহস্পতি সত্যিসত্যি নাস্তিক ছিলেন। জর্ম্মানদের দৃষ্টান্ত দেখলে এ বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। জর্ম্মনির সম্রাট থেকে আরম্ভ কোরে সকলেই চাইত যে, তাদের দেশের পণ্ডিতেরা এমন সব মত প্রচার করুন যে, জর্ম্মানমাত্রেই ন্যায়ত বা অন্যায়ত অন্যের দেশ জয় কোরে নিজের দেশের ধন-দৌলত বৃদ্ধি করাকে অন্যায় বোলে না মনে করে। এমন অনেক জর্ম্মান পণ্ডিত ছিলেন, যাঁদের ভিতরকার মত ছিল যে অন্যায় কোরে দেশ জয় করা অন্যায়; কিন্তু তাঁরাও জর্ম্মানসম্রাটের ভালবাসার টুকরো পাবার জন্য নিজেদের মতকে দুমড়ে-টুমড়ে যুদ্ধের সপক্ষে দাঁড় করাতে কুণ্ঠিত হন নি। তারই ফলে আজ চার বৎসর ধোরে এই এত বড় লড়াইটা বেধে জগতটাকে উচ্ছন্ন করবার যোগাড়ে ছিল। যাই হোক, বৃহস্পতি অসুরদের ভোলাবার জন্য নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন, এই প্রবাদ থেকে বৃহস্পতিকে ঠিক নাস্তিক বোলে ধরা হোক আর না হোক, অন্তত এইটুকু বোঝানো হয়েছে যে নাস্তিকতা থেকে অধর্ম্মেরই প্রচার হয় এবং যারা নাস্তিকতা ও অধর্ম্মকে ধোরে থাকে, তাদের মহাবিনাশ হয়।

ভারতের খুব সৌভাগ্য যে এখানে নাস্তিক ভাবগুলো তেমন কিছু জোর করতে পারে নি। ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস প্রভৃতি আস্তিক ভাবগুলো এ দেশে এমন জমাট বেঁধে আছে যে, নাস্তিক ভাবগুলো এখানে মাথা তুলতে পারে নি। চার্ব্বাক অবশ্য নাস্তিকতার একটা নতুন মত একবার খুব জোরের সঙ্গে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন বোলে মনে হয়। তাঁর খুব একটা ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নেই, আর সেই কারণে সেকালের ভারতবাসীরা তাঁকে "মুনি"র আসন দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ থেকে চার্ব্বাকমুনির সেই সমস্ত নাস্তিকমত যে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই—আজ তাঁর মতের সমর্থক একখানিও বই পাওয়া যায় না। কাজেই আমরাও বলতে পারিনে যে ঠিক কি রকম যুক্তিতর্কের উপর তাঁর মতটা পুরো রকমে দাঁড় করিয়েছিলেন। তবে দর্শন বিষয়ের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁর মতের বিষয়ে দুএকটা টুকরো কথা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামে একটা সংস্কৃত বই আছে। সেই বইয়ে গ্রন্থকার, নিজের সমসময়ে যে সমস্ত দার্শনিক মত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সেইগুলি সংগ্রহ কোরে লিখে গেছেন। তিনি এইগুলো সংগ্রহ কোরে দেশের যে কি উপকার করেছেন, তা একমুখে বোলে শেষ করা যায় না। এই বইয়ে চার্ব্বাকেরও মত বিষয়ে অল্পস্বল্প কিছু লেখা আছে। কিন্তু সে এত অল্প যে, আমার মনেই হয় না যে, সেইটুকুতেই চার্বাকের দর্শন শেষ হয়েছিল। চার্বাকের মত বোলে বলা আছে যে, যেমন চুন আর হলুদ, এই দুটো জিনিসের রং আলাদা হলেও, দুটোকে মেশালে আর একটা নতুন রং হয়—চুনের রং সাদা,

হলুদের রং হলদে, কিন্তু দুটোকে মেশালে লাল রং হয়—সেই রকম আমাদের শরীরে যে নানা রকমের অচেতন বা জড় বস্তু আছে, সেই সমস্ত জড় বস্তুর এক সঙ্গে মিশে থাকবার ফলে, লোকে যাকে চেতন আত্মা বলে, সেই চেতন আত্মা তৈরি হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কেবলমাত্র এই রকম দুএকটা দৃষ্টান্তের উপর যে চার্বাকের দর্শন দাঁড়িয়েছিল তা বিশ্বাসই করতে পারিনে—বিশেষত এই চার্বাকদর্শন যখন এক সময়ে ভারতের প্রাণকে বেশ একটু নাড়া দিয়েছিল বোলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আসল কথা এই যে, ভারতবাসীর প্রাণটা স্বভাবতই ধর্ম্মের দিকে হেলে আছে—চার্বাকদর্শন যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, ভারতবাসীর প্রাণে সেই নাস্তিকতা-পক্ষপাতী মতগুলো কিছুতেই স্থায়ী হোতে পারল না।

সেকালের মতো একালেও নাস্তিক ও আস্তিক দুই দলের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক চলে দেখা যায়। এদেশে এই তর্কের খুব জোর দেখতে না পেলেও ইউরোপ অঞ্চলে এই তর্ক এখনও খুব জোরে চলছে দেখা যায়। একশো দেড়শো বৎসর আগে নাস্তিকদল যে রকম জোর কোরে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয় একেবারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, এখন আর তাঁরা ঠিক সে ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। এখনকার নাস্তিকদল বোলতে চান যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি থাকলেও আমরা কেউ তা জানতে পারি নে, কেন না আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয় নিয়ে ইন্দ্রিয়ের অতীত ঐ সমস্ত বিষয় জানা অসম্ভব। যে সময়ে ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতির সূত্রপাত হয়েছিল, সেই সময়েই বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা প্রধানত অহঙ্কারে ফুলে উঠে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলেন এবং আস্তিকদের মতগুলোকে একেবারে উপহাসের বিষয় বোলে ঠিক করলেন। কিন্তু ক্রমে যতই বিজ্ঞানের সাগরে পণ্ডিতেরা ডুবতে লাগলেন, ততই তাঁরা অসীমের একটা মহান বিরাট ভাব অনুভব করতে লাগলেন এবং ততই তাঁরা বুঝতে লাগলেন যে, অসীম ভূমাপুরুষের ভাবটা নেহাৎ উপহাস করবার জিনিস নয়,—তবে সেটা আমরা মনের ভিতর আনতে পারি নে, কারণ ইন্দ্রিয়ের অতীত সে সমস্ত বিষয় জানবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। তাঁরা অবশ্য ভুলে গিয়েছিলেন যে, যখনই তাঁরা বলেন যে ইন্দ্রিয়ের অতীত সে সমস্ত বিষয় জানবার ক্ষমতাই তাঁদের নেই, তখনই একরকম তাঁদের মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ও জানবার ক্ষমতা তাঁদের আছে, তা নইলে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের গোচর আর ইন্দ্রিয়ের অতীত এই দুই বিষয়ের তফাৎ বুঝতেও পারতেন না, আর সে তফাতের কথা প্রচারও করতে পারতেন না। আজকাল পুরো নাস্তিক বোলে কেউই নিজেকে বোলতে চায় না; কিন্তু নাস্তিকতার পক্ষপাতী পণ্ডিত ঐ কথাই বোলতে চান যে মানুষ ঈশ্বর প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় জানতে পারে না।

এই মতকে সংক্ষেপে অজ্ঞেয়বাদ বলা যায়, অর্থাৎ যে "বাদ" বা মতে ঈশ্বর প্রভৃতি "জ্ঞেয় নয়" অর্থাৎ জানা যায় না। যাঁরা এই মত স্বীকার করেন বা প্রচার করেন, তাঁদের সাধারণত "অজ্ঞেয়বাদী" বলা যায়। ভারতবর্ষেও বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই মতের ঢেউ এসে লেগেছে। যাঁরা নিজেকে ইউরোপের বিজ্ঞানে দর্শনে পণ্ডিত বোলে জানাতে চান, তাঁদের অধিকাংশই সকল সময়ে মনেতে বিশ্বাস না করলেও অন্তত মুখে ঐ মতের কথাগুলো জাহির করতে চান। ভারতবর্ষে এই সব লোকের সংখ্যা খুব অল্প হোলেও তাঁরা ফেলনা লোক নন। তাঁদের অনেকে ধনে মানে বড়লোক, কাজেই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে তাঁদের নকল কোরে অজ্ঞেয়বাদ প্রচার করতে এগোন। তবে এটা আমরা সাহস কোরে বোলতে পারি যে ভারতবর্ষে নাস্তিকভাবের মত কিছুতেই বেশীদূর শিকড় নামাতে পারবে না। কিন্তু এই ভেবে আমাদেরও চুপ কোরে থাকলে চলবে না—ঐ মতের দোষগুণ ভাল কোরে বিচার কোরে আমাদের নিজেদেরও জানতে হবে বুঝতে হবে যে তাঁদের মতের কোথায় ভুল, আর কোথায় ঠিক; এবং সেইমতো লোকেদেরও জানাতে হবে, বোঝাতে হবে।

আমরা বলি যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, পরকাল আছে। কেবল তাই নয়, আমরা বলি যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের

অতীত বিষয় হোলেও আমাদের ভিতরে এমন একটা শক্তি ও ক্ষমতা আছে, যার বলে আমরা ঐ সমস্ত বিষয় জানতেও পারি। "ঐ সব জানতে পারি" যে মত বলে, সেই মতকে "অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম" বলা যায় অর্থাৎ আত্মার উপর এই ধর্ম্মমত দাঁড়িয়ে আছে এবং যাঁরা এই মত স্বীকার করেন ও প্রচার করেন, তাঁদের সাধারণত অধ্যাত্মবাদী বলা যায়। এই অধ্যাত্মবাদীদেরই একজন—তলবকার ঋষি—বলে গেছেন যে আমরা ঈশ্বরকে যে সম্পূর্ণ জানি তা নয়, আর একেবারে যে জানিনে তা-ও নয়। তাঁর সঙ্গে একহৃদয়ে আমরাও ঐ কথাই বলি যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রকমে আমরা জানতে পারিনে বটে, কিন্তু একেবারেও যে জানতে পারিনে তা-ও নয়। যদি তাঁকে একেবারেই জানতে না পারতুম, তবে যুগযুগান্তর ধোরে তাঁকে জানবার একটা প্রবল ইচ্ছে আসতেই পারত না। আজ এই পর্য্যন্ত। এ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে আরও অনেক বিষয় বলবার আছে, সেগুলো ক্রমে ক্রমে বলবার চেষ্টা করব।

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গৌড়-সারস্বত-ব্রাহ্মণ-দিগের ভাষাগত শব্দের সহিত বাংলা শব্দের সামঞ্জস্য দেখাইব। দক্ষিণদেশীয় সারস্বত সম্প্রদায়ের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় খাঁটি বাংলা (মুখ্য গৌড়) দেশ হইতে আসিয়াছিল। ইহারা "মুখ্য গৌড় সারস্বত" নামে পরিচিত। অপর এক সম্প্রদায় কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে পঞ্চগৌড়ের প্রত্যেক স্থান হইতেই এক এক সম্প্রদায় আসিয়াছিল। যাহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষায় তদ্দেশপ্রচলিত অনেক শব্দ পাওয়া যায়। এবং তাহাদিগের আকার-প্রকারও তদ্দেশীয় লোকের অনুরূপ। "মুখ্য গৌড় সারস্বত"দিগের ভাষাই বাংলা ভাষার অনুরূপ। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য যে বাংলা ভাষার ন্যায় মুখ্য-গৌড় সারস্বতীয়-ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় দ্রাবিড় ভাষারও কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল শব্দ মুখ্য গৌড় সারস্বত এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয় নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রধানতঃ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ সূচী অবলম্বন করিয়া আমরা এই তালিকাটি প্রস্তুত করিয়াছি। তালিকার প্রথমে অর্থাৎ বাম দিকে মুখ্য-গৌড়-সারস্বতীয় শব্দ এবং তৎপরে বাংলা শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে। উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা অন্তঃস্থ "ব"কার অনেক স্থলে "ও" এবং "ব" এর মধ্যবর্ত্তী স্বরে এবং "ল" কার কোন কোন স্থানে "ল" এবং র-এর মধ্যবর্ত্তী স্বরে উচ্চারিত হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে, অন্য ভাষায় অননুরূপ, বাংলা ভাষায় যেমন "অ"কার, "ও" কারের ন্যায়; অন্তস্থ "ব", বর্গীয় "ব"র ন্যায়; এবং "ষ্ঠ". "ষ্ট" এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, ইহাদিগের ভাষায়ও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। যথাঃ— "সরূপ" উচ্চারণ "সোরূপ", "অপূর্ব্ব" উচ্চারণ "অপরুব", "বন" উচ্চারণ "বন" "কৃষ্ণ" উচ্চারণ "কৃষ্ট" ইত্যাদি। "ক্ষ" উভয় ভাষারই "ক্-খ" এইরূপ উচ্চারিত হয়। যথা "ক্ষণ" উচ্চারণ "ক্-খ ণ"।

অগণ্ড	অগণ্ড	অগুণ	অগুণ (দোষ)
অতি	অতি	অথবা	অথবা
অনুমতি	অনুমতি	অনেক	অনেক
অন্তর	অন্তর	অপমান	অপমান
অমূল্য	অমূল্য	অবশ্য	অবশ্য
অবিচার	অবিচার	অশেষ	অশেষ
আই }	আই, মা	আকার	আকার
আয়ী }			
আকাশ	আকাশ	আগো, গো	আগো, ওগো (সম্বোধনে)
আজি, আজু }	আজি	আদি	আদি
আজুনী }			
আঁধার	আঁধার	আরতি	আরতি
আরসী	আরসি	আম্বড়া	আম্বড় (আমড়া)
উঠ	উঠ	উত্তম }	উত্তম
		বরা }	বর
উলট	উলট	উদ্দেশ	উদ্দেশ
উপবাস	উপবাস	একলা }	একলা,
উপাস	উপোষ	একলাটি }	একলাটি

এলায়চি	এলায়চি	কঠোর	কঠোর
কণ্ঠ	কণ্ঠ	কান	কান
কথা	কথা (কথকতা)	কপট	কপট
কপাল	কপাল	কমল	কমল
কর	কর (করা)	করপুর	কর্পূর
করুণা	করুণা	করসি	করসি
কলস	কলস	কাঁকর	কাঁকর
কাজল	কাজল	কাড়ি	কাড়ি (কাড়িয়া)
কাপড় কাপাড় বস্ত্র	কাপড়, বস্ত্র		
কিরণ	কিরণ	কুম্ভার	কুম্ভার, কুমার,
কূল	কূল	কোকিল	কোকিল
কোপ	কোপ	কোমল	কোমল
খাইলি	খাইলি	খাজা	খাজ (মিষ্টান্ন)
খাসা	খাসা	খিট খিট	খিট খিট
খিড়কি	খিড়কি	খেল	খেলা
গরজ	গরজ	গম্	গম্ (স্তব্ধতা)
গরু	গরু	গলা	গলা
গাই	গাই	গাঁব গাম	গাঁ, গ্রাম,
গুণ	গুণ	গেল গেলা	গেলা
গোঠ	গোঠ (গোষ্ঠ)	গোয়ালা	গোয়ালা
গোয়ালিনী	গোয়ালিনী	গোরাখা রাখোবাল	রাখাল
গোবর	গোবর	ঘর	ঘর
চক্র	চক্র	অঞ্চল	অঞ্চল
চড়	চড় (উঠ)	চরিত্র	চরিত্র
চল্	চল	চিত্ত	চিত্ত
চিন্ত	চিন্ত	চুর	চুর
ছত্রি	ছত্র (ছাতা)	ছাতি	ছাতি (সাহস)
জগ, জগত	জগ, জগৎ	জঞ্জাল	জঞ্জাল
জটা	জটা	জন	জন
জননী	জননী	জন্তু	জন্তু
জন্ম	জন্ম	জর	জর
জরদ	জরদ	জাউ	জাউ (যাও)
জাতি	জাতি	জাম্বল	জাম্ব, (জাম)
জাল	জাল	জীব জীবন	জীব জীবন
জুতা	জুতা	ঝগড়	ঝগড়
টাটকা	টাটকা	ঢাকণ	ঢাকণ
ঠেঁকুর	ঠেঁকুর	তণ্ডুল	তণ্ডুল
তক	তক (পর্য্যন্ত)		
তপ	তপ	ত্রাস	ত্রাস
তিথি	তিথি	তিল	তিল
তিলক	তিলক	তীর্থ	তীর্থ
তুহ্মি	তুহ্মি, তুমি	তু	তু, তুই
তেকারণ	তেকারণ (সেকারণ)		
ত্যজস্বি	তেজস্বি	তেঁজ	তেজ
তেলী	তেলী (তৈলকার)		

দল	দল	দধি দহি	দধি দই
দন্ত, দাঁত, দশন	দন্ত দাঁত দশন	দরকার	দরকার
দরদ	দরদ	দস্তুর	দস্তুর
দহন	দহন	দান	দান
দাস	দাস	দাসী	দাসী
দিন	দিন	দিবস	দিবস
দীর্ঘ	দীর্ঘ	দুখ	দুখ
দুষ্ট	দুষ্ট	দুধ	দুধ
দেরে	দেরে (দাওরে)		
দেবা	দেব, (দেবতা)		
দৈব	দৈব	দোষ	দোষ
ধন	ধন	ধারা	ধারা
ধ্বনি	ধ্বনি	ধৈর্য্য	ধৈর্য্য
নবীন	নবীন	নদী নয়	নদী
নাব নৌকা	নাব নায়, নৌকা,	নাভি	নাভি
নাক	নাক	না, নাহি	না, নাই
নিদ, নিদ্রা ঝোপ	নিদ, নিদ্রা ঝোপ	নিষ্ঠুর	নিষ্ঠুর
নিন্দা	নিন্দা	নির্দ্দয়	নির্দ্দয়
নিবারণ	নিবারণ	নিশ্চল	নিশ্চল
নিষেধ	নিষেধ	নীতি	নীতি
পতি	পতি(অধিপতি)	পাত্র,	পাত্র, পা
পাতাল	পাতাল	পাথর	পাথর
পাপ	পাপ	পামর	পামর
পিতরে	পিতরে	পুতা পুতু	পুতা, পুত্র
পুতলী	পুতলী	পুণ্য	পুণ্য
পুরে	পুরে, পূর্ণ	পুরুষ	পুরুষ
পূজা	পূজা	প্রিয়	প্রিয়
পোটলী	পোটলী, পুটলী		
ফল	ফল	ফলা	ফুল
বচন	বচন	বদন	বদন
বধ	বধ	বন	বন
বন্ধ	বন্ধ	বর্ণ	বর্ণ
বসন্ত	বসন্ত	বইস্	বইস
বহ	বহ	বায়ু হাওয়া	বায়ু, হাওয়া
বাছা	বাছা (বৎস)	বাজ	বাজ
বাট	বাট	বাপা	বাপা, বাপ
বাঁধ	বাঁধ	বামন	বামন
বার	বার	বাঁশ	বাঁশ
বাস	বাস (গন্ধ)	বাসি	বাসি
বাহু হাত হস্ত	বাহু হাত হস্ত	বিকার	বিকার
বিছানা	বিছান	বিনাশ	বিনাশ
বিরহ	বিরহ	বিরোধ	বিরোধ
বিলাস	বিলাস	বিষ	বিষ

বীর	বীর	বুদ্ধি	বুদ্ধি
বুধবন্তী	বুধবন্তী, বুদ্ধিবন্তী,		
ভক্তি	ভক্তি	ভয়	ভয়
ভাউ	ভাউ	ভাণ্ড	ভাণ্ড (ভাঁড়)
ভারি	ভারি	ভিখারী	ভিখারী
ভিতরি	ভিতরি	ভীতি	ভীতি
ভুজ	ভুজ	ভুবন	ভুবন
ভূমি	ভূমি	ভ্রমর	ভ্রমর
মঙ্গল	মঙ্গল	মন	মন
মরণ	মরণ	মধু, মৌ, মধ্, মধু	
মলিন	মলিন	মাকড়	মাকড় (মর্কট)
মাগ	মাগ (প্রার্থনা কর)		
মুখ	মুখ	মূল	মূল
মেঘ	মেঘ	যন্ত্র	যন্ত্র
যাত্রা	যাত্রা (রথযাত্রা শোভাযাত্রা)		
যে কারণ	যে কারণ	যোগ	যোগ
যোড়	যোড়	বড়	বড় (কাঁদা)
রাখ	রাখ	রাজ, রাজ্য রাজ, রাজ্য	
রে	রে, সম্বোধনে, রাণী	রাণী	
রাতি	রাতি	রান্ধনী	রান্ধনী (উনান)
রন্ধন	রন্ধন	রুচি	রুচি
রূপ	রূপ	রোষ	রোষ
রোষ	রোষ	লবঙ্গ	লবঙ্গ
লাঙ্গল	লাঙ্গল	লাজ	লাজ
লোভ	লোভ	লৌহ, লৌহখণ্ড	লৌহ
শরীর	শরীর	শীঘ্র	শীঘ্র
শুদ্ধ	শুদ্ধ	শোভা	শোভা
সকল	সকল	স্বর্গ	স্বর্গ
সজ্জন	সজ্জন	সত্য	সত্য
স্বপন	স্বপন, স্বপ্ন.	সভা	সভা
সমান	সমান	সন্মান	সন্মান
সমুখ	সমুখ (সমুখ)	সম্বন্ধ	সম্বন্ধ
সব, সর্ব্ব	সব, সর্ব্ব	সাঁকো	সাঁকো
স্বামী	স্বামী	সেবক	সেবক
সেবক	সেবক	হাস	হাস (হাস্য)
হিত	হিত	ক্ষেত্র	ক্ষেত্র

অতঃপর আর একটি তালিকা দিতেছি। ইহাতে যে সকল বাংলা শব্দ গৌড়-সারস্বতীর ভাষায় অপভ্রংশ রূপে বর্ত্তমান আছে তাহা প্রদর্শিত হইল।

অম্মা	মা	অসি চি	অই সি (ঈদৃশী)
অসোলো	আছিল	আজুনী	আজুনী
উদাক্	উদক	উপজল	উপজিল
উন্ন	চুম, (চুম্ব)	উর	পুর (ভরপুর)
একলেচি	একলা	একবেলি	একবার, একবেলা,
কাইন	কেহ নাই	কাণ্ডি	কাড়ি, কাঠি
কানী	কাহিনী	কাপ	কাট
কাছোটা	কাছা	কীড়	কীড়া (পোকা)
কেলে	কলা	কোন	কোন
খবরি	খবর	গরের	গহ্বর, (গহ্বর)
ঘরণ, ঘরণী	ঘরণী, (গৃহিণী)	ঘাঘর	ঘাঘরা (ঘড়া)
চোরি	চুরি	কোলী	কাঁচোলী, কাঁচুলী,
ছে, আছে	আছে	ঠাণ্ড	ঠাণ্ডা
তড়	তট	তড়ে	তড়া (তড়াগ)
থাপড়	থাপড়, থাপ্পড়, থুর		থুর, দুর
নন্তর	অনন্তর	নাতু	নাতি
নাত্তি	নাতিনী	নাঁব	নাম
পট	পেট	পাট	পীঠ
পিকলো	পাক্লো	পুরেৎ	পুরুত (পুরোহিত)
পোথী	পুথী	বইট	বেহেট
বহরি	উপরি	বর (উঃ ওর)	উপর
বড্ডি	বাড়ি, ছড়ি	বলৈ	বোলই
বাগু, বাগ	বাঘ	ঘাড়া	বাড়ী
বেল	বেলা	ভ্যাট	ভেট (দেখা)
মকা	মোকে (আমাকে)	মচ্ছ	মৎস, মাছ
মত্তা	মরতা	মড়ে	মড়া
মাত্তে, মস্তক	মাথা, মস্তক	মাউলানী, মামী	মাউলী, মাতুলানী, মামী
মাচো	মাচা	মাঝা	মাঝু(আমার)
মারগ	মহার্ঘ, মাগ্গি	মৌ	মৌনের ম,
য়ে	আর	য়ো	য়োল
রচলে	রচিল	লগ্গি	লাগি (লাগালাগি)
সান্	ছানা (ছোট বাচ্ছা)	সিসি	ছিছি
হলক্	হলাক্	হেরদে	হেরদয়

রামায়ণের ভ্রাতৃধর্ম্ম।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি যতই বেশী হউক্ না কেন, তাহাকে আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত বলিতে পারা যায় না। কোনো গুণের আদর্শত্ব কেবল তদ্‌গুণের অসম্ভব আতিশয্য লইয়াই নহে; নির্দ্দোষ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে তদ্‌গুণের বিকাশেই আদর্শত্ব। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি পিতার প্রতি সাময়িক ক্রোধের দ্বারা কলুষিত হইয়াছিল। গুরুজনের ইতরবিশেষ আছে, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিরও স্তরের তারতম্য আছে। জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা পিতা অবশ্যই অধিক পূজনীয়। ভ্রাতা এমন কি মাতা অপেক্ষাও পিতা পূজনীয় কোনো কোনো শাস্ত্রকারদিগের এইরূপ অভিমত। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের পক্ষগ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে এবং দশরথের উদ্দেশে যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা কোনো ক্রমেই সমীচীন নহে। ইহা যে কেবল ন্যায়পরতার জন্যই তাহা নহে, রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার

জন্যই। শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃত্তি দুইটী ভালো বটে; কিন্তু তাহাদের বশে পক্ষপাতিত্ব কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা পিতা বড় আবার পিতা অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মের ভিত্তি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মণ সকল ছাড়িয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইহাতে দুইটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। হয় দশরথ অন্যায় করিয়াছিলেন, না হয় রামচন্দ্র অন্যায় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ যদি ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াই থাকেন, তবে দোষটী কাহার হইবে? অবশ্যই দশরথের। এবং সকল ছাড়িয়া ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াই কর্ত্তব্য। নতুবা অপরাধ হয়। তাহা হইলে রামচন্দ্র দশরথের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার বনে যাওয়াটা নিতান্তই বিচারবিমূঢ়তা হইয়া দাঁড়াইবে। এমন কি মাতা কৌশল্যা এবং কত ঋষিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র কাহারো কথা শুনিলেন না। তাহা বালী কূটতম নাস্তিক্যবাদ দ্বারাও রামচন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। রামচন্দ্র যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহা মানিলেন না কেন? ইহাতে বুঝিতে পারি লক্ষ্মণ একটু ভাবপ্রবলচিত্ত। অন্যান্য বিষয়ে কবি লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অনেক স্থলে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তিনি আদর্শ ভ্রাতৃভক্ত নহেন।

অতঃপর ভরতের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কোনো কোনো সমালোচক ভরতকে রামচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া তুলিয়াছেন। ভরত ত্যাগী ও ভ্রাতৃভক্ত বটে কিন্তু রামচরিত্র অপেক্ষা তাঁহার চরিত্র কোনো ক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ রামচরিত্রের ঘটনাপরম্পরায় ঘাতপ্রতিঘাত অনেক বেশী। বহু বিচিত্রতার ভিতর দিয়া রামচরিত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। তবে কিনা লক্ষ্মণের অপেক্ষা ভরতচরিত্র মহত্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি কটূক্তিগুলি ভরতের পক্ষে ঠিক কিনা সন্দেহ। কবি ভরতের কৈকেয়ীর প্রতি কটূক্তি, লক্ষ্মণের দশরথের প্রতি দুর্ব্বাক্য এই সকল দ্বারাই রামচরিত্রের অনন্যসাধারণতা ব্যক্ত করিয়াছেন। এটী অদ্ভুত কৌশল। ইহা দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে শ্রীরামচন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী, যে তাঁহার প্রতি বাণীতে লোক আত্মহারা হইয়া যায়। ভরতের ক্রোধ দ্বারা তিনি ভরতকেই বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন নাই।

অতঃপর আমরা সুগ্রীব ও বিভীষণের চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। উভয় ব্যক্তিই অনার্য্যজাতীয়; উভয় ব্যক্তিই বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত। উভয়েই পরপক্ষ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভ্রাতার নিধন সাধন করাইলেন। সুগ্রীবে আর বিভীষণে কোনো বিভিন্নতা নাই। উভয়েরই ভ্রাতৃবিদ্বেষ স্বার্থমূলক। উভয় ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষেই তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বিভীষণের অপেক্ষা সুগ্রীবই তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াছিলেন অনেক বেশী।

ভ্রাতৃবিদ্বেষে কিষ্কিন্ধ্যার অধঃপতন; ভ্রাতৃবিদ্বেষে লঙ্কার অধঃপতন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে সাহায্য না করিলে, লঙ্কা জয় করিতে রামচন্দ্রের আরো অনেক বেগ পাইতে হইত। এই জন্যই জাতীয়সমাজের যৌথপরিবারকে শিক্ষাদানই যেন কবির অনেকটা উদ্দেশ্য। তাই দেখাইলেন একদিকে ভ্রাতৃস্নেহে অমৃতময় ফল উৎপাদন করিয়াছে, অপর দিকে ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষময় পরিণাম চিত্রিত করিয়া মানবজাতিকে শিক্ষা দান করিলেন।

কেহ বলিবেন বিভীষণের কোনো স্বার্থ ছিল না, তিনি ন্যায়ের লক্ষমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বনে বাস করিতে বলিলেন তাহাতে যুধিষ্ঠির আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভীষণ কোনও এরূপ আপত্তি করেন নাই।

বারাণসী কথা।

(অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

'এবার পূজোর ছুটীতে কোথায় যাচ্ছ?'

'কাশী।'

'আমি ভেবেছিলুম তুমি একটু বিশ্রামের জন্য পুরী কি ওয়াল্‌টেয়ার যাবে, না একেবারে বলে বসলে কাশী!

সেখানেত ভাই বুড়ো বয়সে মানুষ যায়। সেখানে তোমাদের 'প্রত্নতত্বের' কিছু আছে কি ?'

'ভাই ঠাট্টা করো না। দেশের প্রাচীন অবস্থা, রীতিনীতি, পুরাতন মস্‌জিদ মন্দির, স্থাপত্য-শিল্প প্রভৃতি জানা কিছু অন্যায় নয়। এ সব জান্‌তে পারলে হৃদয়ে যে আনন্দ আসে তার তুলনা কোথায় ?' একদিন ভাদ্রের সন্ধ্যাবেলা, হর্ম্মু নদীর পুলের নিকট দাঁড়াইয়া একজন কেরাণী বন্ধুর সহিত আমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বন্ধু যাহাই বলুন, পুজার সপ্তাহে কাশী ও গয়া ঘুরিয়া আসিব স্থির করিলাম।

কাশীবাসী আমার জনৈক আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া সব ঠিক করিয়া লইলাম। বিগত ১১ই আশ্বিন বেলা ২ টার সময় আফিস গৃহ হইতে বাসায় চলিয়া আসি। পথে জনৈক নবাগত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তখন চারিদিক অন্ধকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। আমি দৌড়িয়া বাসায় আসিয়া দেখি, আমার যাত্রার সবই আয়োজন ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি শত শত লোক—কেহবা বাংলা দেশে, কেহবা উড়িষ্যা, কেহবা বিহারে চলিয়াছে। টিকিটঘরে ভয়ানক ভিড়, অনেক চেষ্টা করিয়াও টিকিট খরিদ করিতে পারা গেল না। নিরুপায় হইয়া রেলের একটি কর্ম্মচারীকে একখানি টিকিটের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রায় ২০ মিনিট চেষ্টার পর আমাকে মোগলসরাই পর্য্যন্ত একখানা টিকিট আনিয়া দিলেন। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়, সুতরাং উঠিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহাতে কয়েকটি বেহারী ও উড়িয়া কেরাণী ছিলেন। আমি ক্ষুদ্র একখানি বেঞ্চিতে অতি কষ্টে একটু স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। একটি বিহারী পুলিশের লোকও সেই গাড়ীতে যাইতেছিলেন। চারিটা বাজিয়া গেল, তখনও বহুলোক টিকিট খরিদ করিতেছিলেন। গাড়ী আর ছাড়ে না। ৪-১০ মিনিটের সময় পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা ঢং ঢং বাজিয়া উঠিল। ৪-১৫ মিনিটের সময় দেখি গাড়ীখানি সত্যসত্যই রাঁচি ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

আমি জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাহির করিয়া গাড়ীর উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। গ্রামের পর গ্রাম, নদীর পর নদী, মাঠের পর মাঠ, এমনি করিয়া ছোটনাগপুরের কঠোর প্রকৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমাদের গাড়ীখানি সন্ধ্যার সময় ঝালদায় আসিয়া পা দিল। ঝালদা মানভূমের অন্তর্গত। এস্থান গালা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে ভাল বাঁশের লাঠি ও লোহার জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই লাঠি কিনিবার জন্য যাত্রীগণ ঝুঁকিয়া পড়িলেন। এখানে গাড়ীর এঞ্জিন জল লইয়া পুনরায় ছুটিয়া চলিল। গাড়ীতে দুইটি অপরিচিত বিহারীর ভাব-ভঙ্গী ও 'উৎকট' আলাপে আমার চক্ষু সেই দিকে পড়িল। তাঁহাদের মুখে কেবলি বাঙ্গালীদের সমালোচনা—বাঙ্গালী কেন বাংলা মুলুক ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে, এ দেশ ত তাহাদের নয়, এ দেশ কেবলি বেহারীদের জন্য। আমি ইহাদের তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা শুনিতে লাগিলাম। উড়িয়া যাত্রী কয়টি কিন্তু এসব আলোচনার ভিতর ছিলেন না। তাঁহারা আমারই মত নীরবে দূরে বসিয়া বিহারীদের কাণ্ডটা দেখিতেছিলেন। উহাঁদের মধ্যে একজন বিলাতপ্রত্যাগত উড়িয়া ছিলেন। ইনি খুব শিষ্ট ও বিনয়ী। পরিধানে ধুতি চাদর, গায়ে একটি ফ্লানেলের জামা। ইহার কোমল স্বভাবটি দেখিয়া মনে হইল ইনি হ্যাটকোটকে বিলাতী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; য়ুরোপের জ্ঞান-চর্চ্চাকেই ইনি সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। উড়িয়া সমাজে বিলাত-প্রত্যাগতকে গ্রহণ করা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করায় একজন যুবক বলিলেন,—'হাঁ, আমরা এ সব বিষয়ে বাংলাকেই অনুকরণ করি, বাংলাই আমাদের আদর্শ ছিল'। সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধেও দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উড়িয়াদের নিকট হইতে সরলতা-মাখান সদুত্তর পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। এদিকে কিছুক্ষণ পর দেখি রাত্রি ৮টার সময় গাড়ী পুরুলিয়া আসিয়া পৌঁছিল।* পুরুলিয়ার কুষ্ঠাশ্রম পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি কুষ্ঠাশ্রম আছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রেভারেণ্ড আফ্‌খ্যান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য আরম্ভ করেন ও তিনি দেশে চলিয়া গেলে রেভারেণ্ড হান্‌ সে কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। এখানে রোগী, কর্ম্মচারী প্রভৃতির ঘরবাড়ী লইয়া সর্ব্বসমেত ৬৫টী গৃহ আছে। এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এ ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইতে হয়, আমরা সকলেই এখানে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনঘরের ভিতরের ফটক পার হইয়া অন্য প্লাটফরমে গিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক আসিয়া গাড়ীর দরজায়

---

* Within a few miles of the station of Purulia and near to river Cossye are the ruins of an old Settlement called Palma, where there are some remains of Jain temples, and at the village of Chara there are two very old stone temples, the construction of which is ascribed to the Sarawaks.

ধাক্কা মারিতে লাগিল। একজন পুলিশের দারোগা এই গাড়ীতে ছিলেন। তিনি কাহাকেও গাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, তিনি ভিতরের দিক হইতে দরজা ঠেলিয়া দিলেন, একটি ভদ্রলোক পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। এই সময় একটি প্রৌঢ় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর হ্যাটকোটধারী দারোগা বাবুটির সঙ্গে জুটিয়া 'আইয়ে আইয়ে' বলিয়া ভীষণ নাদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা ত সকলে অবাক। বাঙ্গালী ও উড়িয়ার সহিত বিহারী পুলিশের একটা হাঙ্গামার সূচনা দেখিয়া গাড়ীর আরোহীবর্গ ছুটিয়া আসিলেন। বহু চেষ্টায় গোলযোগ থামিলে দেখি দুইটি বাঙ্গালী সেই গোলের ভিতর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এখানেই যুদ্ধপর্ব্বের শেষ হইল। ৯-৪০ মিনিটের সময় গাড়ীখানি মন্থর গতিতে পুরুলিয়া ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিল। একঘণ্টা পরে আমরা আদ্রা আসিয়া পৌছিলাম। এখানে উত্তর-পশ্চিমের যাত্রীদিগকে নামিয়া আসিতে হয়। কলিকাতার গাড়ী চলিয়া গেল, আমরা তাড়াতাড়ি অন্য এক প্লাটফরমের গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর গাড়ীখানি আমাদিগকে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে আসানসোলের অভিমুখে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিল। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আমি ও আর একটি লোক আশ্রয় লইয়াছিলাম। বি, এন, আরের, এই লাইনে ইণ্টার গাড়ী রাখেন না। কাজেই ইণ্টার গাড়ীর টিকিট থাকিলেও আরোহীদিগকে বাধ্য হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিতে হয়। অন্ধকার রাত্রি, পথের বড় কিছু দেখা গেল না, শুধু মাঝে মাঝে পাশের ষ্টেশনের মিট্‌মিটি ল্যাম্পগুলি চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া উঁকি দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঝম্ ঝম্ শব্দে বুঝিলাম এই আমাদের গাড়ী পুলের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কত গ্রাম, কত মাঠ, কত নদী অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানি রাত্রি ১১টার সময় আসনসোল আসিয়া পৌঁছিল। এই ষ্টেশনটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বড় জংসন, এখান হইতে মেন লাইন পশ্চিমে এবং গ্রাণ্ড কর্ড গয়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই দুইটি লাইন অবশেষে মোগলসরাইতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া ওভারব্রিজ পার হইয়া অন্য একটি প্লাটফরমে এদিক ওদিক ঘুরিতেছি, এমন সময় দেখি হুস্ হুস্ শব্দে একখানি গাড়ী আসিয়া তথায় দাড়াইল। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—'বাবুজি, ও-এক্সপ্রেস হ্যায়।' আমি পঞ্জাব মেল ধরিব, এক্সপ্রেসে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আমি স্বচ্ছন্দমনে বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মশায়, পঞ্জাব মেল কখন ষ্টেশনে আসিবে?' উত্তরে তিনি বলিলেন,—'এই যে পঞ্জাব মেল, এখনি গাড়ী ছাড়িবে। আপনি উঠিয়া পড়ুন'। আমি তাড়াতাড়ি একখানি ইণ্টার গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি 'ন স্থানং তিলধারয়েৎ।' এখন কি করি? উকি মারিয়া দেখিলাম একটি হিন্দুস্থানী রমণী একটি ক্ষুদ্র শিশু কোলে করিয়া নীচে শুইয়া আছে। আমি পাঞ্জাব মেলে উঠিব,—এ উঠা নয় ত, রীতিমত সংগ্রাম। একটি বাবু আমাকে কিছুতেই উঠিতে দিবেন না। তিনি মল্লবেশে 'রণং দেহি' গোছের ভাবে দাঁড়াইয়া আমাকে বলিলেন,—'মশায়, অন্য গাড়ী দেখুন, এখানে জায়গা হবে না।' আমার তখন তর্ক করিবার সময় ছিল না। আমি অতি বিনীতভাবে দুইএকটি কথা বলিলাম। উদ্ধত বাবুটির মেজাজ একটু নরম হইল, আমিও পলকের মধ্যে দরজাখানি একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দাঁড়াইয়া আছি—জানালার ভিতর দিয়া দেখি পঞ্জাব মেল হু-হু করিয়া পথ কাটিয়া চলিয়াছে। গাড়ী আর থামে না, কোনই গোলযোগ নাই, একটু নড়া চড়া নাই। কিছুক্ষণ পর গাড়ী আসিয়া মধুপুর দাঁড়াইল। আবার পাঞ্জাব মেল ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিল। তখনও আমার ঘুম আসে নাই, নীচেই কম্বল খানির উপর বসিয়া আছি। আমার সম্মুখে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া আমি একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে অগ্রসর হইলাম। পরিচয়ে জানিলাম ভদ্রলোকটির পূর্ব্বনিবাস বরিশাল কলসকাটি। তাঁহার পিতৃদেব স্বদেশ ছাড়িয়া কাশীতে যাইয়া ঘরবাড়ী করিয়াছেন। ইহাঁর সদ্ব্যবহারে ও মিষ্টালাপে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। কাশী পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে এক সঙ্গেই ছিলাম। ইনি আমাকে গোধুলিয়া গাড়ীর আড্ডা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন।

গাড়ী চলিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তিখানি দেখিবার জন্য আমি জানালার নিকট দাঁড়াইলাম। দেখি আমাদের গাড়ীখানা প্রকৃতির বিরাট শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে পথের দুইধারে কত বনউপবন, মাঠ ঘাট, গাছপালা দৃষ্টিপথে পড়িতেছে, আবার অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এই ভাবে পরিবর্ত্তনশীল চিত্রের ভিতর ট্রেনখানি কিউল ও মোকামায় অল্প সময়ের জন্য থামিয়া প্রত্যূষে আসিয়া পাটনা ষ্টেশনে দাঁড়াইল। ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির ভৈরবী মূর্ত্তি। বঙ্গপ্রকৃতির সেই সুজলা সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা চিত্রখানি অনেকক্ষণ পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই কঠোর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের দুঃখদৈন্য-পূর্ণ জীবনের শেষ

দিকটা অতিবাহিত করিতে হইবে বলিয়া প্রাণের ভিতর কেমন একটা অবসাদ আসিল। পাটনার পর বাঁকিপুর, বাঁকিপুর ছাড়িয়া গাড়ী দানাপুরে দাঁড়াইল। এইবার আমি জানালার কাচ তুলিয়া বেঞ্চে বসিয়া চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কোথায়ও গাছপালার মধ্যে গ্রাম, গ্রামে কূপ, স্ত্রীলোকেরা জল তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আরায় পৌছিল। আরা ছাড়িলেই বিখ্যাত সোন-সেতু দেখিতে পাইলাম। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৭২৬ ফিট্, ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৪৩,৩৩ ৩২৪৲ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই সেতু প্রথম খোলা হয়। বেলা সাড়ে সাতটায় গাড়ী বক্সার পৌছিল। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে ইংরাজের সহিত বাংলার শেষ নবাবের যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন। বেলা ৯টার সময় পাঞ্জাব মেল আমাদিগকে আনিয়া মোগলসরাইতে ছাড়িয়া দিল। মোগলসরাই আউড্‌রোহিলখণ্ড রেলের সংযোগস্থল। এস্থান হইতে কাশী ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের ওভারব্রিজ পার হইয়া অপরদিকে গিয়া কাশীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটী আমাকে কাশী ষ্টেশনের একখানা টিকিট আনিয়া দিলেন। ষ্টেশনে উৎকৃষ্ট কাঠের খেলানা, নানারকমের ফল দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে বোম্বে ও দিল্লী এক্সপ্রেস ট্রেণ আসিয়া পৌছিল। তখন দেখি অগণিত লোকেরা আমাদিগের প্লাটফরমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অত্যন্ত ভিড় বলিয়া গাড়ী ছাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। পুণ্য নগরী দেখিবার জন্য হৃদয়-মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কখন্ গাড়ী ছাড়িবে এই ভাবনায় অনেকেই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ীখানি মন্থর গতিতে চলিল। স্ত্রীলোকের মুখোত্থিত হুলুধ্বনি ও 'জয় বিশ্বেশ্বরের জয়' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সম্মুখে ধূলি উড়াইয়া মরুসম মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সহসা দিবাকর-কিরণমালায় উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জাহ্নবীসলিলবিধৌত শিবমোক্ষপুরী বারাণসী আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিকশিত হইল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য কত সুন্দর, কত মনোরম। দূরে বেণীমাধবের ধ্বজা আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহার ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম্ম জগতকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলমন্ত্র যেন শিক্ষা দিতেছে বলিয়া মনে হয়। বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বেণীমাধবের মন্দিরের নিকট উচ্চশীর্ষ মিনারেট দেখিয়া আমাদের মনে হইল, 'কাশী সর্ব্বতীর্থ' এখানে আসিলে কেন বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর কোনই প্রভেদ থাকিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

পরশে তোমার।

রাগিণী—ভৈরবী।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে কাঁটা
আলো হয়ে ফুঠে ওঠে আঁধার!
প্রভু পরশে তোমার!

থেমে যায় ঝড়-ঝঞ্ঝা-রাতি
ফুটে ওঠে তারার পাঁতি
জেগে ওঠে শশীর ভাতি
প্রভু পরশে তোমার!

বন্ধুর পথ হয় সে কুসুম কীর্ণ
শ্যামল হয়ে ওঠে মরু জীর্ণ!
জেগে ওঠে নির্ঝর-ধারা
কল-বিহগ ডেকে সারা
পবন বহে পাগল-পারা
প্রভু পরশে তোমার!

তেম্‌নিতর একটি পরশে
চিত্ত আমার ডুবাও হরষে!
অন্ধকারে ফুটাও তারা
ছুটাও প্রাণে গানের ধারা
প্রেমসুধায় কর হারা
প্রভু পরশে তোমার॥

আদর্শ

বা

দাদা ঠাকুর।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অরণ্য। কাল—রাত্রি।

রাস। ও বাবা, কি ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! কোলের মানুষটী দেখ্‌বার যো নাই। জামাই, ভাগ্‌নে, শ্যালক আর পুষ্যিপুত্তুর যার সংসারে থাকে তার ভিটের ঘুঘু চরবেই। ধনদাস খুড়োর ঘাড়ে এই দুইজন চেপেছি—শালা আর

পুষ্যিপুত্তুর। একের ধাক্কা সামলানো দায়, তাতে আবার চৈজন। আর যায় কোথা? কুলভূষণটা বড় গোঁয়ার, ওকে দিয়েই কাজ হাসিল কর্ত্তে হবে। ব্যাটাকে অনেক চেষ্টা করে মদ ধরিয়েছি। আগে ওকে দিয়েই রায়মশাইকে পথ থেকে সরাতে হবে। তার পর কুলভূষণের দফা-রফা করব। একবার দেখাব যে শালাবাবুর বুদ্ধির দৌড় কত!

(কুলভূষণের প্রবেশ)

ও কেউ আস্‌চে নয়? হাঁ তাই তো, ঐ যে কুলভূষণই তো বুঝি।

কুল। কৈ, মামা!

রাস। এস বাবাজী। আমি ভাবনায় পড়েছিলুম।

কুল। এখানে আস্‌তে বলেছিলে কেন?

রাস। তোমার কাছে অনেক দিন থেকেই একটা কথা বল্‌ব বলে ভেবেছি। ফুর্‌সুৎ পাইনি।

কুল। বল।

রাস। কথাটা বড়ই গোপনীয়। সাবধান—

কুল। মামা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?

রাস। না না, অবিশ্বান্ করিনা। তবে কিনা ছেলে মানুষ। দ্যাখো কুলভূষণ, তোমায় আমায় ছেলেবেলা থেকেই বড় ভাব; তার পর সম্পর্ক তো একটা আছেই।

কুল। তা বৈ কি। যাক্ কথাটা বলুন।

রাস। হাঁ বল্‌ব। যা বল্‌ব তাতে তোমারো ভালো, আমারো ভালো।

কুল। যাক্ কথাটা বলুন।

রাস। হাঁ বল্‌চি; বল্‌চি যে তোমারো রাজ্যিপাট উঠ্‌লো, আমারো রাজ্যিপাট উঠ্‌লো।

কুল। কি রকম?

রাস। এখন আগে থেকেই এর একটা উপায় করা উচিত।

কুল। উপায় আর কি?

রাস। আমি একটা ভেবে রেখেছি।

কুল। কি?

রাস। বল্‌ব?

কুল। বল।

রাস। সাবধান, যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা হ'লে বিপদ হবে।

কুল। মামা, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর?

রাস। না না, অবিশ্বাস করি না, তবে কিনা ছেলে মানুষ।

কুল। যাক্ কথাটা বল।

রাস। বিয়ে হবার আগেই রায়মশাইকে পথ থেকে সরাতে হবে। তা হ'লে সব সম্পত্তি তোমার আর আমার।

কুল। পথ থেকে সরাতে হবে কি রকম?

রাস। তবে শোনো। (কানে কানে কহিল)

কুল। আঁ্যা বল কি! সর্ব্বনেশে কথা! ও বাবা!

রাস। বুঝ্‌লে না? এই সোজা কথাটা বুঝ্‌লে না— সাধে কি বলি ছেলেমানুষ!

কুল। যাক্ কথাটা বলুন।

রাস। রায়মশাই আবার বিয়ে করবেন, শুনেছো?

কুল। দাদাঠাকুর মেয়ে দিতে স্বীকার করেন নি।

রাস। আরে তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। সে মেয়ে ছাড়া কি আর মেয়ে নাই।

কুল। তা আছে বৈকি?

রাস। তবে আর কি? বিয়ে একটা কর্‌বেই; বুঝ্‌লে বিয়ে একটা করবেই। এখন ধর, আমারো বোন্ মারা গেছে, তখন আর রায়মশাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি? যদি এ পক্ষে ছেলে পিলে হয়, তোমাকে ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে। আর যে বিমাতা হবে, সে তোমাকে বিষের মত দেখবে। বুঝ্‌লে?

কুল। ঠিক্ বলেছো মামা। আমিও এ কথাটা অনেক দিন থেকেই ভাব্‌ছি। এঃ তোমার মনের সঙ্গে যে ঠিক্-ঠাক্ মিলে যাচ্ছে।

রাস। কেন, পিতৃহত্যা পাতকের ভয় কর নাকি?

কুল। আঃ, বাপ্ কোন্ ব্যাটা। পুষ্যিপুত্তুরের আবার বাপ্!

রাস। তবে আর কি?

কুল। যদি কেউ জান্‌তে পারে?

রাস। কেউ জান্‌বে না।

কুল। কি রকম করে?

রাস। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে।

কুল। আমার যে শুনেই গা কাঁপে।

রাস। কুছ্ পরোয়া নেই।

কুল। আচ্ছা দেখা যাক্।

(অন্তরালে পাগলিনীর বিকট হাস্য—হাঃ হাঃ হাঃ)

রাস। ও কে?

কুল। ও বাবা, ভূত বুঝি।

রাস। র'সো, দেখি।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

কুল। ও বাবা, ও কে? এই—এই—কে তুমি?

রাস। কে তুমি?

পাগলিনী। আমায় চিন্‌বে না। আমি কেবল আমায় চিনি।

কুল। এ আঁধারে বসে এখানে কি কর্‌ছ?

পাগলিনী। তোমরাও যা করছ আমিও তাই করছি। বাইরে তো অন্ধকার নেই। অন্ধকার যে ভিতরে। ও বাবা বড় অন্ধকার! ভিতরের আঁধার বড় আঁধার! সেখানে

ঝড় হ'চ্চে, বাজ পড়্চে, ভূতপ্রেত দানবদৈত্যি কত ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় ভয় করে! বড় ভয় করে!

রাস। বেটী বলে কি?

কুল। দেখ্‌ছো না পাগল।

পাগলিনী। পাগল হ'তে পারি কৈ? তা যে পারি নে। মনে পড়ে—নিজের কথা মনে পড়ে,আর পাগল হ'তে পারিনে। হবি, তোরাও আমার মত পাগল হবি। ও বাবা বড় আঁধার। বড় ভয় করে।

কুল। চল মামা, পাগলীর কাছে থেকে কি হবে?

রাস। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পাগলিনী। কোথায় যাবি? ভিতরের আঁধার যে সাথে সাথে থাক্‌বে। হাঃ হাহাঃ শুনেছি, সব শুনেছি। বিষ দেবে, ও বাবা বিষ খাওয়াবে। এরা তো বিষ খেয়েই আছে। আমায় বিষ কেন দেয় না? আমি তো বিষ খেতে পার্‌লুম না! যাই যাই। বিষ দেবে। হাঃ হাঃ হাঃ!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দাদাঠাকুরের বাটী। কাল—অপরাহ্ন।

সত্যবতী। নাঃ আর ওঁর সঙ্গে পেরে উঠ্‌ছিনে। এই তো বেলা গেল, এখনো বাড়ী-মুখো হচ্চেন না। সারা দিন না-খেয়ে না-নেয়ে ঘুরে' ঘুরে বেড়াবেন। এই বয়সে এমন করে' খাট্‌লে আর শরীর ক'দিন টি'ক্‌বে? হয় তো ভাত খেতে বসেছেন, এমন সময়ে খবর এলো অমুকের কলেরা হয়েছে, অম্‌নি দে ছুট্‌!

(লক্ষ্মীমণির প্রবেশ)

এই যে লক্ষ্মী, কি মা, কোথায় গিয়েছিলে?

লক্ষ্মী। কেলে ডোমের বাড়ী গেছ্‌লুম। তার মেয়ের বড় জ্বর হয়েছে।

সত্য। তা বেশ করেছো বাছা। এখনো যে কিছু খেলে না!

। বাবা এখনো ফেরেন নি বুঝি?

সত্য না, আহা ক্ষিদেয় যে তোর মুখ শুকিয়ে গেছে। আমরা গরীবের মেয়ে, ক্ষিদেয় আমাদের কষ্ট হয় না।

সত্য। তা বুঝেছি।

লক্ষ্মী। মাগো, একটা কথা—

সত্য। কি মা?

লক্ষ্মী। অনেক দিন বল্‌ব-বল্‌ব ভেবেছি, কিন্তু বলা হয়নি'। আজ বল্‌ব।

সত্য। বল।

লক্ষ্মী। আমি আর তোমাদের কাছে থাক্‌ব না।

সত্য। কেন?

লক্ষ্মী। আমি পোড়াকপালী, আমার তিনকুলে কেউ নেই, বাবা দয়া করে' আশ্রয় দিয়েছেন, তোমার যত্নে—

সত্য। আঃ রাখ্‌ রাখ্‌ তোর বক্তিমি রাখ্‌, ও সব কথা বল্‌লে মার খাবি। এক রত্তি মেয়ে, টুলো ভট্‌চাজ্যের মত বক্তিমি কচ্ছে! নে, নে, তোর ছোট মুখে বড় কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছা হয় না, এখন কি বল্‌বি তাই বল্‌।

লক্ষ্মী। আমার জন্য লোকে কাণাকাণি করে; বাবাকে মন্দ বলে।

সত্য। ওমা, লোকে আবার কি বল্‌বে? তুই তো আমাদের হেঁসেলে যাস্‌নি।

লক্ষ্মী। লোকে যা বলে সে বড় মন্দ কথা। আমার জন্য এমন দেবতার মত মানুষ, তার নিন্দা হবে!

সত্য। আ গেল, ও নিন্দে অমন হয়েই থাকে। ও যারা বল্‌চে, তারা ত জানে যে মিছে কথা বল্‌চে। এ নিন্দা চিরদিন থাক্‌বে না। ও কি! আবার কাঁদতে আরম্ভ কর্‌লি! কোথাকার এক বোকা মেয়ে! দ্যাখ অমন কর্‌বি তো ভারী মার খাবি।

লক্ষ্মী। মাগো—(আবার কাঁদিয়া উঠিল)

সত্য। ওকি, আবার কান্না! তবে কাঁদ বসে'। থাক্‌ আজ আর আমি খাবোনা, নাইবোনা কিছু কর্ব না। কেবল বসে' কাঁদব।

লক্ষ্মী। না আর কাঁদব না।

সত্য। ছিঃ মা অমন করে' কি কাঁদতে আছে? তোর কান্না কি সৈতে পারি? তুই কি আমাদের বোঝা? মাগো আয় আমার কাছে আয়। বলুক্‌ লোকে, তাদের যা ইচ্ছা! তোকে কি ফেলে দিতে পারি? আমি যে মা, তুই যে আমার মেয়ে, আয় আমার বুকে আয়।

(বক্ষে ধারণ, উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন)

(নিবেদিতার প্রবেশ)

নিবে। লক্ষ্মী দিদি, তুমি এখানে? আমি যে তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!

সত্য। মা নিবেদিতা, তুমি আর লক্ষ্মী এখনো তো কিছু খেলে না! কি দেব বাছা, ঘরে যে কিছুই নেই।

নিবে। আমি আজ কিছু খাবো না—

লক্ষ্মী। আমিও খাবোনা।

সত্য। বুঝেছি। এ "খাবোনা"র অর্থ ঘরে চাল নেই। আমার এ দুঃখে আর কোনো দুঃখ নেই, কেবল তোদের মুখ যখন শুক্‌নো দেখি তখনি প্রাণ কেঁদে উঠে। আমি যে মেয়ে মানুষ! তিনি সৈতে পারেন, তিনি দেবতা। আমি যে মূর্খ মেয়ে মানুষ!

নিবে। মা, তুমি এজন্ত দুঃখ কর কেন ?

সত্য। দুঃখ হয় বৈ কি। যখন বাড়ীর 'পড়ো' ছেলেরা খেতে না পেয়ে ফিরে গেল। যখন পাড়ার ছেলেরা মা মা বলে কাছে এসে খেতে চায়, তখন তাদের হাতে কিছু দিতে পারিনে। যখন অতিথি এসে ফিরে যায়, তখন আমার প্রাণ কেঁদে উঠে। হা ঠাকুর! আমার এমন সোণার সংসার।

লক্ষ্মী। আমরাই তোমাদের এই কষ্টের মূল।

নিবে। দিদি, অমন কথা বললে ভাব্‌বো তুই আমাদেরে পর ভাবিস।

লক্ষ্মী। আমায় ক্ষমা কর। আর বলব না।

(গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

সারা রাত ঘুমিয়ে কেটে সকাল বেলায় উঠি—
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি
মোদের, হয়ে গেছে ছুটি।
সারা জগৎ মোদের সনে খেলতে এসেছে
কোন্ সুদূরের সাগর পারের খবর এনেছে—
কোথায় বাঁশী বেজেছে
কোথায় সাড়া পড়েছে
ভোরের আলো তাই দেখে তাই হেসে কুটি কুটি।
হল হেসে কুটি কুটি।
লুট করে আজ নেব আকাশ সবাই মুঠি মুঠি
হাসি গানের ঝড় বহায়ে নেব জগৎ লুটি
মোরা নেব জগৎ লুটি।

সত্য। ঐ যে ছেলেরা আসচে।

সকলে। মা, মা ওমা (ঘেরিয়া দাড়াইয়া)

সত্য। কি বাছা ?

১ম বালক। খেতে দে মা।

২য় বালক। যা ইচ্ছে তাই দে। মাঠে গোরু চরাতে গিয়েছিলুম, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

সত্য। হা ঠাকুর! (চক্ষু মুছিলেন)

৩য় বালক। ওকি মা, তুই কাঁদছিস ?

সত্য। না—বাছা, ও কিছু নয়।

২য় বালক। তুই কাঁদিস্‌নে মা। তুই কাঁদলে আমরাও কাঁদব।

সত্য। না আর কাঁদব না। কি দেব বাছা ? ঘরে যে কিছুই নেই।

৩য় বালক। এর জন্যে কাঁদিস্, থাক্, আমরা কিছু চাইনে, আমাদের ক্ষিদে পায়নি। মিছামিছি বলেছিলুম।

সত্য। তা বুঝেছি বাছা।

১ম বালক। আজ তোমাদের ঘরে কিছু নেই মা ?

সত্য। না বাছা কিছুই নেই।

১ম বালক। আচ্ছা আমরা তোমার জন্যে ফল পেড়ে আনব। ভাই চল সবাই মিলে মায়ের জন্য ফল পেড়ে আনিগে।

সকলে। চল্ চল্। (বালকগণের প্রস্থান)

(দাদা ঠাকুরের প্রবেশ)

দাদা। সত্যবতী!

সত্য। একি একেবারে মুখ শুকিয়ে গেছে যে! কোথা ছিলে এতক্ষণ ?

দাদা। রামধনের বাড়ীতে। তার স্ত্রীর বড় ব্যারাম, দু'জন লোক ঘরে মরে পড়ে ছিল। কেউ নেই যে তাদের সৎকার করে, উঃ দেশে কি ভয়ানক মহামারী! কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ! ওকি তোমাকে অমন দেখছি কেন ? তুমি কেঁদেছ ?

সত্য। (নীরব)

দাদা। কথা কইছ না যে! বুঝেছি ; কেন কেঁদেছ ?

সত্য। ছেলেরা এসে খেতে চেয়েছিল।

দাদা। ঘরে বুঝি কিছুই নেই ? তাদের কিছুই দিতে পারনি। তোমরাও উপোস করে আছ!

সত্য। আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি।

দাদা। কষ্ট হয়নি! বুঝি, সবি বুঝ্‌তে পারি। কি করব ? অত্যাচার! ধনদাস রায় আমাকে এমন কর্ব্বে আগে বুঝিনি। কিন্তু মনে রেখো, এ আমাদের পরীক্ষা। দুঃখ দিয়ে ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা কর্‌ছেন। আমরা বড় ভাগ্যবান্, যে তিনি এমন কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। যাকে তিনি বেশি ভালবাসেন, কঠোর পরীক্ষা তাঁরি জন্যে হয়। মহদ্দুঃখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? পাছে ঐশ্বর্য্যের মাঝে থেকে আমরা তাঁকে ভুলে যাই, তাই তিনি এই ঐশ্বর্য্যের ব্যবধানটুকু সরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের অপার দয়া। আচ্ছা তোমার কি বড় দুঃখ হয় ?

সত্য। কিসে ? কি জন্য ?

দাদা। কত কারণ আছে। দ্যাখো আমার ঘরে এসে, লোকে যাকে সংসারিক সুখ বলে তার কিছুই পাওনি। একখানা অলঙ্কার পরনি। আমি নিঃসন্তান ; চিরকাল পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে। তার উপরে বর্ত্তমানে এই দারিদ্র্যের কষ্ট ; এতে বিচলিত হ'চ্ছ ?

সত্য। তুমি বিচলিত হয়েছ!

দাদা। না—।

সত্য। কেন ?

দাদা। আমি জানি, এ ভগবানের অনন্ত করুণা। সংসারে থাকলে এ সব তো হবেই। এর থেকে জ্ঞানলাভ করেই তো মানুষের জীবন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এখানেই আমাদের

শিক্ষা, এখানেই আমাদের পরীক্ষা। দুঃখের কাছে মাথা নুয়ে পড়বে কেন? তার ভয়ে ভীত হব কেন? আমরা মানুষ। আমরা দুঃখকে নির্জ্জীব করে' দেব। এর আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌ব। দুঃখে কাঁদব না, তার পীড়নে জ্ঞানলাভ কর্‌ব। এ যে প্রেমময়ের প্রেমের দান। তাঁর দেওয়া সুখটুকু নিতে পেরেছি, দুঃখটুকু নিতে পারব না? তবে আর তাঁর সঙ্গে প্রেম হ'ল কৈ? এ যে বড় মধুর, প্রেম হলাহলকে অমৃত করে। এমন প্রেমের আমরা অধিকারী। আমাদের দুঃখ কর্‌বার অবকাশ কৈ? আর দ্যাখো, তোমাকে অনেক দিন বলেছি। সুখ দুঃখ সবি মায়া। দেহের ধর্ম্ম। আমরা দেহ নহি। আত্মা সুখ দুঃখের অতীত। এ আঘাত তো আমাদের লাগ্‌বে না। তবে কেন বিচলিত হব? আমার কিন্তু মোটেই দুঃখ হচ্ছে না। ভারী আনন্দে আছি, ভারী আনন্দে।

সত্য। আমারি বা কিসের দুঃখ? যতই ছোটো হই, তবু তোমারি তো সহধর্ম্মিণী। আমার মত ভাগ্যবতী কে? অলঙ্কারের কথা বল্‌ছো, তুমিই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তোমার প্রেমই যে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য। আমি তো সন্তানহীনা নই। এই যে কত ছেলেরা মা বলে ডাকে, চাষী বালকেরা আমার কোলে ওঠে, দীন-দুঃখীরা আমার কাছে খেতে চায়—এরাই তো আমার সন্তান। আমি যে সকলের মা হ'য়ে কৃতার্থ হয়েছি। হয়তো নিজের ছেলে থাক্‌লে তা পার্‌তুম না। প্রাণটা ছোটো হয়ে' যেত। কি দুঃখ আমার? আমার মত ভাগ্যবতী কে?

দাদা। আনন্দ, আনন্দ। দারিদ্র্যে আমার চোখে জল আসেনি, আজ আমার আনন্দে চোখে জলধারা আস্‌চে। আজ আমার মত ভাগ্যবান, এমন সুখী সংসারে কে আছে? আজ আমি রাজ-রাজেশ্বর। ধনদাস, দেখে যাও, তুমি আমায় কিছুমাত্র দরিদ্র কর্‌তে পারনি। সত্যবতী,—

সত্য। প্রভো,—

দাদা। সত্যবতী তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়।

(কিয়ৎকাল উভয়ে নীরব)

সত্য। একটা বড় দুঃখ হয়।

দাদা। কি দুঃখ?

সত্য। আমার মনে হয়—আমি তোমার চরণে শৃঙ্খল, মাথার বোঝা, একটা গলগ্রহ। যদি আমি না থাক্‌তাম!

দাদা। সে কি?

সত্য। আমার মনে হয়, আমি যেন তোমায় আমার স্বার্থপর ভালোবাসা দিয়ে কেবলি ঘিরে রাখ্‌তে চাই। তোমার মূল্যবান জীবনের ভার-স্বরূপ আমি। তুমি তো আমার একার নও; তুমি যে বিশ্বের সম্পত্তি। কত অজ্ঞান জ্ঞানপিপাসায় তোমার দিকে চেয়ে আছে। কত অন্নহীন তোমার কাছে দীনভাবে মুষ্টিভিক্ষা কর্‌ছে। কত পাপী কত অনুতাপী তোমার কাছে উপদেশ নিতে আস্‌চে। দেশ তোমার হৃদয় চায়, অসহায় তোমার বাহু চায়, কে আমি যে তোমায় কেবল সারাক্ষণ আগ্‌লে রাখ্‌তে চাইব? আমার জন্যে তোমায় একটুকু তো ভাব্‌তে হয়—সে ভাবনাটুকু তুমি, আমি না থাক্‌লে, জগতের কাজে ব্যয় কর্‌তে পার্‌তে।

দাদা। তুমি কি জগৎ ছাড়া? আমার এ রাজ্য মধ্যে তোমারো একটা স্থান আছে, আর সে স্থানটুকু সাধারণ নয়।

সত্য। আমি সে স্থানটুকু অধিকার না কর্‌লে, আর একজন এসে সেখানে দাঁড়াতে পার্‌ত।

দাদা। যে স্থানে তুমি আছো, সে স্থানে কেবল তোমারি অধিকার। পাত্রভেদে স্থানভেদ হয়। তুমি আমার বাহুতে শক্তি, কর্ম্মে উৎসাহ, নয়নে দীপ্তি, হৃদয়ে আনন্দ। তুমি আমার সুখে সুখী, দুর্দ্দিনে বন্ধু, বিপদে মন্ত্রী, ঈশ্বরোপাসনায় সহধর্ম্মিণী। তোমায় ভালোবাসি বলে' বিশ্ব ভালোবাসি। আবার বিশ্ব ভালোবাসি বলে' তোমায় ভালোবাসি। এস সত্যবতী এই সন্ধ্যাবেলা একবার দুজনে মিলে ঠাকুরের চরণে প্রণত হই। আজ আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে।

(গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ)

এমন ভাবের পাগল রসের পাগল দেখিনিকো ভাই
পাগ্‌লা দাদার পাগলামীতে পাগল হয়ে' যাই,
ঢুলু ঢুলু' দু'টী আঁখি টলে' টলে' পড়ে
হাসে কাঁদে নাচে মাতে কি এক নেশার ঘোরে
এমন পাগল-ভোলা কেউ দেখিনি গো—
তারে বুঝ্‌তে পারি কইতে নারি,
নূতন যে সদাই!

মিলিয়েছে এই মোদের মাঝি কি এক রংয়ের মেলা
কখন করি মান অভিমান কখন বা খেলা
তাঁরে চিন্‌তে পেরেও চিন্‌তে নারি গো—
এই দেখি এক ভাবে আছে, আবার সে ভাব নাই।

দাদা। এই যে আমার ঠাকুর এসেছে! ঠাকুর—তুমি বালকের বেশে এসেছ?

১ম বালক। দাদাঠাকুর, আমরা মায়ের জন্য ফল এনেছি।

সত্য। ও ফল তোমরা খাও, তাতেই আমি সুখী হব।

১ম বালক। না মা, এ ফল তোমাকে খেতে হবে। না হলে' আমরা কাঁদ্‌বে। দাদাঠাকুর, তোমাকেও খেতে হবে।

দাদা। যে ব্যাটারা তোদের ফল আমি আনন্দে খাব।

২য় বালক। তবে আমরা এখন যাই; আমরা কাল আস্‌ব।

সত্য। এসো বাছা।

(বালকগণের প্রস্থান)

দাদা। সত্যবতী, ধনদাস রায় নিবেদিতাকে বিবাহ করতে চান, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার বিবাহ দিলে সে সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, আর দারিদ্র্য থাকবে না।

সত্য। তুমি কি বলেছ?

দাদা। তা তো বুঝ্‌তেই পারছ।

সত্য। আমিও তাই বলি।

দাদা। তুমি বড়ই দুর্ব্বল হয়ে' পড়েছো দেখ্‌তে পাচ্ছি। সমস্ত দিন অনাহারী!

সত্য। না আমার কোনো কষ্ট হচ্চে না।

দাদা। মেয়ে দু'টো বুঝি কিছুই খায়নি?

সত্য। কিছুই খায়নি।

দাদা। (দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে) প্রেমময়, জগদীশ!

সত্য। লক্ষ্মী পাগ্‌লী বড় ক্ষেপেচে।

দাদা। কি রকম?

সত্য। পাগ্‌লী বলে তারি জন্যে আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে। আর সে এখানে থাকে বলে লোকে তোমাকে নিন্দে করে, তাই সে আর আমাদের এখানে থাক্‌বে না।

দাদা। পাগ্‌লীকে তুমি বুঝিয়ে বলো'। যদি এর চেয়েও কঠোর পরীক্ষা আসে, তবু ভয় করব না। ও যে নিরাশ্রয়া, ওকে তাড়িয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দেবতাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এতে যদি আমার প্রাণ যায়, তবু আমি আমার মাকে রাখ্‌ব। ও যে আমার দুঃখিনী মা, পরের কথায় কি ছেলে মাকে ফেলে দিতে পারে? লোকনিন্দা? লোকনিন্দা আমি তুচ্ছ করি। বিশ্বশুদ্ধ আমার নিন্দা করুক, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি করব। ধর্ম্মের কাছে লোকনিন্দা অতি তুচ্ছ।

(রহিমদ্দীর প্রবেশ)

রহিমদ্দী। দাদাঠাকুর, সেলাম।

দাদা। কিরে রহিম, কি জন্য?

রহিম। দাদাঠাকুর, আমার একটা কথা আছে।

দাদা। কি কথারে রহিম?

রহিম। বল, কথাটা রাখ্‌বে তো?

দাদা। আরে বল্‌না।

রহিম। এই দুটো চাল-ডাল তোমার জন্যে এনেছি। আমার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় একদিন খাওয়াব। তা আমাদের বাড়ীতে গিয়ে, আমাদের রান্না তো আর তুমি খাবে না—তাই এই চাল-ডাল এনেছি, তোমরা রেঁধে খাও। আমি মানৎ করেছিলাম, আমার ছেলের ব্যামো ভালো হলে তোমায় ভুজ্যি দেব। ছেলে তোমার দোয়ায় ভালো হয়েছে এখন এই কাঙালের যা কিছু নিয়ে আমায় খুসী কর।

দাদা। রহিম, তুই এ করেছিস্ কি? তোর নিজেরি যে খেতে নেই। তুই যে নেহাৎ গরীব।

রহিম। খুব আছে। দাদাঠাকুর, আমরা তোমাদের দশজনের কাছ থেকে নিয়েই তো বাঁচি; আমাদের কিসের অভাব? তোমায় এ সব নিতেই হবে। এ আমি মানৎ করেছি। তুমি এগুলো না নিলে আমার ছেলের আবার ব্যামো হবে।

দাদা। ইস্! ও ব্যাটারা দেখ্‌চি আমায় দেবতা করে' তুল্‌লে। কি সরল প্রাণ, সহজ বিশ্বাস এদের! দ্যাখ্ রহিম, ওরকম মানৎ টানৎ করিস্‌নি। অমন করলে আমি আর তোদের সঙ্গে কথাও কবনা। মানৎ করেছিস্ কেন?

রহিম। তুমি মুসলমানের পীর, হিন্দুর দেবতা। আমরা দরগায় সিন্নি মানৎ করি। সেই রকম তোমাকেও মান্য করি। মানৎ করে ফল পেয়েছি।

দাদা। তা হ'লে আমার নামে মানৎ না করে' তোর পীরের নামে মানৎ করিস্। তাতে আমাকেও দেওয়া হবে, পীরকেও দেওয়া হবে। আর আমি সেই পীরের প্রসাদ খাবো। ও সব নিয়ে যা।

রহিম। সে হবে না দাদাঠাকুর, তোমায় ও নিতেই হবে। আমি গরীব মানুষ বলে' বুঝি আমার ঠেঙে নিতে সরম করচ?

দাদা। ওঃ! আরে—এ ব্যাটা তো খুব কথা শিখেচে। দেখি একবার লাঠিখানা।

রহিম। তা মারো দাদাঠাকুর, তোমার মার বড় মিষ্টি। দাদাঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি আমার এ ভুজ্যিখানা নেও। আমি সামান্য লোক। আমার প্রাণে দুঃখ দিও না। তোমার পায়ে পড়ি দাদাঠাকুর।

(পদতলে পতনোদ্যত)

দাদা। (রহিমকে উঠাইয়া) রহিম, রহিম, তুই যদি সামান্য লোক হবি তবে এ দুনিয়ায় বড় কে? সভ্যজগৎ চেয়ে দ্যাখো, যদি প্রাণ থাকে তবে এই রহিমদ্দীর শ্রেণীর লোক যারা, তাদেরি মধ্যে আছে। তবু সভ্যজগৎ এই হৃদয়বান দরিদ্রকে ঘৃণা করে! ভগবান্, তুমি দরিদ্রকে বাহিরের এই হীন সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত করে' হৃদয়ের অমূল্য সম্পত্তি দান করেছো। দীননাথ, দীনেরি উপরে তোমার বেশী দয়া! বাইরের রিক্ততায় তুমি এ মহত্ত্বের উজ্জ্বলতা ঢেকে দিয়েছো। রহিম, আমার চোখে জল

আস্‌চে। এতো তোর মানৎ নয়; আমি উপবাসী তুই তা জেনে একান্ত গরীব হয়েও তোর ক্ষুদ্র ভাণ্ডার খালি করে আমার জন্যে এই স্নেহের দান নিয়ে এসেছিস্। তুই আবার গরীব! তোর চেয়ে ধনী কে? আমার কি সাধ্য যে তোর এই স্নেহের দান উপেক্ষা করি? এ যে শ্রেষ্ঠ দান। রহিম, রহিম, আয় ভাই একবার গলাগলি করে' সুখের কান্না কাঁদি। আজ বড় আনন্দে কান্না পাচ্ছে। ঐ যে তোর চোখে জল দেখ্‌চি—কাঁদ্ রহিম, কাঁদ্। তোর কান্নায় বিশ্বের সকল গ্লানি, সকল নিষ্ঠুরতা, সকল পাপ ধুয়ে যাবে। যে পৃথিবীতে রহিমের মত এক ব্যক্তিও কাঁদতে জানে, সে জগতে আনন্দ, স্নেহ, দয়ার অভাব কি? আয় রহিম একবার আমায় আলিঙ্গন দে। আজ তুই ডাক্ তোর আল্লাকে, আমি ডাকি আমার হরিকে। আয়, রহিম আয় তোকে স্পর্শ করে' ধন্য হই, বাধিত হই, সার্থক হই (আলিঙ্গন)

রহিম। কর কি, কর কি দাদাঠাকুর, আমি যে আর কান্না রাখ্‌তে পার্চ্ছিনা। আমায় অত বলোনা। অত ভালো বেসোনা, সৈতে পার্ব্ব না। আমায় অত প্রশংসা করোনা। আমি যে কেমন হ'য়ে গেছি। দাদাঠাকুর দাদাঠাকুর—

দাদা। রহিম, ভাই আমার। আনন্দ, আনন্দ। আজ তাঁর করুণা মূর্ত্তিমতী হয়ে' দেখা দিয়েছে।

(দারোগা, কয়েকজন কনেষ্টবল ও
ধনদাস রায়ের প্রবেশ)

দাদা। একি আপনারা এখানে কেন? এ সময়ে—

দারোগা। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

দাদা। কিসের?

দারোগা। আপনি ধনদাস রায়ের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে' হাঙ্গামা করেছেন। তাতে দুটো লোক জখম হয়েছে।

দাদা। সে কি?

দারোগা। তবে চলুন।

দাদা। চলুন। তবে যাই সত্যবতী। ওকি! তুমি কথা বল্‌ছ না যে? সত্যবতী, আমার বক্ষ দুর্ব্বল করে' দিও না। মনে রেখো, এও তাঁরি পরীক্ষা।

সত্যবতী। তুমি যে আজ সমস্ত দিন অনাহারী!

দাদা। তার জন্যে কিছু ভেবোনা। স্থির হও। প্রেমময় জগদীশ—

সত্যবতী। যাও, তুমি যদি হাস্‌তে হাস্‌তে এ আঘাত সইতে পারো, আমিও তোমারি স্ত্রী, আমিও তেমনি সইতে পারব।

(সেবাব্রতের প্রবেশ)

সেবাব্রত। দাদাঠাকুর কোথায় যাচ্ছেন?

দাদা। হাজতে—

সেবা। কি অপরাধে?

ধন। আরে অপরাধ না থাক্‌লে কি আর অমনি শুধু শুধু সাজা হয়?

সেবা। চুপ্ কর, কুক্কুর।

দাদা। সেবাব্রত উত্তেজিত হয়োনা।

সেবা। উত্তেজিত হব না! এখনো উত্তেজিত হব না? অত্যাচার ধর্ম্মের বুকের উপর দিয়ে অবাধে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে? অন্যায় আজ ন্যায়ের বক্ষের উপর পৈশাচিক নৃত্য কর্ব্বে? উত্তেজিত হব না? এখনো উত্তেজিত হব না? আশ্চর্য্য! এই অন্যায় দেখে এখনো পৃথিবী একটা বিরাট্ ভূমি-কম্পে কেঁপে উঠচে না! এখনো চন্দ্র সূর্য্য খসে' পড়্‌চে না? এখনো একটা প্রলয়-ঝঞ্ঝা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে' দিচ্চে না! সব স্থির! সব স্থির! আশ্চর্য্য!

দাদা। সেবাব্রত স্থির হও। কাল তার কাজ আপনি করে।

সেবা। না তা করে না। তা করে না। না হলে' এখনো ধনদাসের মস্তকে বজ্রাঘাত হচ্চে না? এখনো স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে সে এই সব দেখ্‌চে? ঈশ্বর, ঈশ্বর, দেখো যেন আজ তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ না হয়। যেন তোমার দয়া, তোমার শক্তিতে বিশ্বাস না হারাই! ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি কি আছো না সয়তানের কাছে পরাস্ত হয়েছ?

দাদা। সেবাব্রত স্থির হও।

ধন। দারোগা বাবু, দাঁড়িয়ে দেখ্‌চেন কি? নিয়ে চলুন। না হলে' হয় তো এখনি একটা হাঙ্গামা কর্ব্বে। ব্যাটা ভারী গোঁয়ার।

সেবা। ধনদাস! না থাক্—কি বল্‌ব—হাঙ্গামা? জানো কি ধনদাস, ঐ যে দেখ্‌ছো পর্ব্বতের মত অটল সমুদ্রের মত স্থির, বৃদ্ধ কেশরী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—যার শিশুর মত সারল্য, ধরিত্রীর মত ক্ষমা, সূর্য্যের মত তেজ, সে যদি একবার চক্ষু রক্তবর্ণ করে, তুমি ভয়ে মাটীর ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। বৃদ্ধ মর্কট, তুমি কি মস্ত অন্যায় কর্‌ছ, জানোনা। কি বল্‌বে যদি একবার আজ্ঞা পাই।

ধন। ওহে বেশ তো অভিনয় করে' যাচ্ছ। থামো থামো আর একটু কাল অপেক্ষা কর। আরো আছে, সব এখনো শেষ হয়নি। আরো দেখাব। আরো দেখ্‌বে। আমি ধনদাস রায় আমায় চেনোনা? কি হে দাদাঠাকুর, এখন তোমায় কে রক্ষা কর্ব্বে। এখনো বল্‌চি, বুঝে দেখ—

সেবা। সাবধান নরপিশাচ! তবে এই লও।

সেবাব্রত আক্রমণ করিলেন দাদাঠাকুর তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

দাদা। ক্ষান্ত হও।

সেবা। (ধনদাসের প্রতি) কুক্কুর, এর প্রতিফল পাবে। জানো আজ কাকে জেলে পাঠাচ্ছ? আজ যার জন্যে সকলের চোখের জল পড়্‌চে, সকলের প্রাণে হাহাকার উঠ্‌চে, সকলের বুকে আঘাত লেগেছে। জেনো, এ আঘাত, এ চোখের জল, এ হাহাকার শুধু যাবে না। এর পরিণাম অতি ভীষণ। যান্ দাদাঠাকুর—যাবার বেলায় একবার পদধূলি দিন। (প্রণত হইলেন)

দাদা। তবে যাই। তোমরা অধীর হবে না। চলুন দারোগা বাবু।

(সকলে প্রস্থান)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্গীকরণ করা প্রযুক্ত, এই বর্গীকরণ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। সাংখ্য বলেন যে, এই পঁচিশ তত্ত্বের মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি এই চারি বর্গ। (১) প্রকৃতিতত্ত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া উহা মূলপ্রকৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) এই মূলপ্রকৃতি ছাড়িয়া অন্য ভিত্তির উপর আসিলে "মহান্" তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মহান্ তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহা 'প্রকৃতির বিকৃতি কিংবা বিকার'; এবং ইহার পরে অহঙ্কার মহান্ তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত বলিয়া 'মহান্' অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল। এই প্রকারে মহান্ অথবা বুদ্ধি একপক্ষে অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল; এবং অন্যপক্ষে মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিংবা বিকার। তাই সাংখ্যেরা তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এই বর্গের মধ্যে ফেলিয়াছে; এবং এই ন্যায়-অনুসারে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাদের সমাবেশও 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এই বর্গের মধ্যেই করিতে পারা যায়। যে তত্ত্ব বা গুণ স্বয়ং অন্য হইতে নিঃসৃত (বিকৃতি) হওয়ার পরে নিজেই অন্য তত্ত্বের মূলভূত (প্রকৃতি) হয়, তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলা যায়। এই বর্গের সাততত্ত্ব মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চত-ন্মাত্র। (৩) কিন্তু পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ষোল তত্ত্ব হইতে পরে অন্য কোন তত্ত্বই নিঃসৃত হয় নাই। উল্টা, তাহাই অন্য তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। তাই, এই ষোল তত্ত্বকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' না বলিয়া শুধু 'বিকৃতি' কিংবা 'বিকার' বলা হয়। (৪) পুরুষ প্রকৃতিও নহে এবং বিকৃতিও নহে; উহা স্বতন্ত্র ও উদাসীন দ্রষ্টা। ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বর্গীকরণ করিয়া—আবার উহার এইরূপে স্পষ্টীকরণ করিয়াছেন:—

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

অর্থাৎ—"এই মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ কোনরূপ বিকার নহে। মহদাদি সাত তত্ত্ব (অর্থাৎ) মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, প্রকৃতি-বিকৃতি; এবং মনসমেত এগার ইন্দ্রিয় ও স্থূল পঞ্চ মহাভূত মিলাইয়া ষোল তত্ত্বকে শুধু বিকৃতি কিংবা বিকার বলা হয়। পুরুষ প্রকৃতি নহে এবং বিকৃতিও নহে"। (সাং. কা. ৩), পরে এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বের আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক মূল প্রকৃতিই অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ তত্ত্ব ব্যক্ত, এবং পুরুষ জ্ঞ। সাংখ্যদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভেদ। পুরাণ, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি বৈদিক মার্গীয় গ্রন্থ-সমূহে প্রায় এই পঁচিশ তত্ত্বই কথিত হইয়া থাকে (মৈত্র্যু. ৬. ১০; মনু ১. ১৪, ১৫ দেখ)। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সমস্ত তত্ত্ব পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে উহাদের বিশেষ বিচার বা বর্গীকরণও করা হয় নাই। উপ-নিষদের পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে মাত্র উহাদের বর্গীকরণ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উপরি-উক্ত সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ হইতে তাহা ভিন্ন। সমস্ত ধরিয়া পঁচিশ তত্ত্ব; তন্মধ্যে ষোল তত্ত্ব সাংখ্য মতানুসারেই স্পষ্টই অন্য তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বিকার বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মূলভূত পদার্থ-বর্গের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাকী নয় তত্ত্ব অবশিষ্ট রহিল—১ পুরুষ, ২ প্রকৃতি, ৩—৯ মহৎ, অহঙ্কার, ও পাঁচ তন্মাত্র। ইহার মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলেন। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বীকৃত হয় না, এক পরমেশ্বর হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মূল-প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি এই যে ভেদ সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। কারণ, প্রকৃতিও পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে মূল বলা যাইতে পারে না, তাহা প্রকৃতি-বিকৃতির বর্গের মধ্যেই আইসে। তাই সৃষ্টি-উৎপত্তি বর্ণনা করিবার সময় বেদান্তী বলেন যে, এক পরমেশ্বর হইতে এক পক্ষে জীব ও অন্য-পক্ষে (মহদাদি সাত প্রকৃতি-

বিকৃতিসহ) অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩০৬. ২৯ ও ৩১০. ১০ দেখ)। অর্থাৎ বেদান্তীদিগের মতে পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে ষোল তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া বাকী নয় তত্ত্বের 'জীব' ও 'অষ্টধা প্রকৃতি' এই দুই প্রকার বর্গীকরণই হইয়া থাকে। বেদান্তীদিগের এই বর্গীকরণ ভগবদ্গীতাতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও শেষে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই গীতায় জীব বলা হয়; এবং জীবই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং সাংখ্য যাহাকে মূল প্রকৃতি বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের 'অপর' অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপ বলা হইয়াছে (গী· ৭. ৪,৫)। এই প্রকার প্রথমে দুই বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপের পরবর্ত্তী ভেদ কিংবা প্রকার যেখানে বলিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বরূপের অতিরিক্ত ও তাহা হইতে নিঃসৃত বাকী তত্ত্ব বিবৃত করা আবশ্যক। কারণ, এই কনিষ্ঠ স্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যদিগের মূলপ্রকৃতি) স্বয়ং আপনারই এক প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণ যথা, বাপের কত ছেলে যখন বলিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা যাইতে পারে না। তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপের ভেদ কত হইয়াছে তাহা বলিবার সময় বেদান্তীরা অষ্টধা প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়ায় বাকী মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী সেই মূলপ্রকৃতির ভেদ কিংবা প্রকার বলিতে হয়। কিন্তু এইরূপ করিলে পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ বা মূলপ্রকৃতি সাত প্রকার বলিতে হয়; এবং উপরে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তী প্রকৃতিকে অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তী যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন, গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন—এই স্থানে এই বিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধ না রাখিয়া 'অষ্টধা প্রকৃতি'র বর্ণনাকেই বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট। তাই মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই এই অষ্টম তত্ত্ব মনকে পুরিয়া দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে (গী· ৭·৫)। তন্মধ্যে মনের ভিতরেই দশ ইন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের সমাবেশ করা হইয়াছে। এখন ইহা প্রতীত হইবে যে, গীতার বর্গীকরণ সাংখ্যদিগের ও বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্ত্বগুলির সংখ্যা তৎপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক হয় না। স্বীকৃত হইয়াছে তত্ত্ব সর্ব্বত্র পঞ্চবিংশতিই। তথাপি বর্গীকরণের উক্ত ভিন্নতার কারণে পাছে ভ্রমে পড়িতে হয় বলিয়া এই তিন বর্গীকরণ কোষ্টকের আকারে একত্র করিয়া পরে দেওয়া হইয়াছে। গীতায় ১৩ অধ্যায়ে (১৩.৫) বর্গীকরণের বিষয় বলিবার সময় সাংখ্যদিগের পঁচিশ তত্ত্ব যেমনটি তেমনিই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহা ধরিয়া বর্গীকরণ ভিন্ন হইলেও দুই স্থানেই তত্ত্বসংখ্যা একই—ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

পঁচিশ মূলতত্ত্বের বর্গীকরণ

সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ। তত্ত্ব। বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ

অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি ১ পুরুষ পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠস্বরূপ।

গীতার বর্গীকরণ।

পরা প্রকৃতি।

অপরা প্রকৃতি।

প্রকৃতি ১ প্রকৃতি

৭ প্রকৃতি বিকৃতি { ১ মহান্, ১ অহঙ্কার, ৫ তন্মাত্র }

পরব্রহ্মের কনিষ্ঠস্বরূপ (আট প্রকারের) } অপরা প্রকৃতির আট প্রকার

১ মন

{ ৫ বুদ্ধীন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ মহাভূত } বিকার বলিয়া বেদান্তী এই ষোল তত্ত্বকে মূল-তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করেন না

বিকার বলিয়া গীতাতে এই ১৫ তত্ত্বকে মূল তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

যাক্। এই পর্য্যন্ত বিচার করা হইয়াছে যে, মূল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র নিরবয়ব অব্যক্ত জড় প্রকৃতিতে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার অস্বয়ংবেদ্য বুদ্ধি কিরূপে প্রকট হইল; আবার 'অহঙ্কারের দ্বারা' সেই প্রকৃতির মধ্যেই সাবয়ব বহুবস্তুত্ব কিরূপে আসিল; এবং পরে 'গুণ হইতে গুণ', এই গুণপরিণামবাদ অনুসারে একপক্ষে সাত্ত্বিক অর্থাৎ সেন্দ্রিয়সৃষ্টির মূলভূত সূক্ষ্ম এগার ইন্দ্রিয় এবং অপর পক্ষে নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ তামসিক সৃষ্টির মূলভূত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্র কিরূপে নির্ম্মিত হইল। এখন ইহার পরবর্ত্তী সৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল পঞ্চ মহাভূত বা তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নির্ম্মিত হইল, তাহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতেই স্থূল পঞ্চ মহাভূত অথবা 'বিশেষ', গুণপরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক বিচার করা প্রযুক্ত প্রসঙ্গক্রমে তাহাও,—এই সূচনারই সঙ্গে ইহা বেদান্তশাস্ত্রের মতে, সাংখ্যদিগের নহে—

সংক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে হয়। 'স্থূল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, ইহাদিগকে পঞ্চ মহাভূত বা বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপত্তিক্রম তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে যে—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ইত্যাদি" (তৈ. উ. ২.১),—অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্যদের কথামত জড় মূল প্রকৃতি হইতে নহে) আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ক্রমের কারণ কি তাহা কথিত হয় নাই। কিন্তু উত্তর-বেদান্ত গ্রন্থাদিতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি-ক্রমের কারণ বিচার সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গুণপরিণামের তত্ত্বের উপরেই করা হইয়াছে দেখা যায়। এই উত্তরবেদান্ত বলেন যে, "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" এই ন্যায় অনুসারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুই গুণের, তিন গুণের, পদার্থ—উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের মুখ্যতঃ শব্দ এই এক গুণই থাকা প্রযুক্ত আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পর বায়ু। কারণ, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ আছে। বায়ুটা বা জলে শুধু শোনা যায় নহে, উহা স্পর্শেন্দ্রিয়েরও গোচর হয়। বায়ুর পর অগ্নি। কারণ, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই ছাড়া অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ আছে। এই তিন গুণের সঙ্গেই রুচি বা রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযুক্ত, অগ্নির পরে জল হওয়া আবশ্যক; এবং শেষে পৃথিবীতে এই চারিগুণ অপেক্ষা গন্ধ এই গুণটি বিশেষ হওয়া প্রযুক্ত জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। যাস্ক এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন (নিরুক্ত. ১৪. ৪)। স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ক্রম-অনুসারে উৎপন্ন হইলে পর "পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।" (তৈ. ২. ১) পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনস্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল,—এইরূপ তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পরে বর্ণিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি পঞ্চমহাভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রণক্রিয়াকে বেদান্ত-গ্রন্থাদিতে 'পঞ্চীকরণ' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চীকরণের অর্থে পাঁচ মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেকের ন্যূনাধিক অংশ লইয়া সেই সমস্তের মিশ্রণে নূতন পদার্থ প্রস্তুত হওয়া। এই পঞ্চীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী "দাসবোধ" গ্রন্থে এই কথারই সমর্থন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

কালেঁ পাঁচরে মেলবিতা। পাবরেঁ হোতেঁ তত্বত।
কালেঁ পিবলেঁ মেলবিতা। হিবরেঁ হোয়॥

অর্থাৎ কাল-সাদা মিলিয়া পায়রা (নীল) হয়, কালো হল্‌দে মিশিয়া সবুজ রং হয়। দাস বোধের নবম দশকে (৯. ৬. ৪০) এইরূপ বলিয়া তের দশকে—

ত্যা ভূগোরাচে পোটী। অনন্ত বীজাঁচিয়া কোটী॥
পৃথ্বী মান্যা হোতাঁ ভেটী। অঙ্কুর নিবতী॥
পৃথ্বী বল্লী নানা রঙ্গ। পত্রেঁ পুষ্পাঁচে তরঙ্গ।
নানা স্বাদ তে মগ। ফলেঁ জালী॥

* * *

অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ উদ্‌ভীজ। পৃথ্বী পানী সকলাচে বীজ ঐসে হে নবম চীজ। সৃষ্টি বচনেচেঁ॥
চারি খানী চারী বাণী। চৌর্‌যাশী লক্ষ * জীব যোনী
নির্ম্মাণ ঝালে লোক তিন্হী। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড॥

অর্থাৎ—সেই ভূগোলের উদরে অনন্ত কোটি বীজ রহিয়াছে। মাটির সহিত মিলন হইয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে লতার নানা রঙ্গ, পত্র পুষ্পের তরঙ্গ। তারপর নানা আস্বাদের নানা ফল। অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভিদ—পৃথ্বী ও জল সকলের বীজ। এই সৃষ্টি রচনা আশ্চর্য্য। এই প্রকার চারি খণ্ড, চারি বাণী, চুরাশি লক্ষ জীবযোনি তিনলোক পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হয়। (দা. ১৩. ৩. ১০-১৫)।

* চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা পৌরাণিক হওয়ায় ইহা আনুমানিক স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তথাপি ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন নহে। পাশ্চাত্য আধিভৌতিকশাস্ত্রী উৎক্রান্তিবাদ-অনুসারে সৃষ্টির আরম্ভে উৎপন্ন এক ক্ষুদ্র গোল সজীব জন্তু হইতে মনুষ্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মানেন। এই কল্পনা অনুসারে সূক্ষ্ম গোল জন্তু হইতে স্থূল গোল জন্তুর উৎপত্তি, এই স্থূল জন্তু হইতে পুনরায় ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, ক্ষুদ্র কীট হইতে তাহার পরবর্ত্তী প্রাণীর উৎপত্তি; প্রত্যেক যোনি অর্থাৎ জাতির মধ্যে এইরূপ অনেক ধাপ চলিয়া গিয়াছে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ জীবশাস্ত্রজ্ঞ এইরূপ গণনা করিয়াছেন যে, জলের ক্ষুদ্র মৎস্যাদিগের গুণধর্ম্ম বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মনুষ্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাপ চলিয়া গিয়াছে; এবং কখনও বা এই সংখ্যার দশগুণও হইতে পারে। জলের ক্ষুদ্র জলচর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত এই যোনি উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যেও ক্ষুদ্র জলচরের পূর্ব্ববর্ত্তী সজীব জন্তু ধরিলে আরো কত লক্ষ বংশ ধরিতে হয় তাহার কল্পনাও করা যায় না। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আমাদের পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পনা অপেক্ষা আধিভৌতিক শাস্ত্রের পৌরাণিক-বংশকল্পনা কত বাড়িয়া গিয়াছে। কালের কল্পনা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। সজীব জগতের সূক্ষ্ম জন্তু এই পৃথিবীতে কখন উৎপন্ন হইল, স্থূল পরিমাণেও তাহা নিশ্চয় করিতে না পারায় সূক্ষ্ম জলচরের উৎপত্তিও কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে এইরূপ ভূগর্ভগত-জীবশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন। এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে The Last Link by Ernst Haeckel with notes &c by Dr Gadow (1898) এই পুস্তক দেখিবে। এই পুস্তকে ডাক্তার গাডো যে দুই তিন উপযুক্ত পরিশিষ্ট যোজিত করিয়াছেন তাহাতে উপরি-উক্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পুরাণের চৌরাশী লক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারে কর হইয়াছে—৯ লক্ষ জলচর, ১০ লক্ষ পক্ষী, ১১ লক্ষ কৃমি, ২০ লক্ষ পশু, ৩০ লক্ষ স্থাবর ও চার লক্ষ মনুষ্য (দাস. ২০.৬ দেখ)।

কিন্তু পঞ্চীকরণের দ্বারা শুধু জড় পদার্থ কিংবা জড় দেহই উৎপন্ন হয়। এই জড় দেহের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে প্রথমে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত পরে আত্মার সহিত অর্থাৎ পুরুষের সহিত জড় দেহের সংযোগ হওয়া আবশ্যক ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

উত্তরবেদান্ত-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত এই পঞ্চীকরণ প্রাচীন উপনিষদের নহে ইহাও এখানে বলা আবশ্যক। পঞ্চ তন্মাত্র বা পাঁচ মহাভূত স্বীকার না করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তেজ, জল ও অন্ন (পৃথ্বী)' এই তিন সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব লইয়া তাহাদের এই মিশ্রণে অর্থাৎ 'ত্রিবিৎকরণের' পরে বিবিধ সৃষ্টি উৎপন্ন হইল এইরূপ বর্ণনা আছে। এবং "অজামেকাং লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" (শ্বেতা. ৪, ৫)- অর্থাৎ—লাল বা তেজরূপী, সাদা বা জলরূপী এবং কালো বা পৃথ্বীরূপী এই তিন রং-বিশিষ্ট তিন তত্ত্বের এক যে অজা অর্থাৎ ছাগ ইহা হইতে নামরূপাত্মক অনেক প্রজা (সৃষ্টি) উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপ-নিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাহার পিতার সংবাদ (কথোপকথন) প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে আরম্ভেই শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা এইরূপ স্পষ্ট বলিতেছেন যে, "বাবা! জগতের আরম্ভে 'একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ'ব্যতীত অর্থাৎ যথাতথা সমস্ত একবস্তুময় ও নিত্য পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যাহা অসৎ (অর্থাৎ 'নাই') তাহা হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরম্ভে সৎ-ই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ছিল। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বহু বস্তু হইবে মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম তেজ (অগ্নি), জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহার পর এই তিন তত্ত্বের মধ্যেই জীবরূপে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, তাহাদের ত্রিবিৎকরণের দ্বারা জগতের অনেক নামরূপাত্মক বস্তু নির্ম্মিত হইল। স্থূল অগ্নি, সূর্য্য বা বিদ্যুৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাম্র (লোহিত) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম তেজোরূপী মূলতত্ত্বের পরিণাম, যে সাদা (শুক্ল) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম জলতত্ত্বের এবং যে কালো (কৃষ্ণ) রং আছে তাহা সূক্ষ্ম পৃথ্বীতত্ত্বের পরিণাম। সেইরূপ আবার মনুষ্য যে অন্ন ভক্ষণ করে তাহাতেও সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম জল ও সূক্ষ্ম অন্ন (পৃথ্বী) এই তিন মূলতত্ত্বই ভরিয়া থাকে। দধি ঘুঁটিলে যেমন মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপরি-উক্ত তিন সূক্ষ্ম তত্ত্বের দ্বারা উৎপন্ন অন্ন উদরে গেলে, তন্মধ্যে তেজতত্ত্ব হইতে মনুষ্যের দেহে অস্থি, মজ্জা ও বাণীরূপে অনুক্রমে স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম পরিণাম উৎপন্ন হয়; এবং সেইরূপ জল এই তত্ত্ব হইতে মূত্র, রক্ত ও প্রাণ; এবং অন্ন অর্থাৎ পৃথ্বী এই তত্ত্ব হইতে পুরীষ, মাংস ও মন এই তিন দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে (ছাং. ৬. ২-৬)। মূল মহাভূত পাঁচ না মানিয়া তিনই মানিয়া ত্রিবিৎকরণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপনিষদের এই পদ্ধতিই বেদান্তসূত্রে (২. ৪. ২০) উক্ত হইয়াছে। বাদরায়ণাচার্য্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই। তথাপি তৈত্তিরীয় (২. ১), প্রশ্ন (৪. ৮), বৃহদারণ্যক (৪. ৪. ৫) প্রভৃতি অন্য উপনিষদে এবং বিশেষত শ্বেতাশ্বতর (২. ১২), বেদান্তসূত্র (২. ৩. ১-১৪) ও পরিশেষে গীতা (৭. ৪; ১৩-৫) এই সকলেও তিনের বদলে পাঁচ মহাভূত উক্ত হইয়াছে। এবং গর্ভোপনিষদে মনুষ্যদেহ 'পঞ্চাত্মক' এইরূপ আরম্ভেই কথিত হইয়াছে; মহাভারত ও পুরাণে পঞ্চীকরণ স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে (মভা. শাং. ১৮৪-১৮৬)। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ত্রিবিৎকরণ প্রাচীন হইলেও যখন মহাভূতের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ স্বীকৃত হইতে লাগিল, তখন ত্রিবিৎকরণের নমুনাতেই পঞ্চীকরণের কল্পনার প্রাদুর্ভাব হইল এবং ত্রিবিৎকরণ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; এবং পরিশেষে পঞ্চীকরণের কল্পনা বেদান্তীদিগের গ্রাহ্য হইল। পরে এই পঞ্চীকরণ শব্দের অর্থে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের শরীর কেবল পঞ্চমহাভূতে গঠিত নহে, কিন্তু এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে প্রত্যেক পাঁচ প্রকার শরীরের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু এই পাঁচটি বিভাগ অন্নময় পৃথ্বীতত্ত্বের ইত্যাদি ইত্যাদি (মভা. শাং, ১৮৪. ২০-২৫; ও মরাঠী দাসবোধে ১৭, ৮ দেখ)। এই কল্পনাও উপরিপ্রদত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বর্ণনা হইতে সূচিত দেখা যায়। কারণ, সেখানে শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে 'তেজ, জল, ও পৃথ্বী এই তত্ত্বগুলির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মনুষ্যের দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতিকথা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ফায়নান্স্ কমিটিতে নিয়োগ—১৮৮৬ অব্দ।

সিমলাযাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেখান হইতে আমরা যাত্রা করিয়া প্রথমে হরিদ্বারে আসিলাম। সে সময়ে সিধা হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেল গাড়ী হয় নাই। রেল ছাড়িয়া ১৩।১৪ ক্রোশ আমাদিগকে

টাঙ্গা করিয়া যাইতে হইল। হরিদ্বারে আমরা সিন্ধিয়ার সরায়ে উঠিলাম। সেইদিন শ্রাবণী সোমবার ছিল। ঠিক-দুপুর বেলা, খুবই গরম হইয়াছিল। আমাদের দেশের চৈত্র বৈশাখের মতো সেখানে আষাঢ় শ্রাবণ শুকনো গরমের দিন। এই সময় উত্তাপে হিমালয়ের বরফ গলিয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়ায় বন্যার জলে গঙ্গা ভরিয়া উঠিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছিল এবং অতি মনোরম দেখিতে হইয়াছিল। তাছাড়া এই সময় আমরা সিমলার ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে সদ্য নীচে নামিয়া আসায় হিমালয়ের পাদদেশস্থ উষ্ণতা আমরা বেশ অনুভব করিয়াছিলাম, এবং অহমদাবাদে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, ঐ উষ্ণতার পরিণাম "ওঁর" শরীরের উপর প্রকটিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব। "খেজুরের সারী"তে সিন্ধিয়ার সরায়ে উঠিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিবার পর, "আমি কি কিছু জলযোগের আয়োজন করিব ?"—এই কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম। দুধ এখনো পাওয়া যায় নাই। আজ শ্রাবণী সোমবার আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক উপোস করিবেন— তাই রান্নাটা দেরীতে আরম্ভ করিলে সকলেরই সুবিধা হইবে, এই কথা আমি বলিতেছিলাম ; কিন্তু শোনে কে ? ওঁর দৃষ্টি তখন কোনদিকে ছিল ? পুরুষদিগের বসিবার জায়গা লম্বালম্বি সোজা সারিতে ছিল। তাতে ৫।৭টা জানালা ও সেই জানালার মধ্যে তাকিয়ার মতো পাথরের কাঠোরা দেওয়া। জানালার নীচেই গঙ্গার প্রবাহপথ হওয়ায়, গঙ্গার জল ভরিয়া উঠিয়া সেই জল জানালায় উপবিষ্ট লোকদিগের হাতে সহজে লাগে। এইরূপ এক জানালায় উনি বসিয়া ও দুই হাত গঙ্গার প্রবাহে ছাড়িয়া দিয়া জলখেলা করিতেছিলেন। চেহারা গম্ভীর, গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের দিকে দৃষ্টি দৃঢ়বদ্ধ। তাঁহার মন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গঙ্গাময় হইয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মুখে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ পাইতেছিল। এই তল্লীন অবস্থা দেখিয়া আমি কয়েক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ওঁর মুখ দেখিতে লাগিলাম, কারণ ইহার মাঝে একটা বিক্ষেপ আনিতে আমার মন সরিল না। ইতিমধ্যে রাওবাহাদুর পণ্ডিত সামনে আসিয়া বলিলেন,—"আমাদের কিছু "খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ?" আমি বলিলাম— "হাঁ, আমি ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, দুধ এখনো পাওয়া যাইনি, মোহনভোগ করে এনে দেব কি ?" এইরূপ আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় 'উনি' আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "ব্যাপারটা কি ? কি বলচ ?" আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই বলিলাম। তাহাতে উনি বলিলেন, "আমি এখন খাব না। তোমরা যখন খাবে তখন আমি খাব। কিন্তু এই ব্যক্তির যাতে সুবিধা হয় আগে তাই কর। "ওঁর ক্ষুধা সহ্য হয় না," এইরূপ শঙ্কর রাওর দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন। এই সুযোগ পাইয়া পণ্ডিত আমাকে বলিলেন "দিদি ওঁর খিদে হবে কি করে' !! তুমি সেদিকে কাজে ছিলে, কিন্তু এখানে আসা অবধি ওঁর মনোভাব একেবারে গঙ্গাময় হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ওঁর এখন হরিদ্বারেই বাস করবার ইচ্ছা হয়েছে। শুধু নামের দরুণ এতটা মনের টান হয়েছে, তারপর প্রত্যক্ষ মহাদেবকে দেখলে না জানি কি কাণ্ডই করবেন !!" তখন উনি হাসিয়া বলিলেন :—"এখানে তুমি একটা মস্ত ভুল করেছ !! এ কথা তোমার উপরেই খাটে, কারণ আমার নাম মহাদেবের নাম নয়, আমার নাম তিন-অক্ষরী বিষ্ণুর নাম (মাধব) !" তবু শঙ্কর রাও আবার বলিলেন : —"কিন্তু দিদি এখানে উনি যদি থাকতে ইচ্ছা করেন তাহলে তোমার কি হবে ?" সেই কুসুমবতী পাহাড়ের কথার এটা পাল্টা জবাব, এই কথা তৎক্ষণাৎ আমার মনে হওয়ায় আমি বল্লুম, "আমার আর কি হবে ? আমার ভাবনা কিসের ? যেখানেই থাকা হোক না আমি ত ওঁর কাছেই থাকব। তবে আমার ভয় কিসের ? আমরা এখানে থাকলে তোমারই কাজ আরও বেড়ে যাবে। রোজকার সংবাদপত্র বই প্রভৃতি পাঠানো, নিজের কোন কাজকর্ম্মের চেষ্টা হলে তাহা জানানো, মত জিজ্ঞাসা করা,—এ সমস্ত কাজ তোমারই করতে হবে। পুণার বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গরূপ আফিম-মৌতাত ছাড়্‌তে হবে এবং তাঁদের কথা-চালাচালিরূপ উদ্ধবের কাজ তোমাকেই করতে হবে।" তখন পণ্ডিত বলিলেন, "উদ্ধবই কি, আর মাধবই কি, পুণার লোক সকল-দেশের সেরা ঝগড়াটে ! আর তাদের উপরই এত ভালবাসা ? পুণা ওঁর প্রাণ বল্লেও হয় ! পুণা ছেড়ে কোথাও ওঁর ভাল লাগে না। এখানে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকলেও মনের টানটা পুণার দিকেই আছে।" এই সব কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, উনি চুপ করে সব শুনিতেছিলেন, তারপর বলিলেন ; "সম্পূর্ণরূপে না হইলেও তুমি যা বলছ তা কতকটা তোমার উপরেই আরোপ করা যেতে পারে।" যাক্। এইরূপ কথা হইতেছিল এমন সময় ক্ষেত্রোপাধ্যায়, সিন্ধিয়ার উকিল প্রভৃতি লোক দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ২।৩টার সময় আমাদের আহার হইল। আহারান্তে আমরা সবাই কনখল তীর্থ দেবালয় ও গঙ্গোত্রী, বদ্রিকেদারা যাইবার দরজা প্রভৃতি দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম ; এবং রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা করিয়া সকালে লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সকালে লাহোর ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী আসিয়া

পৌঁছিল। সেখানে লাহোরের মিত্রমণ্ডলী আমাদের লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন; তাঁরা যে স্থান আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। লাহোরে একটা বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করায় উনি রাজি হইলেন এবং সেইদিন সন্ধ্যাকালেই ওঁর বক্তৃতা হইল। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কতকগুলি পঞ্জাবী বন্ধুর স্ত্রীরা আসিয়াছিলেন। তাঁরা আমাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত সহর এবং সার্থজনির বাগান ও কেল্লা দেখাইলেন এবং সন্ধ্যা-কালে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। তারপর দিন, কতক-গুলি মহিলার আগ্রহ বশতঃ আমি তাঁদের বাড়ী গেলাম। ওঁর মিত্রমণ্ডলীও ওঁর অভ্যর্থনার্থ "পানসুপারীর" নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে, লাহোরের প্রসিদ্ধ কাঠের কাজ, রূপার গিল্‌টি করা উত্তম নক্সাদার বাসন, রেসমি ও কলাবতুর ছুঁচের কাজ-করা হরেক রকমের কাপড়, ছেলেমেয়েদের খেলনা প্রভৃতি খরিদ করিয়া আবার রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা করিলাম এব তাহার পর দিন অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

অমৃতসরের প্রখর গ্রীষ্ম অসহ্য মনে হইল। রেলগাড়ী ও রাস্তায় কুলীদের মাথার উপর মোট্ থাকিলেও, তাহা-দের এক হাতে পাখা থাকা চাই-চাই। এত কড়া গ্রীষ্ম যে, কাজ করিবার সময়েও এক হাতে পাখা করা চাই, নৈলে চলে না। যাঁহারা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁরাই পরে আমাদিগকে একটা বাসা-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমাদের থাকিবার জন্য তাঁরা একটা বড় সরাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সেখানে তাঁরা কোচ, কেদারা, ফলকরা দুধ প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। তাছাড়া তিন চার জন কুলী হাতে পাখা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এই অঞ্চলে "পিয়র" নামক ফল বিস্তর জন্মে। অম্লমিঠা স্বাদ—বড়ই মধুর। যাঁহারা পৌঁছিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরিয়া গেলে পর, পণ্ডিত ও উনি একটু দুধ পান করিয়া ও কিছু ফল খাইয়া আপন আপন পুস্তক খুলিয়া কোচের উপর আরামে গা ঢালিয়া দিলেন। কুলীরা পাখা করিতে ছিল। আমার জন্যেও পর্দা ঘিরিয়া কামরার মতো একটু জায়গা করা হইয়াছিল এবং কোন এক মিত্র, নিজের বাড়ীর একজন মজুরণীকে পাখা করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু আমি সেই মজুরণীকে বলিলাম, "এখন তুই বাড়ী যা, তোকে দরকার নেই। আমার দাসী আমার সঙ্গেই আছে।" এই কথা বলিয়া তার হাতে চারি আনা পয়সা দিলাম; পয়সা পাইয়া সে তখনি চলিয়া গেল, আমিও একটু আরাম করিলাম। কারণ সমস্ত জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করিয়া, রান্নার সরঞ্জাম বাহির করিয়া লইয়া রান্না করাই আমাদের প্রধান কাজ। পুরুষ-দের খাওয়া না হইলে, কাজ ফেলিয়া গরম হইতেছে বলিয়া আরামে পাখার বাতাস খাইতে খাইতে পড়িয়া থাকা, হিন্দু-রমণী আমাদের রুচিবে কেন? আমি নীচে গিয়া রান্নার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলাম। বাসন-কোসন ঠিক্-ঠাক্ করিলাম এবং রান্না না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। কিন্তু অত বেলায় আমার চার বার ঠাণ্ডা জলে গা ধুইতে হইল, তার পর ভাত বাড়িতে সমর্থ হইলাম। এমন ভয়ানক গ্রীষ্ম। আমরা যে সরাইয়ে উঠিয়াছিলাম, সেই সরাইটা খুবই বড় ছিল। সরাই-য়ের দরজা হইতে ভিতরে আসিবার পর প্রায় ২৫।৩০ হাত দূরে একটা বড় বাঁধানো পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীর তিন ধারে বড় বড় ধাপ বাঁধানো, তাহার উপর ঘাটের বাঁধানো চাতাল। তাহাতে প্রবাসীদের নামিবার সুবিধা ছিল। প্রথম-দরজা হইতে ভিতরে সরায়ে আসিবার সময় দরজা বড় ফটকের মতো হওয়ায়, তাহার ভিতরে দুই পাশে দই-য়ে ভরা বড় বড় মাটীর ঘড়া, পানের খিলি, ফুল, পাখা, সরবৎ ও ফলফুলরি—এই সমস্তের দোকান দুইদিকে বসিয়াছিল। বাহির হইতে আসিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি, নিদেন আধপয়সার দই কিনিয়া ভিতরে আসিবার পর, সরায়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত বড় পুষ্করিণীতে গায়ে দই মাখিয়া স্নান করিয়া যাইবে। এই ব্যাপার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এই পুষ্ক-রিণীর একটা কোণ ঘিরিয়া উচু পাকা দেয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ভিতরে যাইবার একটিমাত্র বাঁকা পথ রাখা হইয়াছিল, ঐ জায়গা কেবল স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের মতো দই কিনিয়া ভিতরে আসে। এই লোকদের মধ্যে পর্দার কড়া ব্যবস্থা থাকায়, মুখের উপর 'বুর্খা' দিয়া উহারা স্নানের ঘরে গমন করে। আমি প্রথমে উহাদেরই স্নান-ঘরে স্নান করিয়াছিলাম। আমি আমার পরা-কাপড়-চোপড় সমেত স্নান করিবার জলে প্রবেশ করিলাম। আমার এই ব্যবহার সেখানে অবস্থিত মহিলাদের ভাল বোধ হইল না। কোন কোন রমণী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না দেখিয়া দুই একজন পাকা মেয়ে আমাকে বলিল; "ওগো, কাপড় গায়ে রেখে স্নান করলে কি পরিষ্কার মনে হয়? আমরা কি পুরুষ মানুষ? স্ত্রীলোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জা কিসের? তোমাদের দেশের কি এই চাল্?" আমি বলিলাম— "হাঁ! তোমাদের মত স্নান করা আমাদের কখনই অভ্যাস নাই।" এই কথা বলিয়া আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলাম। এই স্নান ঘরে যারা স্নান করিত সেই সব রমণীর একই রীতি হওয়ায় তাহারা

কিছুই মনে করিত না। কিন্তু আমার এইরূপ মানে অভ্যাস না থাকায় আমার বড় লজ্জা করিত। আমাদের মধ্যাহ্নভোজন হইয়া গেলে, কতকগুলি শিখ-মৈত্রিনী আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। লোকে যে বলে অমৃতসরে এক সোনার মন্দির আছে, না জানি সে কি রকম তাই দেখিবার জন্য আমি এই মহিলাদের সহিত গেলাম। মন্দিরের কেবল ভিতর দিক্‌টা সোনার কাজীর বেলবুট্টা ও নক্সা করা। মন্দিরে বিশেষ কিছু দেখিলাম না। পুরাণ শুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের খুব ভীড় হইয়াছিল। মন্দিরে এবং মুখ্য স্থানে অন্য হিন্দু মন্দিরের ন্যায় দেবতা, শিবলিঙ্গ, কিংবা কোন রকম মূর্ত্তি বা আকার কিছুই ছিল না; মুখ্য স্থানে একটি ভব্য ধরণের চৌকী পাতিয়া তাহার উপর মূল্যবান কাপড়ে আচ্ছাদিত 'গ্রন্থ-সাহেবের' এক পুঁথি ছিল। "এই আমাদের দেবতা এবং এ-ই আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ"—আমার সঙ্গিনী মহিলারা আমাকে বলিলেন। তার পর ফিরিয়া আসিবার সময় কতকগুলি মহিলার বিশেষ অনুরোধে আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। তাঁদের চাল-চলন অনুসারে তাঁরা হুকা, সরবৎ পানসুপারী প্রভৃতি আতিথ্যের দ্রব্য আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। আমরা দক্ষিণী রমণী আমাদের রোজ পান খাইবারও অভ্যাস নাই; তবে অন্য জিনিসটার সহিত আমাদের পরিচয় কি-করিয়া হইবে!! কারণ হুকার সহিত আমাদের পুরুষদেরও প্রায় পরিচয় নাই বলিলেও চলে। কাজে-কাজেই আমি এই আতিথ্যসৎকার অস্বীকার করিলাম। তাহার পর তাঁহাদিগের রীতি অনুসারে একটা মস্ত সম্মান—গৃহকর্ত্রী আমাকে পানের খিলি দিলেন এবং আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। এবং তাঁহাদের চাল-চলন সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়া আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সেই রাত্রিতেই আমরা অমৃতসর হইতে যাত্রা করিয়া তাহার পর দিন দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলাম।

দিল্লীতেও এইরকম একটা বড় সরায়ে উঠিলাম। সেই সরায়ের নীচের তালায় বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীর এক বড় দল উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। তাহার মধ্যে, কতকগুলি বালিকা, কতকগুলি গর্ভিণী, কতকগুলি ছেলেপিলের মা, এবং কতকগুলি বৃদ্ধা—এইরূপ সকল রকমের রমণী ছিল। গায়ে চেলি নাই, কপালে কুঙ্কুম নাই. শুধু তাহা নহে, তাহার মধ্যে একজনেরও মাথায় চুল নাই। কাপড়ের আঁচল শুধু মাথার উপর থাকায় তাহাদিগকে আমাদের বিধবা রমণীদের মত দেখিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত লক্ষণ হইতে আমার ইহাদিগকে বিধবা মনে করিয়া আমার মন বড় খারাপ হইল। এবং এই ভাবেই পুনঃপুনঃ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম—কিন্তু দেখিলাম, তাহারা হাসিতেছে খেলিতেছে, ঠাট্টা মস্করা আমোদ করিতেছে। এই সব দেখিয়া আমার মনে হইল আমার হয়ত ভুল হইয়াছে। বোধ হয় ইহারা বিধবা নহে; কিন্তু সকলেই সধবা-চিহ্ন বিবর্জ্জিত একইরকম কি করিয়া হইল? এই সম্বন্ধে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহটা দূর করিব মনে করিলাম—কিন্তু ভাষার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বাঙ্গালার এক শব্দও বুঝিতাম না এবং উহারাও ইংরেজী কিংবা মরাঠী জানিত না। তাছাড়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার সময়ও ছিল না। কারণ আমরা দিল্লীর প্রসিদ্ধ ইমারৎ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান ও মিনার আজি দেখিয়া দুই দিন পরেই আগ্রায় আসিলাম। সেখানকার মুখ্য ইমারৎ তাজমহল দেখিতে গেলাম। স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ প্রবাহযুক্ত যমুনা-নদী পরিবেষ্টিত সেই সুন্দর মর্ম্মর-প্রস্তরের তাজমহল আমরা দেখিলাম। তাহার প্রত্যেক স্তম্ভের উপর যে বেলবুটা গাছ ফুল ও পাখীর চিত্র খোদিত হইয়াছে, তাহা সকল রকম রঙের পাথর মিলাইয়া যথা প্রমাণ উত্তমরূপে বসান হইয়াছে। এইরূপ ইমারৎ নির্ম্মাণ করিবার জন্য যিনি অগণিত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও, এই ইমারৎ নির্ম্মাণকারী শিল্পকারের কার্য্য আরও অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়, সন্দেহ নাই। সেখানকার আরো কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া আমরা মথুরায় আসিলাম। তার পর দিন নৌকা করিয়া গোকুল ও বৃন্দাবন দেখিতে গেলাম। গোকুলে দ্রষ্টব্য জিনিস কিছুই নাই। কিন্তু বৃন্দাবনে কেবল অতীব সুন্দর-গঠিত বড় বড় দেবালয় আছে। দেবালয়ের হাতাও খুব বড়। সেদিন গোকুল অষ্টমীর উৎসবের দিন হওয়ায় তদ্দেশীয়, অর্থাৎ ব্রজবাসী, গুজরাটি ও বাঙ্গালী প্রায় শ-দেড়শো ব্রাহ্মণ আপন আপন শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুঁথী সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতেছিলেন। এই সপ্তাহের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ ও ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ধনী যাত্রীরাই করিয়াছিলেন; পাণ্ডারা এইজন্য যাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিছু টাকা আদায় করিয়া থাকে। বৃন্দাবন হইতে আবার আমরা মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম, মথুরা বড় সহর, ইহার ইমারৎও বেশ মজবুত ও ভব্যধরণের। সহরের পাণ্ডারা বেশ ধনশালী। সেখানে প্রধানতঃ ব্রজভাষা কথিত হয়। ব্রজভাষা বড়ই মধুর মৃদু ও নম্র এইরূপ সেখানকার লোকেরা মনে করে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ব্রজভাষাই

সর্বাপেক্ষা উপরি-উক্ত গুণে বিভূষিত বলিয়া উহারা অভিমান করে। আমরা মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া আজমীরে আসিলাম। এখান হইতে ৬।৭ মাইল দূরে পুষ্কর নামক পুরাণ প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। এখানে প্রচুর পদ্ম জন্মায় বলিয়া খুব পদ্ম পাওয়া যায়। এবং খাবার সময় কলা-পাতার মতো পদ্মের বড় বড় পাতা ব্যবহার করা হয়। পদ্মবীজকে শস্যদানায় পরিণত করা হয়। আজমীরে আসা অবধি 'ওঁর' শরীর ভাল মনে হইতে-ছিল না; তাই উনি আমাকে বলিলেন, "পুষ্কর যদি দেখিতে হয় তাহলে তুমিই যাও, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই, আমি আর যাব না," পুষ্করের এত নিকটে আসিয়াছি, পুষ্করটা দেখিয়া যাইব এইরূপ মনে করিয়া আমি জানকী-বাই ও উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইলাম। টাঙ্গা হইতে নামিয়া দেখিলাম, সেখানে অনেক যাত্রী স্নানের জন্য আসিয়াছে। দিল্লীতে যে বাঙ্গালী মেয়েদিগকে দেখিয়াছিলাম তাহারাও আসিয়াছে। এই মেয়েদের সহিত শুধু মুখ-চেনাচিনি ছিল মাত্র, তবু তাহাদিগকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় থাকায়, আমি তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধার সহিত এক সঙ্গে স্নানের জন্য জলে নামিলাম। স্নান করিতে করিতে, তাঁহাকে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে কুমারী কত জন? বিবাহিতা কত জন এবং বিধবাই বা কত জন? তোমরা সবাই এক রকমের পরিচ্ছদ পরেছ—এর কারণ কি? চোলী কাঁচের চুড়ী, কুঙ্কুম প্রভৃতি সধবার চিহ্ন ধারণ করবার রীতি কি তোমাদের নাই? অবিবাহিত, বিবাহিত ও বিধবা এদের কি চিহ্ন দেখে চেনা যেতে পারে?—আমাকে অনুগ্রহ করে' বলুন—রাগ করবেন না। আমি পরদেশী লোক ব'লে সব জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি।" এই বৃদ্ধা বেশ পরিপক্কবুদ্ধি ও সমজদার ছিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া লইয়া, নিম্নলিখিত বিবরণ আমাকে বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"দশবৎসরের ভিতর হইলে, যাহার হাতে লোহার বালা নাই, কিন্তু যে পাড়-ওয়ালা কাপড় পরে ও সিঁথিতে সিঁদুর দেয় না তাকে অবিবাহিতা বলেই বুঝতে হবে। যে পাড়-ওয়ালা শাড়ী পরে ও যাহার সিঁথিতে সিন্দুর আছে ও বাঁ হাতে লোহার বালা আছে তাহাকে বিবাহিত বলে বুঝবে। লোহার বালা বাঁ হাতে পরা এই আমাদের বিবাহ চিহ্ন। যে বিনা-পাড়ের সাদা কাপড় পরে ও যার সিঁথিতে সিন্দুর নেই ও যার হাতে বালাও নেই তাকেই বিধবা বলে বুঝবে। চোলী, কাঁচের চুড়ী, মঙ্গলসূত্র হার—এ সব পরা আমাদের রীতি নয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের কাহারও মাথায় চুল নেই কেন?" তিনি বলিলেন—

"তীর্থ করতে এসে যদি মাথা মোড়ান না যায় তাহলে দেশে ফিরি গেলে লোকে আমাদের অশুচি মনে করে"—এই সমস্ত বলিয়া, আমাদের চাল-চলন সম্বন্ধে উল্টে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "মাথায় কাপড় না দিয়ে নির্লজ্জভাবে পুরুষদের সামনে যাওয়া তোমাদের ভাল লাগে কি করে? মাথা খুলে রাখাই কি তোমাদের দেশের চাল? তোমাদের পর্দা নাই কি?"—প্রভৃতি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, আমার স্নান হইয়া গেল, আমি শুকনো কাপড় পড়িয়া ব্রহ্মদেবের মন্দিরে গেলাম। সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে, ব্রহ্মদেবের মন্দির এই ক্ষেত্রেই আছে এবং এই ক্ষেত্রেই ব্রহ্মদেবের পূজা হইয়া থাকে, শুনিলাম নাকি ব্রহ্মদেবের মন্দির আর কোথাও নাই। এখান হইতে আর একটু দূরে সাবিত্রীর মন্দির আছে। কিন্তু তাহা আমি দেখিতে গেলাম না। কারণ, পূর্ব্বদিন হইতেই আমাশা হইয়া "ওঁর" শরীর একটু খারাপ হইয়াছে। সেইজন্য আমার শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইল। আজমীর হইতে আমরা সিদ্ধপুরে গেলাম। সেখানে সরস্বতী নদী আছে; সেখানে শ্রী কপিল মহামুনির দেবালয় আছে। এই স্থানেই কপিলমুনি আপন মাতা দেবহুতীকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান—আমরা হিন্দুলোক এই স্থানকে বিশেষ পবিত্র বলিয়া মনে করি। এই তীর্থক্ষেত্রকে মাতৃগয়া বলে। এই তীর্থক্ষেত্র দেখিয়া আমরা আহমদাবাদে আসিলাম। এই স্থানে "ওঁর" শরীর আরও খারাপ হয়; একবার ভাও-নগর ও কাঠেবাড় দেখিয়া আসিবার জন্য, আমাদের ভাও-নগরের মিত্রেরা অনুরোধ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু শরীর খারাপ বলিয়া এই মৎলব রহিত করিয়া আমরা একেবারে পুণায় আসিলাম। সেইদিনই আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। এদিকে "ওঁর" অসুখ আরও বৃদ্ধি হওয়ায়, আমাদের ১৫ দিন দুঃখ, কষ্ট ও ভাবনায় কাটিল। তারপর, "ওঁর" অসুখ একটু কমিয়া আসিল। ১৫ দিনের পর ওঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া, রেলগাড়ীতে যাইবার মতো অবস্থা হইলে, আমরা মান্দ্রাজের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

(ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত)

মহর্ষির কথা।

(আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ)

একবার যখন মহর্ষিদেব একাকী বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তখন আমার পরলোকগত বন্ধু আনন্দ মোহন বসু ও আমি পরা-

মর্শ করিলাম যে মহর্ষিদেবকে সংবাদ না দিয়া শান্তি নিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইব। তদনুসারে এক-দিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১০টার পরে শান্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চাকরের হাতে আমাদের নাম উপরে প্রেরণ করিলে দেখিতে পাইলাম যে মহর্ষি সিঁড়ির উপরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমা-দিগকে উপরে যাইবার জন্য অদেশ করিলেন। আমরা উপরে উঠিলে বলিলেন—"আমি খেতে যাচ্চি, এস তোমরাও আমার সঙ্গে খেতে বসো।" আমি বলিলাম—"খাবার ত একজনের মত হয়েছে, আপনি আহার করুন, আমরা একটু অপেক্ষা করি, পরে খাব।" শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা কি মনে কর একজনের মতই খাবার প্রস্তুত হয়েছে? এস না, বসে দেখ না, কিছুরই অভাব হবে না।" আমরা গিয়া তাঁর সঙ্গে আহারে বসিলাম। তিন জনে বেশ আহার চলিল, কিছুরই অভাব হইল না। পরে ভৃত্যদের মুখে শুনিলাম যে, কে কখন আসে তাহা স্থির না থাকাতে প্রতি-দিনই দুই একজনের মত অধিক রান্না হয়।

আহারান্তে মহর্ষি মুখ হাত ধুইতেছেন; ইতি-মধ্যে আমরা দুজনে তাঁর বসিবার ঘরে গেলাম। গিয়াই দেখি যে ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বিষয়ে একখানি নব-প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার টেবিলের উপরে রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থখানির প্রশংসা আমরা সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দ-মোহন বাবু বলিলেন—এই বইখানার অনেক প্রশংসা কাগজে পড়েছি, মহর্ষি কি এখানা আনায়ে পড়-ছেন?" আমি বলিলাম—"তাই ত মনে হয় কারণ বৈএর ভিতর হাড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে মনে হয় কাটছেন ও পড়ছেন।" ইতিমধ্যে মহর্ষি আসিয়া উপস্থিত; সে বৈখানা আনন্দমোহন বাবুর হাতে দেখিয়া বলিলেন—"কি আনন্দমোহন, বৈখানা কি আগে দেখেছ?"

আনন্দমোহন।—না দেখিনি, তবে কাগজে অনেক প্রশংসা শুনেছি। এখানা কি আপনি পড়ছেন?

মহর্ষি। হাঁ, আমিও প্রশংসা শুনে আনিয়ে পড়ছি।

আনন্দমোহন। (বিস্ময়াবিষ্টভাবে) আপনি Geology পড়ছেন?

মহর্ষি। (হাসিয়া) সে কি আনন্দমোহন অমন করে জিজ্ঞাসা করছ যে! Geology কি অপাঠ্য? তোমরা কি জান না Geology আমার বহুদিনের পাঠ্য বিষয়; Geology বিষয়ে আমি একটা authority বল্লে হয়; বহু বৎসর পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরেছি ও Geology অনুশীলন করেছি।

মহর্ষি যখন তাঁর পর্ব্বত ভ্রমণের ও Geology পাঠের কথা বলিতেছেন তখন আমি আনন্দমোহন বাবুর কানে কানে বলিলাম,—"আপনি কি মহর্ষির কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর "পৃথিবী" নামক গ্রন্থের ভূমিকা পড়েন নাই? তাতে দেখবেন স্বর্ণকুমারী বলেছেন যে মহর্ষির ক্রোড়ে বসেই তিনি ভূতত্ত্ব-বিদ্যাকে ভালবাসতে শিখেছেন।"

ইত্যবসরে মহর্ষি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে বলিলেন, "কথাটা কি বুঝলে না? আমার যাবার সময় হচ্চে কি না, তাই মনের জাহাজে যত মাল বোঝাই নিতে পারি তার চেষ্টা করছি।"

মহর্ষির সেই হাসি ও সেই উক্তি কখনো আমি ভুলিব না। এই বার্দ্ধক্যে সেই মনের জাহাজ-বোঝাইয়ের কথা মনে হয় এবং আমাকে জ্ঞানালো-চনাতে উৎসাহিত করে।

পরে রাত্রিকালের আহারের পর আমরা মহর্ষির বসিবার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত নানা আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি যখন সাড়ে নয়টা বাজিল তখন মহর্ষি আমাদিগকে বলি লেন—"আমি এখন একলা থাকব, তোমরা গিয়ে শয়ন কর।" আমরা নামিয়া আসিলাম, এবং শয়নগৃহে শয্যাতে গিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম! রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি যে উপরকার বারাণ্ডায় মহর্ষি বেড়াইতেছেন। শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি তিনটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, চাহিয়া দেখি সেই পূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনের বাগান মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে। বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি আনন্দমোহন বাবুকে জাগাইয়া তুলিলাম। বলি-লাম, "উঠুন উঠুন, চলুন একবার পূর্ণিমার রাত্রে বাগানে বেড়াই।"

আমরা দুজনে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, মহর্ষিদেব তখনও উপরের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন। আমি আনন্দমোহন বাবুকে বলিলাম, "মহর্ষির ধ্যানপরায়ণতার বিষয়ে যে শুনিয়াছেন, ঐ তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখুন। এই পূর্ণিমার রাত্রে আনন্দ-সাগরে মগ্ন আছেন।"

একবার মহর্ষিদেব দার্জ্জিলিঙ পাহাড়ে বাস করিতেছিলেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে যাইতাম। একদিন আমি গিয়া বসিয়াছি, মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি গতবারের 'ভারতী' পড়েছ?" আমি বলিলাম—"না, এখনও পড়িনি"। তখন মহর্ষি তাঁহার টেবিল হইতে একখানা "ভারতী" তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"এই দেখ গত বারের ভারতী।" আমি পাতাগুলি উন্টাইয়া দেখি, মহর্ষি প্রবন্ধগুলির পাশে পাশে নিজের হাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। স্বর্ণকুমারীর লিখিত একটি প্রবন্ধের পার্শ্বে লিখিয়াছেন, "রুচিসঙ্গত নহে" ইত্যাদি। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে নিজ পরিবারের ব্যক্তিদের প্রবন্ধ বিষয়েই এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বলিলেন—"আমার কাছে দুখানা 'ভারতী' আছে—একখানা আমার কাছে রাখি; আর একখানাতে আমার পরিবারের লোকদের সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করে ফেরত পাঠাই; সেখানা তাদের কাছে পাঠান হয়।" আমি বলিলাম, "ওঃ, আমি এতদিনের পর বুঝতে পারলাম কেন আপনার সন্তানেরা সাহিত্য চর্চ্চাতে দেশের অগ্রণী,—আপনি তার মূলে। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে যে আপনি তা বুঝতে পারছি। "স্বর্ণ! তোমার হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক" যে বলেছেন, এ কি সামান্য কথা।" শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন—"স্বর্ণের লেখা ত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না?"

আমি বলিলাম, "তাতে সন্দেহ কি? তাঁর প্রতিভা দেখে আমিও চমৎকৃত।" *

* ১৩২২ সালের মাঘ মাসের ভারতী হইতে উদ্ধৃত।

পুরাতন স্মৃতি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের জীবনীর এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পাঠে তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে তিনি মর্ত্ত্যলোকে আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। কোন্নগরের যাহা কিছু উন্নতি, তিনি সকলেরই মূল। ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যালয়, রেলওয়ে ষ্টেসন, পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠা তাঁহা হইতে সংঘটিত হয়। স্থানীয় অনেক গৃহবিবাদ তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। উচ্চ পদস্থ হইলেও তাঁহার মত বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী লোক বড় বিরল। তাঁহার সুন্দর ও সুপরিস্কৃত আবাস নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজের যে উৎসব হইত,তাহা চতুঃপার্শ্বস্থ শিক্ষিত মণ্ডলীতে ভরিয়া যাইত। আদর অভ্যর্থনায় সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু, বেচারাম বাবু প্রভৃতি উপাসনার কার্য্য করিতেন ইহা আমরা নিজে দেখিয়াছি। তৎপরে গঙ্গাতীরে তাঁহারই যত্ন চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবচন্দ্র বাবু মহর্ষির সহধর্ম্মা ও সহকর্ম্মী ছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মগণের মধ্যে যে ঐকান্তিকতা শিক্ষা স্বদেশসেবার পরিচয় পাইয়াছি, তাহার শতাংশও বর্ত্তমান সময়ে পরিলক্ষিত হয় না। কোন্নগরে যাইয়া পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বাবুর আগ্রহে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়া আসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ নানা স্থানে অর্থ সামর্থ্য ও উৎসাহ দিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দিন কতকের জন্য স্থায়ী ভাবে ঢাকায় থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র অর্থ দিয়া ঐ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু চিরদারিদ্র্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদের আমলে তাঁহার গৃহে নিয়মিত ভাবে আজীবন উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত কালিপ্রসন্ন

বিদ্যারত্ন ও বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করিতেন। গবর্ণমেণ্ট প্লীডার স্বর্গীয় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। স্বর্গীয় গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ও নন্দলাল মৈত্রেয় ও স্বর্গীয় উকীল অম্বিকাচরণ সরকার, হুগলী শ্রীরামপুর ও বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুর বোয়ালিয়ায় অবস্থান কালীন সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করিতেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ছিলেন। দ্বারবঙ্গ মহারাজার অন্যতম সদস্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু তথাকার ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিতেন। সদরআলা কাশীশ্বর মিত্র চুঁচুড়ায় অবস্থান কালীন তথাকার ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ দিতেন। আজকালকার দিনে, কয়জন ভৈরব বাবুর প্রচারিত বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ৺ কাশীশ্বর মিত্রের চুঁচুড়া ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ৺ কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের কালনা ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ৺ চন্দ্রশেখর বসুর বক্তৃতা, ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার সন্ধান রাখেন। মহর্ষির ব্যাখ্যান প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবুর ও বেচারাম বাবুর বক্তৃতা অনেক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হইত। বেচারাম বাবু নানা স্থানে আট দশটি ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। ব্যবস্থা-দর্পন প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকার ও সংস্কৃত কলেজের গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকরূপে উহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। যাবতীয় শিক্ষিত মণ্ডলী ও কলিকাতার প্রধান প্রধান সকল লোক ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভাকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ প্যারীচাঁদ মিত্র, পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানবৃদ্ধ আনন্দকৃষ্ণ বসু ও শিবচন্দ্র দেব ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৺ শম্ভুনাথ গড়গড়ি জীবনের শেষ রক্তটুকু ব্রাহ্মসমাজের জন্য পাত করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন আজীবন ব্রাহ্মসমাজের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। শেষ ভাগে ৺ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক করিয়াছেন। মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মূল্যবান সামগ্রী। আজ দীননাথ অধ্যেতা-সমগ্র উপনিষদ্ কণ্ঠস্থ করিয়া নানা স্থানে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ভবানীপুরের শতবর্ষী শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাজীবন ধরিয়া আজও ব্রাহ্মসমাজকে ধরিয়া রহিয়াছেন।

বহু সংখ্যক পণ্ডিত মণ্ডলীর সহানুভূতি ধারণ করিয়া ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ চলিয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহানুভূতি না পাইলে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ত্বরিত গতিতে চলিবে না ইহা বুঝিয়া মহর্ষি মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষে ও গার্হস্থ ক্রিয়া-কলাপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দিতেন। বর্ত্তমানে প্রচার করিবার সে আদর্শ আমরা হারাইতে বসিয়াছি। হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা সম্প্রদায়ের বেড়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব জাগাইয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে আমরা দেশের শাস্ত্র পাঠে বিমুখ হইয়া পড়িতেছি, আজকাল সংস্কৃত ভাষায় অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। বাইবেলে আমরা যেরূপ সুপণ্ডিত, তাহার শতাংশ পাণ্ডিত্য সংস্কৃত ভাষায় থাকিলে ক্ষোভের কারণ থাকিত না। বক্তৃতার সময় সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন না করিয়া বাইবেল হইতে চরণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা দিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুশ্রোতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেছি না। ভারতের গৌরবময় অতীতের সহিত যোগরক্ষা করিবার জন্য মহর্ষি উপনিষদ ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক লইয়া উপাসনা পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। অবিবেচনা বশতঃ তাহার পরিহার অনেক স্থানে ঘটিয়াছে। আমরা বিনয় হারাইতে বসিয়াছি, ঔদ্ধত্য তাহার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্ব আদর্শে ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক নিরামিষ আহার করিতেন বর্ত্তমানে সংযম যাহা ধর্ম্মের পত্তন ভূমি তাহা শিথিল হইয়া যাইতেছে। বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ চীৎকার করিতেছেন, করাও যৌক্তিক ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু

বর্ত্তমান সময়ে কি হিন্দুসমাজের কি ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোকের মধ্যে প্রতিদিনের আহারের জন্য অবাধে বিবিধ প্রাণী হত্যা চলিতেছে। এমন কি উৎসব অবসানে উদ্যান-সম্মিলনের দিনে ছাগ ও ছাগী হত্যা করিয়া মাংসাহারে উদর প্রপূর্ত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গ আজকালকারদিনে প্রমুক্ত, নিবৃত্তিমার্গে আজকাল বড় কেহ হাঁটিতে চাহে না। বিলাস ত্বরিত গতিতে চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে। বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের জীবনকে ভোগের অনুকূল করিয়া তুলিতেছি। মহিলাগণের মধ্যেও বসন-চাকচিক্য উৎসবের দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। বৈরাগ্য সংযম, আজকাল উপেক্ষিত; বিপরীতভাবের ও উচ্ছৃঙ্খলতার আতিশয্য চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাশীল লোকমাত্রেই ইহাতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়িতেছেন।

"মানবাত্মার স্বাধীনতা" আজকাল কদর্থে লোকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আনয়ন করে নাই। "চিন্তার স্বাধীনতা" বা "স্বাধীন মত ঘোষণ" অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকিলে এদেশে বেদত্যাগী বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইত না; হিংসাবিরত জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইত না; দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সূচনা হইত না; নিষ্কাম গীতার ধর্ম্ম মস্তকোত্তলন করিতে পারিত না; পুরাণ তন্ত্রের উদ্ভব হইত না; গৌরাঙ্গদেবের প্রেমের ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিত না। এ সমস্তই মানবাত্মার স্বাধীনতার পরিচায়ক। যাঁহারা জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা স্বাধীন মত প্রচারের দাবী করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ সমুন্নত নহেন, জ্ঞানীর ও ধার্ম্মিকের অনুকরণ ভিন্ন তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। গৃহে বালক ও যুবাকে অবিভাবকের অধীন করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহাদের কল্যাণ নাই। দায়িত্ব-বুদ্ধি-সম্পন্ন বাটীর কর্ত্তার অধীন হইয়া না থাকিলে স্ত্রী পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ কণ্টকময় হইয়া উঠে, পারিবারিক শান্তি চলিয়া যায়। অপরিণত বুদ্ধির নিকটে মানবাত্মার স্বাধীনতার জয়ঢক্কা বাজাইলে তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠে।

সে যাহা হউক শিবচন্দ্র বাবু শেষ বয়সে ৩আইন মতে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রামের লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন। মান সংভ্রম রক্ষার ভয়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সময়ে ইহার কর্ণধার হইয়া উহার সভাপতিরূপে আপনার পরিণত বুদ্ধির সাহায্যে অনেক করিয়া গিয়াছেন। কোন্নগরে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র উঠিয়া গেল। গ্রামের লোক তাঁহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেখানকার ব্রাহ্মসমাজ একেবারেই প্রাণহীন হইয়া যাইল, তাঁহার সুশোভন অট্টালিকা শ্রীহীন হইয়া পড়িল। সে কথা স্মরণ হইলে বিষাদগ্রস্ত হইতে হয়। হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে উত্তোলিত করিয়া তুলিবার একটি দিক আছে এবং উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার আর একটি উল্টা দিক আছে; ইহার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, তাহা বিবেচ্য। অনেকে অনেক কথা বলিবেন, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জিনিষটি সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, ইহাই আমরা মিনতি সহকারে নিবেদন করিতে চাই। আমরা সেদিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী পাঠ করিতেছিলাম। তিনি দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদের প্রাথর্য্যের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া একস্থানে বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয়ান পাদ্রীরা তত্রত্য জাতিভেদের উপর বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার কল্পে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও বলি ধর্ম্মপ্রচার সর্ব্বাগ্রে; অন্যান্য উন্নতি জ্ঞানের ও বিদ্যার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই অল্পে অল্পে সংসাধিত হইবে। সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু ধীরে ধীরে।

শ্রীরামপুর মিসন

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীরামপুর কলেজের শত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রেঃ কেরি সাহেবের বক্তৃতায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির হইয়াছে। এক ভাবে বলিতে গেলে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ বঙ্গ-ভাষার পুষ্টি সাধনে

এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনে বঙ্গ ভাষার বহুল প্রচারে ও শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা যে অনেক বিষয়ে ঋণী এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কেরি ও মার্সমান সাহেবের নাম প্রতি শিক্ষিত বঙ্গসন্তান অবগত আছেন। বর্ত্তমান রেঃ কেরি সাহেব, উক্ত কেরি সাহেবের প্রপৌত্র। পুরাতন কেরি সাহেব এ দেশে আসিয়া প্রথম ৬ বৎসর কাল নীলকরের কার্য্য করিতে থাকেন এবং বঙ্গভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। মার্শমান ও ওয়ার্ড সাহেব পরে আসিয়া পরস্পরে সহিত মিলিত হন। ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে আপনাদের অধিকারের মধ্যে স্থান দেয় নাই। তাহারা মিসন কার্য্যের ও শিক্ষা বিভাগে বিরোধী ছিল। অন্য পক্ষে বাধা দিকে থাকে। কেরি সাহেব উত্তরবঙ্গে মালদহে নীলের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে আসিয়া ১৮০০ অব্দে পূর্ব্বোক্ত অপর দুই জনের সহিত মিলিয়া প্রচারব্রতে প্রবৃত্ত হন। আশাই তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। মালদহে অবস্থানকালে কেরি সাহেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের জনৈক প্রফেসর নিযুক্ত হন। তাহাতে তাঁহার অর্থাগম হইতে লাগিল এবং তিনি বঙ্গীয় ও মাদ্রাজের সিভিলিয়নগণের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইলেন। তিনি তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ ও প্রভাব মিসন কার্য্যে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। কেরি সাহেব সপ্তাহের দুই দিন শ্রীরামপুরে অতিবাহিত করিতেন এবং ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে বিবিধ ভাষার শিক্ষা দান করেন। মার্সমান শ্রীরামপুরে স্কুল স্থাপন করিয়া বহুকাল ধরিয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। উহার এক অংশ গির্জ্জারূপে ব্যবহৃত হইত। চীন ভাষার উপরে মার্সমান সাহেবের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ওয়ার্ড সাহেব বিশ বৎসর ধরিয়া বহু পরিশ্রম অন্তে সুবিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেশ, কাগজের কল ও তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিলেন; এবং যেটুকু অবকাশ পাইতেন তাহার ভিতরে হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিলেন। বঙ্গভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকশিত হইতে লাগিল, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণও উহা পাঠ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিল। তাঁহারা যখন এ দেশে আসেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কয়েক জনকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে এ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের অসুবিধা হইবে, ইহা বুঝিয়া ১৮১৮ অব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

কেরি মার্সমান ও ওয়ার্ড সাহেব উত্তর-ভারতে প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের যেমন প্রথম প্রচারক ছিলেন, তেমনি দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের সান্নিধ্যে ট্রাঙ্কুবার নামক স্থানে Ziegenbalg and Schwarytz সাহেব উঁহাদের এক শতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর ও ট্রাঙ্কুবার এই দুইটী স্থানেই (Danes) দানিসদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দিনেমারেরা ট্রাঙ্কুবারে ১৬২০ অব্দে এবং শ্রীরামপুরে ১৭৫৫ অব্দে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এবং ঐ ঐ স্থানে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ডেনমার্কের ৪র্থ ফ্রেডারিক ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রটেষ্টাণ্ট মিসনের প্রতিষ্ঠাতা; তাঁহারই উদ্যোগে ট্রঙ্কুবারে এবং ৬ষ্ঠ ফ্রেডারিকের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে মিসনরিগণ স্থান পান। শেষোক্ত রাজা শ্রীরামপুরে কালেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে সনন্দ দান করেন। যদিও ১৭৪৫ অব্দে ডেনসরা একই দলিল যোগে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মূল্যে উক্ত দুইটি নগর ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও উক্ত দলিলে এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে শ্রীরামপুর কালেজের সমস্ত স্বত্ব ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিবে। ট্রাঙ্কুবারে আসিয়া মিসনরিগণ উদ্যমসহকারে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া মাদ্রাজ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বহুলোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং কেরি সাহেবের আগমনের পূর্ব্বে তামিল ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যদিও জর্ম্মাণ জাতি বর্ত্তমান যুদ্ধে আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে যাঁহারা মিসনরি হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং পরে এদেশে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই জর্ম্মাণ জাতিভুক্ত; এবং তাঁহারা স্বদেশ

হইতে অর্থ আনাইয়া প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করেন। ভারতের সর্ব্ব প্রথম প্রটেষ্টাণ্ট মিসনরি Ziegenbalg এবং Plutochan, Halle universityর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহারা ১৭০৬ অব্দে ট্রাঙ্কুবারে আসিয়া পৌঁছান। তাঁহারা মিসন কার্য্যে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন।

১৮০০ অব্দে প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গে দীক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার অল্প দিন পরেই বাঙ্গলা বাইবেল বাহির হয়। ক্রমে ক্রমে মিসন কার্য্য প্রসারলাভ করিতে থাকে। বহু লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ১৮১২ অব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরিগণের কর্ত্তৃক বহুকষ্টে স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতে মিসনরিগণের অদ্যম উৎসাহ নির্ব্বাপিত হয় নাই। বাইবেলের নিউ-টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ এদেশের বিভিন্ন ত্রিশটি ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহার পরবর্ত্তী সময়ে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীগণের অদম্য উৎসাহ ফলে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ মিসনরিগণের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

উৎসব দিনে বঙ্গের গবর্ণর শ্রীরামপুরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অযথা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে যদিও তাহারা ধর্ম্মপ্রচারে উদাসীন ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

৺হেমেন্দ্র নাথ সিংহ। *

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১২৭৫ সালের ৫ই আশ্বিন তারিখে দুঃখ-সুখ-পূর্ণ এই সংসারে পরিবারস্থ তৎকালজীবিত জনগণের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যখন তাঁহার জীবনের দুঃখ-ক্লেশভার পর্ব্বতাকার গ্রহণ করিয়াছিল, তখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার জীবনের সকল দুর্ভাবনা হইতে, বিগত ১৩২৪ সালের ১৫ই পৌষ তারিখে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি যে অনন্তধামে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূর্ব্বগত তাঁহার গুরুদেব মহর্ষিদেবের সহিত ও তাঁহার পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দভোগ করিতেছেন। আজ এক বৎসর পূর্ণ হইল, তেমন মধুর ভাবে সকল কষ্ট ভুলাইয়া "বাবা" বলিয়া আমাদিগকে আর কেহ ডাকে নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে—

> We stood beside the dying bed
> Of him we loved so well,
> We gently shed our bitter tears
> And bid Earth's last farewell.
> Our loss is great, will not complain,
> But trust in Heaven to meet again.

তাঁহার কথা স্মরণ হইলে আমরা অনেকগুলি বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—

১। প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সত্যপ্রিয়তা।

(ক) প্রবল ধর্ম্মানুরাগ।

জীবনের সকল অবস্থায় সুখে দুঃখে, সম্পদে ও নিঃস্বতার ভিতরেই তিনি প্রাতে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে উপাসনা ও ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন সমাপন করিয়া তবে দিনের কার্য্য আরম্ভ করিতেন। এমন কি মৃত্যুর দিনও প্রাতঃকালে রুগ্নদেহে উপাসনাদি সমাপন করিয়াছিলেন। উপাসনা না করিয়া তিনি কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। কোন দিন তাঁহাকে উপাসনা বাদ দিতে দেখি নাই। প্রতি সন্ধ্যায় পরিবারস্থ সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। মহর্ষিদেবের নিকট দীক্ষিত হইবার পর ছয় বৎসর ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময়ই নামজপ উপাসনা ও ধ্যানাদিতে মগ্ন রহিতেন। সময়ে সময়ে এমন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন, যে বাহিরের কোন প্রকার কোলাহল তাঁহাকে বিচলিত বা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না।

ধর্ম্মের উদারতাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এই হেতু তিনি সকল ধর্ম্মের সত্যই অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন; কিন্তু সাধন করিতেন ব্রাহ্মধর্ম্ম।

জীবনের শেষ কয় বৎসর যে কোন ধর্ম্মের "প্রেম" সম্বন্ধে কথা উঠিলেই চক্ষু দিয়া জল পড়িত।

সন্তানেরা নানা প্রকারে উৎপাত করিলেও বিশেষ কিছু বলিতেন না। কিন্তু কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইতেন। এমন কি তিনি বিভিন্ন রাজার অধীনে থাকিয়া কর্ম্মকালে তাঁহার প্রভু

* বার্ষিক শ্রাদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপ্রেমনাথ সিংহ কর্ত্তৃক পঠিত।

বা উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারী কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মাচরণে উদ্যত হইলে, তিনি অকুতোভয়ে তাহার প্রবল প্রতিবাদ করিতেন ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যায়াচরণ পরিত্যক্ত না হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না ।

(খ) ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেম—

বাইবেলে যে একটি কথা আছে যে, যদি এক সর্ষপ পরিমাণ বিশ্বাসও থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতকে "চলিয়া যাও" বলিলে উহা চলিয়া যাইবে। ইহা তিনি বিশেষভাবে বিশ্বাস করিতেন।

শেষোক্ত কথাটি সংসারের ঘোর দুর্দ্দিনের সময়ও তিনি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং বলিতেন—ঈশ্বরের করুণার উপর প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস কর, সুদিন আসিবেই। ঘোর বিপৎ-কালেও তিনি অচল অটল রহিতেন ।

এই বিশ্বাসই কর্ম্ম-জীবনে কর্ত্তব্য সাধনে বা পৃথিবীতে প্রভুর আদেশ পালনে তাঁহাকে শক্তি দান করিত ।

(১) মোরভঞ্জে একটি পরগণা বন্যায় ভাসিয়া যায়। তাঁহার উপর ভার পড়িল Relief এর বন্দোবস্ত করিবার জন্য। বন্যার জল দুই দিনেও কমিল না, পার্ব্বত্যনদীর প্রবল স্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নৌকাদি লইয়া মাঝিরা অপর তীরে যাইতে ভীত; সঙ্গে যে হস্তী ছিল তাহার মাহুত ঐ স্রোতমধ্যে হাতী নামাইতে রাজি হইল না। প্রজাগণের দুঃস্থ অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার একটি আর্দ্দালী ও কয়েকটি বন্যজাতীয় বন্ধুর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নদীস্রোতে ঝাঁপ দিলেন, প্রত্যেকের পৃষ্ঠে অর্থের এক একটা পুটুলি। প্রায় ৩ মাইল সন্তরণ করিয়া নদীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পরে দুঃস্থজনগণের relief এর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

(২) তিনি মোরভঞ্জে থাকিয়া অধুনাখ্যাত Tata Iron Mine আবিষ্কার করেন। তখন তিনি মোরভঞ্জের Forest Superintendent। সেই সময় তিনি সমস্ত জঙ্গলের অবস্থা নিজ চক্ষে নিরীক্ষণ করিবার জন্য গমন করেন। একস্থলে বন এত নিবিড় ছিল, যে দিনমানেও তাহা আলোক-রহিত ; জঙ্গলীরাও দিনে তন্মধ্যে কেহ প্রবেশ করিত না। যখন এই জঙ্গলের মধ্যে যাইবার উদ্যোগ করিলেন, সেই শ্বাপদসঙ্কুল গহন বনে যাইতে মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই নিষেধ করিয়াছিলেন; তিনি কাহাকেও সঙ্গী না পাইয়া একাকী কিছু খাদ্য ও অস্ত্র সঙ্গে ঐ বনের মধ্যে সকল বিঘ্ননাশনকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিলেন ; এবং ঐ পথহীন বনে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অন্ধকারে অনেকদূর চলিয়া যান। উহার মধ্যে তিনি দুইদিন ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের পর তিনি সহসা সূর্য্যালোক দেখিতে পান, দেখেন যে একটি খোলা জায়গায় উপনীত হইয়াছেন। তথাকার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে তথায় খনি আছে। পরে ফিরিয়া আসিয়া—বন কাটাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করেন ও যে খনি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত করেন, তাহাই Tata Iron mine। উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার পরে তাঁহার আহারীয় সামগ্রী নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি কোথায় আসিয়াছেন জানেন না। ফিরিতে সময় লাগিবে অন্ততঃ আরো দুই দিন। অরণ্যপথে ক্ষুধাভাবে ও জলাভাবে তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল ও তিনি বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর হঠাৎ দেখিলেন দূরে একটি মনুষ্য মূর্ত্তি কাংশপাত্র হস্তে লইয়া যাইতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন কোথায় উপনীত হইয়াছেন। তাহার হস্তে দুগ্ধ দেখিয়া ভগবানের প্রেরিত দান মনে করিয়া তিনি ঐ দুগ্ধ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া গ্রহণ করেন।

(৩) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা মধুপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে এক দিন অর্থাদি নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় নির্ব্বান্ধব এবং অপরিচিত নূতন দেশে আমরা বিশেষ বিচলিত হই। তিনি অচল অটলভাবে আমাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। "পরদিনকার কথা আজ ভাব কেন; যিনি দিনের মালিক তিনি নিশ্চয়ই দিন চালাইয়া দিবেন। কোনরূপে রাত্রি কাটিল। পরদিন প্রাতঃকালে আটটার সময় সত্য সত্যই রেজেষ্টারী ডাকে অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা আসিয়া পৌঁছিল।

এই প্রকার নানা ঘটনায় ও বিপদের মধ্যে তাঁহার স্থির অনন্ত বিশ্বাস আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

(গ) সত্যানুরাগ—

তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাচরণ করেন নাই। নির্ভয়ে সকল সময়ে সত্য ব্যবহার করিয়াছেন। নিলগিরি রাজ্যে কার্য্যকালে তথাকার মহারাজা বিশেষ ভাবে প্রজাপীড়ন ও নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার সুরু করেন। বাবা কত প্রকারে তাঁহাকে বারণ করিতেন ও কু-কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে। ইহার জন্য মহারাজের সঙ্গীয়া বাবার প্রাণহানির চেষ্টা করে। তথাপি তিনি ভয় পান নাই। গৃহে গৃহে প্রজার ক্রন্দন; বাবা প্রজাদেরও মধ্যে যথাসাধ্য দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতেন এবং যেখানে ঘটনাচক্রে নিজে উপস্থিত হইতেন সেখানে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বীয় শারীরিক বলপ্রয়োগে প্রজার

গৃহমধ্যে দৌরাত্ম্য করিতে রাজাকে ক্ষান্ত করিতেন। শেষে যখন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রজার নিবেদন পৌছিল, কমিশনার সাহেব Political Agentএর সহিত আসিয়া পৌছিলেন তখন উক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীদ্বয় এবং সকল প্রজাই একবাক্যে সাক্ষী স্থির করিল একমাত্র বাবাকে। সকলেই জানিত তিনি কখনই মিথ্যা বলিবেন না। বাবা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন—একদিকে সত্য বলিলে চাকুরী যায় অপরদিকে চাকুরী রাখিতে হইলে মিথ্যা বলিতে হয়। মহারাজার ভীতি প্রদর্শন ও অর্থলোভ প্রদর্শন সত্বেও তিনি মিথ্যা বলিতে পারিলেন না। সত্য কথাই বলিলেন। ফলে চাকুরী যায়; কিন্তু অপরদিকে ভগবান সত্য বলার পুরস্কারও তাঁহাকে দেন। তাঁহার এজাহারের ফলে রাজ্যে অত্যাচারস্রোত বন্ধ হওয়ায় প্রজাকুল বাবাকে ছাড়িতে চাহিল না। তিনি কর্ম্মত্যাগান্তে বালেশ্বর ষ্টেশনে Madras Mailএ উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। দশপল্লার প্রজা, বন্য লোক, ষ্টেশন ঘেরাও করিল। বলে "হেমবাবু তুই আমাকে ছেড়ে যেতে পাবি না ফিরে চল তোকে যেতে দোব না।" তাহা অসম্ভব বলিয়া বাবা যখন কিছুতেই রাজি হইলেন না, তখন দূরাগত ট্রেণ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে বিস্তর লোক রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়ে। বলে, "যদি যাস তবে আমাদের বুকের উপর দিয়া গাড়ী নিয়ে মেরে দিয়ে তবে যা।" তাদের বন্য সরলতার এই আকুল প্রার্থনায় তিনিও অভিভূত হইলেন। তিনিও কাঁদেন তারাও কাঁদে। ট্রেণ প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিতে পায় না। রেল কর্ম্মচারীরাও বিব্রত। পরে তাহাদের অনেককে আলিঙ্গন করিয়া অনেক বুঝান ও চোখের জলের পরে তাহারা পথ ছাড়িল, দুই ঘণ্টা দেরীতে ট্রেণ প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল।

২। অর্থের প্রতি লোভহীনতা ও চরিত্রবল।

তিনি যখনই যে যে রাজ্যে কার্য্য করিয়াছেন তখনই কোন না কোন বিভাগীয় অথবা সমগ্র রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী থাকায় উৎকোচ লইবার বিশেষ সুযোগ রহিলেও তিনি কখনই বেতনের অতিরিক্ত ধনে লোভ করেন নাই বা উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, দুই একটি মাত্র বলি। মৌরভঞ্জের মহারাজা প্রথম বিবাহ কালে বাবার উপর ভার পড়ে মহারাণীর জন্য ১০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ক্রয় করিতে, কলিকাতার * * দোকানে যান। তাহারা তাঁহাকে ২॥ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে চাহে, ও পাঁচ লক্ষ টাকার অলঙ্কারকে ১০ লক্ষ টাকার বলিয়া রিপোর্ট চালাইয়া দিতে অনুরোধ করে। তিনি বলেন যে, যে গহনা গুলিকে তোমরা ১০ লক্ষ টাকায় চালাইতে চলিতেছ, তাহাই মহারাজকে ৫ লক্ষ টাকায় দাও, আমাকে কিছু দিতে হইবে না। শুনিয়া সাহেবেরাও স্তব্ধ ও পরে মহারাজাও ইহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

দ্বারভাঙ্গা রাজ্যেও বর্ত্তমান মহারাজা বাবার আর্থিক অবস্থা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া একদিন বলেন 'হেমবাবু' আমার রাজত্ব সীতার জন্মস্থান লক্ষ্মীর দেশ। এখানে যে মাহিনাতেই নির্ভর করে, টাকা করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, সে বড়ই দুর্ভাগা।" বাবা বলিলেন, "ঈশ্বরের করুনায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে এ দুর্ভাগ্য যেন স্থায়ী হয়।" মহারাজা সকলের coveted post যাহা ও যাহাতে প্রচুর উৎকোচ লইবার সুযোগ সেই সকল কার্য্যে বাবাকে নিযুক্ত করেন। বাবার আর্থিক কোন উপকারই হইল না, বাবার অধীনস্থ accountant প্রভৃতি উৎকোচগ্রাহীতার প্রমাণ পাওয়ায় পদচ্যুত হইল। তাহারা কেহ কেহ, বিশেষ acct বাবু লক্ষপতি হইয়া গেলেন অথচ সংসারের ব্যয়ভারের জন্য বাবা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

এই প্রকারে চাকরীর সময় বেতনাতিরিক্ত কোন অর্থ না লওয়ায় চাকরীর সময়েও সংসারের বিপুল ব্যয় বহন হেতু অর্থসঞ্চয় না হওয়ায় ও অনেক সময় চাকরী না থাকায় তিনি বড়ই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তথাপি কোনকালে কোন অন্যায় উপায়ে অর্থার্জ্জনের লোভই তাঁহার ছল না। এ জন্য তিনি সন্তানদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি কেবলমাত্র বলিতেন "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"; এইরূপে যিনি পুত্রাৎ প্রিয়তরঃ বিত্তাৎ প্রিয়তরঃ করিয়া ভগবানকেই আজীবন ধরিয়া ছিলেন এবং আজীবন ব্রাহ্মধর্ম্মই সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর কি বলা যাইতে পারে?

৩। বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানালোচনা—

দিবসের অধিকাংশভাগই তিনি পুস্তকাদি পাঠে ব্যয় করিতেন। অধ্যয়নই যেন দিবসের প্রধান কার্য্য ছিল, অবসর সময় মাত্র অন্যান্য কর্ম্ম করিতেন; জীবনের শেষ কয়েক বৎসর যখন আর কোন প্রকার চাকরীর চেষ্টা পর্য্যন্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তিনি প্রায় দিবারাত্র অধ্যয়নে নিমগ্ন রহিতেন। অধ্যয়নে এত অনুরাগ ছিল যে জীবনে যখন যেখানে যাইতেন, কয়েক শত বাছা বাছা পুস্তক সর্ব্বদা সকল স্থানেই লইয়া পরিভ্রমণ করিতেন।

জীবনের প্রথম গ্রন্থ রচনা—'প্রেম' পুস্তক খানি ও জীবনের শেষ রচনা ঐ 'প্রেম' পুস্তকেরই ইংরাজী অনুবাদ। এই কার্য্যের জন্য তিনি সকল কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্ত যোগীর ন্যায় অনুবাদ 'কার্য্যে দিবারাত্রি রত

ছিলেন, দেহ বিশেষ পীড়িত ছিল, তথাপি বাটীর সকলে বৈদ্যনাথে যাইলেও তিনি অনুবাদ কার্য্যের জন্য কলিকাতায় রহিলেন। এবং অনুবাদ কার্য্যও বিলাতে প্রকাশ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত দিবা-রাত্র শরীরের প্রতি দৃকপাত না করিয়া শ্রম করিতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং সামান্য জ্বরেই দেহত্যাগ করেন। অনুবাদ শেষ হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশ করিবার সকল ব্যবস্থা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

হৃদয়ের ফুল চন্দনে তাঁহার হৃদয়দেবতার উদ্দেশে যে বন্দনা উপহার রচনা করিয়াছিলেন তাহা জনসমাজে অপ্রকাশিত রহিলেও প্রেমের কাহিনী জগতকে শুনাই-বার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রহিলেও আমাদের বিশ্বাস—

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

পঞ্চম অধিকরণ—ঈক্ষতি অধিকরণ বা সচ্ছব্দবাচ্যতাধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥ গৌণশ্চেন্নাত্ম-শব্দাৎ ॥ ৬ ॥ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥ হেয়-ত্বাবচনাচ্চ ॥৮॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥৯॥ গতিসামান্যাৎ ॥১০॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

শ্লোক। তদৈক্ষতেতি বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্ম বোচ্যতে।

জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণং ॥২৩॥
ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানে তু মায়য়া।
আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে প্রধানস্য বিরোধিনী ॥২৪॥

টীকা। ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাধ্যায়ে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" ইতি প্রস্তুত্য "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি তত্তেজোঽসৃজত" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সাংখ্যা মন্যন্তে সচ্ছব্দবাচ্যং সর্ব্বজগৎকারণং প্রধানং নতু ব্রহ্ম। প্রধানস্য সত্ত্বগুণযুক্ততয়া পরিণামিতয়া চ জ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্তি-সম্ভবাৎ। নির্গুণস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ ইতি।

অত্রোচ্যতে ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাচ্চেতনং ব্রহ্ম সচ্ছব্দ-বাচ্যং। অচেতনস্য প্রধানস্য ঈক্ষিতৃত্বাযোগাৎ। জ্ঞানক্রিয়াশক্তী তু ব্রহ্মণি মায়য়া সম্ভবিষ্যতঃ। কিঞ্চ, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি" ইতি নামরূপব্যাকর্ত্রী জগৎকারণদেবতা স্বস্বাচ-কেনাত্মশব্দেন চেতনং জীবং ব্যপদিশতি। তথা "তত্ত্বমসি" ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতো র্জগৎকারণ-তাদাত্ম্যং গুরুরুপদিশতি। তদুভয়মপ্যচেতনস্য প্রধানস্য জগৎকারণত্বে বিরুধ্যতে। তস্মাৎ চেতনং ব্রহ্ম সচ্ছব্দেনোচ্যতে॥

মূলের অনুবাদ। ঈক্ষতি হেতু (জগৎকারণ) অশব্দ (অ-বেদোক্ত) নহে ॥ ৫ ॥ গৌণ যদি, নহে —"আত্ম" শব্দ হেতু ॥ ৬ ॥ তৎ-(আত্ম) নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষবিষয়ে উপদেশ হেতু ॥ ৭ ॥ হেয়ত্ব (পরিত্যজ্যত্ব) বিষয়ে উক্তি না থাকা হেতু ॥ ৮ ॥ আপনাতেই লয় হেতু ॥ ৯ ॥ (সর্ব্ববেদের) সামান্য (সাধারণ) গতি হেতু ॥ ১০ ॥ এবং শ্রুতিতে উক্তি হেতু ॥ ১১ ॥

পঞ্চম অধিকরণ সংরচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ। "তদৈক্ষত" এই বাক্যের দ্বারা প্রধান অথবা ব্রহ্ম উক্ত হইতেছেন? জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি থাকিবার কারণে প্রধান সক-লের কারণ। ঈক্ষণ হেতু চেতন ব্রহ্ম, কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞান মায়া দ্বারা। "আত্ম" শব্দ এবং আত্মার সহিত তাদাত্ম্য (সমধর্ম্মিত্ব) প্রধানের বিরোধী।

টীকার অনুবাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠা-ধ্যায়ে "হে সৌম্য, পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় এই সৎস্বরূপ ছিলেন" এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন আমি প্রকৃষ্ট-রূপে জন্মিবার জন্য বহু হই, এই সূত্রে তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইহা শ্রুত হয় (অর্থাৎ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে)। এই সম্বন্ধে সাংখ্যগণ বলেন "সৎ" শব্দের বাচ্য সর্ব্বজগতের কারণ প্রধান, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। প্রধানের সত্ত্বগুণযুক্ত ও পরিণামী হই-বার কারণে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্ভাবনা হেতু। নির্গুণ কূটস্থ ব্রহ্মে তাহার অসম্ভাবনা হেতু।

এ বিষয়ে বলা যাইতেছে—ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুত হই-

বার কারণে চেতন ব্রহ্ম সৎ শব্দের বাচ্য। অচেতন প্রধানের ঈক্ষিতৃত্বের যোগাভাব হেতু। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি কিন্তু ব্রহ্মেতে মায়া দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। আরও কি, "এই জীব (রূপ) আত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করি" এই (সূত্রের দ্বারা) নামরূপপ্রকাশক জগৎকারণ-দেবতা স্ব-বাচক আত্মশব্দের দ্বারা চেতন জীবকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সেইরূপ "তত্ত্বমসি" (তিনি তুমি) এই বাক্যের দ্বারা চেতন শ্বেতকেতুর জগৎকারণের সহিত তাদাত্ম্য গুরু উপদেশ করিতেছেন। সেই উভয়ই অচেতন প্রধানের জগৎকারণ হইবার বিরোধী হইতেছে। অতএব চেতন ব্রহ্ম সৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন।

তাৎপর্য্য। এই অধিকরণকে "ঈক্ষতি" অধিকরণ বলা যায়, কারণ যে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণ রচিত হইতেছে, সেই শ্রুতির প্রথমেই আছে "তৎ ঐক্ষত"। এই ঐক্ষত শব্দের মূল ঈক্ষ ধাতুর উত্তর "স্তিপ্" প্রত্যয়ে "ঈক্ষতি" পদ সিদ্ধ হয়। এই 'ঈক্ষতি" শব্দে অবলম্বিত অধিকরণকে "ঈক্ষতি অধিকরণ" বলা হইয়াছে। এই অধিকরণকে "সচ্ছব্দবাচ্যতা" অধিকরণও বলা হয়, কারণ "তদৈক্ষত" মূলক শ্রুতির পূর্ব্বে "সৎ-এব" শব্দ মূলক আর একটী শ্রুতি অবলম্বন করিয়াও এই অধিকরণের বিচার চলিয়াছে।

বেদান্তসূত্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী সূত্রে প্রধানত দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম জগৎকারণ এবং সকল শাস্ত্রই সেই ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। দেখা যাইতেছে যে তাঁহার সময়ের পূর্ব্বাবধি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সমষ্টিকে "প্রধান" নাম দিয়া তাহাকেই জগৎকারণরূপে নির্দ্দেশ করা সাংখ্যবাদীদিগের অনুমোদিত ছিল। বর্ত্তমান অধিকরণে বেদান্তসূত্রকার সেই মতকে অবৈদিক প্রমাণ করিয়া চেতন ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব বেদসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। যে সকল দর্শন বেদান্তসূত্রকারের পূর্ব্বে প্রকারান্তরে জগৎকারণকে অচেতন বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাংখ্যমতই বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বেদান্ত তাহারই মত খণ্ডনে উদ্যুক্ত বলিয়া অনুমান হয়। অবশ্য সাংখ্যেরা তাঁহাদের মতের স্বপক্ষে শ্রুতির দোহাই দিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তাঁহারা বলেন যে যখন শ্রুতির মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহা দ্বারা কোন সৃষ্টিকার্য্য সম্ভব হয় না। অথচ প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকার্য্যও যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং যখন সৃষ্টিতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরিচয় থাকাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সাহায্য বিনা সৃষ্টিকার্য্যের সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারা যায় না, তখন কাজেই সাংখ্যবাদী প্রধান বা প্রকৃতি নামক একটী কল্পিত পদার্থকে জগৎকারণ বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং সেই প্রধান বা প্রকৃতিতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আরোপ করিতে বাধ্য হইলেন। বেদান্তী এখন দেখাইতে চাহেন যে, প্রকৃতির জগৎকারণত্ব অশব্দ অর্থাৎ শ্রুতিতে কোথাও প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, বরঞ্চ তদ্বিপরীতে "তদৈক্ষত" (তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন) এই কথা থাকাতে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব শ্রুতির অনুমোদিত বলিয়া স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে মাত্র শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া সাংখ্যমত নিরস্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এক শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে একমাত্র "সৎস্বরূপ" ছিলেন এবং এই বাক্যের পরবর্ত্তী বাক্যেই আছে "তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন।" প্রশ্ন উঠিল যে উপরোক্ত শ্রুতিমন্ত্রে উল্লিখিত "সৎ" শব্দে কাহাকে ধরিতে হইবে— চেতন ব্রহ্মকে অথবা অচেতন প্রকৃতিকে? বেদান্তী বলিলেন যে শ্রুতির মতে একমাত্র চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অচেতন প্রকৃতি কখনই জগৎকারণ নহে, অতএব "সৎ শব্দে চেতন ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। বেদান্তী স্বমতের ভিত্তি স্বরূপে "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিলেন। তিনি বলেন যে শ্রুতিতে যখন "তদৈক্ষত" অর্থাৎ "তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন", তখন অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতেই পারে না, কারণ দৃষ্টি বা আলোচনা করা চেতনের ধর্ম্ম। সাংখ্যবাদী বেদান্তীকে এই

যুক্তির উত্তরে বলেন—"ভাল, আমি প্রধান বা প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া ধরিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জগৎকারণ হওয়া অসম্ভব বলিতে পার না। আমি প্রধানকে সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের সমষ্টি বলিয়াছি। এখন আমার মতে এবং তোমারও মতে সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম হইল প্রকাশ, আবার জ্ঞানেরও ধর্ম্ম হইল প্রকাশ। কাজেই চেতন ব্রহ্মের জ্ঞানের সাহায্য বিনা যে সৃষ্টিতে জ্ঞানশক্তির কার্য্য সম্ভব নহে সে কথা বলিতে পার না—প্রধানে প্রকাশধর্ম্মী সত্ত্বগুণ থাকাতেই জ্ঞানশক্তিরও কার্য্য প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব। সেইরূপ, আমার মতে এবং তোমারও মতে রজোগুণের ধর্ম্ম হইল ক্রিয়াশক্তি, আবার পরিণাম বা নিত্য নূতন ভাবে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত হইবারও মূল হইল ক্রিয়াশক্তি; কাজেই চেতন ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ না হইলেই যে সৃষ্টিকার্য্যে ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে না, সে কথা বলিতে পার না—প্রধানে রজোগুণ থাকাতেই স্বীকার করিতে হয় যে "প্রধান" পরিণামী অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রধানে ক্রিয়াশক্তি আছে'।

বেদান্তী ইহার উত্তরে বলিলেন যে, সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে নিত্য ও চেতন, এবং তদ্ব্যতীত অন্য সকলকেই অচেতন বলা হইয়াছে—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিসম্মত এবং বেদান্তসম্মত বলিয়া মানিতে প্রস্তুত আছেন; এই অংশে উভয় মতের কোনই বিরোধ দেখা যায় না। কিন্তু সাংখ্য যেখানে "অচেতন" প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, সেই খানেই বেদান্তের সহিত এবং শ্রুতির সহিত বিরোধ। কারণ এই যে, শ্রুতি যে মন্ত্রে বলিতেছেন যে, পূর্ব্বে "সৎস্বরূপ" ছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেই সেই সৎস্বরূপ "দৃষ্টি বা আলোচনা" করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে দেখা যায়। বেদান্তীর প্রধান যুক্তি এই যে, যতই কেন সত্ত্বগুণ বা রজোগুণ থাক্ না, আলোচনা করা অচেতন কোন কিছুর পক্ষে সম্ভব নয়।

ইহার পর, বেদান্তী আরও বলেন যে, শ্রুতিমতে সৎশব্দের দ্বারা মাত্র চেতন জগৎকারণ বুঝাতেছে তাহাও নয়। কিন্তু চেতন আত্মাকেই জগৎকারণরূপে নির্দ্দেশ করা শ্রুতির উদ্দেশ্য বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ উপরোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পরেই শ্বেতকেতুকে তাঁহার গুরু আরুণি উপদেশ দিবার কালে ঐ "সৎ" শব্দের বাচ্য জগৎকারণকেই "তিনি আত্মা, তিনি তুমি" বলিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন দৃষ্ট হয়। আর একটী মন্ত্রে "এই জীবরূপ আত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ আমি প্রকাশ করি" এইরূপ বলিয়া শ্রুতি আত্মাকেই জগৎকর্ত্তারূপে বলিবার অভিপ্রায় খুবই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ অবলম্বনে বেদান্তী বলেন যে শ্রুতিমতে অচেতন প্রধান কিছুতেই জগৎকারণ হইতে পারে না—একমাত্র চেতন ব্রহ্ম বা আত্মাই জগৎকারণ।

কিন্তু এইখানে বেদান্তীর সম্মুখে একটী মহাসমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়—ব্রহ্ম যখন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, অর্থাৎ নির্গুণ ও কূটস্থ, তখন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়? কেবল চেতন যিনি, তিনি মাত্র আছেন এবং আপনাকে আপনি জানেন। চেতনের সঙ্গে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সংযোগ না হইলে পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি সম্ভব হয় না, ইহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেরই সম্মত। এই সংযোগ হয় কিরূপে, অর্থাৎ চেতনে সৃষ্টিমূল জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আসে কোথা হইতে? বেদান্তী তাহার উত্তরে বলেন যে মায়া দ্বারা এই সংযোগ সম্ভব হয়। আকাশে কোন প্রকার বর্ণ না থাকিলেও তাহাকে নীলবর্ণ বলিয়া একটা ভ্রম হয়—আকাশে নীলবর্ণের একটা মিথ্যা আরোপ হয়। এইরূপ আরোপ যে ভ্রমের কার্য্য, তাহাকেই মায়া বলা যাইতে পারে। এই মায়ার ফলে ব্রহ্মেতে সৃষ্টির মূল জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাত্মক একটা ভ্রম উপজাত হয়। কাজেই দাঁড়ায় এই যে, সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের কল্পনা, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ইহার বাস্তব কোন সত্তা নাই।

তারপর, বেদান্তী বিপক্ষ পক্ষের একটী বিতর্ক নিজেই উপস্থিত করিলেন যে, 'ঐ যে ঈক্ষণ বা আলোচনার কথা বলা হইয়াছে, উহা গৌণভাবে বলা হইয়াছে; মনে কর যে, যদি আমি বলি যে, ফুল হাসিতেছে, তবে আমার উক্তির তো এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সত্য সত্যই ফুল হাসিতেছে—

আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, ফুলগুলি যেভাবে রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন ফুল হাসিতেছে ;— ইহাকেই বলা যায় যে গৌণভাবে ফুলের হাসির কথা বলা হইয়াছে। সেইরূপ উপরোক্ত "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে চেতন ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অচেতন প্রধান-সম্বন্ধেই গৌণভাবে আলোচনার কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণরূপে প্রধান যেন আলোচনা করিয়াছিল, এইভাবেই উহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যদি বলা যায় ? বেদান্তী নিজেই তদুত্তরে বলিতেছেন যে তাহা ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে আলোচনার কর্ত্তাকে চেতন আত্মারূপে নির্দ্দেশ করা থাকিত না।

আরও কয়েকটা স্বমতের সমর্থক যুক্তি উল্লেখ করিয়া বেদান্তী সাংখ্যবাদীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিতে চাহেন। একটী যুক্তি এই যে, আত্মনিষ্ঠেরই মুক্তি হয় শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে। সাংখ্যবাদী যদি ইহা ধরেন যে, প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতি যেরূপ গৌণভাবে আত্মা শব্দের প্রয়োগ হয়, সেইভাবেই হয়তো প্রধানেরই প্রতি গৌণভাবে আত্মা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ? তাহারই খণ্ডনের জন্য বেদান্তী বলেন যে সে প্রকার গৌণভাবেও আত্মাশব্দের প্রয়োগ সম্ভব নয়। শ্রুতিতে আছে যে আত্মনিষ্ঠেরই মুক্তি হয়। এখন, সাংখ্যেরও মতে (বেদান্তেরই ন্যায়) অচেতন যাহাই হৌক না কেন, তাহাকে পাইলে মুক্তি হয় না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শ্রুতির মতে চেতন আত্মাই জগৎকারণ।

বেদান্তী আর একটী বিতর্কের অবতারণা করিলেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে কোন কঠিন বিষয় বুঝাইতে গেলে সহজবোধ্য বিষয়ের অবলম্বনে বুঝাইবার বিষয়ে অগ্রসর হইতে হয় ; কোন সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝাইতে গেলে স্থূল স্থূল বিষয়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু যতই কঠিনতর বা সূক্ষ্মতর বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই সেই সেই বিষয়ের পশ্চাদ্বর্ত্তী বিষয়গুলিকে, বুঝাইবার প্রকৃত লক্ষ্য বিষয় নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। মনে কর, কাহাকেও অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো আবশ্যক হইল। তখন হয়তো প্রথমে তাহাকে বলিলাম যে চন্দ্রকে দেখ। সে যখন বলিল যে চন্দ্রকে দেখিতেছে, তখন তাহাকে বলিলাম যে চন্দ্র অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখ। সে যখন বলিল যে সেই নক্ষত্রকে দেখিতেছে, তখন তাহাকে বলিলাম যে ঐ নক্ষত্রও অরুন্ধতী নহে, কিন্তু উহার সমসূত্রে অবস্থিত ঐ সূক্ষ্মতর নক্ষত্রটী দেখ। এইরূপে তাহাকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর নক্ষত্র দেখাইতে দেখাইতে এবং পূর্ব্বদৃষ্ট স্থূলতর নক্ষত্র যে অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে তাহা প্রতিপদে বুঝাইতে বুঝাইতে ক্রমে তাহাকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইলে, দেখাইবার সুবিধা হয়। এই প্রকার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়সমূহকে একে একে ত্যাগ করাকেই "হেয়" করা বলা হয়। "হেয়" শব্দ ত্যাগার্থ "হা" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন কথা এই যে, সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, শ্রুতিতে যেখানে আছে সৎ-কে পাইলেই মুক্তি হয়, সেখানে গৌণভাবে প্রধানকে উদ্দেশ করিয়াই "সৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উত্তরে বেদান্তী পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অবলম্বনে বলেন যে তাহা হইতে পারে না, কারণ গৌণভাবে প্রধানকে মোক্ষের কারণ বলিয়া ধরা হইলে মুখ্যভাবে ব্রহ্মকে মোক্ষের কারণ বলা আবশ্যক হইত এবং সেই সময়ে ইহাও বলা আবশ্যক হইত যে "প্রধান" মোক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। কিন্তু শ্রুতিতে কোথাও এই ভাবে সৎশব্দবাচ্য প্রধানকে হেয় বা পরিত্যাগ করিবার কোন কথা পাওয়া যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে মোক্ষের একমাত্র কারণ চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ এবং তিনিই সৎশব্দের বাচ্য।

সৎশব্দের অর্থে যে শ্রুতিতে প্রধান বুঝায় না, তাহারই সমর্থনে বেদান্তী আর একটী প্রমাণ দিতেছেন এই যে, শ্রুতিতে আছে যে "সুষুপ্তি অবস্থায় এই পুরুষ "সৎ" এর সহিত মিলিত হয়েন।" এই কথা শ্বেতকেতুকে বলা হইয়াছে। এখানে "মিলিত" হওয়ার অর্থে "লীন" হওয়া বা লয় পাওয়া বা অভিন্নভাবে মিলিত হওয়া ধরিতে হইবে। এখন, যে শ্বেতকেতুকে ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই শ্বেতকেতু চেতন। এখন কথা এই যে, চেতন কাহার সঙ্গে অভিন্নভাবে মিলিত বা লীন হইতে পারে ? জল জলেই লীন হয়, মাটীতে লীন হয় না। সেইরূপ চেতন চেতনেই লীন হইতে

পারে, অচেতনের সঙ্গে হইতে পারে না। সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, সমধর্ম্মী না হইলে পরস্পরে অভিন্নভাবে লীন হইতে পারে না। দুইটী বস্তু সমধর্ম্মী হইতে গেলেই এক হইতে অপরের উৎপন্ন বা অংশ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে উভয়ের ধর্ম্ম এক হইতে পারে না। এই কারণে শাস্ত্রীয় একটী যুক্তি এইরূপ উক্ত হয় যে, যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয় বা অভিন্নভাবে মিলন সম্ভব। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তী বলিতেছেন যে, যখন চেতন শ্বেতকেতুরূপ আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সুষুপ্তিকালে সেই আত্মা "সৎ" এর সহিত লীন হইয়া যান, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সেই "সৎ" হইতেই শ্বেতকেতুরূপ চেতন আত্মার উৎপত্তি এবং কাজেই একমাত্র চেতন আত্মা ব্রহ্মই "সৎ" শব্দের বাচ্য।

সমস্ত শ্রুতির একবাক্যতা বেদান্তীদিগের মতে সৎ শব্দবাচ্য ব্রহ্মেরই জগৎ কারণ হইবার সপক্ষে অন্যতর প্রমাণ। সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি বিভিন্ন তর্কশাস্ত্রে একমাত্র কোন বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই—সাংখ্য প্রধানকে জগৎ কারণ বলেন, বৈশেষিক পরমাণুকে বলেন ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত শ্রুতিই একমাত্র চেতন আত্মা বা ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার আলোচ্য অধিকরণের অবলম্বিত শ্রুতিতে দেখা যায় যে "সৎ"কেই সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে জগৎকারণ চেতন আত্মা ব্রহ্মই একমাত্র সৎশব্দের বাচ্য, ইহা শ্রুতিসমূহের অভিমত।

উপসংহারে বেদান্তী বলিতেছেন যে চেতন আত্মা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব কেবল যে শ্রুতিসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু এই মতই সর্ব্বজনবিশ্রুত।

Brahmo Dharma.

Creed.

1. In the beginning was the one God, none else, and naught but He, the Creator of all things.

2. He is the True, the Good, the Infinite. He is the Eternal Lord of the universe, the All-knowing, All-pervading, All-protecting, the Almighty. He is the Formless, Changeless, Self-contained and Perfect. He is the One and Absolute, there is none like unto Him.

3. In His worship lies our good, in this world and in the next.

4. To love Him and to do His will,—this is His true worship.

Initiation.

I accept this creed as my own, and embrace the Brahmo faith.

1. Loving Him and doing His will, I shall worship the One, Absolute Parabrahma, the Creator, Preserver and Destroyer, who is the Giver of all good in this world and the next, who is All-knowing, All-pervading, Formless and Beneficent.

2. I shall not adore any created thing, thinking it to be Parabrahma.

3. Unless prevented by sickness or trouble, I shall daily, in loving reverence, hold communion of spirit with Parabrahma.

4. I shall endeavour to perform good deeds.

5. I shall endeavour to abstain from sinful deeds.

6. If I should ever, through delusion, be led into sin, I shall desist therefrom with sincere repentance.

7. I shall give something, out of my income, every year to the Brahmo Samaj, to promote the Brahmo faith.

O God, grant me strength to live in accordance with the sacred principles of this religion.

God, the One alone, the Absolute.
Ekamevâdvitiyam

The Service.

PRAYER.

Thou art our Father ; as a father, teach us true wisdom : we bend low in reverence before Thee ; save us from delusion and sin ; forsake us not, destroy us not.

O God our Father, forgive us our trespasses and send us that which is for our good.

Thou art the cause and source of all goodness and happiness. Thou art goodness itself, and more than good. We bow down to Thee.

SALUTATION.

We bow down in reverence, again and yet again, to the Deity who dwells in fire, in water, who is immanent in the universe, who is in plants as well as in the trees.

COMMUNION.

He who is our Creator, Protector and Giver of all happiness, the Life of all life and the Fount of all good, from Whose grace we derive our body and mind, our intellect and strength, our wisdom and piety, the constant Protector of our body and mind from manifold disasters, He is the True, All-wise and Infinite Parabrahma, revealing Himself in bliss and immortality. He is the Peace, the Righteousness, the One above all.

With mind intent and full of love, I now hold communion of soul with this supreme Spirit of good.

He is all-pervading, stainless, formless, without infirmity or blemish, pure and sinless, free from all fleshly taints. He is the all-seeing Ruler of the mind. Highest of all is He and Self-revealed. He bestows on His creatures all things at all times according to their needs. He has given us our life, our mind and all our senses. He has created the sky, air, light, water and the all-receiving earth.

Through fear of Him the fire burns, the sun gives out its rays, the clouds pour forth rain, the winds blow, and death wanders through the world.

MEDITATION.

Let me meditate on the benign wisdom and might of that Supreme Being, who reveals all worlds, who pervades all things, who is the highest good, the Creator of the universe, who sends us all our powers of thought.

HYMN.

Thou art the Real, the prime cause of the Universe.
We bow to Thee.
Thou art the All-wise, the one Refuge of all.
We bow to Thee.
We bow to Thee, the Absolute, the Giver of salvation.
Thou art the Supreme, the Eternal,
All-present Brahma, we bow to Thee.
To thee alone is honour due,
Thou alone art the Protector of all,
Thou alone preservest the Universe,
The self-revealed.
Thou alone art Creator, Preserver, and Destroyer of all,
Most high, motionless and fixed of purpose,
Thou the dread of all dreads
The Terror of the terrifying,
Thou art the End of all creatures,
The Purifier of all which purify.
Thou alone art the Ruler of all high estates,
Holier than the holiest,
The Guardian of those who guard.
We commune with Thee, we pray to Thee,
Thou art the Witness of the universe,
We bow to Thee.
Let us seek refuge in the one, absolute God,
Who is shelter, self-poised,
Who is our raft on the sea of life.

PRAYER.

O divine Spirit, deliver us from all sins committed in ignorance of Thy purpose, keep our hearts free from all evil thoughts, make us diligent in righteous deeds which thou hast inspired, grant us with earnest reverence and love to think always of Thy boundless glory and unspeaktable goodess, so that at the last we may attain our fulfilment in the beatitude of Thine Eternal union.

Lead me from the unreal to the real,
Lead me from darkness into light,
Lead me from death to life Eternal.
O Thou self revealed, reveal Thyself to me.
O Terrible, ever protect me with thy look benign.

RECITATION.

Thus say the worshippers of Brahma :—

He from whom all creatures proceed, by whom their life is sustained, to whom they go forth, and into whom they enter at the end of time,—seek ye to know Him wholly; He is Brahma.

All creatures spring from Parabrahma who is Joy Eternal.

After birth their life is preserved by Brahma who is Joy eternal.

At the end of time, they go forth and enter into Brahma, who is Joy Eternal.

He who has tasted the eternal joy of Parabrahma, before whom thoughts and words fail, he no longer knows fear.

That divine Spirit is of joy all compact and satisfies every longing of the heart. All creatures delight to attain to that Parabrahma who is eternal bliss.

Who would ever live and move and have their being, if this divine Spirit of joy did not fill the heavens? He it is who scatters delight through all worlds.

When the worshipper freely rests in this Parabrahma, who is invisible, formless, inexpressible and unbounded, he is released form fear.

He who has known the delights of that Parabrahma, before whom our thoughts and words fail, no longer knows any fear.

He is the highest goal of all creatures,
He is their greatest wealth,
He is their final abode,
He is their utmost joy,

All others enjoy only a particle of this in-effable bliss.

God the Eternal, Peace, Peace, Peace.

CONCLUDING PRAYER.

May God, the Transcendent, who knows the needs of all His creatures and supplies them by His manifold power, who pervades the universe from beginning to end, the shining Lord of all deities, inspire us with holy thoughts and aspirations.

শোক-সংবাদ।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বিনয়ে ঔদার্য্যে সরলতায় ব্রাহ্মণোচিতঅমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলের আদর্শীভূত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার ভিতরে এমন কোন সভা সমিতি হইত না যেখানে গুরুদাস বাবুর পদধূলি না পড়িত। সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। বঙ্গভাষায় শিক্ষা বিস্তারে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য জন-সাধারণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

ভাই উমানাথ গুপ্ত। নববিধান সমাজের অন্তর্গত বর্ষীয়ান শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা এক সময়ে প্রবল উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন। সুলভ সমাচারের সহিত উমানাথ বাবুর নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত। মহর্ষির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মায় শান্তি বিধান করুন।

শ্রীমৃণালিনী দেবী। শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ গত ২রা পৌষ তাঁহার পত্নী হারাইয়াছেন। অরবিন্দ বসুর অসামান্য প্রতিভা বিপদসঙ্কুল সংসারে সেরূপ ফুটিতে পারিল না, ইহাতে আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ। অরবিন্দ বাবু এখন কোথায় কি অবস্থায় জানি না, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী চলিয়া গেলেন ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান দিন।

শ্রীযুক্ত অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী। অজিত বাবু অপরিণত বয়সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। তাঁহার আরব্ধ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মহর্ষির জীবনী রচনায় তিনি তাঁহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সংসিদ্ধ হউক। আমরা আর কি বলিব?

ঊননবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

মাঘোৎসব উপলক্ষে সুলভ মূল্যে পুস্তক বিক্রয়।

আগামী ১১ই মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ১লা হইতে ৩০শে মাঘ পর্য্যন্ত আদিব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ৩০শে মাঘের পূর্ব্বে মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে]	৩৷৹	২৷৷৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]	৷৹	৶৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷৹	৶৹
ব্রহ্মোপদেশ	৷৷৹	৷৹
মাঘোৎসব	৷৷৹	৷৹
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজসনের সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত)	৶৹	৴৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹	৶৹
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৲	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৶৹	৴৹
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹	৴৹
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	৴৹	৴৹

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶৹	৴৹
পরলোক ও মুক্তি	৶৹	৴৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹	৷৷৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	[illegible]	৸৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৶৹	৶৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴৹	[illegible]
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	„ 1	„
The Theist's Prayer Book	„ 1	„
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸৹	১৸৹
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	১৲	১৲

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	৷৷৹	৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸৹	৷৶৹
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹	৷৹
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. 4	„ 3 „
Adi Samaj as a Church	4 „	3 „
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	4 „	3 „
The Doctrine of Christian Resurrection	4 „	2 „

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম	৷৹	৶৹
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	৷৷৹	৷৹
ঐ , দ্বিতীয় খণ্ড	৷৷৹	৷৹
রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৲	১৲

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (ভাল বাঁধা)	৸৹	৷৷৹
রাজা হরিশ্চন্দ্র „	৷৷৹	৷৶৹
আঁখিজল „	৷৷৹	৶৹
শ্রীভগবৎ কথা „		৷৶৹
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১৷৹	৷৶৹
ওঁ পিতা নোঽসি	৷৷৹	৷৹
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	৷৷৹	৷৹
বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	৴৹	৴৹
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	৷৷৹	৷৷৹

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	৷৷৹	৷৷৹

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	৷৹	৶৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৴৹	[illegible]

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত

	পূর্ণ মূল্য	সুলভ মূল্য ।
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১৷৹	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১৷৹	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১৷৹	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১৷৹	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১৷৹	১৲

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত		
সনেট পঞ্চাশৎ	‖০	‖০
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত		
আমার খাতা	৸০	।৵০
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸০	৷৵০
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত		
গীত পরিচয়	।৶০	।০
শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত		
সঙ্গীত মঞ্জরী	৫৲	৪৲
শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত		
সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲	১‖০
পরলোকগত আচার্য্য ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত		
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	⁄০	⁄০
ধর্ম্মদীক্ষা	৶০	⁄০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১ম হইতে ৪র্থ ভাগ	৸৶০	‖৶০
গৃহকর্ম্ম	।০	৶০
কুমার শিক্ষা	‖০	।০
প্রশ্ন মঞ্জরী	‖০	।০
প্রভাতকুসুম	৷⁄০	৶১০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০	।০
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত		
হরিলীলা	১।০	‖৶০
স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত		
ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা	‖৶০	‖০
শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত		
ব্রহ্মনাম ও হরিনাম	৶০	⁄০
নামতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব	৶০	⁄০
মানব মণ্ডলে কি সুন্দর দেখায়	৶০	⁄০
প্রণবতত্ত্ব	৶০	⁄০
সহজ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য	৶০	⁄০
উত্তরাখণ্ডের ধ্বনি	৶০	⁄০
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	।৶০	৶০
মহর্ষির কর্ম্মজীবন	১।০	‖৶০
সাধু উমেশ চন্দ্র	।৶০	৶০

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
এ, কে, কৌকভ প্রণীত		
সঙ্গীত পরিচয়	‖০	‖০
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত		
Life of Dwarka N. Tagore		।০
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত		
নচিকেতা		৸০
স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—		
হিত গ্রন্থাবলী	২৲	২৲
শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত—		
পদ্মরাগ	৸০	৸০
মুদীর দোকান	১‖০	১‖০
সপ্তস্বর	১‖০	১‖০
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত		
* পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)		‖০
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ)		১‖০
ঐ (৭ম ঐ)		১৲
* সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ ঐ)		১‖০
* আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ)		১৲
* বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় ঐ)		‖০
* ঐ ২য় ভাগ (তন্ত্রের কথা প্রভৃতি)		‖০
* স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস		।০
* বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ		‖০
ঐতিহাসিক উপন্যাস (ষষ্ঠ সংস্করণ)		‖০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব (পঞ্চম ঐ)		১
[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী		৷৶০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]		১।০
* সদালাপ নং ১ (সচিত্র)		৸০
* ঐ নং ২ (ঐ)		৸০
* ঐ নং৩ (ঐ)		৸০
*নেপালী ছবি (ঐ)		৸০

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 462.

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

মাঘোৎসব সংখ্যা।

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮। ১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ঊনন্নবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

(সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী)

বর্ত্তমান বৎসরের দুঃখ-দুর্দ্দিনের ভিতর, মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ব্রহ্মোৎসবের সার্থকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভগবানকে প্রাণের সহিত ডাকিতে হইবে, এই প্রকার একটা ব্যাকুল প্রার্থনার ভাব যেন সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রাতঃকালের এবং সায়ংকালের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাঙ্গনটী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া এবং দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়া সকলের হৃদয়ে উৎসবের ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রাতঃকালের উৎসবে প্রায় তিন শত ভক্তজন গম্ভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদিগের সঙ্গেই ভগবানের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের আশা এই অল্পসংখ্যক ভক্তমণ্ডলী দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে না। আমরা চাই যে বিস্তৃততর ভক্তমণ্ডলী প্রস্তুত হইয়া প্রাণ ভরিয়া প্রাতঃকালের বিহগগীতের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ের গীত মিলাইয়া দেন।

প্রাতঃকালে সকলে সমবেত হৃদয়ে সেই সুপ্রসিদ্ধ অর্চ্চনাগীত "দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি—তুমি মঙ্গল আলয়; ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ওপদ আশ্রয়" গাহিবার পর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যে রাখিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন পরিগ্রহ করিলেন।

তৎপরে শ্রীমতী রমাদেবী এবং শ্রীমতী অরুণাদেবী সুমিষ্ট কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের একটী গান গাহিলেন। তৎপরে সুগায়ক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কগণ গম্ভীর ভৈরব রাগে একটী গান করিবার পর আমাদের প্রিয়বন্ধু ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী শোভনা দেবীর সহিত স্বরচিত গান গান্ধারী তোড়ী রাগিণীতে গাহিয়া সকলের হৃদয়কে ভগবানের উপাসনার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

তৎপরে সুধীন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক কবিহৃদয়োত্থিত প্রাণস্পর্শী ভাষায় ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিবার জন্য সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন।

ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন হইলেও তাঁহার যে স্বাভাবিক উৎসাহ লইয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণের

উপাসনার পর চিন্তামণি বাবু প্রার্থনার প্রয়োজন সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

সায়ংকালের উৎসবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বেই সমস্ত প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টার সময় মঙ্গলশঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হইল।

তৎপরে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী বাণী-দেবী স্বরসন্ধি সহকারে অর্গ্যাণ ও পিয়ানো যন্ত্রে বেদগান (তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং) বাজাইতে লাগিলেন এবং তাহার সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গায়কগণ ও বালিকাগণ বেদগান গাহিয়া এক স্বর্গীয় ভাব সকলের হৃদয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। উপনিষদের সেই কথা—মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে —মুহুর্মুহু আমাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

বেদগানের পর আচার্য্যগণ বেদী গ্রহণ করিলেন এবং আরম্ভোচিত সঙ্গীত হইবার পর আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি সুবিদ্বান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় স্বাভাবিক সুগম্ভীর স্বরে সমবেত উপাসকগণের প্রতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। সেই অভিভাষণে তিনি হিন্দুর ধর্ম্ম কি এবং হিন্দুধর্ম্মের বীজ যে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক এবং সেই ধর্ম্মবীজ ও আদিব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যে একই তাহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া সকলকে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম গ্রহণে আহ্বান করিলেন।

যথাসময়ে ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এই উপাসনা উপলক্ষে সত্যেন্দ্র বাবু, মহর্ষিদেব যে কি ভাবে ১১ই মাঘের উৎসবের প্রবর্ত্তনা করিলেন, তদ্বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। সর্ব্বশেষে ক্ষিতীন্দ্র বাবু নির্জ্জন ও সজন উপাসনার উপকারিতাবিষয়ক একটী সুলিখিত উপদেশ পাঠ করেন। বর্ত্তমানে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসনা, বিশেষত সজন উপাসনার উপযোগিতাবিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে! ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার উপদেশে এ বিষয়ে সন্দেহের নিরর্থকতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপদেশটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে প্রাঙ্গনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশের প্রত্যেক শব্দটী সুস্পষ্ট শোনা গিয়াছিল।

সর্ব্বশেষে কবি রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনা-গীত "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" স্বরসন্ধি সহকারে গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে পঠিত তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের লক্ষণ" বিষয়ক একটী উপদেশ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য-এই যে, ইহারও মধ্যে সেই উপাসনার উপযোগিতাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মাঘোৎসবের উদ্বোধন।

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ প্রাতঃকালে সমস্ত কুজ্‌ঝটিকা অন্ধকার দূর করে' সূর্য্যকিরণ যেমন প্রকাশ পাচ্চে, তেম্‌নি আজকের এই শুভ উৎসব আরম্ভে আমাদের অন্তরের সমস্ত গ্লানি সংশয় সন্দেহ বিষাদ অবসাদ দূর করে' প্রত্যেকের হৃদয়ে আনন্দজ্যোতি বিভাসিত হোক্। আজকের এই উৎসব কোন ব্যক্তিগত জীবনের পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার উৎসব নয়, কোন পারিবারিক বা সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্ম অনুষ্ঠানের উৎসব নয়, কোন জাতিবিশেষের কৃত কর্ম্মগৌরবের উৎসব নয়, আজকের এ উৎসব সমস্ত মানবজাতির পরমোৎসব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাজরাজেশ্বর যিনি, তাঁর অন্তঃপুরে সন্তানপরিচয়ে আমাদের সকলেরই যে সমান স্বাধীন অবাধ গতিবিধি, তাঁর সম্মুখে আমাদের প্রাণের সকল অভাব আকাঙ্ক্ষা নিবেদনের যে পূর্ণ অধিকার আছে, আজ এইদিনে এদেশে এ আনন্দ-বার্ত্তা পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। আজকের এ উৎসবের অধিকারী উদ্যোক্তা আনন্দফলভাগী আমরা সকলেই। আজ নববেশে শুদ্ধচিত্তে আমরা সকলে এক হ'য়ে এ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি—আজ যিনি এই উৎসবের দেবতা তাঁকে আমরা প্রাণের মধ্যে দেখে, নতমস্তকে ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণাম করে' এস আমরা এ উৎসবের আবাহন করি।

আজ কিছুকাল থেকে আমরা দেখ্‌চি এ পৃথিবীর বুকের উপর কি ভীষণ ঝড়ই ব'য়ে যাচ্চে ;—দুর্ভিক্ষ মহামারী যুদ্ধবিগ্রহ রোগ শোক মৃত্যুর করাল ছায়ায় এ পৃথিবীর মুখ অন্ধকার। মানবপ্রাণে এরূপ নিদারুণ আঘাতের পর আঘাত জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। কত গ্রাম নগর জনপদ দেশ-দেশান্তর আজ শ্মশানে পরিণত, কত স্নেহময়ী জননীর কোল আজ শূন্য, কত শিশু-প্রাণ আজ অনাথ নিরাশ্রয়, কত প্রিয়পরিজনবেষ্টিত আনন্দমুখর সুখের ভবন আজ নীরব নিস্তব্ধ,—চারিদিকে অন্ধকার অন্ধকার। কিন্তু এই দুর্দ্দিনের অন্ধকারে সব্‌চেয়ে আমাদের এই কথাই বেশী করে' মনে হয় যে, যে আঘাত, প্রতিদিনের যে নিদারুণ বিচ্ছেদব্যথা এই দুর্ব্বল মানুষের শরীর মনকে নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ করে' দিতে পারে তা' কেমন করে' আজ আমাদের পক্ষে সহনীয় হ'ল ? কেমন করে' এই প্রলয়-ঝঞ্ঝার মুখে আমরা এখনও নির্ভয়ে অবস্থান করচি ? কোন্ আশ্বাসে বিশ্বাসে এখনও আমাদের মুখে হাসি, প্রাণে আশা, কর্ম্মে উৎসাহ, জীবনে উৎসব র'য়েছে ? সংসারচক্র যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নি চল্‌চে ? ব্রাহ্মধর্ম্ম—যে সত্যধর্ম্মের উৎসবে আমরা আজ এখানে সকলে সমবেত হয়েছি—তিনিই এর উত্তর দিচ্চেন—এ জগতে এক সর্ব্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আছেন, তিনিই একমাত্র এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি মঙ্গলময় ; আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। তিনি মঙ্গলময় ;—আমরা মুখে যে যাই বলি না কেন, অন্তরে তাঁকেই আমরা মানি, তাঁর মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস করি। আমরা জানি, এ জগৎসৃষ্টি কোন অন্ধশক্তির নিয়মাধীনে নেই ; আমরা জানি, আমাদের এ মানবজীবন শূন্যময় নয় ; আমরা জানি, জন্ম হ'তে আরম্ভ করে' আমাদের জীবনরক্ষার এত স্নেহ-আয়োজন কোন নিষ্ঠুর দানবের ক্রূর পরিহাস নয় ; আমরা জানি, শীতের পর বসন্ত আসে—আবার ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, মধুর বাতাস বয়, পাতায় পাতায় রঙ ধরে—চারিদিকে আনন্দ জেগে ওঠে ; আমরা জানি, দুর্গন্ধ কদর্য্য পঙ্ক ভেদ করে' অপূর্ব্ব শোভাময় কমল ফুটে ওঠে ; এবং আমরা জানি, এই দুঃখময় পৃথিবীতে আমরা নিরাশ্রয় নই, ঈশ্বর আছেন—এ অন্ধকারপথে তাঁরই মঙ্গল কর আমাদের অমৃতের পথে নিয়ে যাচ্চে, আমাদের কোন ভয় নেই, ভয় নেই। এই জ্ঞানে ও বিশ্বাসে, যিনি বিশ্ববিধাতা তাঁরই জয়গান পূজা করতে আমরা সকলে এখানে সমবেত হ'য়েছি। আজ ব্যাকুলপ্রাণে তাঁকেই আমরা ডাক্‌চি, তিনি তাঁর অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হউন্।

আজ আমাদের উৎসব, আনন্দের দিন ; এ উৎসব পুষ্পসৌরভের মত ক্ষণকালের জন্য আমাদের জীবনে বৎসরান্তে এক দিন আসে ; তাই আবার বলি, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আজ আনন্দজ্যোতি বিভাসিত হোক্। এ উৎসবক্ষেত্রে ভগবান আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের বল্‌চেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে রয়েচি, আমি তোমাদের পরিত্যাগ করিনি ; তোমরা আমাকে আর দূরে রেখো না ; তোমাদের দুঃখ তোমাদের প্রাণের,—তোমাদের প্রাণের সেই ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সকল দুঃখ দূর করে দেব।'—এস আজ আমরা আমাদের প্রাণেশ্বর প্রিয়তম জীবনবল্লভকে আমাদের প্রাণের ঘরে আনি, হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তিপ্রীতির কুসুমাঞ্জলি দিয়ে তাঁর পূজা করে' আমাদের জীবনকে নিরাময় ধন্য ও এ উৎসবকে সার্থক করি।

প্রার্থনার প্রয়োজন। *

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

সম্বৎসরকাল পরে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিমণ্ডিত তাঁহারই এই আবাস-নিকেতনে, মাঘোৎসব উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ—যাহা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অমূল্য দান, এখনও আমরা তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তিনি আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অরুণালোক লাভ করিয়া এখনও আমরা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, বিপুল স্বদেশপ্রেম, এখনও আমাদিগকে তাঁহার

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উপাসনায় বিবৃত।

পথের পথিক করিতে পারে নাই। দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য, তাঁহার আকুলতা, তাঁহার ত্যাগের ভাব এখনও আমরা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারি নাই!

রাজা রামমোহন অদ্যকার শুভদিনে আদি-ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, যে প্রতিদিন সেখানে এমনই ভাবে প্রার্থনা ও সঙ্গীত চলিবে, যাহাতে ভগবৎ-চিন্তার ভাব অন্তরে জাগ্রত হয়, নীতি ও ধর্ম্মের ভাব বিকশিত হয়, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ এই ভাবে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইলে, সপ্তাহান্তে একদিন মিলনের আদেশ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রায় নব্বুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, ঠিক এই দিনে সম্পাদিত "ব্রহ্মসভার" প্রতিষ্ঠাপত্রে, রাজা তাঁহার বিরাট হৃদয়ের যে সুস্পষ্ট ছবি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে গিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। সম্মিলিত ভাবে উপাসনা না করিলে যে জাতির কল্যাণ নাই, দেশব্যাপী জাগরণের সম্ভাবনা নাই, ইহা বুঝিয়া তিনি মিলিতভাবে উপাসনার পথ প্রমুক্ত করিয়া দিলেন।

নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা উচ্চ অঙ্গের সাধনা কি না, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও, প্রার্থনা ছাড়িয়া মানুষ এক দণ্ডের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। প্রার্থনা মানবের চিরসঙ্গী। দুর্ব্বলতাই উহার নিয়ামক। মাতার ক্রোড়ে শায়িত ক্ষুদ্র শিশু ক্রন্দনের ভাষায় তাহার অভাব অভিযোগ পিতা মাতা বা ধাত্রীর নিকট জ্ঞাপন করে। শিশুর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ক্রমিকই তাহার প্রার্থনা; বিদ্যালয়ে গিয়াও তাহার প্রার্থনার অন্ত নাই। সে শিক্ষককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া শিক্ষালাভ করিতে থাকে। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও তাহার প্রার্থনা। অপরের মুখাপেক্ষী না হইলে তাহার চলে না। সে পণ্যশালায় গিয়া মূল্য দিয়া তাহার অভাবের বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করে বটে; কিন্তু সেই ক্রয়ের ভিতরেও প্রার্থনার ভাব অন্তর্নিহিত। বার্দ্ধক্যে যখন দুর্ব্বলতা আসিয়া মানবকে অথর্ব্ব করে, তখন স্ত্রী-পুত্র কন্যার সেবাপ্রার্থনা [illegible]। [illegible]

সমস্যার মধ্যে অবস্থান করে, নিজের জ্ঞানের আলোকে সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই পরের নিকটে গিয়া সে পরামর্শ প্রার্থনা করে, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে, শোকে সান্ত্বনা লাভের জন্য অপরের দ্বারে গমন করে। মানুষ যখন আবার তাহার সন্তাপ—তাহার সন্দেহ এখানে নিরাকৃত করিবার অবসর পায় না, কিছুতেই আপনার দুর্ব্বলতা মোচনের সন্ধান পায় না, হৃদয় যখন নিতান্ত ভারবহ হইয়া উঠে, তখন সে পৃথিবীর দিক হইতে নিরাশ হইয়া করজোড়ে উর্দ্ধমুখে চাহিতে অভ্যাস করে। এইখান হইতেই তাহার প্রকৃত প্রার্থনার সূচনা। সে এই অবস্থায় নিজ অন্তরে দৈববাণী শ্রবণ করে। কে যেন তাহার অন্তর্দেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া এই আশার বাণী শুনাইয়া দেয় যে "ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তাঁহারে, যে জন চায় নাহি ফিরে, তিনি যে অকিঞ্চনগুরু"।

মাতার নিকট প্রার্থনা করিবার যৌক্তিকতা ক্ষুদ্র শিশুকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। এ তাহার স্বাভাবিক ভাব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার আগ্রহও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। আমরা আমাদের প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, তাই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রার্থনা আমাদের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া উৎসারিত হইতে কালবিলম্ব ঘটে। যৌবনের চাপল্য অতিবাহিত না হইলে, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতায় আপনাকে অসহায় না বুঝিলে, দুঃখ-দুর্দ্দিনের ভিতর নিপতিত না হইলে, তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিবার সৌভাগ্য মানুষ লাভ করে না।

আমরা কখন্ প্রার্থনা করি? যখন দেখি নিজ-শক্তি পরাস্ত। আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন মনে না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হয় না। মানুষ কাহার নিকট প্রার্থনা করে? যেখানে দেখে তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে। একজন দরিদ্র আর একজন দরিদ্রের দ্বারে গিয়া প্রার্থনা করে না, কেন না সে জানে, সে তাহারই মত শক্তিহীন। কেন লোকে প্রার্থনা করে? পাইবার আশায়। তাই প্রকৃত প্রার্থনার মূলে চাই নিজের ভিতরে অভাব-বোধ, এবং চাই সেই অভাব-বোধের তাড়না। যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার [illegible] সেই অভাব দূরীকরণের সামর্থ্য আছে,

চাই সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস। তিনি আমার সমস্ত অভাব বিদূরিত করিয়া দিবেন, চাই সেই অনির্ব্বাণ আশা। সেই দাতা যে আমার সম্মুখে, চাই সেই সুস্পষ্ট ধারণা; ভিখারী শূন্যে তাহার প্রার্থনা নিবেদন করে না। দ্বারের নিকট গিয়া চীৎকার করে, এই বোধ লইয়া, যে গৃহস্বামী গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভিক্ষাহস্তে বাহির হইয়া তাহার অভাব বিদূরিত করিয়া দিবেন।

আমরা যখন অন্তরের কালিমা ধৌত করিবার জন্য, পুণ্য সলিলে স্নাত হইবার জন্য, ক্ষতহৃদয়ে মৃতসঞ্জীবন ঔষধ লাভ করিবার জন্য, সংশয়-অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভের জন্য, দুর্ব্বল হৃদয়ে বললাভের জন্য, জীবনে প্রথম প্রার্থনা আরম্ভ করি, তখন হয়তো তাঁহার দক্ষিণ মুখের আভাস সুস্পষ্টরূপ দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রার্থীর মত আশা লইয়া, ব্যাকুলতা লইয়া, দৈন্যের বেদনা লইয়া, তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস লইয়া করযোড়ে একাগ্রমনে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। অচিরে দেখিতে পাইব, তিনি তাঁহার স্বর্গদ্বার প্রমুক্ত করিয়া আমাদিগকে তাঁহার করুণহস্তে স্পর্শ করিতেছেন, সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দিতেছেন, সকল সন্দেহ নিরাকৃত করিতেছেন, অন্তরের চিরসঞ্চিত কালিমা বিধৌত করিতেছেন, পুণ্যনীরে আমাদিগকে দীক্ষা দিতেছেন, নবজীবনে আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছেন, আনন্দনীরে অভিষিক্ত করিতেছেন।

যাঁহারা প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের হস্তে জীবন ন্যস্ত করিয়া দিন, পরীক্ষা করিয়া দেখুন, নবজীবন লাভ হয় কি না; শোক-দুঃখবহুল জরা-ব্যাধিসঙ্কুল পৃথিবীতে আশ্রয়তরু প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না। এখানে এমন অনেক সত্য রহস্যের আবরণে আবৃত হইয়া প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা যুক্তিপরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন। তাই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ সুস্পষ্ট-ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, "নৈষা মতিস্তর্কেনাপনেয়া"। আস্তিক্যবুদ্ধিই বল, আর ধ্যান ধারণা সাধনার কথাই বল, উহা ঠিক তর্কের বিষয়ীভূত নহে। নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

না চাহিলেও যখন ভগবান আমাদের অভাব পূর্ণ করিতেছেন, তথাপি প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা আছে? মাতা ত পুত্রকে অযাচিতভাবে বক্ষের রক্ত পর্য্যন্ত দান করিতেছেন, তাই বলিয়া পুত্র কি সঙ্গত বা অসঙ্গত সমস্ত প্রার্থনা মাতার নিকট নিবেদন করে না? এ যে তাহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। ইহা যে তাহার দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি। সে শক্তিহীন বলিয়াই দাঁড়াইতে শিক্ষা করিবার জন্য মাতার অঙ্গুলির আশ্রয় ভিক্ষা করে। সে বাক্‌শক্তিহীন, তাই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য, বস্তুর নাম জানিবার জন্য মাতাকে অস্ফুটস্বরে অবিরাম প্রার্থনায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কৌমারে বা যৌবনে, শিক্ষাগারে বা বিষয়ক্ষেত্রে প্রার্থনা আছে বলিয়াই অজ্ঞানতা অপসারিত হয়, জ্ঞানের দ্বার প্রমুক্ত হইবার অবসর ঘটে। আবার সাধকের প্রার্থনা আছে বলিয়াই, নবনব আধ্যাত্মিক সত্য তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, প্রেমানন্দে যোগানন্দে তাঁহার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠে।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই আশায় যে, মোহ-অন্ধকার নির্ব্বাসিত হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ জাগিয়া উঠিবে যে, সেই পরমমাতা আমাদের অতি নিকটে রহিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমাঞ্চলের আবরণে, আমাদিগকে জীবনে-মরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে "পিতা নোঽসি" "তুমি যে আমাদের পরমপিতা" এ-বোধ আমাদের অন্তরে প্রেরণ কর। সংসার-তাপদগ্ধ, সংশয়বিমুগ্ধ মানব! উপাসনারত জীবনে অবলম্বন কর, সেই অপ্রতিম দেবতাকে জানিবার ও বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হও, নিশ্চয়ই ভয়শূন্য হইবে। সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে—পারিবে, "ব্রহ্মাভয়ং" সেই অভয়-স্বরূপ শান্তিদাতা বিধাতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন।

সমগ্র ইউরোপব্যাপী মহাসমরে ধরণীর গাত্র নরকণ্ঠ নিঃসৃত রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল, বিয়োগবিধুর অসংখ্য নরনারীর কাতর ক্রন্দনে গগনাভোগ প্রতিধ্বনিত হইল, ইহাতে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে সন্দিহান হইও না। এই আপাত-প্রতীয়মান

অমঙ্গলের ভিতর দিয়াই যে তাঁহার মঙ্গলরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিবাদের ভিতর দিয়াই যে চিরশান্তি জাগিয়া উঠে, সংসারে মৃত্যু আছে বলিয়াই যে অমৃতের সন্ধান পাইবার জন্য সকলে আকুলভাবে তাঁহার অনুসন্ধান করে, কলহ আছে বলিয়াই শান্তির অর্থ আমাদের হৃদ্গত হয়। দুঃখ আছে বলিয়াই মানুষ আনন্দ লাভের প্রয়াসী। দৈন্য আছে বলিয়াই সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য মানুষের এই অদম পিপাসা। এই বিরুদ্ধ ভাব আছে বলিয়াই মানুষকে সংগ্রাম করিতে হয়, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই সত্যের ধারা উৎসারিত হইতে পারিয়াছে, ধর্ম্মের ভাব আধ্যাত্মিকতার ভাব স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিয়াছে। আলোড়নের ভিতর দিয়া যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের গণনায় যাহা অমঙ্গল, তাহাই মঙ্গলের কূলে আমাদিগকে উপনীত করিতেছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জগতে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল নাই। মঙ্গল তাহার অন্তর্নিহিত। প্রাণঘাতী সর্পবিষও বিকারী-রোগীর একমাত্র মহৌষধ। যে জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত তরঙ্গের মত ক্রীড়া করে না,—নিশ্চেষ্ট সে জীবন। কর্ম্মবিহীন উদ্যমবিহীন উদ্দেশ্য ও চিন্তাবিহীন যে জীবন, তাহা অধঃপতনের অভিমুখীন। পাশ্চাত্য ভূমিতে এই যে দারুণ বিপ্লব, অসংখ্য কামানের এই যে অশনিনির্ঘোষ, জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা তাহার চরম পরিণাম নহে, কিন্তু সমগ্র খৃষ্টিয়ান জাতি "তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক" এই বলিয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া যে প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, এই মহাবিপ্লব সেই অমূল্য প্রার্থনাকে সফলতার দিকে আনয়ন করিবে; ভগবানের মাতৃমূর্ত্তিকে প্রকট করিয়া দিবে, আধ্যাত্মিক চক্ষুকে আরও বিকশিত করিয়া তুলিবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আঘাত যত বলে কার্য্য করে, প্রতিঘাত তাহার শতগুণ বলে বিশ্বব্যাপী সুফল প্রসব করিবে।

প্রার্থনার ভাব সাধককে উপলব্ধির দিকে দিন দিন অগ্রসর করিয়া দেয়। সর্ব্বাবস্থায় এই যে ব্রহ্ম উপলব্ধি, ইহাই ধর্ম্মজীবনের শেষ পুরস্কার। আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা লইয়া চিরদিন থাকিতে চাই না। আমরা তাঁহার অখণ্ড সত্তা উপলব্ধি করিতে চাই। তাঁহার বিরাট সত্তার ভিতরে আপনাদিগকে ডুবাইতে চাই, অন্তরে-বাহিরে সেই জাগ্রত দেবতা যে বিরাজমান, আমরা যে তাঁহার ভিতর নিমজ্জিত, আমরা সেই বোধ আনিতে চাই।

আমরা কি বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিব? তাঁহার নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করিব কি না? সাংসারিক অভাব নিবেদন করিব কি না? অভাব দূরীকরণের জন্য ভিক্ষাই যদি প্রার্থনার অর্থ হয়, তবে তাঁহার নিকট সমস্ত অভাবই জানাইতে পারি। প্রার্থনার বিষয় বা তাহার ভাষা কে কাহাকে শিখাইয়া দিবে? উৎস হইতে বিনিঃসৃত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রার্থনা আপনা হইতেই বাহির হইবে, এবং জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার বিষয় নব নব মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ক্ষুদ্র শিশু কাচখণ্ডের চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ক্রন্দন করে, কিন্তু যুবক রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড লাভের জন্য ব্যাকুল। মানুষের প্রথম অবস্থার প্রার্থনা "ধনং দেহি, মানং দেহি, যশো দেহি" হইলেও তপঃক্লিষ্ট সাধক ব্যাকুলভাবে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে, "অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে জীবনে লইয়া যাও, তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর", "ধন মান চাহি না তোমা হতে। দাও দাও এই অধিকার যাতে সহচর অনুচর হয়ে থাকি তোমারি"।

ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক বা সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দৃশ্য অবলোকন করিয়া যদি আমরা মনে করি যে ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের তাবৎ, তাহা হইলে ইহা সুনিশ্চিত যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি নিঃসংশয়রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্যক্তিগত সাধনার উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। একেশ্বরবাদের শীতল ছায়ায় বসিয়া আমরা যে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছি, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের যে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইয়াছে, সেই কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা ও সাধারণের মধ্যে সেই বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য আমাদের এই আনন্দসম্মিলন।

ধর্ম্মকে জীবনে, ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে নিভৃতে

রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিদিনের পূজা তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার ভাব নিত্য সাধনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিয়া জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে আত্মীয় স্বজনের প্রেমার্দ্র ভাবের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। আবার উৎসবের ভিতরে সকলের প্রেমোজ্জ্বল ভাবের অন্তরালে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইবে।

হে প্রতিদিনের পূজার দেবতা! আজ এই নৈমিত্তিক সাধনার দিনে, এই মহা মহোৎসবে তোমার প্রসাদ তুল্যরূপে উপভোগ করিবার জন্য আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। এই বিমল প্রভাতে, এই পুণ্য দিনে, তড়িৎপ্রকাশের ন্যায় উৎসাহবহ্নি আজ অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের বীজ আজ সকলের অন্তরে অঙ্কুরিত হউক। কঠোর পাষাণ হৃদয় আজ তোমার নামে বিগলিত হউক; সংশয়াত্মার অন্তরে আজ ক্রন্দন জাগিয়া উঠুক; মৃতের হৃদয়ে আজ নব চেতনার সঞ্চার হউক; শক্তিহীন আজ নবজীবন লাভ করুক, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিবাদ কলহের উপরে চিরযবনিকা নিপতিত হউক, বিশ্ব জুড়িয়া ব্রহ্মনাম প্রতিধ্বনিত হউক! হে জগন্মাতা তুমি আজ আমাদের সম্মুখে; তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়া উঠুক, আজ সকলের মস্তক তোমার চরণে অবনত হউক, তোমার শুভ আশীষ এই প্রভাতের আলোর মত সকলকে স্পর্শ করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

হিন্দুর সাধনা।

(আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ)

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু ॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আ বর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥

অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭। ১৩। ১-৪

ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোৎসবের দিনে যাহা আমাদিগের দূর হইতেও সুদূরে তাহা সন্নিকট হয়; যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা বিকশিত হয়; যাহা সুষুপ্ত তাহা জাগ্রত হয়। আজকার দিনে সমাসীন সভাসদবর্গের হৃদয়ের আনন্দ সকলের হৃদয়কে অধিকার করে। অন্য সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে আজ তাহা পরিস্ফুট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব আমার মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহসপূর্ব্বক আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হইয়াছি। সেই সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠা কিংবা সঙ্কোচ হয় না। সমবেত সকলের হৃদয় প্রসূত আনন্দ আমার হৃদয়কে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অদ্যকার অধিবেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে আদিসমাজের যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছা পাই, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ ভক্তিতে পরিণত হয়, পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহায্য করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদিগের জাতীয়তার স্রষ্টা। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হিন্দুর বলিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহু দিন পূর্ব্বে এই সমাজের একজন পূজ্য স্বনামধন্য আচার্য্যমহোদয় * হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই কয়েকটী কথা বলেন:—

"আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবী সুশোভিত করিতেছে, হিন্দু-

* ৺ রাজনারায়ণ বসু মহোদয়।

জাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে”।

আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাঁহার উপসংহার আমার উদ্বোধনস্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা মরি নাই। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। যাহা সত্য, সত্য-প্রতিষ্ঠ, তাহার মরণ নাই। আশা হয় আমাদের ধর্ম্মকেন্দ্রক জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিলে সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—“আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাহিরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটী জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।” আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি তাহা ধর্ম্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরাগাঙ্গে আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস। আশা হয় পোড়া ক্ষেত আবার অঙ্কুরিত হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া আজ দু'চার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, যাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যাহা এখনও ধোঁয়াইতেছে, যতদিন ধর্ম্মাধিকার ও রাষ্ট্রধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিবে ততদিন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্ত্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগুণ জ্বলিয়াছিল তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুকরা মাত্র। League of Nationsই বল, Parliament of menই বল, আর Federation of the worldই বল—যেভাবেই তাহার উল্লেখ করনা কেন, সেই League, Federation, Parliament এর ধর্ম্ম ভিত্তি না হইলে নামেমাত্রই থাকিবে। সে নামে মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐহিক প্রতিপত্তির উপর নহে। ঐহিক প্রতিপত্তির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্ম্মী হও, কিন্তু কর্ম্মের শেষে “ব্রহ্মার্পণমস্তু” বলিয়া কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই। কর্ম্মী কর্ম্মবল চায়। তুমি যতই সেই শক্তি উপার্জ্জন কর ততই তাহা অসংযত হইয়া পড়ে, তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তিসাধনা আসুরিক।

নিটশের (Nietzsche) অ্যান্টিক্রাইষ্ট গ্রন্থে (Anti-Christ) পড়িতে পাই—

“শুভ কিসে? ক্ষমতা প্রসারে। ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয় তাহাতে। মানুষের শক্তি প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা প্রসারের অনুভূতিতে। বাধা বিঘ্নের অতিক্রমে। ক্ষমতা অর্জ্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে। সর্ব্বস্ব বিনিময়ে শান্তিলাভে নহে, সংগ্রামে। কর্ম্মবলে, ধর্ম্মবলে নহে।” *

জার্ম্মানীতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি?

ম্যাটসিনি তাঁহার “মানবধর্ম্মে” (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, ‘যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না’। ঐহিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য,তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুকে পা পড়িতেছে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দলাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে “ভাই, ভাই”, কিন্তু কার্য্যে বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাটসিনি বলেন যে ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বিরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য এক হওয়া,—একীভূত হওয়া চাই, সেই লক্ষ্য ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সেই অধিকার রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন

* “What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contendedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but capacity.”

বা অন্য জাতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—যতদিন তাহাকে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না পারে। সমাজ কিংবা জাতি সংস্করণে ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি ফরাসী দেশের Lamennais-এর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'অধিকারলিপ্সা ও কর্ত্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ'। প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরোধের অবসান হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পার না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন শোণিত-সিক্ত। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? যত দিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি জগতে থাকিবে, ততদিন সেই অধিকারের প্রসার চলিতে থাকিবে। নির্জ্জীব জাতি দলিত হইবে। বলবানের কথা,—'আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে পড়িবে তাহাকে দমন করিব, যাহার সহিত বিরোধ তাহাকে উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। বাধা বিঘ্ন সহ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই'।

এই আসুরিক ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী দানব-রাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ধর্ম্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্ম্মরাজ্যের সংগ্রাম বাধে, তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে মহাসমর হইয়া গেল তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া আসুরিক বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই ধর্ম্মভাবের উত্তেজনায়। আমেরিকার নিজের সুবিধা কিংবা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না। Crusade এর সময় যেমন God wills it! God wills it! বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের আদেশপালনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর তাহারা একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্ম্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেবদানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে রিপু দমন হয় না। যে শক্তিসাধনায় মুক্তি লাভ হয়, তাহা ঐশী শক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মোক্ষ লাভ হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধ্বংসের কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। প্রাপ্তিতে ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয়দিনের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই "আমিত্ব" পরিত্যাগ আবশ্যক। সব জগতের যাহা, তাহা অনন্তের; হৃদয়ের সেই সর্ব্বব্যাপক ভাব ধর্ম্মেই অর্জ্জনীয়। কর্ম্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্র আসুরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

ম্যাটসিনি বলেন—"যদি মানব-মনের অধীশ্বর-রূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোন পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার মাপদণ্ড কোথায় থাকে? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে কাহার বলে, কিসের বলে প্রতিবাদ করিব? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া জনসাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিতে, আপনাকে 'বলি দিতে' আহ্বান করিব? যত দিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধি-প্রসূত মতামতের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, ততদিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে পাইতে পারিব না।" *

* "If there be not a Supreme mind reigning over all human minds, who can save us from the tyranny of our fellowmen, whenever they find themselves stronger than we? If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against

জর্ম্মান জাতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধনা বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব সংগ্রামচেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা Baron von Freytag Loringhoven জর্ম্মানীর এক জন সর্ব্বপ্রধান সৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইট্স্কে (Treitschke) বলেন—

"সুসভ্য বল, বর্ব্বর বল উভয়েরই পশুপ্রবৃত্তি আছে। বাইবেলের এক কথা সত্য—মানবচরিত্রের পাপভাব মানুষ যে সময় সৃষ্টি হয় সেই সময় হইতেই। সভ্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—যতই কেন সভ্য হও না তাহা যাইবার নহে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই পারিবে না"।*

কিন্তু তাঁহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হইলে শক্তিপূজাতে মানবের হিতসাধন হইবে না। আত্মার সংস্কার যদি আবশ্যক হয়, তাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে? জর্ম্মনসম্রাট যিশুখৃষ্টের পদ পাইয়াছেন ভাবিতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রজাবর্গকে বলেন "আমি সমরেশ—আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, পিতা মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগের তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। সে কার্য্য ভাল কি মন্দ তোমাদের বিচারাধীন নহে। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম।"

জর্ম্মনির নেতাগণ জর্ম্মান সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে তাহারা সততই মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।—শিক্ষা দেন, "বল, আমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিব? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিব।" তাঁহাদের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম শাসনতন্ত্র (State and Church) বহু দিন হইতেই ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য, রাজনীতি ধর্ম্মের শাসনের অধীন নহে এই তাঁহাদিগের কথা।

কিন্তু হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবহৃদয়ে আনন্দ দেখা গিয়াছে। ম্যাটসিনি এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—

সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তাহাই ক্রুজেডের ধ্বনি—"ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।" এই ধ্বনিই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে ফ্লরেন্সের শিল্পীগণ মেডিচিদিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রীয় স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিয়া যিশুখৃষ্টকেই জনতন্ত্রের নেতা বলিয়া অভিষেক করেন।*

ইতালিতেই স্যাভনরোলা (Savanorola) ম্যাটসিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা—জ্ঞানময় পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জ্জন কর, এবং তাঁহার নিয়ম, সত্যের নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন ;—

---

oppression and irregularity? How shall we demand of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect suggests to us, we shall have what we have to-day adherence in words not in deeds*.

• The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

* The cry which rang out in all the great revolutions the cry of the crusade "God wills it" ! God wills it !" alone can rouse the inert into action. Remember the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা"

তাঁহাকে "প্রেমস্বরূপম্" বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে,—

'সিদ্ধো ভবতি'
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি' বলিয়াছেন।

ভন মল্টকি (Von Moltke) একটী শান্তি সঙ্ঘতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন :—

"যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ মানব-প্রকৃতির মহত্ব ও উন্নতির উপায়। তাহাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয়. বৈষয়িক ভাব হইতে যুদ্ধ মানুষকে উদ্ধার করে। *

এই কপট আধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মানিতে কি দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা বুঝা যায়। যে যাহাই বলুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ধর্ম্ম-সভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, মানব সম্প্রদায়ের বিবেক নাই—"Human communities have no conscience"; তিনি বলেন—"উদ্দেশ্য সাধনে সব পন্থাই সাধু।" সেখানকার একজন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য। জেনারল বার্ণহার্ডি বলেন, যুদ্ধ স্বভাবদত্ত জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); যুদ্ধ হইতে জীবন লাভ হয়। আজকালকার অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মনির এই ভাব।

কিন্তু সেই জর্ম্মানিতেই ক্যাণ্ট (Kant) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে, "মানুষ স্বাধীন; স্বাবলম্বন তাহার প্রকৃতি। যখন সে কোন স্বার্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তখনই সে ন্যায়ের পথে চলে।" তিনি বলেন যে "ঐশী প্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মানুষ কর্ত্তা. নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে।" * ক্যাণ্ট আরও বলেন "মানবহৃদয়ে ন্যায়জ্ঞানই ব্রহ্মোদ্ভূত। যাহা ন্যায় তাহাই পবিত্র। এই নীতিধর্ম্ম রাজারও প্রণম্য, তাঁহাকে তাহা হাঁটু পাতিয়া লইতে হয়।"† কিন্তু বার্ণহার্ডি বলেন—ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ দেখ এই দুই কথা রাজ্যতন্ত্রে খাটে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম-নীতি নিজের জন্য. তাহা কখনই শাসনতন্ত্রের জন্য হইতে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে। ‡

"Never can the teaching of jesus be quoted in opposition to a universal law of nature." মল্টকি (Moltke) হউন বার্ণহার্ডি হউন কিংবা কাইজার (Kaiser) হউন, কাহারও এ সব কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা দাস জাতি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে,—আমাদের অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তি আছে; আমাদের মনে তাঁহাদিগের

* "War is sacred and instituted by God; it is one of the holy bonds which rule the world; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism."

* "He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate deeps of the Divine nature. Man is then a sovereign entity, bearing within himself the law of his own will."

† "Our sense of right, the Divine element in man, desires it. What-soever is right must be held sacred by man. To this law all statecraft must bow the knee."

‡ Love God above all-things and your neighbour as yourself cannot in any way apply to the relation of one state to another. For this would lead to a collision of duties. Christian morality is personal and social but it can, from its very essence, never become political."

এ কথা কখনও স্থান পাইবে না। আমাদের কথা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতং॥

"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাং"

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, 'পিতানোঽসি' তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন—

"পিতা নো বোধি"।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ (ভক্তিসূত্রম – ৪৮)

ভক্তদিগেরই তিনি সুলভ।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ (ভক্তিসূত্রম – ৭২)।

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির ভেদ নাই।

তন্ময়াঃ (ভক্তিসূত্রম – ৭০)

তাঁহাতে সকলই সম্পূর্ণ;

যত স্তদীয়াঃ (ভক্তিসূত্রম ৭৩)।

সবই তাঁহার;

এই সহজ শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের। যিনি এই শিক্ষা অনুসরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে (ভক্তিসূত্রম – ৮৪)

তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন।

আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা—হিন্দুধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্রজালই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ; আদিসমাজের ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে কুণ্ঠা হয় না—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং বলিতে সাহস হয়, বলিতে গৌরবান্বিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় একীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূত-ভবিষ্যতের এই শেষ শিক্ষা—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী—স্বত্বাধিকার অর্জ্জন কর কিন্তু ধর্ম্মার্জ্জনের অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মে তাহা সমর্পণ না করিলে বিরোধের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর নির্ভর করে; ইহার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যবিন্দু 'ত্বং অস্মাকং তবাস্মি'। এই ধর্ম্ম সনাতন—ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের শিক্ষা নহে।

ম্যাটসিনি বলেন—ভগবান ক্রমান্বয়ে মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান—God manifests himself successively in humanity.

হিন্দুধর্ম্মেও জগদ্ধিতের জন্য

সম্ভবামি যুগে যুগে

ভগবানোক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাটসিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব নিদ্রিত আছে—জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন। *

আমারও আজ সেই কথা। এই কোটি কোটি হিন্দুর মধ্যে এরকম একটি লোকও জন্মে নাই, কিংবা জন্মিবে না, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্ম্মসভা হইতে ধর্ম্মোৎসবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত হয় এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু

উপাসনা।

(মাঘোৎসবে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত)

বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং ভজামো।
বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ॥

আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি; তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

যে বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র উন্নতির পথে পরিচালিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার শুভ অভিপ্রায়সকল সম্পাদন করিতেছে, নবযুগের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজ সেই জগন্মাতা বিশ্বপিতার অবাধ প্রত্যক্ষ উপাসনা এই শুভ ১১ই মাঘের দিনে নবতরভাবে

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories.

প্রচারিত করিয়াছেন বলিয়া এই ১১ই মাঘ আমাদের বড়ই প্রিয়। মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যেমন নবযুগে ভারতের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের অন্তর হইতে একটী কঠিন শৃঙ্খল নামাইয়া দিয়াছেন, তেমনি বিশ্বপিতা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের আত্মার যোগের কথা, তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের পিতাপুত্রের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের কথা নবতরভাবে প্রচার করিয়া, জগতের অন্তরে তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়া, ভারতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতকে আর একটী শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। আমরা নবযুগে ব্রাহ্মসমাজ হইতেই আমাদের পিতামাতা পরমেশ্বরকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং বিনা বাধায়, তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবার অধিকার পাইয়াছি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন এই শুভ ১১ই মাঘ আমাদের এত প্রিয়। ব্রাহ্মসমাজই নবযুগে বিশেষভাবে প্রচার করিলেন যে যন্ত্রের ন্যায় মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরিবর্ত্তে, নির্জ্জনে এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সজনে, সমুদয় হৃদয় দিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে হইবে। ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন আমাদের মহোৎসবের দিন। আজ সম্বৎসর পরে এই মহোৎসবের দিনে সমাগত এই ভক্তজনগণের হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদিগের কণ্ঠের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া ব্রহ্মনামের জয়গান করিয়া ধন্য হইবার আশায় এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

গীতা আমাদিগকে এই একটী মহাসত্য দিয়াছেন যে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনরায় সংস্থাপন করেন এবং শান্তিজল বর্ষণ পূর্ব্বক জগতকে শীতল করেন। পাশ্চাত্য জগতের মহাসমর ইহার যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতেছে। মহাসমরের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগত অন্তরের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পরিবর্ত্তে প্রেয়ের উপাসনাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ক্রমে যখন প্রেয়ের প্রতি আসক্তি নিজের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় করাল বদনে সর্ব্বপ্রকার সাধুভাব গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্যসকল যখন জ্ঞানসাধনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল, তখনই বিধাতার মঙ্গল বিধানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ রণদুন্দুভি বাজাইয়া বলদৃপ্ত বৃষভের ন্যায় পরস্পরের সংহারকল্পে মহাসমরে অবতীর্ণ হইল। ভগবান তখন স্বীয় রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই মহাসমরের প্রখর অগ্নিতে অধর্ম্মের জঞ্জাল ভস্মসাৎ করিয়া দিলেন এবং সুদূর আমেরিকা হইতেও যুক্তরাজ্যের ধর্ম্মাত্মা সভাপতিকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃসংস্থাপনের সূচনা করিয়া দিলেন। ধর্ম্মের জয়ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর শান্তিজল বর্ষিত হইয়া মহাসমরের দাবানল নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইল। এই মহাসমরের কঠিন আঘাতের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আজ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সেখানে সত্যের মর্য্যাদা, ন্যায়ের মর্য্যাদা, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের অনেকটা আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথার্থ আন্তরিক ঈশ্বরোপাসনার প্রতি, সরল সবল সত্যধর্ম্মের প্রতি একটা আন্তরিক টান হইয়াছে দেখা যায়।

এই মহাসমরের আঘাত-তরঙ্গ আমাদেরও দেশে যে লাগিয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত যে সেই আঘাতের যন্ত্রণা আমাদের কাতর শরীরে বহন করিতে হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয়, এই অল্পতর যন্ত্রণার ফলে ভগবৎরক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ এই ভারতের জনসাধারণের মনের গতি সত্যধর্ম্মের প্রতি, প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা এখন বুঝিয়াছি যে আমাদের সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল। দেশবাসী এখন বুঝিয়াছে যে, আমাদের সকল কার্য্যের ভিতরেই ভগবানের মঙ্গল হস্ত উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিলে, সবল করিলে, দেশের প্রকৃত মঙ্গল। ভগবানের নিকট যোড়করে এই প্রার্থনা করি, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে তিনি এই ধর্ম্মভাবে, শ্রদ্ধাপূর্ণ জ্ঞানযোগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ধর্ম্মগ্লানির ফলে এদেশে যেন কুরুক্ষেত্রের অগ্ন্যুৎপাতের পুনরভিনয় না হয়;

শ্রদ্ধার অভাবে এদেশ যেন বিনাশের অভিমুখীন না হয়।

আমাদের নিজের, দেশের, জাতির, সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই ভগবানের মঙ্গল হস্ত জাগ্রত উপলব্ধি করাই তাঁহার প্রকৃত উপাসনা। মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সঙ্গে জ্ঞানযোগে যুক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত আমাদের অনুপম আনন্দের সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, চির-বন্ধুর সম্বন্ধ জানিয়া তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত, সমুদয় বলের সহিত ভালবাসা এবং ভালবাসিয়া তাঁহার প্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উপাসনা। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। প্রকৃত উপাসনার মূল প্রাণ হইল ভগবানকে মঙ্গলময় আশ্রয় জানিয়া তাঁহারই হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ। যাঁহার অন্তহীন স্বরূপের নিকট আমরা আপনাকে হারাইয়া ফেলি, যাঁহার ইঙ্গিতে মাত্র এই বিশ্বচক্রের প্রত্যেক অণুপরমাণু যথানিয়মে আপনাপন কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতিরাজ্যে এবং জগতের ইতিহাসে যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়তই অভিব্যক্ত হইতেছে, ভয় ও বিপদের মাঝে তাঁহাকে বর্ম্ম-দুর্গরূপে, প্রিয়তম সখারূপে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করাই হইল প্রকৃত উপাসনার প্রাণ। আমাদের দেশে এ কথা নূতন নহে। উপনিষদকার ঋষি খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন যে "সেই পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্যান্য যাহা কিছু আছে সকল অপেক্ষা তিনি প্রিয়তম"—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতমং যদয়মাত্মা।" সমস্ত গীতাতেও এই আত্মসমর্পণের কথাই বিশদরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবানের উপাসনায় সত্যসত্য প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে ধন দাও পুত্র দাও, এ ভাবের স্বার্থসাধক প্রার্থনা করিলে চলিবে না। এরূপ প্রার্থনা যে উপাসনার একেবারেই অঙ্গ নহে, সে কথা আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির যে, এরূপ প্রার্থনা উপাসনার অতি নিম্ন স্থান অধিকার করে। কেবল মাত্র ঐহিক সুখের প্রার্থনা পূরণের উপর যে ভালবাসা নির্ভর করে, সে ভালবাসা কাঙ্গাল-দুঃখীর ভালবাসা। এ রকম কাঙ্গালের ভালবাসায় মহাশক্তি বিশ্বপতি ধরা দেন না। এই জন্যই ঋষি বলিয়াছেন যে বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে পাইতে পারে না—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই বিশ্ববিধাতা আমাদের প্রত্যেকের পিতা-মাতা। তাঁহাকে কেবল মুখের ভালবাসা দেখাইলে চলিবে না। শুষ্ক পত্রের মস্তকে বর্ষার সমস্ত বারিধারা পড়িলেও যেমন সে তাহার এক বিন্দুও গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ শুষ্ক হৃদয় শত মুখের ভালবাসা দেখাইলেও ভগবানের প্রেমকরুণা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাঁহাকে আমাদের পিতামাতা জানিয়া ভালবাসিতে হইবে বলিয়াই ভালবাসিতে হইবে। তাঁহাকে সকল হৃদয় দিয়া ভালবাসিলেই আমাদের তাঁহাকে পাইবার পিপাসা নিশ্চয়ই মিটিবে; তাঁহার সঞ্জীবনীশক্তি আমাদিগকে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবে। দ্বৈত-বাদ ঠিক, অথবা অদ্বৈতবাদ ঠিক, তর্কনিপুণ ব্যক্তি-দিগের এই সকল বাক্যজঞ্জাল নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া, যিনি আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতা, সরল পথে তাঁহার চরণতলে গিয়া উপস্থিত হও এবং তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিলাইয়া দাও; তাঁহার সঙ্গে জ্ঞানযোগে প্রেমযোগে একযুক্ত হইয়া যাও। তখন আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে পরমাত্মার উপাসনা কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি। ঋষিরা তাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে সাধক তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন। তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাসিয়া ডাকিলে তিনিও যে তাহার সাড়া দেবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রকার সাড়া পাইয়াই তো যুগযুগান্তর ধরিয়া কত সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ এই উপাসনাতত্ত্বটী নবযুগে সকলের সম্মুখে পরিস্ফুট আকারে ধারণ করিয়াছেন। রাজা রাম-মোহন রায় তাঁহার "ব্রহ্মোপাসনা" পুস্তিকাতে বলিয়াছেন যে "মনুষ্যের ধর্ম্মের দুই মূল—একটী পরমেশ্বরে নিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টী পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও সাধু ব্যবহার"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাধু

ব্যবহারের মূল দৃষ্টি করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের" অন্যতর বীজ ও সনাতন মূল সত্য ব্যক্ত করিলেন যে, "পরব্রহ্মে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা; এবং একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।"

ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন উপাসনার দুইটী অঙ্গ। তাহারা উভয়ে বলিতে গেলে ভগবৎপ্রীতিরূপ একই বস্তুর দুইটী পিঠ। আমার হৃদয়ের দেবতা যিনি, তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন না করিয়া কি থাকিতে পারি? ভাল কাজ তাঁহার প্রিয় বলিয়া করিতে থাকিলে ভাল কাজ করা সহজ ও সরল হয়। আবার তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রীতিও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিবার চেষ্টা না থাকিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি নিশ্চয়ই মুখের কথামাত্রে দাঁড়ায়। একদিকে যেমন প্রীতি ব্যতীত প্রিয়কার্য্যসাধনে ক্রমেই অনিচ্ছা আসা সম্ভব, সেইরূপ অপরদিকে প্রিয়কার্য্যসাধন ত্যাগ করিলে প্রীতির উৎসসকল শুষ্ক ও নির্জ্জীব হইয়া পড়া সম্ভব।

আমরা অনেক সময়ে উপাসনাপদ্ধতিকে উপাসনার সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া বড়ই ভুল করি। উপাসনা ও উপাসনাপদ্ধতি এক নহে বলা বাহুল্য। প্রকৃত উপাসনা এক—পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগযুক্ত হওয়া। উপাসনাপদ্ধতি স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন। বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন দেশে প্রয়োজন অনুসারে উপাসনামন্দিরের আকারের ন্যায় উপাসনাপদ্ধতিও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে অনুপযোগী বিবেচিত হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণ ভগবানের উপাসনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। তাই দেখা যায় যে, নিতান্ত বন্য জাতি হইতে সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে প্রকৃত উপাসনার ভাব অল্পবিস্তর আছেই।

সকল সাধকেরই মত এই যে, "পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত উপায়। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য হইলে তাহা উপাসনার আশু উপকারী হয়।" যে দেশের যে ধারায় জনসাধারণ শৈশব অবধি লালিত পালিত, সেই ধারা অনুযায়ী শব্দগুলি নির্ব্বাচিত হইলেই ধর্ম্মপ্রচার সহজ হয়। আমাদের দেশে বহুযুগের সাধনালব্ধ ঋষিদৃষ্ট ওঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় এবং গায়ত্রী প্রভৃতির ন্যায় উপাসনার সহায়ক শব্দ মন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত থাকিতে আমরা অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্র হইতে উপাসনাপদ্ধতি রচনা বিষয়ে ঋণ লইবার কোনই প্রয়োজন দেখি না। তাই, ইতিপূর্ব্বে যে উপাসনাপদ্ধতি অবলম্বনে বর্ত্তমান উৎসবক্ষেত্রের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইল, সেই পদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র বর্ষের পরমার্থচিন্তার ফলে প্রাপ্ত, সহজ ও সুবোধ্য শব্দবিশিষ্ট এবং স্বল্পাক্ষর ও গভীর ভাবরাশির ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ উপনিষদাদির প্রাচীন ও প্রচলিত মন্ত্র সকল অবলম্বনে সংরচিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি একটী আদর্শ পদ্ধতি মাত্র। অনেক আত্মসন্ধানের পর মানবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের উপর ইহা গঠিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধক যিনি, যিনি প্রকৃতই ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ হইতে চাহেন, উপাসনার গভীরতা যিনি প্রার্থনা করেন, তাঁহার পক্ষে এই পদ্ধতিটী বড়ই সহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সময়, স্থান ও অবস্থা অনুসারে কোন নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে অথবা কোন পদ্ধতির কোন অংশ পরিত্যাগ করিলে বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা মনে করি না।

যে কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হউক না, আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া একটুও গৌরব করিতে চাহিলে আমাদিগকে প্রতিদিন নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মাকে যোগযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা নিজেকে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিলে জাগরণ অবধি শয়ন পর্য্যন্ত আমাদের সকল কার্য্যই ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া নিয়মিতরূপে পরমাত্মাতে আত্মার নীরব সমাধান করিতে হইবে।

নির্জ্জনেও যেমন পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, সেইরূপ সময়ে সময়ে সকলের সহিত, পিতাপুত্রে স্বামীস্ত্রীতে ভাইভগ্নীতে এবং বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়াও তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। নির্জ্জনে

আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা, তাঁহার মহিমা আলোচনা করা এবং তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য আর কি আছে? তেমনি পরিবারস্থ পাঁচজনের সহিত, বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতভাবে উপাসনা, এক কথায়, সজন উপাসনার ন্যায় আনন্দদায়ক কার্য্য আর কি আছে? নির্জ্জন উপাসনার ন্যায় সজন উপাসনাও ব্রহ্মপ্রীতি-সাধনের পক্ষে মহান সহায়। নির্জ্জন উপাসনায় জগন্মাতার পবিত্র মূর্ত্তি দেখা যায়, সজন উপাসনায় বিশ্ববিধাতার সবল ও কর্ম্মোজ্জ্বল মূর্ত্তি উপলব্ধ হয়। বিশ্ববিধাতা জগন্মাতাকে ভালবাসিতে গেলে তাঁহার পবিত্র স্থির অকম্পিত মাতৃমূর্ত্তি যেমন উপলব্ধি করিতে হইবে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য-ঢলঢল, ব্রহ্মচক্রের পরিচালক ও জনগণের অধিনায়ক পিতৃমূর্ত্তিটীও তেমনি উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের এই উৎসবক্ষেত্রে আমাদের হৃদয়-দেবতা তাঁহার অরূপ রূপের যে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার এ মূর্ত্তি নির্জ্জন উপাসনায় দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

নির্জ্জন ও সজন, উভয়বিধ উপাসনাই পরস্পর পরস্পরের সহায়। যিনি নীরবে আত্মসমাধানের স্থলে শ্রদ্ধাভাব উদ্রিক্ত করিয়াছেন, সজন উপাসনাতেও তাঁহার আত্মসমাধান সহজ হয়। আবার, সজন উপাসনা সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মনোযোগ নিশ্চয়ই নির্জ্জন উপাসনার দিকেও ফিরাইয়া দিবে। সজন উপাসনাতে একটী বিশেষ লাভ এই হয় যে, সমাগত ভক্তজন পরস্পরের বলে ধর্ম্মপথে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারেন। সমাগত ভক্তগণ প্রকৃত শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলে নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে যেরূপ আলোক ছুটিয়া যায়, সেইরূপ এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে শ্রদ্ধা তড়িৎবেগে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া যিনি সমস্বরে ভগবানের আরতিতে, স্তবগান প্রভৃতিতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে যোগ দিয়াছেন, তিনিই অনুপম আনন্দের এই তড়িৎপ্রভাব নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

নির্জ্জন উপাসনা ও সজন উপাসনা যেমন পরস্পরের সহায়, তেমনি উভয়ই মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ। পরিবারে সুখ দুঃখের কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে সন্তানেরা যেমন পিতামাতাকে সকল কথা নিবেদন করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে, সেইরূপ দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে বা সমাজের মধ্যে বিপদ ঘটিলে সকলের মিলিতভাবে জগন্মাতার চরণতলে দণ্ডায়মান হওয়া অথবা সম্পদ আসিলে তাঁহার সিংহাসন ঘিরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও প্রকৃতিসিদ্ধ। ইহাই হইল সজন উপাসনার মূলতত্ত্ব। সজন উপাসনা মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াই ইহা কোন না কোন আকারে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অভিব্যক্ত দেখা যায়। বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিয়া উপাসনা প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াই ইহা মানবের একটী স্বাভাবিক পবিত্র অধিকার এবং কর্ত্তব্য। মানবজাতিই যে সামাজিক জীব। রাজনীতিক্ষেত্রে, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে সে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে চাহে। উপাসনা বিষয়েও যে সে সহধর্ম্মী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে।

পূর্ব্বতন ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া নির্জ্জন ও সজন উভয়বিধ উপাসনার সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর প্রধান কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ যেমন প্রতিদিন নির্জ্জনে আত্মসমাধান করিবার উপদেশ দেন, তেমনি সপ্তাহান্তে, মাসান্তে ও বৎসরান্তে উপাসনা ও ব্রহ্মোৎসব প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সজন উপাসনারও মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে হিমালয়ের প্রবাসে নীরব সাধনে মন দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সজন উপাসনারও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া এই মহানগরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং অগ্নিময় বাক্যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান বিবৃত করিলেন। নির্জ্জন উপাসনায় যে ব্রহ্মতত্ত্ব পাওয়া যায় সজন উপাসনাসূত্রে তাহা জনসমাজে বিতরণ না করিয়া কি থাকা যায়? কেবলমাত্র নির্জ্জন উপাসনা অবলম্বন করিলে, আজ ব্রাহ্মসমাজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে যে অমূল্য ব্রহ্মবাণী সকল প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রচার হইত কি না জানি না।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, হিন্দুশাস্ত্র সজন উপাসনার বিরোধী। আমরা কোন শাস্ত্রে এরূপ কোন কথা দেখি নাই। বরঞ্চ অনুমান হয় যে,

উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋষিরা মিলিতভাবে উপাসনার জন্যই অনুশাসন করিয়া বলিয়াছিলেন—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং। এক সঙ্গে চল, একসঙ্গে বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও। যে স্তোত্রের দ্বারা আমরা আজ এই উৎসবে আত্মাতে পরমাত্মার আসনপ্রতিষ্ঠা করিলাম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র সেই স্তোত্র "ব্রহ্মনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের" নিকট "শুনাইবার ও বুঝাইবার" বিধি প্রদান করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবানের প্রতি আত্মসমাধান করিয়া পরস্পরকে তাঁহার বিষয় বুঝাইবার এবং তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনের যে উপদেশ আছে (গীতা ১০।৯) তাহার ভিতর তো সজন উপাসনারই প্রাণ উপলব্ধি করা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও দেখি যে সজন উপাসনার বিরুদ্ধে কথা উঠিয়াছিল। তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে মৌনী হইয়া থাকা, নির্জ্জনে থাকা ব্রাহ্মের নিত্য ধর্ম্ম নহে; বেদে ও মন্বাদিশাস্ত্রে উপনিষদ্ প্রভৃতির পাঠ করিবার ও উপদেশ দিবার অনুশাসন আছে (কবিতাকরের সহিত বিচার)।

বৃথা তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া আজ এই উৎসবের মাঝে সমাগত এই বন্ধুবান্ধবের মুখশ্রীতে আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া পূজ্যপাদ কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত বলিব—

"সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবা মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।

* * * *

কেবলি তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত রবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে,
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে, সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

অষ্টম প্রকরণ।

বিশ্বের রচনা ও সংহার।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে পরব্রহ্ম হইতে অনেক নামরূপধারী জগতের অচেতন অর্থাৎ নির্জীব বা জড় পদার্থ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিচার শেষ করা গিয়াছে। এক্ষণে বিচার করিব যে, জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষ বক্তব্য কি আছে; তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার কতটা মিল আছে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মূল প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত পৃথিব্যাদি স্থূল পঞ্চমহাভূতের সংযোগ হইলে সজীব প্রাণীর শরীর প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই শরীর সেন্দ্রিয় হইলেও জড় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণা করিবার তত্ত্ব জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং তাহাকে পুরুষ বলা হয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপ্রকরণে বর্ণন করিয়াছি যে, যদিও পুরুষ মূলে অকর্ত্তা, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সজীব সৃষ্টির আরম্ভ হয়; এবং "আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্" এই জ্ঞান হইলে পর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরূপ না হইলে জন্মমরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়। কিন্তু পুরুষ পৃথক্ ও প্রকৃতি পৃথক্ এই জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কিরূপে হয়, তাহার বিচার করা হয় নাই, অতএব তৎসম্বন্ধে এইখানে বেশী বিচার করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া যে মনুষ্য মরে, তাহার আত্মা প্রকৃতিচক্র হইতে একেবারে ছাড়ান পায় না, ইহা সুস্পষ্ট। কারণ ছাড়ান পাইলে, জ্ঞানের কিংবা পাপপুণ্যের কোনই মাতব্বরী থাকে না; চার্ব্বাকের ন্যায় ইহাও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি হইতে ছাড়ান পায় বা মোক্ষ লাভ করে। ভাল; যদি বলা যায় যে, মরিবার পর শুধু আত্মা অর্থাৎ পুরুষ অবশিষ্ট থাকিয়া আপনা হইতেই নব নব জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুরুষ অকর্ত্তা ও উদাসীন এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির—এই মূলভূত সিদ্ধান্তের বাধা আসে। তাছাড়া যখন আমি মানিতেছি যে, আত্মা আপনা হইতেই নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হইয়া যাইতেছে; এবং তখন তো এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মমরণের ফের হইতে সে কখনই মুক্তি পাইবে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, যদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন মনুষ্য মরিয়া যায়, তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ অবশ্যই থাকা চাই। মৃত্যুর পর স্থূল দেহের নাশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে স্থূল মহাভূতাত্মক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু একথা বলা যায় না যে, প্রকৃতি কেবল পঞ্চ মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি

হইতে সমস্ত তেইশ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়; এবং স্থূল পঞ্চমহাভূতও এই তেইশ তত্ত্বের শেষের পাঁচ। এই শেষের পাঁচ তত্ত্বকে (পঞ্চ মহাভূত) মোট তেইশ তত্ত্ব হইতে বাদ দিলে ১৮ তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে। অতএব, এক্ষণে কাজে কাজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না হইয়া যে মরে সেই পুরুষ পঞ্চ মহাভূতাত্মক স্থূল শরীর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ তত্ত্ব হইতে মুক্ত হইলেও প্রকৃতির অন্য ১৮ তত্ত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ এই প্রকার মরণের দ্বারা কখনই ছিন্ন হয় না। মহান্ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটী আঠারো তত্ত্ব (গ্রন্থের ১৭৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ব্রহ্মাণ্ডের বংশ বৃক্ষ দেখ)। এ সমস্তই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। তাই, এই তত্ত্বগুলির সহিত পুরুষের সংযোগ বজায় রাখিয়া যে দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাকে স্থূল শরীরের বিরুদ্ধ সূক্ষ্ম কিংবা লিঙ্গশরীর বলা হয় (সাং. কা. ৪০)। যখন কোন প্রাণী জ্ঞান না পাইয়া মরে, তখন মৃত্যুর সময় তাহার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উক্ত ১৮ তত্ত্বের নির্ম্মিত এই লিঙ্গশরীরও স্থূল দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়; এবং জ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পুরুষ নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে কাহার কাহার এই সন্দেহ হয় যে, মনুষ্য মরিবার পর প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও নষ্ট হওয়া প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই ১৩ তত্ত্বের সমাবেশ করিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই ১৩ তত্ত্বের সহিত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের সমাবেশ কেন স্বীকার করিব? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, শুধু বুদ্ধি, শুধু অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই তের তত্ত্ব—প্রকৃতির শুধু গুণ; এবং ছায়ার যেরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় আবশ্যক হয় কিংবা চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল কাগজ প্রভৃতির আশ্রয় দরকার হয়, সেইরূপ এই গুণাত্মক ১৩ তত্ত্বেরও একত্র থাকিবার জন্য কোন-না-কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই। এখন আত্মা (পুরুষ) স্বয়ং নির্গুণ ও অকর্ত্তা, সুতরাং তাহা কোন গুণেরই আশ্রয় হইতে পারে না। মনুষ্য জীবিত থাকিতে, তাহার দেহের স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ১৩ তত্ত্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু মরণান্তর অর্থাৎ স্থূল দেহের নাশানন্তর স্থূল পঞ্চ মহাভূতের এই আশ্রয় বিনষ্ট হয়। তখন, এই গুণাত্মক ১৩ তত্ত্বের অন্য কোন দ্রব্যকে আশ্রয় পাওয়া চাই। যদি মূল প্রকৃতিকেই আশ্রয় বলি, তবে উহা অব্যক্ত ও অবিকৃত অবস্থার অর্থাৎ অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত উহা একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গশরীরস্থ অহঙ্কার বুদ্ধি আদি গুণের আধার হইতে পারে না। তাই মূল প্রকৃতিরই দ্রব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থূল পঞ্চমহাভূতের বদলে তাহাদের মূলভূত পাঁচ সূক্ষ্ম তন্মাত্র দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে লিঙ্গশরীরের মধ্যে সমাবেশ করিতে হয় (সাং. কা. ৪১)। কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থকার লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রনির্ম্মিত তৃতীয় এক শরীর কল্পনা করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, এই তৃতীয় শরীর লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। কিন্তু সাংখ্যকারিকার ৪১ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নহে, টীকাকারেরা ভ্রান্তিবশত তৃতীয় শরীর কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয়। আমার মতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই বুঝানো যে, বুদ্ধি-আদি ১৩ তত্ত্বের সহিত লিঙ্গশরীরে পঞ্চতন্মাত্রেরও সমাবেশ কেন করা হইয়াছে। * একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সূক্ষ্ম আঠারো তত্ত্বের সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীর ও উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গশরীর এই দুয়ের মধ্যে বেশী পার্থক্য নাই। বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত আছে যে, জোঁক (জলৌকা) যেরূপ একগাছা ঘাসের এক ডগায় পৌঁছিলে অন্য একগাছা ঘাসের উপর (সামনের পা দিয়া) শরীরের সামনের ভাগ রাখিয়া, পূর্ব্ব ঘাসের উপর অবস্থিত দেহের পশ্চাদ্‌ভাগটা টানিয়া লয়, সেইরূপ আত্মা এক শরীর ছাড়িয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে (বৃ ৪, ৪. ৩)। কিন্তু কেবল এই দৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মাই অন্য শরীরে যায়, এবং তাহাও এক শরীর ছাড়িবামাত্রই যায়, এই দুই অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ, বৃহদারণ্যকোপনিষদেই পরে (বৃ. ৪. ৪. ৫) বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ (সূক্ষ্ম) ভূত, মন, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মও শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়; আর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, আপন আপন কর্ম্ম-অনুসারে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই লোকে কিছুকাল বাস করে। সেইরূপ, ছান্দোগ্যোপনিষদেও অপ (জল) মূলতত্ত্বের সঙ্গে জীবের যে গতি বর্ণিত হইয়াছে (ছাং. ৫. ৩. ৩; ৫. ৯. ১), এবং বেদান্তসূত্রে তাহার যে অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে (বেসূ. ৩. ১. ১-৭), তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, লিঙ্গশরীরে

* আমাদেরই মতানুযায়ী ভট্টকুমারিলও এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থের এক শ্লোক হইতে (আত্মবাদ, শ্লো. ৬২) দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শ্লোকটি এই—

অন্তরাভবদেহো হি নেষ্যতে বিন্ধ্যবাসিনা।
তদস্তিত্বে প্রমাণং হি ন কিঞ্চিদবগম্যতে। ৬২।

"অন্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ও স্থূল শরীর এই দুয়ের মধ্যস্থিত দেহ কিংবা শরীর বিন্ধ্যবাসীর সম্মত নহে। এই প্রকারের মধ্যবর্ত্তী দেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" ঈশ্বরকৃষ্ণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে বিন্ধ্যবাসী বলা হইয়াছে। অন্তরাভব শরীরের 'গন্ধর্ব্ব' এই নামও আছে। অমরকোষ ৩. ৩. ১৩২ এবং তাহার উপর কৃষ্ণাজী গোবিন্দ ওক প্রকাশিত ক্ষীরস্বামীর টীকা ও মূল গ্রন্থের প্রস্তাবনা পৃ. ৮ দেখ।

জল, তেজ ও অন্ন এই তিন মূল তত্ত্বেরই সমাবেশ ছান্দোগ্যোপনিষদেরও অভিপ্রেত। সার-কথা, মহদাদি আঠারো সূক্ষ্ম তত্ত্বের নির্ম্মিত সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরেই প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম সামিল করিলেই বেদান্তীয় লিঙ্গশরীর হয় দেখা যাইতেছে। কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এগারো ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যেই প্রাণের এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই ধর্ম্মাধর্ম্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত ভেদ কেবল শাব্দিক,—লিঙ্গশরীরের গঠনসম্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে বস্তুত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে। এইজন্য মৈত্র্যুপনিষদে (মৈ. ৬. ১০) "মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তং" এই সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরের লক্ষণ "মহদাদ্যবিশেষান্তং" এইরূপ পর্য্যায়ের দ্বারা যেমনটি তেমনি ঠিক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।* ভগবদ্গীতাতে "মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" (গী. ১৫. ৭) অর্থাৎ মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়াই সূক্ষ্ম শরীর হয়, এইরূপ বলিয়া পরে বলা হইয়াছে—"বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" (১৫. ৮) অর্থাৎ বায়ু যেরূপ ফুল হইতে সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীব স্থূল শরীর ছাড়িবার সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়া যায়। তথাপি গীতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই গৃহীত হওয়ায় বলা যায় যে, 'মনের সহিত ছয় ইন্দ্রিয়' এই শব্দগুলির মধ্যেই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিপ্রেত। মনুস্মৃতিতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মনুষ্য মরিবার পর এই জন্মের পাপপুণ্য-ফল ভোগ করিবার জন্য পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয় (মনু. ১২. ১৬, ১৭)। "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে এই শরীর যে সূক্ষ্ম, তাহাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু তাহার আকার কত বড় তাহা বুঝা যায় না। মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে (মভা. বন. ২৯৭. ১৬) সত্যবানের (স্থূল)শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক পুরুষকে যম বাহির করিল,—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ" এই যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এই দৃষ্টান্তেরই জন্য লিঙ্গশরীর অঙ্গুষ্ঠ-আকারবিশিষ্ট মানা হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়।

লিঙ্গশরীর আমাদের চোখে না দেখা গেলেও তাহার অস্তিত্ব কোন্ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং সেই শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার বিচার করা হইল। কিন্তু, প্রকৃতি ও পাঁচ স্থূল মহাভূতের অতিরিক্ত আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় হইতে লিঙ্গশরীর নির্ম্মিত হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, লিঙ্গশরীর যেখানে যেখানে থাকিবে, সেখানে সেখানে এই আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় নিজ নিজ গুণধর্ম্মানুসারে মাতাপিতার স্থূল দেহ হইতে এবং পরে স্থূল জগতের অন্ন হইতে হস্তপদাদি স্থূল অবয়ব বা স্থূল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করিবে অথবা তাহাদের পোষণ করিবে। কিন্তু এখন বলা আবশ্যক যে, আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয়ে উৎপন্ন লিঙ্গশরীর পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেহ কেন উৎপন্ন করে। সজীব জগতের সচেতন তত্ত্বকে সাংখ্যবাদী 'পুরুষ' বলেন; এবং সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক পুরুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অকর্ত্তা হওয়া প্রযুক্ত পশুপক্ষী-আদি প্রাণীদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেহ উৎপন্ন করিবার কর্ত্তৃত্ব পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদান্তশাস্ত্রে পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের পরিণাম হইতে এই ভেদ উৎপন্ন হয়, উক্ত হইয়াছে। এই কর্ম্মবিপাকের বিচার পরে করা যাইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মকে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ত্ব মানিতে পারা যায় না; এবং পুরুষ যখন উদাসীন, তখন বলিতেই হয় যে, কর্ম্ম প্রকৃতির সত্ত্বরজতমগুণেরই বিকার। লিঙ্গশরীরে যে আঠারো তত্ত্বের সমুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রধান। কারণ, বুদ্ধি হইতেই পরে অহঙ্কারাদি সতেরো তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অতএব বেদান্ত যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের ন্যূনাধিক পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, ধর্ম্ম বা বিকার বলা হয়। বুদ্ধির এই ধর্ম্মের সংজ্ঞা—'ভাব'। সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়ের তারতম্যে এই ভাব অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। ফুলেতে যেরূপ গন্ধ ও কাপড়ে যেরূপ রং, সেইরূপ লিঙ্গশরীরে এই ভাব লাগিয়া থাকে (সাং কা. ৪০)। এই ভাব অনুসারে কিংবা বেদান্তের পরিভাষায় কর্ম্মানুসারে লিঙ্গশরীর নব নব জন্ম গ্রহণ করে; এবং জন্মগ্রহণ করিবার সময় পিতামাতার শরীর হইতে যে দ্রব্য লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া লয় সেই সকল দ্রব্যেতেও অন্যভাব আসিয়া থাকে। 'দেবযোনি, মনুষ্যযোনি, পশু-

---

* দ্বাত্রিংশৎ উপনিষদের পুনা আনন্দাশ্রম-সংস্করণের মৈত্র্যুপনিষদের উক্ত মন্ত্রের পাঠ "মহদাদ্যং বিশেষান্তং" এইরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই টীকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। এই পাঠ গ্রহণ করিলে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আরম্ভের মহৎ-তত্ত্বের সমাবেশ করিয়া বিশেষান্তং এই পদের দ্বারা সূচিত বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ছাড়িয়া দিতে হয়। অথবা এই অর্থ করা আবশ্যক হয় যে, মহদাদ্যং ইহার মধ্যে 'মহৎ'কে ধরিতে হইবে এবং 'বিশেষান্তং' ইহার মধ্যে বিশেষকে ছাড়িতে হইবে—কিন্তু যেখানে আদ্যন্ত বলা হইয়াছে সেখানে দুই-ই ধরা কিংবা ছাড়া যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়সন্ বলিয়াছেন যে, মহদাদ্যং এই পদের শেষের অনুস্বার ছাঁটিয়া ফেলিয়া "মহদাদ্যবিশেষান্তম্" (মহদাদি+অবিশেষান্তম্) এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ করিয়া অবিশেষ পদ ধরিলে, মহৎ ও অবিশেষ অর্থাৎ আদি ও অন্ত এই দুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এবং লিঙ্গশরীরে উভয়েরই সমাবেশ করা যাইবে। এই পাঠের ইহাই বিশেষ গুণ। কিন্তু যে-কোন পাঠই গ্রহণ কর না কেন, অর্থের ভেদ হয় না, ইহা মনে রাখা আবশ্যক।

যোনি ও বৃক্ষযোনি' এই সকল ভেদ এই ভাবের সমুচ্চয়েরই পরিণাম (সাং.কা.৪৩—৫৫)। এই সমস্ত ভাবের মধ্যে সাত্ত্বিকগুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মনুষ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই প্রযুক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ বুঝিতে আরম্ভ করে, তখন মনুষ্য আপনার মূলস্বরূপ কৈবল্যপদে উপনীত হয়; এবং তখন এই লিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি হইয়া তাহার দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এই প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান না হইয়া শুধু সাত্ত্বিকগুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিঙ্গশরীর দেবযোনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে; রজোগুণের প্রাবল্য হইলে মনুষ্যযোনিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে তাহাকে তির্য্যক যোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গী· ১৪. ১৮)। "গুণা গুণেষু জায়ন্তে" এই তত্ত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবযোনিতে জন্ম হইলে পর রেতবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদ্‌বুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন ভিন্ন স্থূল ইন্দ্রিয়সকল কিরূপে গঠিত হয় (সাং·কা· ৪৩; মভা. শাং. ৩২০)। সাংখ্য ও গর্ভোপনিষদের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সাংখ্যশাস্ত্রে 'ভাব' শব্দের যে পারিভাষিক অর্থ বলা হইয়াছে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে বিবক্ষিত না হইলেও ভগবদ্‌গীতাতে (গী. ১০. ৪, ৫; ৭. ১২), "বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ" ইত্যাদি গুণের (পরবর্তী শ্লোকে) যে 'ভাব' নাম দেওয়া হইয়াছে, অনুমান হয়, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রের পরিভাষা মনে করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকারে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদান্ত অনুসারে মূল সৎ-রূপী পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির সমস্ত সজীব ও নির্জীব ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে; এবং যখন সৃষ্টির সংহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন উপরে কথিত জগৎ-উৎপত্তির গুণ-পরিণামক্রমের বিপরীত ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতিতে কিংবা মূল ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্রেরই মান্য (বেসূ.২. ৩. ১৪; মভা. শা ২৩২)। উদাহরণ যথা, পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে পৃথিবীর লয় জলেতে, জলের অগ্নিতে, অগ্নির বায়ুতে, বায়ুর আকাশে, আকাশের তন্মাত্রে, তন্মাত্রের অহংকারে, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, এবং বুদ্ধি বা মহানের প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং বেদান্তানুসারে প্রকৃতি মূল ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইলে পর উহার লয় ও সংহার পর্য্যন্ত কতকাল অতীত হয়, ইহা সাংখ্যকারিকায় কোথাও কথিত হয় নাই। তথাপি মনে হয় যে, মনুসংহিতা (১, ৬৬–৭৩), ভগবদ্‌গীতা (৮·১৭), এবং মহাভারতে (শাং· ২৩১) বর্ণিত কালগণনা সাংখ্যদিগেরও মান্য। আমাদের উত্তরায়ণই দেবতাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই দেবতাদের রাত্রি। কারণ, শুধু স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নহে পরন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের সংহিতাদিতেও বর্ণনা আছে (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১. ১৩; ১২. ৩৫, ৬৭) যে, দেবতা মেরুপর্ব্বতের উপর অর্থাৎ উত্তর ধ্রুবস্থানে থাকেন। অর্থাৎ দুই অয়নের আমাদের এক বৎসরই দেবতাদের এক দিবারাত্রি এবং আমাদের ৩৬০ বৎসরই দেবতাদের ৩৬০ দিবারাত্রি বা এক বৎসর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ আমাদের চারি যুগ। এই চারিযুগের কালগণনা এইরূপ—সত্যযুগের চারি হাজার বৎসর, ত্রেতাযুগের তিন হাজার, দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক হাজার বৎসর। কিন্তু এক যুগ শেষ হইতেই অন্য যুগ একেবারে আরম্ভ না হইয়া মধ্যে দুয়ের গোলযোগ অর্থাৎ সন্ধিকালের কএক বৎসর চলিয়া যায়। এই প্রকারে সত্যযুগের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে চারিশত বর্ষের, ত্রেতাযুগের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে তিনশত বর্ষের, দ্বাপরের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে দুই শত বর্ষের, এবং কলিযুগের পূর্ব্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত বর্ষের সন্ধিকাল মিলিয়া মোট চারিযুগের আদ্যন্তের সন্ধিকাল দুই হাজার বৎসর হয়। এই দুই হাজার বৎসর এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের পূর্ব্ববর্ণিত সংখ্যামতে চারি যুগের দশ হাজার বৎসর মিলিয়া মোট বারো হাজার বৎসর হয়। এই বারো হাজার বৎসর মনুষ্যদিগের না দেবতাদিগের? মনুষ্যের বলিয়া ধরিলে, কলিযুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে; কাজেই বলিতে হয় যে, হাজার মানব-বৎসরের কলিযুগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় তার পরে আগন্তব্য সত্যযুগও শেষ হইয়া এক্ষণে ত্রেতাযুগ আসিয়াছে! এই বিরোধকে ঠেকাইবার জন্য এই বারো হাজার বৎসর দেবতাদের, এইরূপ পুরাণে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর, মনুষ্যদের ৩৬০ × ১২০০০ = ৪৩, ২০, ০০০, তেতাল্লিশ লক্ষ, বিশ হাজার বৎসর হয়। এখনকার পঞ্জিকায় যুগপরিমাণ এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হইয়া থাকে। (দেবতাদের) বারো হাজার বৎসর মিলিয়া মনুষ্যদের এক মহাযুগ বা দেবতাদের এক যুগ হয়। দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর বলা যায় এবং এইরূপ মন্বন্তর চৌদ্দটী। কিন্তু প্রথম মন্বন্তরের আরম্ভে ও শেষে এবং পরে প্রত্যেক মন্বন্তরের শেষে দুই দিকে সত্যযুগের ন্যায় একাদিক্রমে এইরূপ ১৫ সন্ধিকাল হইয়া থাকে। এই পনেরো সন্ধিকাল ও চৌদ্দ মন্বন্তর মিলিয়া দেবতাদের এক হাজার যুগ কিংবা

ব্রহ্মদেবের এক দিন হয় (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১.১৫-২০); এবং মনুস্মৃতিতে ও মহাভারতে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়া ব্রহ্মদেবের এক রাত্রি হয় (মনু. ১. ৬৯-৭৩ ও ৭৯; মভা. শাং ২৩১.১৮-৩১; এবং যাস্কের নিরুক্ত ১৪.৯ দেখ)। এই গণনানুসারে ব্রহ্মদেবের একদিন মনুষ্যের চার অর্ব্বুদ বত্রিশ কোটি বৎসর হয়, এবং ইহারই নাম—কল্প। * ভগবদ্‌গীতাতে (গী. ৮-১৮ ও ৯. ৭ দেখ), স্মৃতিগ্রন্থে এবং মহাভারতেও কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেবের এই দিন কিংবা কল্প আরম্ভ হইলে পর—

> অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
> রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

"অব্যক্ত হইতে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং ব্রহ্মদেবের রাত্রি সুরু হইলে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ আবার অব্যক্তের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়"। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়ের কথা পুরাণ-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রলয়সমূহে সূর্য্যচন্দ্রাদি সমস্ত জগতের নাশ না হওয়ায়, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও সংহারের বিচার করিবার সময় ইহাদিগকে গণনার মধ্যে ধরা হয় না। কল্প—ব্রহ্মদেবের এক দিন কিংবা রাত্রি; এবং এইরূপ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিই তাঁহার এক বৎসর। তাই পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে (বিষ্ণুপুরাণ ১.৩ দেখ) যে, ব্রহ্মদেবের আয়ু তাঁহার একশত বৎসর, তাহার অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫১ বৎসরের প্রথম দিন কিংবা শ্বেতবারাহ নামক কল্প এখন সুরু হইয়াছে; এবং এই কল্পের চৌদ্দ মন্বন্তরের মধ্যে ছয় মন্বন্তর গিয়া সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন চলিতেছে। ১৯৫৬ সম্বতে (১৮২১ শকে) এই কলিযুগের ঠিক ৫০০০ বৎসর অতীত হইয়াছিল। এই অনুসারে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কলিযুগের প্রলয় হইতে ১৮২১ অব্দে (১৯৫৬ সম্বতে) মনুষ্যের চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর বাকী ছিল; আবার বর্ত্তমান মন্বন্তরের শেষে কিংবা এখনকার কল্পান্তে যে মহাপ্রলয় হইবে সে ত দূরেই রহিয়া গেল! মানবী চার অব্জ বত্রিশ কোটি বৎসরের ব্রহ্মদেবের যে দিন এখন চলিতেছে, সাত মন্বন্তরেও তাহার পূর্ণ মধ্যাহ্নও এখনো হইল না অর্থাৎ সাত মন্বন্তরও এখনও অতীত হয় নাই!

জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা বেদান্তের উপর,—এবং পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিলে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞানের উপর করা হইয়াছে, সেই কারণে জগৎ-উৎপত্তিক্রমের এই পরম্পরাই আমাদের শাস্ত্রকার সর্ব্বদা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, এবং ভগবদ্‌গীতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকরণের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির উৎপত্তিক্রমের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা যায়; যেমন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের কোন কোন স্থানে কথিত আছে যে, প্রথমে ব্রহ্মদেব বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হয়েন কিংবা জল প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পরমেশ্বরের বীজ হইতে এক সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিচার গৌণ ও উপলক্ষণাত্মক বুঝিয়া তাহাদের উৎপত্তি বুঝাইবার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন ইহাই বলা যায় যে, হিরণ্যগর্ভ কিংবা ব্রহ্মদেব অর্থে প্রকৃতিই বুঝায়। ভগবদ্‌গীতাতেও "মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম" (গী. ১৪. ৩) এইরূপ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার বীজ হইতে এই প্রকৃতিতে ত্রিগুণের দ্বারা অনেক মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়। অন্যত্র এইরূপ বর্ণন আছে যে, ব্রহ্মদেব হইতে আরম্ভে দক্ষাদি সাত মানসপুত্র বা সাত মনু উৎপন্ন হইয়া তাঁহারা পরে চরাচর জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন (মভা, আ. ৬৫-৬৭; মভা. শাং. ২০৩; মনু. ১. ৩৪-৬৩); এবং ইহার উল্লেখ একবার গীতাতেও করা হইয়াছে (গী. ১০. ৬)। কিন্তু বেদান্তগ্রন্থ ইহাই প্রতিপাদন করে যে, এই সকল বিভিন্ন বর্ণনাতে ব্রহ্মদেবকেই প্রকৃতি ধরিলে উপরি-প্রদত্ত তাত্ত্বিক জগদুৎপত্তিক্রমের সহিত মিল হইয়া যায়; এবং এ নিয়ম অন্যত্রও উপযোগী হইতে পারে। উদাহরণ যথা, শৈব ও পাশুপতদর্শনে শিবকে নিমিত্ত-কারণ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে কার্য্য-কারণাদি পাঁচ পদার্থ উৎপন্ন হয়, এইরূপ মত দেখা যায়, এবং নারায়ণীয় ভাগবত ধর্ম্মে বাসুদেবকে প্রধান মানিয়া বাসুদেব হইতে প্রথমে সংকর্ষণ (জীব), সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) উৎপন্ন হয় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রানুসারে জীব প্রত্যেকবারেই নব নব উৎপন্ন হয় না, উহা নিত্য ও সনাতন পরমেশ্বরের, নিত্য—অতএব অনাদি—অংশ; তাই বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (বেসূ, ২. ২. ৪২-৪৫) ভাগবতধর্ম্মোক্ত জীবের উৎপত্তিবিষয়ক উপরি-উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া ঐ মত বেদবিরুদ্ধ অতএব ত্যাজ্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে; এবং গীতাতে বেদান্তসূত্রের এই সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে (গী. ১৩. ৪; ১৫. ৭)। সেইরূপ আবার, সাংখ্যবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ

* জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভিত্তিতে যুগাদির গণনার বিচার স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বীয় 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে ঠিক-ঠিকভাবে করিয়াছেন তাহা দেখ পৃ, ১০৩-১০৫; ১১৩ ইত্যাদি।

এই উভয়কে স্বতন্ত্র তত্ত্ব মানিয়া থাকেন; কিন্তু এই দ্বৈত অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব নিত্য ও নির্গুণ এক পরমাত্মারই বিভূতি, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাতেও এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইয়াছে (গী. ৯. ১০)। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার পরবর্ত্তী প্রকরণে করা যাইবে। এখানে ইহাই বক্তব্য যে, ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মে বর্ণিত বাসুদেবভক্তির ও প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মের তত্ত্ব ভগবদ্‌গীতার মান্য হইলেও গীতাতে ভাগবতধর্ম্মের এই কল্পনা স্বীকৃত হয় নাই যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) প্রাদুর্ভূত হয়। সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ইহাদের নামও গীতার কোথাও আসে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত ভাগবতধর্ম্ম এবং গীতার ভাগবত ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে জানিয়া বুঝিয়া করা হইয়াছে; কারণ "ভগবদ্গীতাতে ভাগবতধর্ম্ম বলা হইয়াছে" এইটুকু হইতে কেহ ইহা না বুঝেন যে জগতের উৎপত্তি-ক্রমসম্বন্ধে কিংবা জীব-পরমেশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে ভাগবতাদি ভক্তি-সম্প্রদায়ের মতও গীতায় মান্য। এক্ষণে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়েরই বাহিরে ব্যক্তাব্যক্ত ও ক্ষরাক্ষর জগতের মূলের অন্য কোন তত্ত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইহারই নাম অধ্যাত্ম কিংবা বেদান্ত। ইতি ৮ম প্রকরণ সমাপ্ত।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতাযাত্রা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

মাদ্রাজ-অঞ্চলে একমাস থাকিয়া দশহরার সময় আমরা মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং ৮।১০ দিন পুণায় থাকিয়া তাহার পর কলিকাতাযাত্রা করিলাম। রাস্তায় ভুসাওয়ল, জবলপুর প্রভৃতি স্থানে আড্ডা করা গেল। জবলপুরে এক দিন বেশী থাকিয়া নর্ম্মদায় প্রসিদ্ধ ধবল পাহাড় দেখিতে গেলাম। টাঙ্গা হইতে নামিয়া, নৌকা করিয়া ধবল-পাহাড় ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অতীব রমণীয় দৃশ্য দেখিলাম। ঐ দৃশ্য দেখিয়া ঈশ্বরের অনন্ত অপার সৃষ্টিসম্বন্ধে অন্তঃকরণ বিস্ময়ে চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া আমরা প্রয়াগে আসিলাম ও দারাগঞ্জে নামিলাম। তাহার পর দিন, দশাশ্বমেধে গিয়া কলসি ভরিয়া গঙ্গাজল লইলাম; তাহার পর সেখান হইতে আমরা সবাই একটা নৌকায় উঠিলাম এবং ত্রিবেণীসঙ্গমের মাঝখানে বড় বড় কাঠের চৌকোনা তখ্‌তা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার উপর নামিলাম। মস্তকমুণ্ডন করিবেন না, এইরূপ "উনি" স্থির করিলেন। কাছাকাছি আর একটা চৌকা তখ্‌তার উপর এক রমণীর মস্তক মুণ্ডন অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম এবং তার পর দিন কাশীতে আসিলাম। তাহার পর, কলিকাতায় যাইবার ত্বরা থাকায়, কাশীতে আমাদের দুই দিনও থাকা হইল না। কাশীতে পৌঁছিয়া তাহার পর দিন সকালে উঠিয়া ভাগিরথীতে স্নান করিলাম এবং বিশ্বেশ্বর, মঙ্গলাগৌরী, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। দুপর বেলায় নানা রকমের বাসন ও কাপড় খরিদ করিয়া সন্ধ্যাকালে এক ভাড়াটে নৌকা করিয়া, বরুণা পর্য্যন্ত আশপাশের সমস্ত ঘাট ও দেবালয় দেখিয়া, রাত্রি ৯।১০ টার সময় বাড়ী আসিলাম। রাত্রে জ্যোৎস্না ও চারিদিকের দৃশ্য অতীব রমণীয় হওয়ায়, এবং বিশেষত কাশীক্ষেত্রসম্বন্ধে পবিত্র ধারণা ও পূজ্যবুদ্ধি অন্তরে অনুভূত হওয়ায় সেই সময়টা ও সেই দৃশ্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। তার পর দিন আমরা কলিকাতায় গেলাম, সেখানে ধর্ম্মতলায় একটা বাঙ্গলা ভাড়া করিয়া রহিলাম এই বাঙ্গলাটা খুব বড় ছিল সত্য; কিন্তু অত্যন্ত পুরাতন। বাঙ্গলার হাতার মধ্যে কুয়া, বাগান, গাছপালা প্রভৃতি কিছুই না থাকায়, একেবারে উজাড় ও পোড়ো দেখাইতেছিল। এই জন্য এই বাঙ্গলায় মনের সুখ ও আনন্দ হওয়া দূরে থাক্ বরং মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; এবং সেই দিনটা বড়ই খারাপ গিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে উনি বাড়ী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ কি করিলে"? আমি একটু বিরক্তির ভাবে বলিলাম—"কিছুই করি নি, কি আর করব? প্রথমত নূতন জায়গা, কারও সঙ্গে চেনাপরিচয় নেই। যে বাঙ্গলা নেওয়া হয়েছে তাও যদি সুন্দর হত—তাও না। গাছ, ফুল, লতা এই সব দেখেও তবু মানুষের মন খুসী হয়; কিন্তু এখানে তা কিছুই নেই। বরং যে দিকে তাকানো যায় সেই দিকেই সব ভোঁতা করচে ও উজাড়। বাড়ীতেও কিছু করতে মন যায় না। ভাল, বাঙ্গলার ভাড়াটা কি কম? তাও না; ভাড়া খুব বেশী। এ রকম বাঙ্গলা নিয়ে কি হবে? বরং এর চেয়ে একটা সুন্দর বাঙ্গালা নেওয়া যাক্। খর্চ্চা যতদূর হবার তাত হয়েছে—কিন্তু আমরা যেন এখানে মাগুনা আছি এই রকম মনে হচ্চে" ইত্যাদি শুনাইবার মতো অনেক কথা বলিলাম। বাড়ীটা পুরাতন, মাটীর নীচের তলায় দিনের বেলাতেও শেয়াল ডাকে। যারা বাহিরে যায় তাদের কোন কষ্ট

নেই।" কিন্তু বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের সময় যেন কাটে না; মন উদাস হইয়া যায়। এই সমস্ত কথা শুনিয়া 'উনি' শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"বাগ-বাগিচা ও গাছপালাই কি শুধু মানুষের মনোরঞ্জন করে? বই পড়ে' যে ব্যক্তি সময় কাটাতে পারে তার এরকম খুঁৎখুঁৎ করা উচিত নয়। পুস্তকপাঠে মনে যেমন আনন্দ ও সন্তোষ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এক রকমের বই পড়ে বিরক্তি বোধ হলে, অন্য কোন বই পড়তে পার, কবিতা পড়তে পার, কিংবা পুঁথী পড়তে পার। বেশী অধ্যয়নে মন ক্লান্ত হলে, ঈশ্বরনির্ম্মিত উদ্যান কানন দেখ্বার জন্য যেতে পার; এই সব উপায় কি তোমার নাই? গাড়ী যুতে কোথাও বেড়িয়ে আস্তে পার; এই-সবে মনের বিশ্রাম হয়। মানুষের হাতে গড়া বাগান প্রভৃতিতে যদি মনের আনন্দ ও আমোদ হয় তা-হলে সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের আলোচনা করলে সামঞ্জস্য, গভীরতা ও দয়াব্যঞ্জকতার হিসাবে সেই সব সৃষ্টিসৌন্দর্য্য প্রাণীমাত্রেরই কতটা সুখের সাধন ও উপভোগের জিনিস হয়ে রয়েছে। একথা মনে করলে মন স্তম্ভিত ও অন্তঃকরণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন তোমার মন পিতৃশোকে উদাস হয়ে আছে, তাই কিছুতেই তোমার আমোদ হয় না। এখন তোমার মনকে কিছু কাজ দেওয়া দরকার। কাল তুমি এই উজাড় জায়গায় শোভা মনে আনবার চেষ্টা কর।" এই কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। আমি বলিলাম, "শুধু মনে আনলেই জায়গার শোভা কি-করে দেখা হবে?" এই কথায় উনি বলিলেন "আমি কি বলচি আগে তা' শুনে নেও;—কাল সকালে চার জন মজুর লাগিয়ে, তোমার যে রকম বাগান করতে হবে, সেই রকম জায়গা দাগ কেটে চিহ্নিত করে দিয়ে, তাদের দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে নেবে ও বুনানির উপযুক্ত করে নিয়ে তাতে মেথী ও ধনিয়ার বীজ ফেল। তা ছাড়া, এই ঋতুর উপযোগী ফুলগাছের কিছু বীজ আনিয়ে দিয়ে পুঁতে দেও, তাহা হইলে আমোদ ও কাজ দু-ই হবে। এই বাগানে তুমি নিজে জল দেবে, তাহলে, তোমার ব্যায়ামও সহজে হবে। আমি বাড়ী এলে, তোমার সন্ধ্যা-কালের পড়াশুনা এই বাগানেই আমরা করব।" এইরূপ বলিয়া তারপর দিন, শয্যা হইতে উঠিবামাত্র উনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমিও তাঁর কথা-অনুসারে মজুর ডাকাইয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কাজ করাইয়া লইলাম। সন্ধ্যাকালে উনি বাড়ী আসিলে, আমরা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গেলাম এবং আসিবার সময় ফুলগাছের কিছু বীজ লইয়া আসিলাম। তারপর, দুদিন পরে আমাদের এই নূতন বাগানে কেদারা আনিয়া সন্ধ্যা-কালের পাঠ পড়িতে বসিলাম। এমন সময়, বাঙ্গালা সংবাদপত্র বিলি করিবার একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এই সংবাদপত্রের গ্রাহক হব কিনা, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "না বাবা ও পত্র আমার দরকার নেই! আমি বাঙ্গালা জানি না। তবে অনর্থক এই পত্র কেন নেব?" ঐ লোকটা আমার কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ওঁর দিকে তাকাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। তখন উনি বলিলেন, "আজ-কের কাগজটা রেখে যাও। কাল থেকে আর এনো না। আসচে সোমবারে কাগজ নিয়ে এসো। তারপর কাগজ নিতে আরম্ভ করব।" এই কথা শুনিয়া আমার একটু আশ্চর্য্য মনে হইল, কিন্তু আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেই লোকটা চলিয়া গেলে, উনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"যাদের নগরে দুই চার মাস থাকতে হবে, তাদের ভাষা আমরা বুঝি না, এই কথা বলতে আমার লজ্জা কচ্ছিল।" আমি বলিলাম, "যে ভাষা আমাদের নয়, তা বুঝি-না বলতে লজ্জা কিসের? এর পর, শিখতে ইচ্ছে করলেও, শেখা হবে কি করে'? শেখা-বেই বা কে"? "ওঁর" শুধু বাঙ্গালার অক্ষর পরিচয় ছিল মাত্র; কিন্তু ভাল পড়িতে পারিতেন না; এই কথা আমি জানিতাম বলিয়া আমি বলিলাম;—"ভালই ত, তুমি কাল থেকেই আমাকে শেখাও-না। আমি প্রস্তুত আছি" এই কথা শুনিয়া, সত্য হইলেও নিত্যানুসারে কোন কিছু ঠাট্টা করিতেন কিংবা উত্তর দিতেন; কিন্তু আজ সেই জায়গায় কোন কথা না বলিয়া, যেন কি-একটা ভাবিতেছেন, এইরূপ তাঁহার মুখের ভাবে মনে হইল। আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম; আমার ঐ রকম বলার দরুণ উনি রাগ করেন নাই ত?—এইরূপ আমার মনে হইল। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন কথাই হইল না। সেইদিন ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল। তারপর দিন চা-পান করিবার পর, নিত্য নিয়মানুসারে বেড়াইতে গেলেন। কিন্তু বাড়ী আসিতে নিত্যাপেক্ষা বিলম্ব হওয়ায় আমি তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম,—এমন সময় উনি আসিলেন। সঙ্গে এক সিপাই ছিল। তাহার হাতে ছোট বড় এইরূপ ১০।১২ খানা বই ছিল। সেই পুস্তকগুলি সে টেবিলের উপর রাখিল। আমি 'ওঁর' কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাহার মধ্য হইতে দুই একটা পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। সেগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক। "এই সব পুস্তক কেন আনা হল?" এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র আগেকার দিনের কথা স্মরণ হওয়ায়, আমি চুপ হইয়া গেলাম। ওঁর ঘামে-ভেজা কাপড় ছাড়াইয়া অন্য এক সদরা (পাঞ্জাবী কামিজ) পরিতে দিলাম, এবং ওঁর পান করিবার দুধ আনিতে যাইব সেই সময় উনি বলিলেন

"পুস্তকগুলি গুনতি করে নিয়ে এই লোককে চিঠি মতো দাম চুকিয়ে দেও ত।" "আচ্ছা"—বলিয়া আমি তখনি চিঠি মতো পুস্তক গুনতি করিয়া লইয়া দাম চুকাইয়া দিলাম। তারপর, দুধ আনিয়া দিলাম। দুগ্ধ পান করিয়া তাহার পর টেবিলের উপর হইতে একটা বই উঠাইয়া লইয়া উহার পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিলেন: আমি সেই বৈঠকখানা ঘরে দূরে এক কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে, কি চলিতেছে তাহা দেখিতেছিলাম। কারণ, এত পুস্তক যে উনি নিজে গিয়া খরিদ করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি নাই। ওঁর বাজারে যাওয়া, জিনিস খরিদ করা কখনও আমি দেখি নাই। জীবনের মধ্যে ওঁর এই প্রথম বাজার করা হইল। আদৌ পয়সা হাতে লইতেন না, নিজের কাছেও রাখিতেন না, ইহাই তাঁহার মুখ্য নিয়ম ছিল। ১১টা পর্য্যন্ত এই বইগুলির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তক পাঠ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহু পূর্ব্বে শিক্ষা করায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সেই জন্য অক্ষর চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইল। ১১টার সময়, রান্না হইয়া গিয়াছে বলায় উনি স্নান করিতে উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে সিপাইকে বলিলেন,—"আমি আহার করিয়া ফিরিয়া যতক্ষণ না আসি তুই বাজারে গিয়া একটা শ্লেট ও পেন্‌সিল নিয়ে আয়; দেরী করিস্‌নে।" আহারান্তে আবার বৈঠকখানায় আসিলে পর, আনীত শ্লেট হাতে লইলেন এবং সেই সকল পুস্তকের মধ্য হইতে একখানি পুস্তক লইয়া শ্লেটের উপর মূল-অক্ষরগুলা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত, নিত্যানুসারে মাঝে মাঝে কিছু-না-কিছু আমোদ করিয়া, ঠাট্টা করিয়া কথা বলিতেন, কিন্তু আজ সে সব কিছুই নহে। এই নূতন পাঠের উপর তাঁর সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। সন্ধ্যাকালে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে, যে পুস্তক পড়িতে আট্‌কাইয়া ছিল, তাহা খুব উচ্চৈঃস্বরে শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে লাগিলেন এবং সেই পুস্তকখানা নীচে রাখিয়া পোষাক পরিলেন। আমরা গাড়ী করিয়া দুজনে বেড়াইতে গেলাম। এটা ওটা অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু সকালের পুস্তক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না, উনি কথা-প্রসঙ্গে সহজভাবে বলিলেন, "আজ বাঙ্গালা পড়তে সমস্ত সময় কেটে গেছে—আমার রোজকার কাজ কিছুই হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া আমি কোন উত্তর করিলাম না; কিন্তু কাল আমার বলাতেই উনি যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন,—ইহা আমার নিজেরই খারাপ লাগিল। বাঙ্গালা শেখাটা কোন প্রকারে এড়াইবার জন্যই, আমি বলিয়াছিলাম; "তুমি যদি আমাকে শেখাও তবেই শিখ্‌ব, আর কারও কাছে শিখ্‌ব না।" কারণ, আমি যদি শুধু বলিতাম—"আচ্ছা", তাহলে উনি একজন বাঙ্গালী মাষ্টার আনিতেন। কিন্তু আমার তাহা ভাল লাগিত না। কারণ, একে ত ছোটবেলা হইতে স্কুল কি তাই জানিতাম না এবং "উনি ছাড়া অন্য কোন পুরুষের নিকট শিক্ষার কোন প্রসঙ্গই হয় নাই। এখন ওঁর সময় না থাকায় এবং অনেক দিন হইল বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন কিন্তু এখন ভুলিয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য যদি কোন লোক রাখার দরকার হয়, তাহা এড়াইবার জন্যই আমি পূর্ব্বদিনে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এই কথায়, রেষারিষি করিয়া তার পর দিন বাঙ্গালাটা আবার ঝালাইয়া লইবার জন্য সমস্তক্ষণ ক্ষেপণ করিলেন,—ইহার দরুন আমার অনুতাপ হইল; আমি যেন চোরের মতন হইয়া গেলাম। রাত্রে ওঁর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে অস্পষ্টশব্দে ঐরূপ কিছু আমি বলিলাম এবং তাহাতে করিয়া আমার মনের ভার কতকটা কমিয়া গেল। তার পর দিন সকালে, বেড়াইতে যাইবার আগে, উনি শ্লেট লইয়া এবং শ্লেটের উপর বাঙ্গালা মূলাক্ষর লিখিয়া আমাকে দিলেন এবং দুই একবার পাঠ করিতে বলিয়া তাহার পর, "আমি বাড়ী আস্‌বার পূর্ব্বে এই অক্ষরগুল অভ্যাস করে রেখো" এই কথা আমাকে বলিলেন। ওঁর বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্ত অক্ষর অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার লিখিয়া রাখিলাম, এবং তার পর আমার নিজের কাজে চলিয়া গেলাম। উনি বাড়ী আসিয়া নিত্যানুসারে সমস্ত কাজ সারিয়া ক্ষৌরী হইতে বসিলেন। সেই সময় উনি এক বাঙ্গালা বই হাতে করিয়া উচ্চস্বরে পড়িতে সুরু করিলেন এবং যে শব্দ আট্‌কাইতেছিল তাহার অক্ষর ও উচ্চারণ ঐ নাপিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি নিকটের এক কামরায় পড়িতেছিলাম। সেখানে বৈঠকখানায় আর একজন কে কথা কহিতেছে এইরূপ আমি শুনিতে পাইলাম। কেহ হয় ত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া, লোকটি না জানি কে দেখিবার জন্য উঠিলাম; দেখিলাম অন্য কেহ আসে নাই; বাঙ্গালা বই হাতে করিয়া "উনি" উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছেন। এবং নিকটস্থ নাপিত শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ বলিয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। নাপিত চলিয়া গেলে পর তৎক্ষণাৎ আমি ওঁর সম্মুখে আসিয়া বলিলাম—"মাষ্টারটি ত দিব্যি মিলেছে। শ্রীদত্ত যেমন ১৪ জন গুরু করেছিলেন, সেই রকম, এখানকার গুরুদের একটা ফর্দ্দ যদি কেউ করতে বলে, তাহলে এই গুরুর নাম আমি প্রথমে দেব। পূর্ব্বে গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হলে, গুরুর

সেবা করতে হত এইরূপ শোনা যায়; কিন্তু এই গুরু বেচারা উল্টা এইখানেই চাকরী করচে, তাই এর নামটা প্রথমে দেওয়া চাই।" এত বেশী বয়সে এই প্রকারে নিজে বাঙ্গালা শিখিয়া আমাকে শিখাইবেন মৎলব করিয়াছেন দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য মনে হইল এবং আমি পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহার দরুন উনি রেখারিখি করিয়া অনেক জবাবদিহির কাজের মধ্যেও, সময় করিয়া লইয়া আমাকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য এত কষ্ট করিতেছেন। এই অনুসারে বাঙ্গালা পাঠের ক্রম স্থির হইলে, মাস-দেড়েকের মধ্যে আমি বেশ পাঠ করিতে সমর্থ হইলাম; কম্পৌণ্ডের মধ্যে তৈয়ারী করা বাগানে মেথী ও ধনিয়া খুব ঘনভাবে বাহির হইয়াছিল, ইংরেজী ফুলগাছেও ফুল ধরিয়াছিল। সেই স্থানে কেদারা আনিয়া আমরা যখন বসিতাম, তখন কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা খবরের কাগজ চাইনা বলিয়াছিলাম তাহাই এখন লইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন সেখানে পাঠ করিতাম; তা-ছাড়া ক্রম-পাঠের পুস্তকগুলিও অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময়, বিষবৃক্ষ দুর্গেশনন্দিনী আনন্দমঠ প্রভৃতি আরও অন্যান্য উপন্যাস লইয়া আমরা প্রত্যাগত হইলাম।

আর্য্যবিবাহের অভিব্যক্তি।

(আধুনিক)

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্, বার এট্-ল)

আর্য্যসমাজের, ব্রাহ্মসমাজের, ও অন্যান্য অভিনব সম্প্রদায়ের বিবাহপদ্ধতি এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে আলোচ্য।

ভারতবর্ষ caste-ridden বা "বর্ণ"-প্রধান দেশ। সচরাচর দেখা যায়, "caste"-বিহীন জাতিরা হিন্দুর caste অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। আবার নিম্ন casteএর ব্যক্তিরা উচ্চ casteএর দাবী করে, অর্থাৎ শূদ্রেরা বৈশ্য, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উত্তরোত্তর উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে চায়। বঙ্গদেশে কোন কোন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।* এইরূপে যাহারা উচ্চ casteএর দাবী করে, সেই উচ্চcaste এর লোকেরা তাহাদিগের সে দাবী গ্রাহ্য করিলে, অর্থাৎ তাহাদিগকে সেই casteএর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিলে, তাহাদিগের সেই উচ্চ casteএর সভ্যস্বরূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না। আর যদি তাহাদিগের সে দাবী অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা একটী নূতন caste সংগঠন করিতে বাধ্য হয়। আবার দেখা যায়, উচ্চ casteএর লোকেরা casteএর rules বা বিধান ভঙ্গ করিয়া একঘরে হয়, অর্থাৎ তাহাদের কি ধর্ম্মকর্ম্মে কি অন্য বিষয়ে নিজ নিজ সমাজে চলন রহিত হয়। যদি এই লোকেরা ক্ষমতাশালী না হয়, তবে কালে তাহারা সেই casteএর একটী নীচ শাখায় পরিণত হয়। কোন্ হিন্দুর কি caste, তাহা এই প্রণালীতে নির্ণীত হইয়া থাকে।

সৌরজগতের গ্রহাদিরা যেরূপ সৌর-নীহারিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া কেন্দ্রস্বরূপ সূর্য্যমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, ভারতবর্ষের বর্ণোপবর্ণসমূহও সেইরূপ বিভিন্ন কারণ বশতঃ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অন্যোন্যস্বতন্ত্রতা প্রাপ্তিপূর্ব্বক মহাহিন্দুজাতির গণ্ডীর মধ্যে স্ব স্ব মার্গে চলিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের Calcutta Law Journalএ "Indo-Aryan Penal Jurisprudence" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি হিন্দুদিগের বর্ণ-উপবর্ণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটা উপমা দিয়াছি :—

"Out of the four primary castes of Manu have sprung up, (and the process is still going on under our very eyes), by social degradation, mixture of castes, conversion of foreigners and aborigines (originally by the vratya-stoma), and multiplication of occupations—an infinity of secondary castes, or rather sub-castes, each caste grown or growing into a nation, and each sub-caste into a caste, with a tendency, under the operation of the same causes, towards further ramification into sub-caste, caste, and nation *ad infinitum*; yet *all* of them gathered up

* জনৈক কায়স্থ উকিল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মা দুইপা পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াছ, কিন্তু আমি এখনও শূদ্রাণী আছি, তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারিব না, পাপ হইবে।" "কি-মা, আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন না? এমন ব্রাহ্মণ না হওয়াই ভাল," এই বলিয়া তিনি পৈতা ফেলিয়া তাঁহার মাকে প্রণাম করিলেন।

under the mother-wings of Hinduism; like unto the Majestic Banyan, throwing out, on all sides, shoot after shoot, each striking root into the soil and growing into a separate tree with a similar tendency to multiply itself, b t all united to the same parent-trunk by bonds of natural piety." অর্থাৎ—মনুকথিত প্রধান চারি বর্ণের ভিতর দিয়া আবার নানা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এখনও আমাদের চক্ষের সম্মুখে হইতেছে; উহার কোনটি বা প্রচলিত বর্ণ বা সমাজ হইতে বহিষ্কৃতি-নিবন্ধন, কোনটি বা বিভিন্ন-বর্ণের সংমিশ্রণে, কোনটি বা বিদেশীয় অথবা আদিম অধিবাসীগণের হিন্দুভাবের দীক্ষা গ্রহণে (প্রাচীন কালে ব্রাত্য-স্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা এইরূপ ঘটিত), কোনটি বা বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় অবলম্বনে সৃষ্টি হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটীই এক একটি বর্ণ বা জাতি দাঁড়াইয়া যাইতেছে এবং এইরূপ শাখা-বর্ণের ভিতরে ঐ একই কারণে আবার অগণিত প্রশাখার সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ নানা প্রকারে বিভক্ত হইলেও সেই সকল শাখা-প্রশাখা মাতৃরূপী হিন্দু-সমাজের ভিতরে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইতে চারিদিকে অসংখ্য ঝুরি নামিয়া যেমন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং কালে এক একটী প্রকাণ্ড স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়, আবার তাহা হইতে স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্মিতে থাকে, অথচ তাহারা সকলে মিলিয়া সেই মূল মাতৃবৃক্ষের সহিত অখণ্ডভাবে অবস্থান করে, হিন্দু সমাজের ধারাও ঠিক সেই ভাবের।

বিভিন্ন শাখা-বর্ণের উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া Risley রিজলী সাহেব তাঁহার People of India গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আমরা নানা বর্ণের উৎপত্তি যাহা দেখিতেছি, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর দিয়া বহুযুগ ধরিয়া পূর্ব্বকালেও এইভাবে অসংখ্য শাখা-বর্ণের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। সার জেম্‌স ষ্টিফেন * ১৮৭২ অব্দের তিন আইনের (Act III of 1872) পাণ্ডুলিপি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে,—"(প্রতিবন্ধক না পাইলে) নূতন সম্প্রদায় সমুত্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব পতন নির্ভর করে তাহাদের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির উপরে। এতদবস্থায় তাহাদের অস্তিত্ব লোপ না হইলে তাহাদের বৈবাহিক ও অন্যান্য আচার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচারাদির সহিত সমশ্রেণীতে পরিগণিত এবং তাহাদের বিবাহাদি, সাধারণ প্রচলিত হিন্দুবিবাহের সহিত তুল্যরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। এই সমস্ত আচারে কেন আমরা হস্তক্ষেপ করিব? কোনটি প্রকৃত হিন্দুভাবের অনুমোদিত, কোনটিই বা তাহার বিপরীত, কেনই বা আমরা তাহার মীমাংসা করিতে বসিব? যাহা আপনাপনি ঘটিতেছে, কেনই বা আমরা তাহার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিব? এইরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এক কথায় এই যে, আমাদের পক্ষে কোনরূপ হস্তক্ষেপ অবিবেচনার কার্য্য হইবে, গবর্ণমেণ্টের মূল নীতির বিরুদ্ধ হইবে, জনসাধারণের অপ্রীতিকর হইবে, অসমীচীন হইবে। হিন্দু জাতির ভিতরে কোন সম্প্রদায় নিতান্ত আধুনিক এবং সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত বিবাহপদ্ধতি দেশপ্রচলিত সাধারণ বিবাহপদ্ধতি হইতে বিভিন্ন,—ব্রিটিষ ধর্ম্মাধিকরণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হিন্দু-আইনের দৃষ্টিতে এতাদৃশ বিবাহ অসিদ্ধ হইবার পক্ষে এই দুই কারণ মাত্র যথেষ্ট নহে"।

বিচারপতি সার শঙ্কর নায়র, মধুস্বামী মুদালিয়র বনাম মসিলামনি * সংক্রান্ত মোকদ্দমায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সার জেম্‌স্ ষ্টিফেনের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে বিবাহসংক্রান্ত হিন্দু-আইন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে; শাস্ত্রের বিধি মুখ্যতঃ তাহাদেরই জন্য, যাহারা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মমত, সামাজিক এবং নৈতিক বিধি মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কোন সম্প্রদায় ধর্ম্ম ও ন্যায়-যুক্তিতে অন্য কোন প্রণালীতে সুসম্পন্ন বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, দেশপ্রচলিত প্রণালীর সহিত তাহার মিল নাই বলিয়া তাহা অসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। নানা সম্প্রদায়ে ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইবার এবং নূতন ধর্ম্মভাব ও নূতন আচার-

* The Gazette of India (January 27th, Supp. 1872) p. 81.

* Indian Cases Vol. V. 1910 p. 48.

ব্যবহার গ্রহণ করিবার দিকে হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক গতি। তাহার উপর আইন আদালতের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। যদি কোন সম্প্রদায় সঙ্গতবোধে অন্যরূপ ধর্ম্মমত পোষণ ও ঘোষণ করে, আদালতের উচিত নহে, তাহাকে জোর করিয়া পরিত্যক্ত পুরাতন মত বা ভাবের মধ্যে বাঁধিয়া বা অবরুদ্ধ করিয়া রাখা।

"১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। গত শতাব্দীতে আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্যসমাজ আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইল উদিত হইয়াছে, তাই বলিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিবাহপদ্ধতি চলিয়াছে, সেগুলি আদালতের অনুমোদিত অন্যান্য হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন বলিয়াই যে অসিদ্ধ হইবে তাহা সঙ্গত নহে। বৃটিষ আইনমতে সংসিদ্ধ আচার বা valid customএর প্রয়োজনীয় উপকরণবিহীন আচার দ্বারা সম্পন্ন কোন বিবাহ যদি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং এইরূপ বিবাহের বিরুদ্ধে যদি আইনের কোন সুস্পষ্ট নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে বুঝি না কেমন করিয়া উহা অসিদ্ধ হইতে পারে।

"আর্য্যসমাজ হিন্দু অহিন্দু যে কোন লোককে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহ দিয়া দিতে পারে, কিন্তু আমি (বিচারপতি নায়ার) বলি, এরূপ ব্যাপার যদি তাহাদের প্রথাসঙ্গত হয়, তবে তাহা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও তাহা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ বিবাহ কোন সম্প্রদায়সম্মত কি নয়, তাহা সেই সম্প্রদায়ই বিচার করিবে। প্রাচীন কালের কথাই বল, আর বর্ত্তমান প্রথার কথাই বল, যে জাতি বা caste এর মধ্যে বিবাহ, সেই জাতির লোকই, অর্থাৎ সেই casteএর পঞ্চায়েতগণ তাহা সিদ্ধ কিনা মীমাংসা করিয়া থাকে; বাহিরের লোক তাহার বৈধতা অবৈধতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে না। বাহিরের লোকের ধারণার বিরোধীভাবে ঐরূপ বিবাহ সম্পাদিত হইলে, যদিও সেই সম্প্রদায়ের ভিতরে ঐরূপ বিবাহ দোষ জনক হয় না, তথাপি সেই সম্প্রদায় বাহিরের লোকের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিতে পারে এই মাত্র বলা যাইতে পারে। যদি কোন সম্প্রদায় কোন বিবাহকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করে এবং ঐ স্বামী-স্ত্রীকে তাহার দলস্থ বলিয়া গণ্য ও গ্রহণ করে, তবে অপর সম্প্রদায়ের পক্ষে ঐরূপ বিবাহের অসিদ্ধতা ঘোষণা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

"কোন হিন্দুর বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অনুসারে না হইলেও এবং তাহা সেই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলেও ঐ বিবাহ যে একেবারে অসিদ্ধ হইবে এমন কোন কথা নাই। অবশ্য স্বসম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে না হইলে বিবাহটা সাধারণ-প্রচলিত হিন্দু আইনের পদ্ধতিতে হওয়া চাই। মানুষ যদি তাহার জাতি বা সম্প্রদায় ছাড়িতে চায়, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সে ইচ্ছা করিয়া তাহার নিজ সম্প্রদায়ের নিয়মপ্রণালী রক্ষা বা ভঙ্গ করিয়া থাকে। যাবৎ সে সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে তাবৎ স্বসম্প্রদায়ের মতে সম্পন্ন তাহার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে। স্বসম্প্রদায়ের বিরোধী মতেও সে বিবাহ করিতে পারে, এবং তাহা আইনানুসারে গ্রাহ্যও হইতে পারে। আইনে গ্রাহ্য হইলেও যদি এইরূপ বিবাহ তাহার জাতি বা সম্প্রদায় বৈধ বলিয়া গণ্য না করে, তাহা হইলে সে স্বসম্প্রদায়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে মাত্র।

"বৌদ্ধধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের সংঘর্ষে অনেক অভিনব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আংশিক মত বা ভাব, যাহা orthodox হিন্দুদিগের চক্ষে অপরিহার্য্য, পরিহার করিয়াছে এবং পরধর্ম্মের আংশিক ভাব বা মত গ্রহণ করিয়াছে।" ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ এই নব সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্যার শঙ্কর নায়ার তাঁহার রায়ের উপসংহারে বলেন—

"These facts make it impossible to apply the rules of present orthodox Hinduism to such sects when any usage inconsistent with such rules is proved or to treat such usages, as deviations from the ordinary law, requiring for their validity the requisites of anti-quity and continuity necessary to uphold a

custom in English law." মথুস্বামী মুদালিয়ার মকদ্দমায় বিচারপতি শঙ্কর নায়ারের রায়ের এই সার মর্ম্ম।

অতএব ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ ও অন্যান্য অভিনব সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতি অ-দূষণীয় ও সম্পূর্ণসিদ্ধ। *Contra bones mores* অর্থাৎ সুনীতি-বিরুদ্ধ না হইলে কোন অভিনব বৈবাহিক usage বা প্রথা Anglo-Hindu law অর্থাৎ British Courts দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হিন্দু-আইনের চক্ষে অসিদ্ধ হইবে না। সুতরাং নজীরের বিপক্ষে খাঁটি মান্ধাতার আমলের হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের চক্ষে কিংবা কাশী ও ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদিগের মতে এই সকল বিবাহ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, তদ্‌বিষয়ে আলোচনা করা academic তর্ক মাত্র অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন।

শোক-সংবাদ।

শ্রীমতী সুকেশী দেবী—শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী সুকেশী দেবী গত ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল। এই অল্প বয়সেই তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

শ্রীমতী করুণা দেবী—গত ২রা ফাল্গুন শুক্রবার বেলা ১১॥০ টার সময় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা করুণা দেবী মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন জগৎপিতা তাঁহাকে শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন এবং শোকাহত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দাস—গত ২০শে মাঘ সোমবার গোবিন্দলাল দাস মহাশয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে আপনার স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

রায় সাহেব শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দেব—রায়গড় নিবাসী রায়সাহেব শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দেব মহাশয় গত ২২শে মাঘ বুধবার ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোক গত আত্মার মঙ্গল কামনা করি। পরিজনবর্গের শোকসন্তাপ ভগবান দূর করিয়া দিন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উৎসব উপলক্ষে নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত	১৲
শ্রীভগবতীচরণ মিত্র	১৲
শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীরাধাকিশোর ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীজিতেন্দ্রজিত সেন গুপ্ত	১৲
শ্রীসতীশচন্দ্র পল্লে	১৲
শ্রীফকিরচন্দ্র নাথ	১৲
শ্রীবিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
শ্রীচূণীলাল মজুমদার	১৲
শ্রীস্টবেহারী চট্টোপাধ্যায়	॥০
শ্রীপ্রভাকর দাস	॥০
শ্রীএন, কে, মুখার্জ্জি	১৲
শ্রীজ্যোতিন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০
শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত	৫৲
শ্রীতুলসীদাস দত্ত	২৲
শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র	১৲
শ্রী ইউ, এল, কুমার	২৲
শ্রীডি, এন দাস	॥০
শ্রীকল্যাণচন্দ্র বড়াল	॥০
জনৈক ভদ্র লোক	।০
শ্রীমাণিকলাল দাস	।০
শ্রীশশীভূষণ ঘোষ	।০
জি, সারওয়ার এস্কোয়ার	১৲
শ্রীমহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি	৫৲

আনুষ্ঠানিক দান।

বালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত অমলকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার পরলোক গত মাতার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি প্রদান করুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে]	৩॥০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
জ্ঞানোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত)	৵০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	/০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৵০
পরলোক ও মুক্তি	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	,, 1 ,,
The Theist's Prayer Book	,, 1 ,,
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	১৲

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	।০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P, ,, 4 ,,
Adi Samaj as a Church	,, 4 ,,
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	,, 4 ,,
TheDoctrine of Christian Resurrection	,, 4 ,,

	পূর্ণ মূল্য।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতসম্ঘাত	৶০
গীতাপাঠ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	॥০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	॥০
রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৲

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (ভাল বাঁধা)	৸০
রাজা হরিশ্চন্দ্র ,,	॥০
অঁাখিজল ,,	॥০
শ্রীভগবৎ কথা ,,	।৵০
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১।০
ওঁ পিতা নোঽসি	॥০
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	॥০
বলসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	/০
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	॥০

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	॥০

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	/০

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১।০

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত

সনেট পঞ্চাশৎ ॥০	॥০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

আমার খাতা	৸০
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸০

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীত পরিচয়	।৵০

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত মঞ্জরী	৫৲

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲

পরলোকগত আচার্য্য ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ধর্ম্মদীক্ষা	৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১ম হইতে ৪র্থ ভাগ	৸৵০
গৃহকর্ম্ম	।০

Tattwabodhini Patrika   Reg. No. C. 462.

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ।

চৈত্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

৯০৭ সংখ্যা   ১৮৪০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। [illegible]
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য [illegible]

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৯। ১লা চৈত্র, শনিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল ।৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। { আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

উদ্বোধন।

ভগবানের রাজ্যে এটা একটা সত্য যে জীবন যখন শুষ্ক হয়ে যায়, জীবন যখন একবিন্দু করুণা-বারির জন্য হাঁ হাঁ করে ছটফট করে বেড়ায়, যখন প্রাণ শুষ্কতার তাপে দগ্ধ হবার উপক্রম হয়, তখনই করুণাধারা সুশীতল ধারায় নেমে এসে জীবনকে শান্ত করে, সুস্থ করে। প্রকৃতিতে এই সত্যের কেমন জ্বলন্ত পরিচয় পাই। জীবজন্তু বৃক্ষলতা যখন গ্রীষ্মের তাপে দগ্ধ হবার পথে চলে, সহসা আকাশের কোন্ এক কোণে মেঘ উঠে বাতাস হয়ে জলের ধারা পড়ে' প্রাণীগণকে সজীব করে' তোলে। এই ভাবটা বড়ই স্বাভাবিক। শিশুর কণ্ঠ যখন শুষ্ক হয়ে যায়, শিশুর প্রাণ যখন পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠে, কিন্তু সে সেটা ব্যক্ত করতে পারে না, তখনও মাতার প্রাণ কেঁদে ওঠে, মাতার স্তন্য অবিরলধারে শিশুর উদ্দেশ্যে ঝরতে থাকে। এ সমস্তই সত্য কথা। কিন্তু আমরা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছি, তাই আমাদের জীবন শুষ্ক হোতে থাকলেই আমাদের জানা চাই বোঝা চাই যে জীবন শুষ্ক হচ্ছে। সেইটী জানলে, ভগবানকে করুণাধারার জন্য প্রাণ ভরে' ডাকলে তবে আমাদের প্রাণ শীতল হবে। আমাদের জীবন বোধ হয় যেন কতকটা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শুষ্ক হতে দিলে চলবে না। তাই বুঝি এবার মাঘোৎসবে সকল উৎসবক্ষেত্র থেকে উপাসনার জন্য এক গভীর আহ্বান জেগে উঠেছিল। উপাসনার দরকার কি অ-দরকার, এও যে ব্রাহ্মমণ্ডলীকে বোঝাতে হয়, এই আশ্চর্য্য। উপাসনা কি? না, কাছে বসা। মায়ের কাছে বসব, মাকে সুখদুঃখের কথা জানাব, এর আবার দরকার অ-দরকার কি? সকল ধর্ম্মেই উপাসনা দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই কথাটা খুব স্পষ্ট করে' বলে' স্পষ্টভাষায় মানুষকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে মায়ের কাছে বসবার সেই মধুময় আহ্বান আমাদের কানে পৌঁচেছে। সংসারের সকল কথা ফেলে রেখে, একবার এসো, মায়ের কাছে বসে' মায়ের কথা শুনে হৃদয়কে পবিত্র করি, জীবনকে ধন্য করি।

ঈশ্বরকে জানার ফল।

ঈশ্বরকে জানা আর না জানা নিয়ে যে দুটো দল আছে, সে কথা তোমাদের বলে' এসেছি। এবারে তোমাদের বলব যে ঈশ্বরকে জানার ফল কি। ঈশ্বরকে জানা বলতে গেলেই স্বীকার করতে হয় যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে ইত্যাদি।

তোমাদের হয়তো মনে হবে যে ঈশ্বরকে জানার আবার ফল কি? তাঁকে জানলুম তো জানলুম, আর না জানলুম তো না-ই জানলুম; কিম্বা

বিশ্বাস করলুম বা না-ই করলুম যে তাঁকে জানা যায় বা না-ই যায়; তার আবার ফলাফল কি? যার যে মত ভাল লাগে, সে সেই মত নিয়ে থাকুক, তার ফলাফল নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? না—ঈশ্বরকে জানা বা না জানা, এর ফলাফল দেখার দরকার আছে। মতামতের ভালমন্দের উপর সংসারের অনেক ভালমন্দ কাজ হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত দিই। জর্ম্মনির সম্রাট থেকে অনেক বড় বড় লোক বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ করা কেবল ভাল নয়, খাওয়া দাওয়ার মত যথাসময়ে যুদ্ধ না করে' থাকা যায় না—করতেই হয়। এই মতটা তাঁরা জর্ম্মনির যেখানে-সেখানে যখন-তখন প্রচার করতে লাগলেন, আর তার ফলে দাঁড়ালো এই যে, জর্ম্মনির ছেলেছোকরা থেকে আরম্ভ করে' মেয়ে বুড়ো পর্য্যন্ত সকলেরই মন ঐ মতে গড়ে' উঠল। যখন সমস্ত জর্ম্মনির লোকদের মন ঐ খারাপ মতের উপর গড়ে' উঠল, তখনই ঐ মস্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলে' উঠে' কত ভাল ভাল লোক, ভাল ভাল গ্রাম পল্লী, কত সহর বন্দর, কত জ্ঞান ধর্ম্ম, সমস্তই একেবারে হাঁ-হাঁ করে খেয়ে দিলে। আবার দেখ, আমেরিকা ধর্ম্মের ঠিক পথটা বলে' দিয়ে যেমনি এগিয়ে এল, অমনি সমস্ত জগত, এমন কি জর্ম্মনির লোকেরাও, সেই পথটা ভাল বুঝে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ফলে, সমস্ত জগতে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা হোল। এত বড় যুদ্ধটা বলতে গেলে কেবল মতামতের উপর দাঁড়িয়ে গেল। এই মনে কর যে, একজনের মত, দেবতার কাছে ছাগল বলি না দিয়ে কুমড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া উচিত। তার মনটা স্বভাবতই এমন নরম হবে যে, সে ছাগল বলি দেখলেই শিউরে উঠবে। আবার যার মত ছাগল বলি দেওয়াই উচিত, তার মনটা আস্তে আস্তে কি রকম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—ছাগলের ছটফটানি দেখে সে মজা ভেবে হাসতে থাকে। এই রকম নিষ্ঠুর ভাব মনে পুষতে পুষতে, ক্রমে সে মানুষের উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও তার মনে যে কিছু-মাত্র কষ্ট আসবে না, সেটা কিছু অসম্ভব কথা নয়। ডাক্তারেরা ডাক্তারী বিদ্যা শেখবার সময় অনেক কাটাকুটি করবার ফলে মানুষের শরীরটাকে আর শরীর বলে' মনে করেন না, শরীরটাকে তাঁদের কাটাকুটির পরীক্ষার একটা বিষয় বলে' মনে করেন, একথা অনেক ভাল ভাল ডাক্তারের মুখে শুনেছি। এইজন্য বলি যে মতামতের ভালমন্দ দেখার দরকার আছে। মতামতের ভালমন্দের উপর আমাদের জীবনের ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। আর একটা কথা এই যে, আমরা দেখতে পাই যে, যে মতের ফল ভাল, সে মতটা প্রায়ই সত্য হয়; আর যে মতের ফল খারাপ সে মতটা প্রায়ই মিথ্যা হয়। চুরি করার ফল খারাপ, কাজেই চুরি করবার পক্ষে যদি কেহ মত দেয়, সে মতটা মিথ্যা বলে' জানব। ধর্ম্মের পথে চল্লে ভাল হয়, তাই তার সপক্ষে মত সত্য বলে' জানব। ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে যদি ভাল ফল হয় দেখি, তাহলে তাঁকে জানা দরকার এই মতটা বুঝে, প্রাণের ভিতর ধরে', জীবনকে উন্নতির পথে চালাবার চেষ্টা করব।

দেখা যাক যে ঈশ্বরকে জানার ফল কি? মনে কর, একজন লোক ঈশ্বর আছেন বলে' বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ তিনি মনে ঠিক জানেন যে, এই বিশ্ব-জগতের একজন স্রষ্টা আছেন, আর তিনি জগতের স্রষ্টা বলে'ই আমাদের প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই জানছেন, আর আমাদের দরকার বুঝে সমস্তই দিচ্ছেন; কেবল তাই নয়, আমাদের সমস্তের ভিতর দিয়ে যাতে ভাল হয়, তারই ব্যবস্থা করছেন। এক কথায়, সেই লোকটী ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ আর মঙ্গলস্বরূপ জেনে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' থাকেন। আচ্ছা বল দিকিন, এই লোকের মনে কি রকম একটা গাঢ় গভীর শান্তির ভাব থাকবার কথা! সংসারের কাজে যদি আমরা পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারি, তাহলে কি রকম একটা নির্ভরভাব মনে আসে বল দিকিন? বাপ-মা পরস্পরের উপর, বাপ-ছেলে পরস্পরের উপর, ভাইবোন পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করে' কাজ করতে থাকলে সকল কাজের ভিতরেই কেমন একটা সাহস পাওয়া যায়; সকল কাজের ভিতরেই কেমন একটা ভাল ভাব যেন সমস্ত ক্ষণ জেগে থাকে বল দিকিন? এখন ভেবে দেখ, যে ঈশ্বর সেই বাপ-মাকে সেই ছেলে-মেয়েকে সেই ভাই-বোনকে সংসারে পাঠিয়েছেন, যিনি আমাদের প্রাণে সেই মঙ্গলভাব পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর

যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারেন, তাঁর ভয় কোথায়? তাঁর নির্ভরের জায়গা খুবই গভীর।

তোমার মা মৃত্যুশয্যায় পড়ে' আছেন, কিম্বা তোমার প্রাণাধিক ভগ্নী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন; সেই ভীষণ সময়ে তোমার কি কষ্ট! কিন্তু তুমি যদি ভগবানের হাতে সকলই নিবেদন করে' দাও, তাহলে কেমন শান্তি পাও বল দিকিন? তাঁরা ইহলোক থেকে চলে' যান কিম্বা ইহলোকেই বেঁচে থাকুন, তুমি জান যে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের ভালবাসা হারাবেন না—এতে তোমার কতটা উদ্বেগ, শ্রান্তি আর ভয় ভাবনা দূর হোল বল দিকিন?

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক পদে ভাল করছেন, এইটা যিনি প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস করবেন, তিনি কথায় কথায় অমঙ্গলের ভয়ে চমকে', উঠবেন না। তিনি জগতের প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক জায়গায় ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের পরিচয় পান। এই মস্ত বড় আকাশের অসীমভাবের মধ্যে, প্রকৃতির ভিতর প্রতি মুহূর্ত্তে যে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য ফুটে বেরোচ্ছে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, পৃথিবীর অসংখ্য জীবজন্তুর মধ্যে, তিনি সেই জগতের স্রষ্টা পাতা ও বিধাতা পরমেশ্বরের জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পেয়ে খুবই সুখী হন। আকাশের প্রতি নক্ষত্রে, পৃথিবীর প্রতি ফুলে তিনি ঈশ্বরকে দেখতে পান। এই যে শীতের পর গরম, গরমের পর বর্ষা, এইরকম করে' এক ঋতুর পর আর এক ঋতু আসে, সেই ঋতুপরিবর্ত্তনের মধ্যে, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, বরফপড়ার মধ্যে তিনি ঈশ্বরেরই মঙ্গল নিয়ম কাজ করছে দেখেন। ঐ বড় বড় পর্ব্বত-গুলোর মধ্যে, পর্ব্বতগুলোর উপত্যকার বনজঙ্গলের মধ্যে, আর ঐ সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে ভগবানেরই হাতের কারিগুরি দেখে তাঁর মন আনন্দে ভরে' যায়। তিনি আরও দেখেন যে তাঁর মতো কত অসংখ্য মানুষ ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করে' তাঁর নামগান করেছে, আর এখনও কত অসংখ্য মানুষ করছে। ইতিহাস আলোচনা করে' তিনি বুঝতে পারেন যে ঈশ্বর কেমন করে' এই জগতকে পালন করছেন। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর মানুষকে ছেড়ে যান নি, বরঞ্চ ভালর দিকেই নিয়ে যাচ্ছেন। এই রকমে তিনি যা কিছু দেখেন, সকলের ভিতরেই ঈশ্বরের হাত, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা দেখে তাঁর বিষয়ে সমস্ত সংশয় মন থেকে দূর করে' দেন।

ঈশ্বরে যাঁর শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তিনি শুধু বাইরে বাইরে ঈশ্বরকে দেখে' চুপ করে' থাকেন না। তিনি আত্মার ভিতরে সুখ-দুঃখের মধ্যে, আশানিরাশার মধ্যে ঈশ্বরকে আরও স্পষ্ট দেখতে পান। এই পৃথিবীতে আমরা রোগে শোকে, পাপেতাপে কত-না কষ্ট পাই। এই সমস্ত কষ্টের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পিতৃভাব বুঝতে পেরে কষ্টকে কষ্ট বলে'ই মনে করেন না। তিনি দেখতে পান যে, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, এ সমস্ত কিছুই আমাদের মেরে ফেলবার জন্য কোন অন্ধশক্তি পাঠায় নি। যখন তাঁর কাছে সম্পদ আসে, তখন তিনি সেই সম্পদ ভোগ করে'ই ক্ষান্ত হন না, তিনি সেটা ভগবানের দান বুঝতে পেরে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে' কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করেন। আবার বিপদের গাঢ় অন্ধ-কার যখন তাঁকে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি তার মধ্যে এই জেনে নির্ভয় থাকেন যে, ভগবান তাঁকে এই বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর নিজের কাছে আরও বেশী করে' টেনে নেবার ব্যবস্থা করছেন। তাঁর উপর বিশ্বাস ও নির্ভর থাকলে আমাদের কর্ত্তব্যের অধিকার দৃঢ় হয়; তাঁর আদেশ মনে করে', আর ফল ভালই হবে মনে করে' কর্ত্তব্য পালন করবার একটা জোর আসে। দুঃখকষ্টের বিষম কষ্ট পেলে সময়ে সময়ে সংসারটাকে মরু-ভূমির মতো বড়ই শুষ্ক কঠোর বলে' মনে হয়; কিন্তু ভগবানকে ভালবাসতে শিখলে সেই দুঃখ-কষ্টের ভিতরেও তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পেয়ে তাঁর দেওয়া সংসারকে কেমন সরস কেমন কোমল মনে হয়। তাঁকে হৃদয়ে রাখলে ভাল কাজের দিকে মন আপনিই ছুটে যায়।

এইভাবে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা মনের ভিতর রাখাতে ঈশ্বর-ভক্তের মনে অহঙ্কার এতটুকু স্থান পায় না—শান্ত বিনয় সমস্ত মনটাকে অধিকার করে। তাঁর সঙ্গে কথা কও, দেখবে, তিনি নিজের

কথা একটুও ওঠাবেন না; যাঁর দয়াতে তিনি ভাল কাজ করতে পেরেছেন, সেই ভগবানেরই কথা তাঁর মুখে সমস্তক্ষণ শুনতে পাবে। তিনি নিজের মনটাকে এই বিশ্বপতির মস্ত ভাবে পূর্ণ করে' রাখেন। এই রকম ভক্ত লোকেই প্রকৃতির গান শুনতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যান, আর আনন্দে ডুবে যান। এই রকম ভক্তের প্রাণ থেকেই গান উঠেছিল—

আনন্দ ধারা প্রবাহে কিবা আজি
হৃদাকাশ মাঝে
শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখরে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়—
একদৃষ্টে আত্মার পানে
মাতা হয়ে' অবনত
আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে; শূন্য পূর্ণ আজি।

ঈশ্বরের ভক্তদের গান শুনলেই বোঝা যায় যে, তাঁরা সকলের চেয়ে প্রিয়, এমন কি আপনার চেয়েও প্রিয় ভগবানকে কত কাছে করে' দেখেন। তাঁদের কাছে দুদণ্ড বসে' থাক', দেখবে যে তাঁদের আত্মার ভিতর থেকে কি এক আশ্চর্য্য জ্যোতি বেরিয়ে তোমার ভিতর প্রবেশ করছে। ভক্ত লোকের কাছে চুপি চুপি চলতেও যেন সাহসে কুলোয় না—ভয় হয় পাছে এতটুকুও শব্দে তাঁর ধ্যানের ব্যাঘাত হয়।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিকে চলিত কথায় ধর্ম্ম নাম দেওয়া হয়। ধর্ম্ম শব্দের মানে হচ্ছে যা ধরে' রাখে। শ্রদ্ধাভক্তি জগতকে ধরে' রাখে, শ্রদ্ধাভক্তি জগতের লোককে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে খুব রক্ষা করে, পরস্পরকে বিনাশ করা থেকে রক্ষা করে, তাই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিকে চলিত ভাষায় এককথায় ধর্ম্ম বলা হয়। জগতের ইতিহাস ভাল করে' পড়লে দেখা যায় যে, জগতের অনেক উন্নতির প্রথম আরম্ভ হয়েছে ধর্ম্মের দ্বারা। তোমরা তো জান, এক সময়ে ইউরোপ অসভ্যতা আর অজ্ঞানের অন্ধকারে একেবারে ডুবেছিল। সেই সময়ে যিশুখৃষ্টের শিষ্যেরা সেই সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যে উঁচুদরের ধর্ম্মের কথা প্রচার করলেন, তারই প্রভাবে তো আজ ইউরোপের লোকেরা এই উন্নতি লাভ করেছে। যদি বল যে, তাহলে সেখানে এত লড়াই মারামারি কাটাকাটি হয় কেন? তার উত্তর এই যে, সেখানকার বেশী লোক স্বার্থে অন্ধ হয়ে ধর্ম্মের কথা মেনে চলতে চায় না। এক সময়ে আরব দেশের লোকেরা জড়পূজা করতে করতে নানা বিষয়ে আপনাদের খুবই অবনত করে' ফেলেছিল। সেই সময়ে মহম্মদের উন্নত ধর্ম্মের কথা তাদের জাগিয়ে তুলেছিল। মুসলমানদেরও যে কালে অবনতি হয়েছিল, তার একটী প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত মুসলমানেরা ঠিক ধর্ম্মপথ অর্থাৎ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধাভক্তি করে' তাঁর আদেশমতে ভাল কাজ করার পথ থেকে সরে' গিয়েছিল। এই যে আকাশ সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রে ভরা, অসভ্য জাতিরা যখন এই আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে খোঁজবার বোঝবার চেষ্টা করলে যে, কে এই সমস্ত গ্রহনক্ষত্র সূর্য্যচন্দ্র সৃষ্টি করলেন, কে-ই বা এ সমস্ত ধরে' রেখেছেন, কারই বা নিয়মে এগুলো নিয়মিতভাবে দেখা দিচ্ছে আবার সরে' যাচ্ছে, সেই খোঁজার ভিতরে, সেই বোঝবার চেষ্টার ভিতরে কত বড় উন্নতির মূল লুকিয়েছিল, ভেবে দেখলে অবাক হতে হয় না কি? শরীরটাকে ঠিক রাখবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করতে হয়, সেই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে মানুষের জ্ঞানের খুব চর্চ্চা হয়, মানুষের অনেক উন্নতি হয় বটে; কিন্তু আপনার ভিতরে ঈশ্বরকে দেখবার যে চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের আরও অনেক বেশী চর্চ্চা হয়, অনেক বেশী উন্নতি হয়, আনন্দ হয়। ইতিহাসে এর অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। হাতে হাতে দেখি যে, ভারতের একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন শাণ্ডিল্য। তিনিই সব প্রথম বুঝেছিলেন যে ঈশ্বর কেবল বাইরের ঈশ্বর নন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা। কথাটা বড় শক্ত, কিন্তু এ ভাবে ছাড়া এ কথা বলবার কোন উপায় দেখিনে। এর ভাবটা এই যে, আমাদের আত্মার ভিতরে ঈশ্বরকে দেখতে চাইলে আত্মারও মূল কারণ বলে' তাঁকে জানা যায়। এই কথাটা আলোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষে সেই ঋষিদের সময়ে যে কি রকম উন্নতি হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। ঋষিরা আত্মাতে

ঈশ্বরকে দেখেছিলেন বলে'ই তাঁরা যে সমস্ত আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, আর যে সমস্ত ভাল ভাল কাজ করেছিলেন, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের লোক যতই সেগুলোর বিষয় জানতে পারে ততই অবাক হয়ে যায়। আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা, এরই উপর বেদ উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভারতের সমস্ত শাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে, যার জ্যোতিপ্রভায় আজ জগত মুগ্ধ।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

গত মাঘোৎসবে যে কয়েকটী নূতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, সেগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

* * *

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥
মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মত,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

গান্ধারী তোড়ী—তাল ঝাঁপতাল।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে
মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম
শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া॥
তোমারি মধুরে সকলি মধুর
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়া।
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস
দিতেছে আমারে পাগল করিয়া॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

* * *

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে?
যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারী
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

আমরি মরি কি রূপ ধরি
এসেছ মা—মা আমার!
হৃদয় উজল করি,
জ্যোতি অপরূপে ভরি,
বারেক দাঁড়াও
প্রণমি গো মা আমার!
তোমারি ভালে তপন জ্বলে,
তোমারি হাসি ফুটে কমলে,
তোমারি প্রভা জগতীতলে
প্রণমি গো মা—
মা আমার!

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মিশ্র আড়ানা—একতালা।

এস হে এস সুন্দর ওহে নবতপন।
এস তিমির-হরণ, অরুণ-বরণ,
পুণ্য কিরণ ঢালো ঢালো—
আলোকে কর আলো ভুবন।
আমি খুলি মন্দিরদুয়ার সখা,
আঁধারে রয়েছি দাঁড়ায়ে একা,
কখন উদিবে তরুণ রেখা—
ভরিয়া নয়ন মন।
আমি অধিক কিছু চাহি না আর,
তুমি ঢেলে দাও নিখিল মাঝে,
তোমার সকল জ্যোতিধার।

শুধু দিয়ে যাও রেখে যাও হে সখা—
আমার লাগি, কাতরে মাগি,
একটি বিন্দু তার—ওহে বিশ্ব বিমোহন।
(সেই) একটি বিন্দু একটি দীপ্ত কণিকা—
অতি উত্তম, অতি উজ্জ্বল, অতুল রত্ন মণিকা—
তাহা যতনে রাখিব ধ'রে আমারি বিজনঘরে—
তোমারি তরে গো তোমারি তরে—
জ্বালিব আরতি দীপিকা।
আমি দিবস নিশীথে, অশ্রু হাসিতে
বচনে গীতিতে, আশীষে প্রীতিতে
তোমারে করিব বরণ হে, অনুদিন অনুক্ষণ।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী]

বেহাগ—তেওরা।

ভুবন জোড়া আসন খানি।
হৃদয় মাঝে আমার হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা দিনের রবি
আঁধার আলোর সকল ছবি
তোমার—আকাশভরা সকল বাণী।
ভুবনবীণার সকল সুরে,
আমার হৃদয়পরাণ দাওনা পুরে,
দুঃখ সুখের সকল হরষে
ফুলের পরশে ঝড়ের পরশে,
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
আমার হৃদয় মাঝে আমার হৃদয় মাঝে
দিক্‌না আনি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

* * *

দাড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে॥
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখোনা তরী
এস এস পার হয়ে মোরে
হৃদয় মাঝারে॥
তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে
বেদনাতে বাঁশী বাজায়
সকল বেলা যে
কবে নিয়ে আমার বাঁশী
বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতে
নিবিড় আঁধারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

নির্ভরের সোপান।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এ কথাটী ভাবিতে, বলিতে, শুনিতে কত মধুর! বুঝিবা এ বাক্যের প্রতি অক্ষরে কত ভক্তি, কত শান্তি, কত প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে!

"হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ, তুমি যখন আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর, আমি তাহাই করিয়া থাকি।" সত্যই তো তাই! কিন্তু আমরা এ সত্যতা উপলব্ধি করিতে কখন্ সমর্থ হই? কখন্ আমরা প্রাণ খুলিয়া হৃদয় ভরিয়া বলিতে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। চারিদিক হইতে অজস্র সুখ-সম্পদ, আনন্দ-গৌরব আসিয়া আমাদিগকে সংগ্রাম-সঙ্কুল সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে, আমরা যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তখনই তাহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্য্য হইতেছি, আমাদের স্পর্শে ভস্মরাশিও স্বর্ণরাশিতে পরিণত হইতেছে; সেই সৌভাগ্য-সূর্য্য-করোজ্জ্বল জীবনের গৌরব-মধ্যাহ্নে দাঁড়াইয়া উপরোক্ত মহাবাণী কি আমাদিগের অন্তরে জাগরিত হইয়া থাকে? আমরা যে তখন 'শয়নে-স্বপনে-জাগরণে' শুধু এই একটী কথাই শুনিতে পাই—'অহম্'! সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বক্ষও অহঙ্কারে অনেকটা স্ফীত হইয়া উঠে।

কালবশে আবার যখন আমাদের ভাগ্যচক্র বিপরীত দিকে পরিবর্ত্তিত হয়, পদে পদে পরাজয় ও ব্যর্থতা আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসে, আমরা রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যের তীব্র আঘাতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি, তখনও যে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত মহাবাণী সম্যক

স্ফূর্ত্তি পায় না—আমরা যে তখন নিরাশা ও হতাশার নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া শুধু নিষ্ফল আর্ত্তনাদকেই সম্বল করিয়া লইয়া থাকি। তবু এত নিষ্পেষণেও যে 'অহম্' এর আস্ফালন সম্পূর্ণরূপে থামে না।

দেখিলাম, সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য আমাদিগকে "হৃষীকেশের" কথা শুনাইতে আসিলেও আমরা সে কথা শুনিতে পাই না—আমরা 'অহম্' এর মোহে এমনই বধির ও অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি! যদি আমাদের জপমন্ত্র কিছু থাকে তবে সে—'অহম্!' সমুদ্রে যেমন একটীর পর একটী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা উদ্বেগচঞ্চল করিয়া রাখে, তেমনিধারা আমাদের চিত্তসাগরেও প্রতিনিয়ত 'অহম্' এর ঢেউ জাগিয়া আমাদিগকে নানাভাবে নাচাইয়া মাতাইয়া, অবশেষে কাঁদাইয়া ডুবাইয়া যাইতেছে! আজীবন 'হৃষীকেশের' অপার করুণার মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও তাই আমাদের বিরাম, বিশ্রাম, শান্তি, সান্ত্বনা নাই!

যদি আমরা বাস্তবিকই বলিতে পারিতাম, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তবে আমাদের এ দুরবস্থা হইবে কেন? সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয় আমাদিগকে বিচলিত করা দূরে থাকুক, তাহা হইলে আমরা যে মন্দ কর্ম্মের ভিতরে, পাপের দণ্ডের ভিতরেও ভগবানের মঙ্গল হস্তের পরিচয় পাইয়া প্রকৃত আত্মপ্রসাদ অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিতাম; অপহরণ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেও আমাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইয়া বলিতে পারিতাম, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"!

কিন্তু তাহা তো হয় না! যতক্ষণ 'অহম্'এর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ আছে, ততক্ষণ আমাদিগকে হাউই বাজির মত শূন্যে জ্বলিতে, দহিতে ও নিভিতে হইবে। সমস্ত সংসার বিপর্য্যয় হইয়া গেলেও আমাদের নিস্তার নাই—কেহ আমাদিগকে রক্ষাও করিতে পারিবে না!

তবে উপায় কি? জীবনের কোন্ অবস্থা আমাদিগকে প্রাগুক্ত মহাবাণী উচ্চারণের যথার্থ যোগ্যতা ও অধিকার দান করিবে? নির্ভরের সে সোপান কোথায়?

আমার মনে হয় দুঃখের পর দুঃখের, আঘাতের পর আঘাতের 'বজ্রবেদনায়' যখন আমাদের অন্তর বাহির পূর্ণ হইয়া উঠে, আমাদের সকল আশাসাধ জল্পনা কল্পনা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর তাড়নায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, বিশাল সংসারে কাহারও মুখের পানে চাহিবার ভরসামাত্র থাকে না, হাহাকার—শুধু হাহাকার, অন্ধকার—শুধু অন্ধকার আমাদিগের সকল দম্ভ-অভিমান, শক্তিসামর্থ্য ও পুরুষকারকে গ্রাস করিবার জন্য চারিদিক হইতে মহাকালের তাণ্ডবলীলার ন্যায় বিকট উৎসাহে ছুটিয়া আসে, মন্ত্রৌষধিবশীভূত দুরন্ত পন্নগের মত আমাদের দুর্দ্দান্ত 'অহম্' একান্ত বিমুগ্ধ, বিমূঢ় ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, আমাদের সেই মথিত চূর্ণিত অন্তরের অন্তস্থল হইতে মর্ম্মভেদীস্বরে স্বতঃই স্ফুরিত হয়—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ," প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জীবনের সেই অনন্যগতি মুহূর্ত্তেই আমরা উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা জানেন, আমাদের এই পরম নিরাশ্রয়ভাবই আমাদিগকে চরম আশ্রয়ের পথে লইয়া যায়—ঘোর অকল্যাণ এমনি ভাবেই আমাদের জন্য শাশ্বত কল্যাণের সৃষ্টি করে, মঙ্গলময় দেবতার রাজ্যে ইহাই তাঁহার মঙ্গলবিধান—ইহাই নির্ভরের একমাত্র সোপান।

উপসংহারে, সেই নামহীন দেবতার দুইটী নাম-রহস্য একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় তাঁহাকে "হৃষীকেশ" বলিয়া সম্বোধন করি কেন? আবার নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁহাকে "জগদীশ" বলিয়া কেন আহ্বান করি?

তিনি "হৃষীকেশ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি, এ কথা জানিলেই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আর কুকর্ম্মে রত হইতে পারে না; তিনি "জগদীশ", আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র হইলেও তিনি আমাদিগকে ভুলিয়া নাই—আমরা তাঁহার খাস্‌দরবারেরই প্রজা, এ কথা বুঝিতে পারিলেই আর আমাদিগকে সদয় আশ্রয়ের জন্য কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে হয় না।

এ জন্য নির্ভরের এ সোপানে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের

পথ অবলম্বন করিতে হয়। আমরা শ্রেয়ের পথে দাঁড়াইয়াই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" কিংবা "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ"। নতুবা এ দুইটী মহাবাক্যের দিব্যপ্রভাব আমাদিগের নিষ্ফল জীবনে প্রসারিত বা কার্য্যকরী হয় না।

আঁধারে।

(নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

একটি সহজ হাসি হেসে
গলিয়ে দাও সব দুখ, রে ভাই
গলিয়ে দাও সব দুখ!
তোমার সকল কাঁটা ফুটুক ফুলে
দুঃখ হউক্ সুখ, রে ভাই
দুঃখ হউক্ সুখ!
আছে আঁধার আছে কালো,
তাই নেবাবে কি প্রাণের আলো?
কালোর বুকে আলো নাচে
তায় হৃদয়-দেউটী জ্বালো, ও ভাই
হৃদয়-দেউটী জ্বালো!
আলোকেরই পুত্র মোরা,
জনম মোদের আলোকে;
স্থির যে আলো বুকের তলে—
জ্বালা'ব তায় কালোকে,
মোরা জ্বালা'ব তায় কালোকে॥

পল্লীবাস।*

(শ্রীমনোরমা দেবী)

আজকাল প্রায় সকলেই লিখিয়া থাকেন ম্যালেরিয়ানিবারণ ও পল্লীবাস ব্যতীত বাঙ্গালার আর বাঁচিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে কিছু চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই। দূরে থেকে উপায় নির্দ্দেশে ত কোন ফল হইবে না, এখন কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য কর্ম্মীর আবশ্যক হইয়াছে, আর সময় নাই। ম্যালেরিয়া দূর হইলে ও পল্লীবাস স্থাপিত হইলে আবার বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ সকলই ফিরিয়া আসিবে, এ কথা সকলেই বলিতেছেন; কিন্তু কেবল বলিলেই ত আপনা আপনি সমস্ত হইয়া যাইবে না। সে চেষ্টা কই? প্রাণের সে আগ্রহ কোথায়? একটা বিরাট জাতি এইরূপে দ্রুত ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে ইহা দেখিয়া দেশনেতৃগণের হৃদয়ে সেইরূপ তীব্র বেদনা কই? এখন মধ্যবিত্ত অনেকেরই প্রাণে পল্লীবাসের বাসনা জাগিয়াছে, ইহাদের সাহস দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে কে? ম্যালেরিয়া-শ্মশান পল্লীতে গিয়া দুচার ঘর গৃহস্থ প্রাণে বাঁচিবে, না তাহারা ম্যালেরিয়ায় চিঁচিঁ করিতে করিতে দেশের উন্নতি করিবে?

আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে স্থানটায় খুব ঘন বসতি, ডোবা-জঙ্গল কম, সে স্থলে ম্যালেরিয়া নাই; এমনও দেখিয়াছি, একই গ্রামে যে পাড়ায় খুব ঘন-বসতি, সে পাড়ায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই চলে; আর যে পাড়ায় বিরল বসতি, ঝোপ জঙ্গল বেশী, সেই পাড়াতেই যত ম্যালেরিয়া। এ জন্য প্রত্যেক গ্রামে বিস্তর গৃহস্থ চাই। বসতি বিরল হইলে জঙ্গল ত হইবেই; কারণ, দ্রুতবর্দ্ধনশীল আগাছা কে কত পরিষ্কার রাখিতে পারে? ঘন-সন্নিবিষ্ট বসতি থাকিলে সকলে নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন ভূমি পরিষ্কার রাখিলেই সমস্ত গ্রাম পরিষ্কার থাকিবে।

যে ম্যালেরিয়ার জন্য এত কাণ্ড, যে ম্যালেরিয়ার জন্য লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও কিছুই হইতেছে না, তাহা একরূপ বিনা চেষ্টাতেই দূর হইয়া যাইবে। কোন যোগ্যব্যক্তির অধীনে এ জন্য একটি পল্লীবাস-সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে একটি গ্রাম ধরিয়া সমিতি কার্য্য আরম্ভ করিবেন; তারপর ক্রমে ক্রমে কার্য্য বিস্তার করা যাইবে। এই পল্লীবাস-সমিতির যিনি সভ্য হইবেন তাঁহাকে পল্লীবাস অথবা পল্লীবাস-সমিতিতে সাহায্য করিতে হইবে। যাঁহারা পল্লীবাস করিতে ইচ্ছুক অথচ ম্যালেরিয়ার ভয়ে একা সাহস করেন না তাঁহারা এই সমিতির সভ্য হইবেন। এক সহস্র গৃহস্থ পূর্ণ হইলেই তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে একখানি পতিত গ্রাম অথবা সুবিধা মত গৃহ, জমি কিনিয়া সকলের অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী সকলকে গৃহ ও জমি

* মহিলাদের মনেও যে এ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। আমাদের মত লেখিকার সহিত অভিন্ন না হইলেও আমরা প্রবন্ধটী সাদরে প্রকাশ করিলাম। তঃ বোঃ সং

বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। সমিতির সভ্য হইবার পর সকলে নিজ নিজ অর্থ স্বীয় নামে যাহার যেখানে সুবিধা সেইখানে জমা রাখিবেন কেবল খাতাগুলি সমিতির অধ্যক্ষের নিকট রাখিতে হইবে। এমন স্থানে টাকা রাখিতে হইবে যেন ইচ্ছামাত্রই টাকা উঠাইয়া লওয়া চলে। সমিতির সভ্যগণই নিজ-গ্রামে একটি চিকিৎসালয় একটি বিদ্যালয় ও একটি বাজার পরিচালিত করিবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার সমস্ত পল্লীতেই বসতি স্থাপন করা যাইতে পারে। যে সমস্ত বড়লোকের পল্লীবাসের আবশ্যক নাই, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ দরিদ্র আত্মীয় একঘর নিজব্যয়ে পল্লীবাস করাইয়া এই পল্লী-বাস-সমিতির সাহায্য করিতে পারিবেন। অথবা কোন বড়লোক যদি নিজব্যয়ে দুই ঘর গৃহস্থকে পল্লীবাস করান তাহা হইলে সেই গ্রামের নাম তাঁহার নিজ নামে অথবা তাঁহার নির্ব্বাচিত নামে রাখা হইবে। ইহা নাম রাখিবার এক সুযোগ।

আজকাল পল্লীবাসে অনেকেই ইচ্ছুক হইয়াছেন, কারণ মধ্যবিত্ত লোকের সহরবাসে দুরবস্থার অন্ত নাই। যদি ৫০ টাকা আয় হয় তবে বাড়ীভাড়া দিতেই ১৫ টাকা যায় তার পর মাটি হইতে নিমপাতা পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতে হয়। ছেলে মেয়ের হাত ধরিয়া অসহায়ভাবে এবাড়ী সেবাড়ী করিয়া বেড়াইতে হয় তাহাতেও পয়সা খরচ মনের অশান্তি। দুগ্ধের উপকারিতার কথা সকলেই জানেন; তাহা সহরবাসী কয়জন খাইতে পান? বয়স্ক লোকের কথা ছাড়িয়া দিই; যাহাদের দুগ্ধই জীবন সেই শিশুরাই উদর পুরিয়া দুগ্ধ না পাইয়া দুর্ব্বল—রুগ্ন। সহরবাসী দরিদ্র ভদ্রলোকেরা যতদিন কাজ করিতে পারেন ততদিন একরূপ চলিয়া যায়, যদি দু-মাস অসুখে পড়িয়া কাজ করিতে না পারেন তবে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিতে হয়। আর যাহাদের কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে তাহাদের ইচ্ছা থাকিলেও সহরে বাড়ী করা অসম্ভব; কাজেই তাহাদের চিরদিন গৃহহীন হইয়াই থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে সুখ নাই, প্রাণে ভবিষ্যৎ ভরসা নাই; কোন গতিকে নিরানন্দ দিন গুলি কাটাইয়া দেওয়াই যেন ইহাদের একমাত্র কাজ।

দরিদ্র লইয়াই জাতি। সেই জাতীয় শক্তি দরিদ্রেরা যদি এমন ভাবে অর্দ্ধাশনে ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরন্তর ঋণভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে তবে কেমন করিয়া জাতীয় উন্নতি হইতে পারে? ইহারা যদি পল্লীবাস করিতে পায়, ইচ্ছামত ফলতরকারি গাছ লাগাইয়া দুটি একটি গরু রাখিয়া সুখে সংসার করিয়া দু-পয়সা সঞ্চয়ও করিতে পারে। হাতে পয়সা না থাকিলে শুধু শাক পাতা তুলিয়া দু-কুনকে চাউল রাঁধিয়াও গৃহস্থের দুদিন চলিয়া যাইতে পারে। কথায় কথায় এমন পয়সা খরচ করিতে হয় না। উদর পূর্ণ থাকিলে, ভবিষ্যৎ ভরসায় প্রাণটা উৎফুল্ল থাকিলে, তখন যদি দেশের উন্নতির কথা বল তাহা শুনিতেও ভাল লাগে আর তাহা করিতেও প্রাণ চায়; নচেৎ যাহারা পুত্রকন্যা লইয়া নিজে মরিতে বসিয়াছে তাহারা দেশের ও দশের উন্নতি করিবে কেমন করিয়া?

আবার যদি পল্লীবাস স্থাপিত হয়, ম্যালেরিয়া নিবারিত হয় তবেই পুষ্টকায় বাঙ্গালী শিশু ও অকালবৃদ্ধ বাঙ্গালী যুবকের যৌবন-লাবণ্য ফিরিয়া আসিবে; নচেৎ বাঙ্গালী মরিবে। আজকাল দেখা যায়, প্রায় সব কাজেই সকলে ধনীদের মাথায় সকল দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হন, যেন তাঁহাদের দোষেই আমরা দরিদ্র হইয়াছি; ধনীরা সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করিয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেই যেন লোকে সুখী হয়। কিন্তু তাহাতেই কি এই সীমাহীন জগদ্ব্যাপী অপার দারিদ্র্য-দুঃখ প্রশমিত হইবে। ধনীদের ত অন্ত নাই—ধনীদের সাহায্য দ্বারা উপকৃত হয় নাই এমন সৎকার্য্যই নাই। সকলেরই নিজের উন্নতির চেষ্টা নিজের করা উচিত। কেহ যদি পতিতকে তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন, তবে পতিতের সাহায্যকারীর হস্তে কম জোর দিয়া নিজের হাতে পায়ে বেশী জোর দিয়া উঠা উচিত। যে পতিত ব্যক্তি সাহায্য-কারীকে দেখিয়া একেবারেই হাত-পা ছাড়িয়া দেয় তাহাকে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

জাগর্য্যা।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
আজি সারা নিশি জাগি'
র'ব বাঞ্ছিতের লাগি'

রহিব তাঁহার ধ্যানে নিয়ত বিভোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
এমন চাঁদিনী রাতে
নীরব চরণ-পাতে
গোপনে একেলা আসে সে চতুর চোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
কি জানি কি আছে ভালে
এসে ফিরে কোন্ কালে
যাবে চলে ফাঁকি দিয়ে—হবে নিশি ভোর!
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
না আসে নিঠুর যদি
তা হ'লেও নিরবধি
র'ব চাহি পথপানে ব'বে আঁখি-লোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।
বিরহ বহিয়া বুকে
তাঁরি ধ্যানে র'ব সুখে
সেও ভালো, যাক্ দূরে এ ঘুমের ঘোর
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর।

গীতাধ্যায় সঙ্গতি।

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং ঋষির্নারায়ণোঽব্রবীৎ।*

মহাভারত, শান্তি. ২১৭. ২

কর্ম্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের দ্বারা কিংবা ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাত্মৈক্যরূপ সাম্যবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করা এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা না করিয়া সংসারে শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সর্ব্বদা করিতে থাকা, ইহাই এই জগতে মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ কিংবা জীবন যাপনের উত্তম মার্গ, এইরূপ ভগবদ্গীতায়, ভগবান্ কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে। তথাপি যে ক্রম-অনুসারে আমি এই গ্রন্থে এই অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গীতাগ্রন্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ায়, ভগবদ্গীতায় ইহার কিরূপ বিন্যাস করা হইয়াছে, এখানে তাহারও একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

কোনও বিষয়ের নিরূপণ দুই পদ্ধতি অনুসারে করা যাইতে পারে; এক, শাস্ত্রীয়, আর-এক পৌরাণিক। তন্মধ্যে সমস্ত লোকের সহজবোধ্য বিষয় হইতে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলতত্ত্ব কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তর্কশাস্ত্রানুসারে সাধক-বাধক প্রমাণ যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া তাহা দেখানো হইল শাস্ত্রীয় পদ্ধতি। ভূমিতিশাস্ত্র এই পদ্ধতির একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ; ন্যায়সূত্র কিংবা বেদান্তসূত্র—ইহাদের উপপাদনও এই বর্গের মধ্যে আসে। তাই ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তসূত্রের যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে তাহার বিষয়টি হেতুযুক্ত ও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়—"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" (গী ১৩. ৪)। কিন্তু ভগবদ্গীতার নিরূপণ শাস্ত্র হইলেও উহা এই পদ্ধতি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে করা হয় নাই। ভগবদ্গীতার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্জক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া তাহার পর "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" এইরূপ গীতানিরূপণের স্বরূপপ্রদর্শক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিরূপণ ও শাস্ত্রীয় নিরূপণের প্রভেদ স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাত্মক নিরূপণকেই পৌরাণিক নাম দিয়াছি। ৭০০ শ্লোকের এই সংবাদাত্মক বা পৌরাণিক নিরূপণে "ধর্ম্ম" এই ব্যাপক শব্দের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহার সবিস্তর বিচার আলোচনা করা কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু যত সংক্ষেপেই হউক না কেন, গীতায় অনেক বিষয় যাহা পাওয়া যায়, তাহাদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন করিয়া হইল ইহাই আশ্চর্য্য। ইহা দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে; এবং অনুগীতার আরম্ভে যে বলা হইয়াছে যে, গীতার উপদেশ "অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে" কথিত হইয়াছে তাহার সত্যতায় বিশ্বাস হয়। অর্জ্জুন যাহা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন তাহা পুনর্ব্বার সবিস্তর বলিবার কোন কারণ ছিল না। আমি যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিব কি না, এবং করিলেও কিরূপে করিব ইহাই তাঁহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তরে, দু'একটি যুক্তিবাদ দেখাইতে থাকিলে, অর্জ্জুন সেই সম্বন্ধে কোন-না-কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে ছিলেন। এই প্রকার প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদে গীতার বিচার-আলোচনা স্বভাবতই কখন তাঙ্গাভঙ্গি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর কখন বা পুনরুক্ত হইয়াছে। উদাহরণ যথা,—ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের বর্ণনা স্বরভেদে দুইস্থানে (গী, অ. ৭ ও ১৩) করা হইয়াছে; আবার, স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মভূত—ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও,

---

* "নারায়ণ ঋষি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক বলিয়াছেন।" নর ও নারায়ণ এই দুই ঋষিদের মধ্যেই এই নারায়ণ ঋষি ছিলেন; এবং এই দুয়েরই অনুক্রমে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেইরূপ আবার, নারায়ণীয় ধর্ম্মই গীতার প্রতিপাদ্য—এই সম্বন্ধে মহাভারতের বচন পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেকবার করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থ ও কাম যদি ধর্মকে না ছাড়ে তবেই তাহা গ্রাহ্য হয়, এই তত্ত্বের—"ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি (৭, ১১) এই একটি বচনেই গীতা ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার পরিণাম এই হয় যে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাবেশ করা হইলেও শ্রৌত ধর্ম, স্মার্তধর্ম, ভাগবত ধর্ম, সাংখ্য শাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, কর্ম বিপাক, ইত্যাদি যে সকল প্রাচীন সিদ্ধান্ত সমূহের আধারের উপর গীতার পরম্পরায় জ্ঞানের নিরূপণ করা হইয়াছে, সেই পরম্পরা যে ব্যক্তি অবগত নহে, গীতা পাঠ করিবার সময় তাহার মন ঘুলাইয়া যায়; এবং গীতার প্রতিপাদনের গতি কোন্ দিকে তাহা ঠিক্ উপলব্ধি করিতে না পারায় এই লোকদিগের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে যে, গীতা এক-প্রকার ভেল্কীবাজি, অথবা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, এবং সেইজন্ত গীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা নিদানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সংশয়নিবৃত্তির জন্ত টীকা দেখিতে গেলে বিশেষ লাভ হয় না; কারণ, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টীকাকারদিগের মতসম্বন্ধীয় পরস্পর-বিরোধের সমন্বয় করা দুর্ঘট হয় এবং পাঠকদের মন আরও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন সুপ্রবুদ্ধ পাঠকও এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন আমি জানি। এই বাধা যাহাতে না থাকে সেইজন্ত আমার নিজের ধারণা অনুসারে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস করিয়া এপর্য্যন্ত বিচার করিয়া আসিয়াছি। এখন এ স্থলে আর একটু ইহা বলিতে চাহি যে, এই বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে, অর্জ্জুনের প্রশ্ন কিংবা সংশয়ের প্রসঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক পরিমাণে কি প্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা বলিলে, এই বিচার-আলোচনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং পরবর্ত্তী প্রকরণে সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করা সহজ হইবে।

আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, বৈভব, যশ ও পূর্ণ-স্বরাজ্যের সুখ সম্ভোগ করিতেছে বলিয়া তাহার খ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছিল, তখন এক সর্ব্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী যশস্বী ও পরমপূজ্য ক্ষত্রিয়, অন্য মহাধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়কে ক্ষাত্রধর্ম্মানুযায়ী স্বকর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, এই দুজনও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাপি ইহাঁরা উভয়েই বৈদিক ধর্ম্মের কেবল সন্ন্যাস-মার্গকেই স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত বর্ণের সম্মুখে যেরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া-ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ করেন নাই; কারণ, ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ এই যে, শুধু ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাহ্মণ-দিগকেও নিবৃত্তিমার্গের শান্তির সহিত, নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবার প্রযত্ন করিতে হইবে। যে কোন উপদেশই হউক না কেন, তাহার কোন-না-কোন কারণ অবশ্যই থাকে; এবং সেই উপদেশের সফলতা চাহিলে, শিষ্যের মনে উক্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জ্জন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাই, এই দুই বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্য ব্যাসদেব গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিবার কি কারণ হইয়াছিল, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই বিলম্ব আছে; ইতিমধ্যে অর্জ্জুনের কথা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথ উভয় সৈন্যের মাঝ-খানে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন এবং অর্জ্জুনকে বলিলেন, "যাহাদের সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভীষ্ম দ্রোণাদিকে দেখ"। তখন অর্জ্জুন উভয় সৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপন বাপ, কাকা, পিতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রভৃতি দুইদিকে ভরিয়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! যুদ্ধ কিছু একেবারেই উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধ করা পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল এবং উভয় পক্ষেরই সৈন্য সংগ্রহ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পরস্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ যখন সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার ন্যায় মহাযোদ্ধারও তাহা খারাপ লাগিল এবং তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল "রাজ্য-লাভের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় আমরা করিতে বসিয়াছি; ইহা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেয়স্কর নহে?" এবং পরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে "শত্রুরা আমার প্রাণবধ করিলেও আমার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা গুরুহত্যা ভ্রাতৃ-হত্যা বা কুলক্ষয়ের ন্যায় মহাপাপ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।" অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হাতপা শিথিল হইয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, বিষণ্ণ বদনে হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ নিঃক্ষেপ করিয়া বেচারা রথে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন—এই কথা প্রথম অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়কে "অর্জ্জুনবিষাদ-যোগ" বলে। কারণ, সমস্ত গীতায় ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত (কর্ম্ম)-যোগশাস্ত্র নামক একই বিষয় প্রতিপাদ্য হইলেও, প্রত্যেক অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্যরূপে বিবৃত করা হইয়াছে তাহাকে এই কর্ম্ম-

যোগশাস্ত্রেরই এক অংশ মনে করিয়া প্রত্যেক অধ্যায়কে তাহার বিষয়ানুসারে অর্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ এইরূপ বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং এই সমস্ত 'যোগ' একত্র হইলে পর তাহাই "ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্ম্মযোগশাস্ত্র" হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্ব কি, তাহা আমি এই গ্রন্থের আরম্ভে বলিয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে কি প্রশ্ন উপস্থিত তাহা ঠিক না জানিলে সেই প্রশ্নের উত্তরও সম্যক্‌রূপে মনে আসে না। সাংসারিক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবদ্‌ভজনেই প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা,—ইহাই যদি গীতার তাৎপর্য্য বলিতে হয়, তাহা হইলে অর্জুন যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে তখনই প্রস্তুত থাকায় তাঁহাকে এই উপদেশ দিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। প্রথম অধ্যায়ের শেষে "বাঃ! বড় উত্তম কথা বলিয়াছ; চল, আমরা দুজনেই এই কর্ম্মময় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন করি!" এইরূপ অর্থের দুই একটা শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিয়া সেই স্থানেই গীতা সমাপ্ত করা উচিত ছিল। আবার এদিকে যুদ্ধ হইয়া গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বৎসর কাল (মভা. আ. ৬২. ৫২) যদি আপন বাণীর দুর্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে তাহার দোষ বেচারী অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে সমবেত শত শত মহারথী অর্জুনকে ও শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিতেন সত্য, কিন্তু যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে সে এইরূপ উপহাসকে অল্পই ভয় করিবে! জগতের লোক যাহাই বলুক না; "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জা. ৪)—যখনই উপরতি হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব করিবে না—এইরূপ উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে। অর্জুনের উপরতি জ্ঞানমূলক ছিল না মোহমূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও উপরতিই তো হইয়াছিল; ইহাতেই অর্দ্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই উপরতিকেই সম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক করা ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন কারণে সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিলে সেই বিতৃষ্ণার দরুণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার অনেক উদাহরণ ভক্তিমার্গে বা সন্ন্যাসমার্গেও আছে। অর্জুনেরও এই প্রকার দশা হইত। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বস্ত্র গেরুয়া করিবার জন্য এক মুঠা গেরুয়া মাটি কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্য তাল মৃদঙ্গাদি সরঞ্জামও সমস্ত কুরুক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে।

কিন্তু সেরূপ কিছুই না করিয়া বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন—"অর্জুন, তোমার এই দুর্বুদ্ধি কি করিয়া আসিল? এই ক্লৈব্য তোমার শোভা পায় না! ইহা তোমার কীর্ত্তিনাশ করিবে! অতএব এই দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও!" তথাপি অর্জুন কাপুরুষের ন্যায় পুনর্ব্বার প্রথমেই কাঁদার সুর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে বলিলেন—"আমি ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহাত্মাদিগকে কি করিয়া বধ করিব? মরা ভাল কি মারা ভাল, এই সংশয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে; অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে বলো; আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি"। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অর্জুন মায়ার বশীভূত হইয়াছেন; এবং একটু হাসিয়া "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিয়াছিলেন এবং কর্ম্মসন্ন্যাসের কথাও পাড়িয়াছিলেন। তাই, জগতে 'কর্ম্মত্যাগ' ও 'কর্ম্মসাধন'—জ্ঞানীপুরুষদিগের এই যে দুই আচরণ-পন্থা অর্থাৎ নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইতেই ভগবান নিজের উপদেশ সুরু করিলেন; এবং এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন একটী নিষ্ঠা গ্রহণ করিলেও তুমি ভুল করিতেছ ইহা অর্জুনের প্রতি ভগবানের প্রথম উক্তি। তাহার পর, যে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যনিষ্ঠার উপরে অর্জুন কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বলিতেছিলেন সেই সাংখ্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে "এষা তেঽভিহিতা বুদ্ধিঃ" (গী. ২. ১১-৩৯) পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেন; এবং আবার অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, কর্ম্মযোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধই তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য এইরূপ অর্জুনকে বলিয়াছেন। "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" এইরূপ শ্লোক "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং"—এই শ্লোকের পূর্ব্বে যদি আসিত তাহা হইলে এই অর্থই অধিকতর ব্যক্ত হইত। কিন্তু সম্ভাষণের প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমার্গের প্রতিপাদন হইলে পর উহা এইরূপে আসিয়াছে—"ইহা সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদিত হইল; এক্ষণে যোগমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন করিতেছি"। যাহাই হউক না, অর্থ একই: সাংখ্য (বা সন্ন্যাস) ও যোগ (বা কর্ম্মযোগ) ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১ প্রকরণে প্রথমেই আমি স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি। অতএব তাহার পুনরুক্তি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানলাভ হইলে পর মোক্ষের জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই 'সাংখ্য'মার্গ বলে; এবং কর্ম্ম কদাপি ত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকাকেই যোগ কিংবা কর্ম্মযোগ বলে।

ক্রমশঃ

লিঙ্গায়তধর্ম্মে নীতিপ্রসঙ্গ।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

অতঃপর বাসবার নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব। বসবা বলিয়াছেন—ধর্ম্ম কতকগুলি নিয়ম এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ নহে। চরিত্রগঠন ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। কদাপি মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবে না।

"তোমরা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। নানা দেবতার দিকে ধাবিত হইও না। তোমরা শিবমন্ত্র শিক্ষা করিয়াছ, চরিত্র-নীতি শিক্ষা করিয়াছ, তথাপি যদি তোমরা সেই সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে সেই কপটতার জন্য তোমা-দিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে।—ঐ ৯২।

"কুষ্মাণ্ডকে লৌহ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কি উহা পচিয়া নষ্ট হইবে না? কুচরিত্র ব্যক্তি বাহ্যিক ধর্ম্ম কর্ম্মে আবৃত থাকিলে কিরূপ প্রকৃত ধর্ম্ম মার্গ অধিকার করিতে পারিবে?—ঐ ৯২।

"তুমি গোময় দ্বারা একটি গণেশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে যেমন গোময়ের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় না, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিকে বারংবার ধৌত করিলে যেমন তাহার মৃণ্ময়ত্ব নষ্ট হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি পার্থিব সৃষ্ট পদার্থের প্রতি সর্ব্বদা ধাবিত হয় তাহাকে শিবদীক্ষা বা ব্রহ্মজ্ঞান দিলে সে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারে না। ঐ ৯৩।

"যে ব্যক্তির কর্ম্ম তাহার জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করে, যে ব্যক্তি নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে, আমি সেরূপ ব্যক্তিকে চাহি না। ঐ ৯৫।

"যাহারা ক্রুর ও কপটহৃদয় কিন্তু মুখে সরলতার ভান করে, তাহাদিগের সহিত আমার সম্পর্ক নাই। তাহারা লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত নহে। তাহারা কেবল পার্থিক সুখের অভিলাষী বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে পরি-ত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাহারা ঈশ্বরের ধারণা করিতে অসমর্থ হয়। ঐ ৯৬।

"যদি কাহারও গৃহের দ্বারদেশ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ থাকে তাহা হইলে কি সে সেই গৃহের মধ্যে বাস করিতে পারে? সেইরূপ ঈশ্বরও আবর্জ্জনা পূর্ণ (কুপ্রবৃত্তিগত) মনের মধ্যে থাকিতে চান না। ঐ ৯৭।

"যাহার ভিতর এবং বাহির পবিত্রতাপূর্ণ নহে ঈশ্বর তাহাকে কৃপা করেন না। বরং তাহার সেই পঙ্কিল মনের জন্য তাহাকে বারংবার জন্মমৃত্যুর মধ্যে পরিভ্রমণ করান। ঐ ১০২।

"প্রস্তরখণ্ডকে অধিকক্ষণ জলমধ্যে রাখিলে কি তাহার কাঠিন্য নষ্ট হয়? সেইরূপ অপবিত্র মনে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কি ফল? ঐ ৯৯।

"বল্মীক-স্তূপের উপর আঘাত করিলে কি তন্মধ্যস্থিত সর্প আহত হয়? সেইরূপ মন পবিত্র না করিয়া কঠিন ব্রত সংযমের দ্বারা কি ফল হইবে? ঈশ্বর সেই কপট ভক্তকে কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? ঐ ১১৭।

"কেন তুমি লোককে বৃথা উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছ। প্রথমে নিজের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সাধন কর। যাহারা নিজের (আধ্যাত্মিক) উন্নতি না করিয়া অপরের জন্য দুঃখ করে সেই সকল কপটদিগকে আমাদের প্রভু ঈশ্বর কখনই ভালবাসেন না।" ঐ ১২৪।

"ভেক যেমন সর্পের মুখমধ্যে থাকিয়াও ক্ষণিক সুখের জন্য সম্মুখস্থ মক্ষিকার প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ তুমিও তোমার অনিত্য মরণশীল দেহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষণিক পার্থিব সুখের জন্য লালায়িত রহিয়াছ। চোর যেমন কারাগারে যাই-বার সময় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করে তোমার অবস্থাও সেইরূপ। আমাদের ঈশ্বর এই-রূপ আত্মপ্রবঞ্চকদিগকে চান না।" ঐ ১৩০।

"যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত নহে তাহার নিকট বাস করিও না, তাহার সহবাসে থাকিও না, তাহার সহিত একত্রে যাত্রা করিও না, এমন কি দূর হই-তেও তাহার সহিত বাক্যালাপ করিও না। প্রকৃত ভক্তের গৃহে দাসত্ব করাও দশগুণে শ্রেয়ঃ। ঐ১৩৩।

"যে সকল লোক জিহ্বার সুখের জন্য মদ্য এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করে তাহার জীবনে ফল কি?" ঐ ১০৬।

———

লর্ড বিশপের শ্রাদ্ধ বাসরে।

(শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ)

জীবিতকালে যে মানুষটিকে আমরা শ্রদ্ধা করেছি, মৃত্যুর পরেও তাঁকে প্রীতির সহিত স্মরণ করতে ভাল লাগে; তাঁর বিচ্ছেদের দুঃখ আমরা এই উপায়ে বিস্মৃত হই, আর স্মৃতির মধ্যে সঞ্জীবিত করে তাঁকে ইহজীবনের সঙ্গীস্বরূপে লাভ করি। যিনি চলে গিয়েছেন তাঁকে অমর করে রাখবার একমাত্র উপায়, তাঁকে বারম্বার স্মরণ করা। এই উদ্দেশ্যেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

আজ যে মহানুভব ব্যক্তির স্মৃতিসভায় আমরা প্রীতি ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে সমবেত হয়েছি তিনি বিদেশীয়, ভিন্ন জাতীয়, আর স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী, তবু সহৃদয়তা ও সহানুভূতির গুণে তিনি বঙ্গবাসী কেন, ভারতবর্ষীয়মাত্রেরি একান্ত আত্মীয় হয়েছিলেন। লর্ড বিশপ ডাক্তার লেফ্রয় যে বৎসর প্রথম কলিকাতায় আসেন তার অল্প-দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমা-দের ঘটেছিল। প্রথম দিনই তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি, সৌজন্য, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশেষ তাঁর ঐকান্তিক মাতৃভক্তি আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে-ছিল। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরে তাঁর ধর্ম্ম নিষ্ঠা, অগাধ পাণ্ডিত্য, খৃষ্টশিষ্যের উপযোগী পরদুঃখ-কাতরতা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা গুণের কথা ভাল করে জানবার সুযোগ হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম পরি-চয়ের-দিনে তিনি আপন মায়ের সম্বন্ধে যে কথা গুলি বলেছিলেন এখনও সে কথাগুলি মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মায়ের কথা বলবার সময় তিনি যেন শিশুর মত হয়ে যেতেন; তাঁর কথা বলতে হলেই বলতেন My mother was an angel মা আমার দেবী ছিলেন। পাছে মায়ের কোনরূপ কষ্ট কি অসুবিধা হয়, তাই তিনি চির-কৌমার ব্রতধারী ছিলেন। যে ছেলেরা মাতৃভক্ত হয়, দেখা যায় তারাই নারীজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা যাতে প্রসর লাভ করে, সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ মেয়েদের ডাইওসিজান কালেজে তিনি তাঁর অনেক ঐশ্বর্য্য দান করে গিয়েছেন। এ কাজ তাঁর হৃদয়ের উদারতার পরিচায়ক—এই কালেজও ইংরাজ মেয়ে এমন কি শুধু খৃষ্টান মেয়েদের জন্যেই নয়, এখানে সকল ধর্ম্মের সমস্ত জাতির মেয়েই শিক্ষা লাভ করে থাকে। খৃষ্টান অপেক্ষা ভিন্ন জাতি ও অন্য ধর্ম্মের ছাত্রই অধিক। এখানকার এই স্কুল এবং কালেজের পারিতোষিক বিতরণের সভায় প্রতি বৎসরই তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন। উপদেশ দিবার সময় মেয়েরা যাতে ভাল মা হতে পারেন, সেই শিক্ষাই তাদের বিশেষ শিক্ষা, এই কথাটি বলতে কখনো ভুলতেন না—নিজের কথা বলে বলতেন, "আমি যদি কোন সদ্‌গুণের অধিকারী হয়ে থাকি, সুশিক্ষা লাভ করে মানুষনামের যোগ্য হতে পেরে থাকি সে সবই আমার মায়ের অনুগ্রহে—তাঁরি শিক্ষা ও যত্নে"। জাতিকে উন্নত করতে হলে মায়েদের সুশিক্ষা হওয়া প্রথম আবশ্যক এই ছিল তাঁর দৃঢ় মত এবং বিশ্বাস; তাই এদেশের মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য প্রভূত সম্পত্তি দান করে তিনি সেই মতের সম্মান রক্ষা করে গিয়েছেন। এই দানই তাঁর নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন আর এই হতভাগ্য দেশের প্রতি একান্ত প্রীতির পরিচয়।

ইউরোপে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেল, সেই প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেছিলেন, আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, খৃষ্টশিষ্য হয়েও আমরা দারি-দ্র্যের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখিনি; এ যুদ্ধের আবশ্য-কতা ছিল, আর যদি আমরা এই যুদ্ধ হতে জীবনের যথার্থ মূল্য বুঝতে পারি, যদি শিখতে পারি, ধর্ম্ম প্রথম, ক্ষমতা তার অনেক নীচে তবেই এ যুদ্ধের সব দুঃখ সার্থক হবে। ১৯১৭ সালের খৃষ্টের জন্মদিনে উপাসনামন্দিরে তিনি জর্ম্মানদিগেরও জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি যথার্থ সাধু, ভক্ত এবং বিশ্বাসী। যুদ্ধের সংস্রবে বার্ষিক উপাসনার দিনে যেভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে ভারত-প্রবাসী ইংরাজ সন্তুষ্ট হয় নাই। কিন্তু সেজন্য তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না, তিনি শত্রুর জন্যও ভগবৎ-কৃপা প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি যথার্থ খৃষ্টভক্তের ন্যায়ই নির্ভীক হৃদয়ে বলিয়াছিলেন শত্রুকেও প্রীতি এবং মার্জ্জনা করিতে হইবে।

এদেশের ছোট বড় সকলেরি প্রতি তাঁহার

আন্তরিক প্রীতি ছিল। একবার একটি জৈন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন—কয়েক জন উৎসাহী যুবক পল্লীর চামার ছেলে মেয়েকে একত্র করিয়া সন্ধ্যাকালে শিক্ষা দিতেন, এবং নির্দোষ আমোদে অভ্যস্ত করিয়া তাদের পানদোষ প্রভৃতি সংশোধন করিতেছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী; সভা শেষ হইবার পূর্ব্বে ডাক্তার লেফ্রয় যে সুন্দর সরল সহজ উর্দ্দুতে তাদের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা যাহারা শুনিয়াছিল, নিশ্চয়ই আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। বিদেশীর মুখে এমন পরিষ্কার উর্দ্দু এমন সহৃদয় কথা ক্বচিৎ শোনা যায়। তিনি দিল্লীতে বহুকাল ছিলেন। চামারদিগকে উন্নত, ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য তিনিও সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহারা সমাজে সকলের উপেক্ষিত হেয়, তাহাদের জন্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাহাদিগের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট হইয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বদেশের লোক যাহাদের দূরে রাখে, তাহাদের দুর্দ্দশার কথা একবার মনেও করে না; বিদেশীর প্রাণ যদি তাহাদের জন্যই ব্যথিত হয়, ব্যাকুল হয়, তবে সে প্রাণ যে মহৎ প্রাণ,সে হৃদয় যে ভগবদ্ভক্তের উদার হৃদয় ছিল সে বিষয় আর সন্দেহ কি? এক একটি মানুষ জন্মে যাঁহাদের জাতি বর্ণ গোত্র ধর্ম্ম দেশ থাকিলেও তাঁহারা তাহারি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না উদার হৃদয়ের সহানুভূতির বলে বিশ্বমানবের আত্মীয় পদবীতে উন্নীত হয়েন। ডাক্তার বিশপ লেফ্রয় ছিলেন সেই পর্য্যায়ের মানুষ—তিনি বিদেশী হইয়াও আজ স্বদেশীর অপেক্ষা আমাদের আত্মীয়। খৃষ্টান হইয়াও তিনি কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমন্দিরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দূরে বসিয়া নাই; দেশে কালে যুগে যুগে যে একমাত্র ধর্ম্মকে মানুষের মন চিরদিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে,—ক্ষমার ধর্ম্ম, দয়ার ধর্ম্ম, ন্যায়ের ধর্ম্ম—সেই চিরন্তন ধর্ম্মের অধিকারী মানব, মৈত্রী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তিনি, তাই আজ তাঁর স্মৃতিসভায় আমাদের হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি উদ্দেশে নিবেদন করিয়া চরিতার্থতা বোধ করিতেছি।

যিনি জীবের চরম গতি ও পরম আশ্রয় তিনিই তাঁহার আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন।

বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

বাঙ্গালা ভাষার মূল কি? কোথা হইতে উহার উৎপত্তি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ অনুসন্ধানের ফলে মনীষিবৃন্দের দুই প্রকার অভিমত দেখা যায়। কাহারও মতে বাঙ্গালাভাষা প্রাকৃতভাষা হইতে উৎপন্ন, কাহারও মতে সংস্কৃত ভাষাই ইহার জননী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু এই উভয় মতেই ইহার স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক নিজস্বের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। এই উভয় মতের মধ্যে একটিরও সমীচীনতা অনুভূত হয় না। কারণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ বঙ্গদেশ সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য দেশ হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াও কেবল ভাষাবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরতন্ত্র, একথা কিছুতেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যায় না। অতএব উহার মূলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিচার বিতর্কের দ্বারা স্থির করা আবশ্যক। এই দেশ কখনও নির্ম্মনুষ্য ছিল না। দেশান্তর হইতে আগত অধিবাসী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহাকে জনাকীর্ণ করিয়াছে, এরূপ কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্যুত স্মরণাতীত কাল হইতেই এই দেশে জনতার অধিষ্ঠানের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ থাকিলেই তাহার একটি ভাষাও থাকে, সুতরাং আদিম অধিবাসীদিগের কোন না কোনরূপ ভাষা ছিল বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। সেই ভাষার সহিত ইদানীন্তন ভাষার কতটুকু সম্বন্ধ আছে, ইহার নিজস্বই বা কতটুকু, প্রথমতঃ তাহাই বিচার্য্য।

প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে দুই প্রকার ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি আর্য্য ভাষা, অপরটি ম্লেচ্ছ ভাষা নামে অভিহিত হইয়াছে। দেবভাষা, দৈবী বাক্, যজ্ঞীয় বাক্ শব্দ ইত্যাদি আর্য্য ভাষারই নামান্তর। পক্ষান্তরে, ম্লেচ্ছভাষা, অপশব্দ অযজ্ঞীয় শব্দ প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে।

যে সময়ে সভ্যজগতে যাগযজ্ঞের বাহুল্য ছিল, ঐ সময়ে ভাষাগত এই দ্বিবিধ পার্থক্যেরই পরিচয়

পাওয়া যায়। যজ্ঞ সময়ে যাজ্ঞিকগণ অপশব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা আছে। মহাভাষ্যকার এই বিষয়ে একটী ব্রাহ্মণ বাক্য প্রদর্শিত করিয়াছেন। যথা—

"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ"। ইহার অর্থ—যদি আহিতাগ্নি দ্বিজাতি অপশব্দের প্রয়োগ করেন, তবে সারস্বত যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যাজ্ঞিকগণ এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ তাহাদের ইহাই আদেশ। এইরূপ স্থলে আচার্য্য গোভিলও ক্রমে তিনটি সূত্র পাঠ করিয়াছেন। যথা—(১) ভাষেত যজ্ঞসংসিদ্ধিং। (২) নাযজ্ঞীয়াং বাচং বদেৎ। (৩) যদি অযজ্ঞীয়াং বদেৎ বৈষ্ণবীমৃচং যজুর্ব্বাজপেৎ। ইহাদের স্থূল অর্থ—যজ্ঞসময়ে ব্রহ্মারূপে পরিকল্পিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদনের উপযোগী উপদেশ সংস্কৃত বাক্যের দ্বারা করিবেন, যদি তিনি অযজ্ঞীয় বাক্য অর্থাৎ অসংস্কৃতবাক্য উচ্চারণ করেন, তবে বৈষ্ণবী ঋক্ অথবা যজুর্মন্ত্র জপ করিবেন। এই বিষয়ে পাণিনীয় ভাষাবৃত্তির টীকাকার সৃষ্টিধরাচার্য্যও একটি বৃহস্পতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

"নাসংস্কৃতাং বদেদ্বাণীং কর্ম্মকুর্ব্বন্নযজ্ঞীয়াং
যজ্ঞেঽপশব্দভাষী তু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥

অর্থ—যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান সময়ে যজ্ঞকর্ত্তা অসংস্কৃতবাক্য প্রয়োগ করিবেন না; যদি অপশব্দ প্রয়োগ করেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

ব্যাকরণের প্রয়োজন কথন প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার আর একটী বৈদিক বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই—"তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছোহথ বা এষ যদপশব্দঃ ম্লেচ্ছামাভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণং" ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন অর্থাৎ অপশব্দ ব্যবহার করিবে না; কারণ যিনি অপশব্দ ব্যবহার করেন তিনিই ম্লেচ্ছ; আমরা ম্লেচ্ছ হইব না, এই উদ্দেশ্যেই ব্যাকরণ পাঠ করা কর্ত্তব্য। মনুসংহিতাতেও ম্লেচ্ছভাষা এবং আর্য্যভাষা এই দুই প্রকার ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আর্য্যভাষা বা সংস্কৃত ভাষার অতিরিক্ত যাবদীয় ভাষাই ম্লেচ্ছভাষা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অতএব ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মানবসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ এবং অপশব্দ চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন মনীষীর মতে বৈদিক ভাষাই আদিম মানবদিগের সমস্ত ব্যবহার-সম্পাদক ভাষা। আপাতত ইহার অনুকূলরূপে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটি শ্রুতি উল্লেখযোগ্য। যথা—সোঽকাময়ত দ্বিতীয়োমে আত্মা জায়তেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ॥ সেই প্রসিদ্ধ মৃত্যু অর্থাৎ ঈশ্বর কামনা করিয়াছিলেন, আমার দ্বিতীয় আত্মা অর্থাৎ শরীর হউক, যাহাতে আমি শরীরী হইতে পারি, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বেদবাক্যের সহিত অর্থাৎ বেদে যে সকল শব্দ রহিয়াছে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া মিথুন-ভাব (স্ত্রী-পুরুষ ভাব) ধারণ করিলেন অর্থাৎ বেদপ্রসিদ্ধশব্দানুসারে বস্তুজাতের নাম কল্পনা করিয়া ক্রমে সৃষ্টিব্যাপার আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দ্বারা যেমন সন্তানের উৎপাদন হয়, তেমনই ঈশ্বর ও বাক্য এতদুভয়ের দ্বারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। ভগবান্ মনুর উক্তিও এই মতের সমর্থন করিতেছে।

"সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে"

অর্থ—সেই মহেশ্বর সৃষ্টির আদি সময়ে সমস্ত প্রাণিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ সংস্থান ও কর্ম্ম বেদশব্দ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শারীরক মীমাংসাতেও এইমত সমর্থিত হইয়াছে। বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণের তত বাঁধন নাই, "কর্ণৈঃ কর্ণেভিঃ দেবাঃ দেবাসঃ" ইত্যাদি অনেক যাদৃচ্ছিক প্রয়োগ বৈদিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে এই ভাষাকেও সাধু করিবার জন্য প্রযত্নের ত্রুটি হয় নাই, তথাপি এমন কোনও রীতি অবলম্বিত হয় নাই, যাহার ফলে লৌকিক প্রয়োগের মত বৈদিক প্রয়োগ অব্যভিচরিতভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। বৈদিক প্রক্রিয়ার অনেক সূত্রেই দেখা যায় "ছন্দসি বহুলং" এই এক ঘেঁয়ে সুরের কথার দ্বারা বেদে প্রযুক্ত অশুদ্ধ প্রয়োগের সাধুত্ব কীর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। মানবজাতির সভ্যতাবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণাদির উদ্ভাবন হইয়াছে, এবং তাহার ফলে ভাষার সংস্কার অর্থাৎ পরিমার্জ্জন হইয়াছে। এই আগন্তুক সংস্কারের

ফলেই ইহার সংস্কৃত ভাষা এই নাম হইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণের দ্বারা সংস্কার লাভ করিয়া ভাষা সংস্কৃত নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত সহজে মানিয়া লইবার উপায় নাই। কারণ যদি বেদের ভাষাকে অসংস্কৃত বলা যায়, তবে "যজ্ঞসময়ে অসংস্কৃত কথা বলিবে না" এই নিষেধ বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বেদের মন্ত্র ছাড়িয়া দিলে যজ্ঞনির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ বেদের ভাষা সংস্কারবর্জ্জিত নহে; প্রত্যুত উদাত্তাদি স্বরভেদের নিয়ম বেদমন্ত্রেই প্রভূতরূপে পালনীয়। ব্যাকরণকেও বেদপরবর্ত্তী আগন্তুক বলিবার উপায় নাই, কারণ বেদবাক্যেই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভাষ্যকার দেখাইয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ ইহা নিষ্কারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহার কোনও কাম্য ফল নাই, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই মনে করিয়া ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিবেন, এবং বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবেন (১), এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। ষড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান অঙ্গ। এই শ্রুতিমূলক মীমাংসাদর্শনে এবং মীমাংসা সম্প্রদায়ের বিবিধগ্রন্থে নানারূপ বিচার ও মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাকরণকে ভাষার সংস্কারক আগন্তুক বলিয়া স্থির করা যায় না। যদি এই মত স্থির হয়, তবে এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ব্যাকরণাদি পাঠের দ্বারা যাহার বুদ্ধি এবং বাগিন্দ্রিয় সংস্কৃত অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, তাদৃশ মানবই এই ভাষার ব্যবহারে সমর্থ হয়, হয়ত এইরূপ উপায়গত সংস্কৃতত্ব উপেয় পদার্থে উপচরিত হইয়া ভাষাকে সংস্কৃত নাম প্রদান করিয়া থাকিবে। অথবা ব্রহ্মা পূর্ব্বতন সংস্কারানুসারে বেদভাষার উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধনই ভাষার "সংস্কৃত" নাম সিদ্ধ হইয়াছে। বৈদিক ভাষা হইতেই অপভ্রংশ বা প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকেই এই মতের পক্ষপাতী।

সংস্কৃতরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ মূল হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন ভাষার "প্রাকৃত" এই সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত গ্রন্থেও এই নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত প্রাকৃত বিবিধ ব্যাকরণের রচয়িতা এবং "কলিকাল সর্ব্বজ্ঞ" বিশেষণে বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার এই নিরুক্তি যুক্তিসহ বলিয়া মনে না। কারণ এমন অনেক প্রাকৃত শব্দ আছে, যাহাদের সহিত সংস্কৃত শব্দের অতি দূরসম্পর্কও অনুভূত হয় না; বিশেষতঃ তিনিও বৃহৎ মাগধী ব্যাকরণে "ন দেশ্যাস্য" এই সূত্রে বলিয়াছেন যে দেশ্য অর্থাৎ তত্তদ্দেশপ্রসিদ্ধ প্রাকৃত শব্দের অনুশাসন (সূত্র) হইতে পারে না। যদি সংস্কৃতই সমস্ত প্রাকৃতের মূল হয়, তবে "দেশ্য" নামক স্বতন্ত্র শব্দের অস্তিত্বই অসম্ভব। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচার্য্য দণ্ডীর মতেও সাহিত্যে প্রচলিত শব্দগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে (২), তৎপর প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃতোৎপন্ন, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিনপ্রকার ভাগ করা হইয়াছে (৩)। সুতরাং সংস্কৃত গন্ধরহিত দেশী প্রাকৃতের স্বতন্ত্র সত্তা স্পষ্টতই বিঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার মতে গোয়াল জেলে চাণ্ডাল প্রভৃতির ভাষা কাব্য শাস্ত্রে অপভ্রংশ নামে পরিভাষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অর্থাৎ বেদানুসারী গ্রন্থে সংস্কৃত ভিন্ন যাবতীয় ভাষাই অপভ্রংশ নামে কথিত হইয়াছে (৪)। অতএব সুধীগণ ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে সংস্কৃত গন্ধরহিত দেশপ্রচলিত শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সন্দেহ হইতেই পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যেমন হিন্দীভাষায় বিভিন্ন দেশবাসীর মনোগতভাবের আদান প্রদান হয়, পক্ষান্তরে এক প্রদেশের চলতি ভাষা অপরদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, পূর্ব্বকালেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর পরস্পর কথোপকথনে ব্যাকরণ-নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। ছাত্রদিগকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য দেশভাষারও ব্যবহার হইত, কারণ দেশভাষায় মনের ভাব যতটা প্রকাশ পায়, অন্য কোনও ভাষাতেই ততটা প্রকাশ হইতে পারে না। এমন কি শিবধর্ম্মের একটি বচনে দেশভাষা ছাত্র বুঝাইবার একটি উপায়রূপে নির্দিষ্ট

(১) ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয় ইতি।

(২) তদেতদ্বাঙ্ময়ং নাম সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যাশ্চতুর্বিধম্।

(৩) তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ।

(৪) আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষ্বপভ্রংশ ইতি স্মৃতাঃ।
শাস্ত্রেষু সংস্কৃতাদন্যদপভ্রংশতয়োদিতম্।

হইয়াছে। তাহার অর্থ এই—"যিনি সংস্কৃত প্রাকৃত এবং দেশভাষা ও অন্যান্য উপায়ের দ্বারা শিষ্যকে বুঝাইতে পারেন, তিনি গুরু নামে অভিহিত হন (১)। প্রকৃতির নিয়মানুসারে মুখ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উচ্চারিত বলিয়া এই ভাষা প্রাকৃত নামে পরিচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জলবায়ুর পার্থক্য অথবা অন্য কোনও অপরিজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণেই যে দেশভেদে বাগ্‌বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। সুতরাং দেশভাষা মাত্রই সাধারণতঃ প্রাকৃত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। অধুনা বাঙ্গালা ভাষাকেও ব্যাকরণের দ্বারা অনেকটা শোধিত করিয়া বিভিন্ন দেশবাসী বাঙ্গালীর বোধগম্য একটি ভাষারূপে পরিণত করা হইতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষার সংস্কার হয় নাই, এবং হইতে পারেও না; সর্ব্বজনীন প্রাকৃতের সহিত দেশ্য প্রাকৃতের এইরূপ প্রভেদ বিবেচিত হইয়াছিল। এই হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাও একপ্রকার প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পরমার্থতঃ বাঙ্গালাভাষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশুদ্ধ প্রাকৃত হইতে অথবা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ ইহার অন্যনিরপেক্ষ প্রভূত "নিজস্বের" পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রত্যেক ভাষারই উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেশজ কোনও ভাষাই সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত প্রাকৃত অথবা অন্য কোনও ভাষা হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই। কোনপ্রকারে ইহার আত্মলাভ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ আসিয়া ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য সকল ভাষারই ভিত্তি সচল, ইহার প্রমাণ অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সচল ভাষা এক শতাব্দীর মধ্যেই যে কতদূর রূপান্তরিত হইয়া থাকে, আমাদের বঙ্গভাষাই তাহার প্রকৃত নিদর্শন। রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের লেখনীপ্রসূত বাঙ্গালা হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গলার প্রভূত প্রভেদ ঘটিয়াছে। সেকালের "আপনকার" বর্ত্তমানে "আপনার"রূপে পরিণত হইয়া ককারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা, এই তিন ভাষার স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় যে মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি বর্ণের তিরোভাব, স্বরসন্ধি, পূর্ব্বাপর স্বরের একীভাব ও বর্ণের স্থান পরিবর্ত্তন, এই ত্রিবিধ ভাষারই যেন সাধারণ। প্রাকৃত ব্যাকরণের একটি সূত্র আছে "ক গ চ জ তদ পয় বাং প্রয়োলোপঃ" ইহার অর্থ অনাদিস্থিত অসংযুক্ত এই কয়টি বর্ণের প্রায়ই লোপ হয়, অর্থাৎ অনেক স্থলেই ইহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অপর একটি সূত্রানুসারে (৪।১ প্রাকৃত প্রকাশ) সন্ধির প্রসক্তিস্থলে একস্বরের স্থানে অপর স্বর হয়, এবং কোন কোন স্থলে পূর্ব্বস্বরের লোপ হইয়া যায়। ইহা প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ পররূপ বা একীভাব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। যেমন দেব × কুলং = দেউলং। পূর্ব্বপ্রদর্শিত সূত্রানুসারে বকারের তিরোধান, ৪।১ সূত্রানুসারে অকারের লোপ হওয়ায় "দেউল" এইরূপ সিদ্ধ হয়।

পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে "শকন্ধ্বাদি"গণে পঠিত কতকগুলি শব্দের ঘটক স্বরবর্ণের পররূপ হইবার বিধান আছে। যেমন শক × অন্ধু = শকন্ধু ইত্যাদি। সুতরাং পাণিনীয় পররূপ ব্যবস্থা ও প্রাকৃতের লোপবিধান, এতদুভয়ের ফলগত কোনও প্রভেদ উপলব্ধ হয় না। সায়নাচার্য্য অথর্ব্ব বেদভাষ্যে (৯৯ পৃ, বোম্বে মু পৃ) মহীশব্দের নিরুক্তিকথনে বলিয়াছেন যে,—"মহতী = মহী। মহতী শব্দে ছান্দসঃ অচ্ছব্দলোপঃ"। অর্থ—ছান্দসরীত্যনুসারে মহতী শব্দে অৎভাগের লোপ হওয়ায় "মহী" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। এইস্থলে স্পষ্টতঃ প্রাকৃতের রীতি প্রতিভাত হইতেছে। ছান্দস "অৎ" ভাগের লোপ কল্পনা না করিয়া প্রাকৃত রীত্যনুসারে "তী" ভাগের তকার লোপ এবং ৪।১ সূত্রানুসারে অকারের লোপ করিলেই অনায়াসে "মহী" এইরূপ সিদ্ধ হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষার উচ্চস্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতির এই অপ্রতিহত শক্তি সংস্কৃত শব্দজগতেও রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ এইস্থলে কিঞ্চিৎ উপন্যস্ত হইতেছে। অভিধানে "কর্ম্মকার" ও "কর্ম্মার" এই দুইটি শব্দ

(১) সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্ব্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥ আহ্নিকতত্ত্ব।

একার্থে পঠিত হইয়াছে। টীকাকারগণ উভয় শব্দেরই সাধুতাজ্ঞাপক নিরুক্তিও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়,—কর্ম্মকার শব্দের ককার প্রাকৃত রীতিতে অন্তর্হিত হওয়ায় "কর্ম্ম আর" এইরূপ হইল ; অনন্তর সন্ধি হওয়ায় "কর্ম্মার" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

রামচরিত্রে ঋষিপ্রভাব।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

শ্রীরামচরিত্রের উপর দুইজন ঋষির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বামিত্র ঋষির দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম-জীবন গঠিত হইয়াছিল।

যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণার্থে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে পঞ্চদশবর্ষ বয়সের সময় লইতে আসিয়াছিলেন। ইহার অর্থ কি? এই বিঘ্ন নিবারণ করিতে কি তিনি নিজে অশক্ত ছিলেন? অথবা রাজা দশরথকেও লইয়া যাইতে পারিতেন? বিশ্বামিত্র এ সকল উপায় উপেক্ষা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকেই এ কার্য্যে ব্রতী করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বামিত্র তখন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যুদ্ধাদি ক্ষাত্র ধর্ম্ম। তপস্বীর এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারে অভিশাপাদি দ্বারা তপোক্ষয় করা উচিত নহে। কঠোর তপস্যার সময় রম্ভাকে অভিশাপ দিয়া তিনি পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ব্রাহ্মণেরা করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। রামায়ণের যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাই শ্রীরামচন্দ্রের শূদ্র তপস্বীকে নিহত করিতে হইয়াছিল।

আর এক কারণ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র যে কি বস্তু, জগতে তাঁহার দ্বারা কি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে তাহা ঋষিপ্রবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে শ্রীরামচন্দ্রকে যে কি কার্য্য করিতে হইবে যৌবনোদগম সময়েই ঋষিপ্রবর তাঁহাকে সেই কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। রাজপুরীর বিলাসিতার ভিতরে থাকিয়া চরিত্র অন্যরূপে গঠিত না হয় সেই জন্যই ঋষিপ্রবর আসিয়া কৌশলে শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া গেলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক মাত্র। দশরথ সেই কাকপক্ষধর বালককে আশঙ্কা-প্রযুক্ত বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কহিলেন ;—

বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্নৈব দাস্যামি পুত্রকম্।
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ॥
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তেনৈব দাস্যামি পুত্রকম্।

(বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ডম্)

ইহা শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন—

ইতি নরপতিজল্পনাৎ দ্বিজেন্দ্রম্।
কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ॥
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ।
সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষি বহ্নিঃ॥

(বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ডম্)

কৌশিক-দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নৃপতির এই কথা শুনিয়া আজ্যসিক্ত যজ্ঞীয় বহ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন রাজাকে বলিলেন—

পূর্ব্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
রাঘবানামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্য্যয়ঃ॥
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ॥

(বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ডম্)

রাজন্ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন আপনি তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা রঘুকুলের নিতান্ত গর্হিত আচরণ ; ইহাই যদি আপনি উপযুক্ত বোধ করেন, আমি তাহা হইলে নিজস্থানে প্রতিগমন করি, আপনিও বৃথা প্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধুগণের সহিত সুখে অবস্থান করুন।

তখন ভীত দশরথকে মহামুনি বশিষ্ঠদেব বুঝাইলেন। বশিষ্ঠের কথায় আশ্বস্ত হইয়া দশরথ শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন।

প্রকৃতই কি বিশ্বামিত্রের ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল? কখনই নহে। ইহা ঋষিজনোচিত কৃত্রিম কোপ মাত্র। মহৎকার্য্য সম্পাদনকালে ঋষিগণ এ প্রকার অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার ক্রোধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় ক্রোধাদি ঋষিজীবনের বিরোধী নহে। আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিত

ব্যক্তিগণ অনেক সময় এই কথাটুকু ভুলিয়া গিয়া •চ্চরিত্র সম্বন্ধে বড়ই অবিচার করিয়া বসেন।

শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্ব-গৌরব যাহা কিছু, সে সকলই বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত। প্রথমতঃ, তাঁহাকে বলা ও অতিবলা নাম্নী দুইটী বিদ্যা দান করিলেন। সেই বিদ্যা দুইটির গুণ এই—

ন শ্রমো ন জ্বরো বা তেন রূপস্য বিপর্য্যয়ঃ।
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়ন্তি নৈঋতাঃ॥
ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্য্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন।
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব॥
বলাঞ্চাতিবলাঞ্চৈব সর্ব্বজ্ঞানস্য মাতরৌ।
ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম॥
বলামতি বলাঞ্চৈব পঠতঃ পথিবাদ্যব।
বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেদ্ভুবি॥
কামংবহুগুণাঃ সর্ব্বে ত্বয্যেতে নাত্রসংশয়ঃ।
তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ॥
(বাল্মীকি রামায়ণম্—আদিকাণ্ডম্।)

তারপর ঋষিপ্রবর শ্রীরামচন্দ্রের তাড়কা রাক্ষসী বধের পর দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ কৃশাশ্বের তপোবলসম্ভূত অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ ও প্রতিসংহার কৌশল সহিত দান করিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্রের সহিত যে কয়দিন শ্রীরামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের আসিতে হইয়াছিল, ততদিন তাঁহাদেরও মুনিঋষির মত থাকিতে হইয়াছিল। কুশ-শয্যায় শয়ন, অতি প্রত্যুষে স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যাবন্দন সমাপন করিতে হইত।

বিশ্বামিত্র এই দুই ভ্রাতাকে ভাগীরথীর উত্তর দক্ষিণদিকের দেশসমূহ ভ্রমণ করাইয়া জনক রাজার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। এই দেশ ভ্রমণকালীন পথিমধ্যে ঋষিপ্রবর শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁহার পিতৃপিতামহগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিগাথা সকল শুনাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র দেশভ্রমণে বহুদর্শী এবং ইতিহাসজ্ঞ হইলেন। এই দেশভ্রমণ করার ও ইতিহাসজ্ঞ হওয়ার যে কি উপকারিতা, দুঃখের বিষয় আমরা তাহা যেন দিন দিন ভুলিয়া যাইতেছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মত সঙ্গী সমভিব্যাহারে যৌবনের প্রারম্ভে সংযতচিত্তে দেশভ্রমণ করিতে করিতে তত্তৎস্থানীয় প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রবণ করা প্রকৃতই কতই আনন্দের বিষয়। প্রায় মহাত্মাগণের জীবনেই এইরূপ দেশভ্রমণাদি দ্বারা সুশিক্ষা লাভের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অর্জ্জুন, বলরাম প্রভৃতির বহুদেশ পর্য্যটনের কথা পুরাণে বর্ণিত আছে। সংযম, অধ্যবসায়, এবং ঐকান্তিকী তপস্যা ব্যতিরেকে মহজ্জীবন গঠিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকেও সন্দীপনী মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। বুদ্ধদেবও প্রথমে বিশ্বামিত্র নামক একজন পণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত প্রকারে বিশ্বামিত্রের দ্বারায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রথম জীবন গঠিত হইয়াছিল।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

নবম প্রকরণ।

অধ্যাত্ম।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ *
গীতা, ৮. ২০

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই প্রকরণের মর্ম্মার্থ এই যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে তাহারই নাম সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ; সমস্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের সংহার ও সৃষ্টির বিচার করিবার সময়, সাংখ্যমতানুসারে শেষে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই-ই স্বতন্ত্র ও অনাদি মূলতত্ত্ব থাকিয়া যায়; এবং আপনার সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে, প্রকৃতি হইতে আপন ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবল্য উপলব্ধি করিয়া পুরুষের ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের সম্মুখে কেমন করিয়া বিস্তার করে এই বিষয়ের ক্রম আধুনিক সৃষ্টিশাস্ত্রবেত্তাগণ সাংখ্য-শাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন; এবং আধিভৌতিক শাস্ত্র সমূহে যেমন যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি তেমনি এই ক্রম বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, এক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ গুণোৎকর্ষ অনুসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, এই মূল সিদ্ধান্তে কোনই পার্থক্য হইতে পারে না। তথাপি, এই বিষয় অন্য শাস্ত্রের, আমাদের নহে, এইরূপ মনে করিয়া বেদান্ত-কেশরী সেই সম্বন্ধে

* "সেই (সাংখ্য) অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সনাতন যে অন্য অব্যক্ত পদার্থ, যাহা সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইলেও নাশ পায় না", তাহাই চরম গতি।

বিধান করিতে বলেন না। তিনি এই সমস্ত শাস্ত্রের অগ্রে চলিয়া পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডেরও মূলে কোন্ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আছে এবং মনুষ্য কেমন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্বে মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ কেমন করিয়া তদ্রূপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই রাজ্যের মধ্যে অন্য কোন শাস্ত্রের গর্জ্জন চলিতে দেন না। সিংহের সম্মুখে যেরূপ শৃগাল চুপ্ হইয়া যায় সেইরূপ বেদান্তের সম্মুখে অন্য শাস্ত্রসকলও নীরব হইয়া যায়। তাই একজন প্রাচীন সুভাষিতকার বেদান্তের যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

তাবৎ গর্জ্জন্তি শাস্ত্রাণি জম্বুকা বিপিনে যথা।
ন গর্জ্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎবেদান্ত-কেসরী॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বিচারান্তে নিষ্পন্ন 'দ্রষ্টা' অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা এবং ক্ষরাক্ষর জগতের বিচারান্তে নিষ্পন্ন সত্ত্ব-রজ-তমোগুণময়ী অব্যক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র হওয়ায়, জগতের মূলতত্ত্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়া মানিতেই হয়—এইরূপ সাংখ্য বলেন। কিন্তু বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া এইরূপ বলেন যে, সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ হইলেও অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত ইহা মানা সংগত নহে যে, এই অসংখ্য পুরুষের লাভ কিসে হয় তাহা বুঝিয়া প্রত্যেক পুরুষের সহিত তদনুসারে ব্যবহার করিবার সামর্থ্য প্রকৃতির আছে। এরূপ মানা অপেক্ষা সাত্ত্বিক তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা স্বীকার করাই অধিক যুক্তি সংগত হইবে যে, ঐ একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদ প্রয়োগ করা হোক এবং প্রকৃতি ও অসংখ্য পুরুষের একই পরমতত্ত্বে অবিভক্ত রূপে সমাবেশ করা হোক যাহা "অবিভক্তং বিভক্তেষু" এই অনুসারে নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত শ্রেণী সমূহে দেখা যায় এবং যাহার সহায়তাতেই সৃষ্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্যক্ত প্রকৃতিতে সমাবেশ করা হয় (গী. ১৮. ২০-২২)। ভিন্নতার অবভাস হওয়া অহঙ্কারের পরিণাম; এবং পুরুষ যদি নির্গুণ হয়, তবে অসংখ্য পুরুষের পৃথক থাকিবার গুণ উহাতে থাকিতে পারে না। কিংবা বলিতে হয় যে, বস্তুত পুরুষ অসংখ্য নহে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার-গুণরূপী উপাধির কারণেই উহাতে অসংখ্যতা দেখা যায়। তা ছাড়া আর এক প্রশ্ন এই উঠে যে, স্বতন্ত্র প্রকৃতির সহিত স্বতন্ত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে তাহা সত্য বা মিথ্যা? সত্য বলিয়া মানিলে সেই সংযোগ কখনই দূর হইতে পারে না, সুতরাং সাংখ্যমতানুসারে আত্মা কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। মিথ্যা বলিয়া যদি মানা যায়, তাহা হইলে, পুরুষের সংযোগ প্রযুক্ত প্রকৃতি, পুরুষের সম্মুখে নিজের বাজার সাজাইতে যে বসিয়া যান, সে কথা নির্ম্মূল হয়। গাভী যেরূপ বাছুরের জন্য দুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি কার্য্যতৎপর থাকেন, এই দৃষ্টান্তও খাটে না; কারণ, গরুর পেটেই বাছুর হয় বলিয়া বাছুরের উপর গরুরসন্তান বাৎসল্যের উদাহরণ যেরূপ দেখান যায়, প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ দেখান যায় না (বেদ. শাং ভা. ২. ২. ৩)। প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য-শাস্ত্রানুসারে মূলেই অত্যন্ত ভিন্ন—একটি জড়, আর একটি সচেতন। জগতের আরম্ভ হইতেই এই দুই পদার্থ যদি অত্যন্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইল, তবে আবার একের প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের স্বভাব, ইহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাবকেই যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে হেকলের জড়াদ্বৈত মন্দই বা কি? মূল প্রকৃতির গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে সেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার করিবার চৈতন্য-শক্তি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইহা তাহার স্বভাবই, হেকলেরও ইহাই সিদ্ধান্ত, কি না? কিন্তু এইমত স্বীকার না করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র এই ভেদ করিয়াছেন যে, 'দ্রষ্টা' পৃথক এবং 'দৃশ্যজগৎ' পৃথক। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যে ন্যায়ানুসারে এই ভেদ দেখান হয় সেই ন্যায়ের উপযোগ করত আরও অগ্রে চলিব না কেন? বাহ্য জগৎ তন্নতন্ন পরীক্ষা করিলেও এবং চক্ষুর স্নায়ুর মধ্যে অমুক অমুক গুণধর্ম্ম আছে নির্দ্ধারণ করিলেও, এই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা বা 'দ্রষ্টা' ভিন্ন রহিয়াই যায়। 'দ্রষ্টা' পুরুষ 'দৃশ্য জগৎ' হইতে ভিন্ন, ইহা বিচার করিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই; এবং ইহা জানিবার কোন মার্গ আছে কি নাই যে, এই দৃশ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেরূপ দেখি তাহাই ঠিক্ কিংবা তাহা হইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদী বলেন যে, এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব মূলেই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এইরূপ ধরিয়া লইতেই হয়। নিছক আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলেও সাংখ্যের উক্ত মত অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। কারণ, জগতের অন্য পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলে আমরা তাহাদের গুণধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সেইরূপ এই 'দ্রষ্টা' পুরুষ যাহাকে বেদান্ত 'আত্মা' বলেন সেই দ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে কখনও গোচর হইতে পারে না। এবং যে পদার্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, মানবী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? ভগবান ভগবদ্‌গীতাতেও ঐ আত্মার এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ (গী. ২. ২৩)

অর্থাৎ আত্মা এরূপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদা-

র্থের ন্যায় আমরা তাহার উপর উক্ত জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা দ্রব হইবে, কিংবা প্রয়োগশালার তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার আন্তরিক স্বরূপ দেখিয়া লইব, অথবা অগ্নির উপর রাখিলে তাহা ধোঁয়া হইয়া যাইবে কিংবা বাতাসে তাহা শুকাইয়া যাইবে। সারকথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা করিবার, আধিভৌতিক শাস্ত্রবেত্তাদিগের যে কোন উপায় আছে সে সমস্ত এস্থলে নিষ্ফল হইয়া যায়। তখন সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, আত্মার পরীক্ষা হইবে কি প্রকারে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় সত্য; কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুই কঠিন নাই। সাংখ্যবাদীগণ তবে 'পুরুষ' নির্গুণ ও স্বতন্ত্র কিরূপে স্থির করিলেন? আপন অন্তঃকরণের অনুভূতি হইতেই কি নহে? তবে এই রীতিই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে কেন প্রয়োগ করা যাইবে না? আধিভৌতিক শাস্ত্রের বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে; এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ নিছক্‌ স্বসম্বেদ্য অথবা আপনিই আপনাকে জানিবার যোগ্য। কেহ যদি এইরূপ বলেন যে, আত্মা যদি স্বসম্বেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মনুষ্যের ঐ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান হইবে তাহাই হইতে দাও; তবে অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? হাঁ, প্রত্যেক মনুষ্যের মন কিংবা অন্তঃকরণ যদি সমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন হইবে। কিন্তু যখন সকল লোকের মনের শুদ্ধি ও শক্তি এক প্রকার নহে বলিয়া আমরা জানি; তখন যাঁহাদের মন অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল, তাঁহাদেরই প্রতীতি এই বিষয়ে আমাদের প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। অনর্থক "আমার এইরূপ মনে হয়" কিংবা "তোমার এইরূপ মনে হয়" বলিয়া বাদবিতণ্ডা বাড়াইয়া কোন লাভ নাই। যুক্তিবাদ ছাড়িয়া দেও বেদান্তশাস্ত্র সে কথা একেবারেই বলেন না। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাই বলেন যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় স্বসম্বেদ্য অর্থাৎ নিছক আধিভৌতিক যুক্তির দ্বারা নির্ণীত হইবার নহে বলিয়া যে সকল যুক্তি অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল মন-বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই সকল যুক্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে। আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেরূপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ এই অনুভব ত্যাজ্য বলিয়া মানা হয়, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রে যুক্তি অপেক্ষা উক্ত স্বানুভূতির অর্থাৎ আত্মপ্রতীতির প্রামাণিকতা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। যে যুক্তি এই অনুভূতির অনুকূল তাহাই বেদান্তীদিগের মান্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনকারীদিগের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক—

> অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ।
> প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

"ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা করা অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা কিংবা অনুমানের দ্বারা করিবে না; সমস্ত জগতের মূল প্রকৃতিরও বাহিরে যে পদার্থ তাহা এইরূপ অচিন্তনীয়"। এই একটী পুরাতন শ্লোক মহাভারতের মধ্যে (মভা. ভীষ্ম. ৫. ১২) পাওয়া যায় এবং 'সাধয়েৎ' ইহার বদলে 'যোজয়েৎ' এইরূপ পাঠভেদে বেদান্তসূত্র সম্বন্ধীয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেতেও গৃহীত হইয়াছে (বেসূ. শাং ভা. ২.১. ২৭)। মুণ্ডক ও কঠোপনিষদেও আত্মজ্ঞান শুধু তর্কের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা কথিত হইয়াছে (মুং. ৩.২. ৩; কঠ ২. ৮, ৯ ও ২২)। অধ্যাত্মশাস্ত্রে উপনিষদ্‌ গ্রন্থাদির বিশেষ মাহাত্ম্যের কারণও ইহাই। মনকে কি করিয়া একাগ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক আলোচনা হইয়া পরিশেষে এই বিষয়ে (পাতঞ্জল) যোগশাস্ত্র নামক এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রই রচিত হইয়াছে। যে সকল বড় বড় ঋষি এই শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, এবং স্বভাবতই যাঁহাদের মন পবিত্র ও বিশাল ছিল, এইরূপ মহাত্মাগণ মনকে অন্তর্মুখ করিয়া আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অনুভূতি পাইয়াছিলেন, কিংবা সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের শুদ্ধ ও শান্ত বুদ্ধির যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ্‌গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। তাই, যে কোন অধ্যাত্মতত্ত্বের নির্ণয় করণে এই শ্রুতিগ্রন্থ সমূহে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা নাই (কঠ. ৪. ১)। মনুষ্য কেবল স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির দ্বারা এই আত্মপ্রতীতির পোষক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যুক্তি দেখাইতে পারে; কিন্তু তন্নিবন্ধন মূল-প্রতীতির প্রামাণ্য এতটুকুও ন্যূনাধিক হইতে পারে না। ভগবদ্‌গীতা স্মৃতি গ্রন্থের অন্তর্গত সত্য; কিন্তু এই বিষয়ে তাহার যোগ্যতা উপনিষদের সমানই স্বীকৃত হয় ইহা প্রথম প্রকরণের আরম্ভেই বলিয়াছি। এতএব গীতা ও উপনিষদে প্রকৃতির অতীত এই অচিন্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে কি-কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শাস্ত্ররীতিতে উহাদের উপপত্তির বিচার এই প্রকরণের শেষ দিকে করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"করমালা" তালুকে পীড়া।

২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৯১।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে, কৃষি-বিভাগের স্পেশ্যাল জজ্‌ ডাঃ পোলেনের জায়গায় ওঁর স্থায়ী

নিয়োগ হইল। যখন উনি এসিষ্টাণ্ট স্পেশ্যাল জজ্ ছিলেন তখন ওঁর পুণা ও সাতারা এই দুই জেলার আদালতের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। কিন্তু এখন পুণা সাতারা নগর ও শোলাপুর এই চার জেলায় ভ্রমণ করিতে হইত বলিয়া আট মাস ভ্রমণেই কাটিয়া যাইত। তদনুসারে আমরা ১৮৮৯ জানুয়ারী মাসে নগর জেলায় ভ্রমণ করিতে গেলাম। সমস্ত জেলা ভ্রমণ করিয়া শোলাপুর জেলায় আসিতে আমাদের দেড়মাস লাগিল। এই বৎসরে ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে আদমসুমারী হয়। সেই দিন এদিককার কাজ সারিয়া এবং শোলাপুর জেলার অন্তর্গত "করমালা"-তালুকে আফিস ও সমস্ত লোকজন রাখিয়া আমরা দুই দিন পুণায় থাকিয়া আসিব এইরূপ মৎলব করিলাম এবং সেইজন্য নগর-জেলার কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া আমরা করমালায় আসিলাম। সেখানকার কাজ দুই দিনে সারিয়া আফিস সমেত সমস্ত লোককে শোলাপুরে রওনা করিয়া দিয়া আমরা আদমসুমারীর জন্য পুণায় যাইব এরূপ উনি আমাকে বলিলেন ও স্থির করিলেন।সেই অনুসারে তারপর দিন সমস্ত সময় একটুও বিশ্রাম না করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিলেন। সেইজন্য খাইতে উঠিতেও একটু দেরী হইয়া গেল। আহারান্তে সেইদিন পড়া শুনিলেন না। তারপর দিন সকালে নিত্যানুসারে উঠিয়া কোকো পান করিয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই ক্যেপে, চিরঞ্জীব সখুকে সঙ্গে নওয়া হইয়াছিল। সে মোটে ১০ মাসের হওয়ায় সকাল বেলাটা তার কাজেই আমাকে থাকিতে হইত। তথাপি যত শীঘ্র সম্ভব সেই সব কাজ সারিয়া ওঁর বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে, পাঠের জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইত; কারণ সকাল বেলায় উনি ৮টা, ৯টার সময় বাড়ী আসিলে পর, ইংরেজী পাঠের জন্য ঘণ্টা দেড়েক পাওয়া যাইত। কোনদিন আমার নিজের কাজ সারিতে না পারিলে, সেই দিনটা বৃথায় যাইত, এবং তারপরদিন ছাড়া ওঁর কাছে পড়িবার আর সুযোগ হইত না; তাই, পারত-পক্ষে আমি সময় নষ্ট হইতে দিতাম না—ঠিক সময়ে প্রস্তুত থাকিতাম। এই সময় আমি মেডোজ-টেলারের "তারা" নামক পুস্তক পড়িতে লইয়াছিলাম। সেইদিন ওঁর বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে ৯টা বাজিয়া গিয়াছিল। আমি পুস্তক, খাতা ও পেনসিল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। উনি বাড়ী আসিলে পর আমি সহজভাবে বলিলাম। "আজ ভ্রমণের জন্য বেশী সময় দিয়াছিলে? এই তালুকের কাজ কি কম মনে হয়? এটা নূতন ছোলা-ফসলের সময় গ্রামের লোকদের এখন খুব গরজ; সেখানে মুনসেফদের নানাপ্রকার অনুরোধ উপরোধ করে; এই অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করতে না পেরে নিরুপায় হ'য়ে ২টার সময় আদালৎ বন্ধ করে মুনসেফদের চলে যেতে হয়; সেইজন্য তদন্তের কাজটা সাদামাটা রকমই হয়ে থাকে" এই কথায় উনি বলিলেন "একেইত দেরী হয়ে গেছে, কথা কয়ে আর সময় নষ্ট কোরো না, পড়ে নেও। কিন্তু প্রথমে আমাকে একটু চিনি এনে দেও। তারপর আরম্ভ কর। তোমরা মেয়ে মানুষ, আমাদের পুরুষদের কাজের খোঁজখবরে তোমাদের দরকার কি?" আমি বলিলাম, "বটেই ত! আমাদের খোঁজ খবরে দরকার নেই? খোঁজখবর নেবার মত কাজই বা কি আছে? এই তালুকের আদালতে যতটা কাজ সবজজ্ করেন, ততটা কাজ আমরা মেয়েমানুষরাও করতে পারি।" এই কথায় উনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ সবজজদের উপর তোমার গদা উঠিয়েছ কেন? কাজ কম করা কিংবা বেশী করা—সে লোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে; কিন্তু তাঁরা যে কাজ করেন তা গুরুতর কাজ নয়—এ তোমার কিসের থেকে মনে হল?" আমি বলিলাম, "কাজের গুরুত্ব কে অস্বীকার করচে? কিন্তু সেই কাজের গুরুত্ব কতটা তাঁরা অনুভব করেন আমাদের এই ভ্রমণের সময়েই তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। সরকার বাহাদুর ওঁদের নির্দ্দিষ্ট বেতন না দিয়ে, যদি উত্তম মধ্যম অধম এইরূপ কাজ অনুসারে কমিশনের ব্যবস্থা করতেন তা হলে এর চেয়ে অধিক যত্ন ও শ্রমের সহিত কাজ করা হত; তাছাড়া গরীব বাদীপক্ষের লোকদের অকারণে এখনকার মতো আপীল করবার জন্য খর্চা হত না। কিন্তু একি! আমি কথা কইতে কইতে আমার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছি!" এইরূপ বলিয়া আদা চিনি মিশাইয়া দিয়া পড়িতে বসিলাম। এই সময়কার পড়িবার অংশে তারার বৈধব্য অবস্থা ও তাহার বাপ-মায়ের মনের বিহ্বলতার বর্ণনা পাঠ করিবার সময় আমার মন খারাপ হইল, আমার যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এবং এই মনের আবেগের দরুন পড়া বন্ধ করিতে হইল। তাহার পর, বিধবাদের শোচনীয় অবস্থার কথা আমি এইরূপ বলিতে লাগিলাম;—"আমাদের সমাজের কোন কোন রীতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও মারাত্মক; তার ফল দিন দিন লোকের উপর ফলচে এবং অত্যন্ত অহিত হচ্ছে এ কথা যখন লোকে বুঝ্‌বে তখনই ভাল হবে। এখন না বুঝুক, আস্তে আস্তে ক্রমশঃ বুঝ্‌বে";—ইত্যাদি কথা যখন আমি গম্ভীরভাবে ও আগ্রহের সহিত বলিতেছিলাম, তখন উনি বলিলেন,—"আজ পথেই আমার শরীর খারাপ হয়েছিল ও পেট কামড়াচ্ছিল"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন বল দেখি? আজ সকালে দাস্ত সাফ্ হয় নি কি? রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নি? কাল রাত্রে সেই যে ঘুমিয়ে ছিলুম তারপর একেবারে ভোরে উঠলুম। আমিই প্রথমে জেগেছিলুম। "সখুও" সারারাত্রে একবারও ওঠে নি।"

উনি বলিলেন—"সখু" ওঠেনি বলেই তোমাকে আমি জাগাই নি। গত দুই তিন রাত্রি তার চোখের দরুন তোমাকে জাগ্‌তে হয়েছিল, তাই কাল তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পেয়েছিল। এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। রাত্রে আমার বেশ ঘুম হয়েছিল। আশপাশের হাওয়া খারাপ হবার কোন আশঙ্কা নেই; তা ছাড়া, আমরা যে জল পান করি তা ফুটিয়ে ফিল্টর করে তবে পান করি। তখন এরূপ কোন সংশয়ের কারণ নেই। কিন্তু আজ আমার শরীর ঐ রকমই খারাপ হয়েছে সত্যি।" আমি বলিলাম, "তাহলে হয় ত ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। চিনির উপর কয়েক ফোটা পুদিনা ও আমের রস দিচ্ছি ও আদার রস জ্বাল দিয়ে আন্‌চি তাতে অসুখটা কমে যাবে।" এইরূপ বলিয়া আমি উঠিলাম এবং অনেকক্ষণ পরে এই দুই জিনিস তৈয়ারী করিয়া লইয়া আসিলাম। তখন পর্দ্দা লাগান হইয়াছিল, পর্দ্দার ভিতর হইতে উনি ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দুর্ব্বল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার তৈরী সেই দুই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলাম এবং রবারের থলিয়া গরম জলে ভরিয়া তাহা দিয়া পেটে শেক দিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই ভাল বোধ হইল না। তখন আমি ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। তিনি আসিয়া হিং, মউরী ও পেপরমেণ্টের আরক একত্র করিয়া পান করিতে দিলেন এবং শেক্‌টা বরাবর চলুক—এই বলিয়া স্পঞ্জোপারলিনের একটা বড় টুকরা পেটে সেক্‌ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। "ভাত দিও না, চাল ভেজে' তার কথ কিংবা সাবুদানা জলে সিদ্ধ করে' তাতে একটু লবণ মিশিয়ে পান করতে দেও। দুধ দিও না।"—এইরূপ ঔষধ, শেক্‌ ও পথ্য চলিতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর আমি ছাড়া আর কেহই ছিল না। তথাপি আমাদের আফিসের সমস্ত লোক কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। এই সব লোক অধীন বলেই যে কাজ করিত তাহা নহে। ওঁর উপর তাদের যে ভক্তি ও ভালবাসা ছিল তাহার দরুন এই সব লোক তৎপরতার সহিত কাজ করিত। ঔষধোপচারের প্রয়োগ সত্ত্বেও পীড়ার কিছুই হ্রাস হইল না। চার পাঁচ মিনিটের পর আবার পীড়াটা সুরু হইল। অপরাহ্ণ প্রায় তিন চারিটা বাজিয়া গেল, তখনও আমাদের আফিসের কর্ম্মচারীদের স্নান কিংবা আহার হয় নাই। 'সখু' খুব ছোট, এক বছরের ও হয় নাই। আমাদের শিরেস্তাদার বাহিরে বাহিরে খুকীকে দাইয়ের দুধ খাওয়াইয়া সাম্‌লাইতেছিল, আমার কাছে আসিতে দিত না। আমার ব্যাকুলতার দরুন সখুকে আমার মনে পড়েনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনটে পর্য্যন্ত ডাক্তার বসিয়া ছিলেন; তারপর তিনি আহার করিতে বাড়ী গেলেন; "এর মধ্যে আমি একবার সন্ধ্যাকালে দেখ্‌তে আস্‌ব, কিন্তু রাত্রি ৮টার পর আদমসুমারীর কাজে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে বলে আমি আস্‌তে পার্ব্ব না" এইরূপ বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার বড়ই ভাবনা হইল; আমি আমাদের শিরেস্তাদারকে বলিলাম "তুমি মাম্‌লেদারের কাছে গিয়া দেখা কর এবং ওঁর অসুখের এই সমস্ত বিবরণ জানিয়ে, "অনুগ্রহ করে আজকের রাত্রিটা ডাক্তারকে আমাদের এখানে রেখে দিন,—তার বদলে আফিসের দুই জন কেরাণীকে কাজের জন্য আপনার এখানে পাঠাচ্ছি" এই কথা আমার নাম করে মাম্‌লেদারকে বোলো। এই কথা বলিয়া আমি ভিতরে পর্দ্দার মধ্যে আসিলাম; আসিয়া দেখি ওঁর শরীরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে ভাবনা হইবার কথা; মুখের ভাব বদলিয়া গিয়াছে। গা দিয়া ঘাম ছুটিতেছে, হাতের পাঞ্জা ও নখ্‌ একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া আমার বুক একেবারে দমিয়া গেল; আমার খুবই ভাবনা ও ভয় হইল; আমার এই ভাবটা ওঁর চখে না পড়ে এইজন্য সমস্ত দিন জোর করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম; ইতি মধ্যে ডাক্তার আসিলেন। আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া বলিলাম; "আর আমার সাহস হচ্চে না। পুনায় ডাক্তার বিশ্রামজীকে তার করচি। তিনি কাল সকালে আস্‌বেন; তাঁর না আসা পর্য্যন্ত, তুমি এই অবস্থায় আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি মাম্‌লেদারকে এই কথা বলে পাঠিয়েছি, যে কাজের জন্য তোমার বদলে দুইজন কেরাণী পাঠানো হয়েছে"। এইরূপ বলিয়া আমি পুণার ডাক্তার বিশ্রামজীকে ও আমার ননদকে তার করিলাম। করমালা হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন ১৩ মাইল দূর; তাই ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নানা- আগাশাকে পাঠাইলাম, এবং তাকে বলিলাম;—"তুমি তার করে' ষ্টেশানেই থাক্‌বে ও ভোর চারটের সময়, ডাঃ বিশ্রামজী ও আমার ননদকে শীঘ্র নিয়ে আস্‌বে।" (ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ।

শ্রীমতী মাধুরী দত্ত—আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে মদনমিত্রের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী মাধুরী দত্ত গত ১৬ই ফাল্গুন তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিন এবং শোকগ্রস্ত আত্মীয়গণকে শান্তি প্রদান করুন। ইহাঁর মাতা শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত তদীয় কন্যার স্মৃতিকল্পে আদিব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, ১৪২ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৪০ শকের ৪ঠা ফাল্গুন দিবসের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

গত ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার দিবসের আহ্বান অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত ভবনের দালানে ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

উপস্থিত সভ্য।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" নরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ।
শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসগুপ্ত।
" পাঁচু গোপাল মল্লিক।

১। আদিব্রাহ্মসমাজের পরম সুহৃৎ ৺শরৎ চন্দ্র চৌধুরীর পরলোকগমন বিজ্ঞাপিত হইল।

স্থির হইল—তাঁহার পরলোকগমনে আদিব্রাহ্মসমাজ একজন বিশেষ বন্ধু হারাইল। তাঁহার পরিবারবর্গকে সমাজের সমবেদনা জানানো হউক।

২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসগুপ্তের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী বৎসরের জন্য অধ্যক্ষসভার সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

৩। ১৩২৬ সালের আনুমানিক আয় ব্যয় আলোচিত হইল।

সম্পাদক মহাশয়ের নানা কার্য্যের ঝঞ্চাটে ১৩২৫ সনের বজেট উপস্থিত করিতে পারা যায় নাই। ১৩২৬ সনের বজেট এক খণ্ড করিয়া অধ্যক্ষদিগের নিকটপাঠানো হইয়াছে। স্থির হইল—

(ক) ১৩২৬ সালের আনুমানিক আয়ব্যয় গৃহীত হউক।

(খ) বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের খাজানা দিয়া উহাকে আদিসমাজের অধীনে পূর্ব্বের ন্যায় রাখা হউক।

(গ) কালনা ব্রাহ্মসমাজের দলিল করিয়া দিয়া উহার যথারীতি খাজানা দিয়া উহাকে আদিসমাজের তত্ত্বাবধানে আনা হউক।

৪। আদিব্রাহ্মসমাজের (১৮৩৭-৩৯ ত্রৈবার্ষিক কার্য্যবিবরণ আলোচিত হইল।

এই বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই অধ্যক্ষগণের নিকট পাঠানো হইয়াছিল এবং গত ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্থির হইল—এই বিবরণ গৃহীত হউক।

৫। ১৩২৬ সনের জন্য অধ্যক্ষসভা সংগঠন ও কর্ম্মচারী নিয়োগ আলোচিত হইল।

স্থির হইল—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, যথালিখিত পদে নিযুক্ত হইলেন। পুনর্নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারাই স্থায়ী থাকিবেন।

১৮৪১ শকের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।

সভাপতি

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

অধ্যক্ষ

(স্বপদে বা exofficio)

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। " আশুতোষ চৌধুরী
৩। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। " চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

(কলিকাতা ও প্রান্তবাসী)

৫। " সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬। " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭। " সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়
৮। " কেদারনাথ দাস-গুপ্ত
৯। " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১০। " ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র লাল গুপ্ত
১১। " পাঁচুগোপাল মল্লিক
১২। শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক
১৩। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব
১৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু
১৬। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সরকার
১৭। " যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি
১৮। " নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল
১৯। " হরিপদ ত্রিবেদী
২০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী
২১। শ্রীযুক্ত তুলসী দাস দত্ত
২২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
২৩। রায়সাহেব " রসিকলাল রায়
২৪। ডাক্তার " গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
২৬। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মল্লিক
২৭। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮। " যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
২৯। " সুরেশচন্দ্র চৌধুরী

(মফঃস্বলের সভ্য)

৩০। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস—ধারবার
৩১। " উপেন্দ্রনাথ সেন—গৌহাটি
৩২। " জ্ঞানাভিরাম বড়ুয়া—গৌহাটি
৩৩। " রাজগোপাল চারিয়র—বীরভূম
৩৪। " সত্যেন্দ্র মোহন চৌধুরী—সেরপুর

৭৫। রাজেন্দ্রনাথ বসু—বৈদ্যনাথ দেওঘর
৭৬। চণ্ডীচরণ রায়-চৌধুরী—রংপুর
৭৭। যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চট্টগ্রাম।

৬। ১৩২৫ সালের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসম্মিলন উপলক্ষে ব্যয় আলোচিত হইল।

এই উপলক্ষে মোট ৫৮।০ খরচ হইয়াছে। রামমোহন লাইব্রেরীর হল পাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা না পাওয়াতে সিটিকলেজ হলে সম্মিলন হইয়াছিল। এই সম্মিলনকে স্থায়ী অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা হইতেছে।

স্থির হইল—গত ৬ই ভাদ্রের ব্রাহ্মসম্মিলন উপলক্ষে ৫৮।০ ব্যয় অনুমোদিত হউক।

৭। আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান গৃহ বিক্রয়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

মাননীয় জষ্টিস্ ও আদিসমাজের অন্যতর সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে আদিসমাজের বর্ত্তমান উপাসনাস্থল লোকসংগ্রহ প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে, সেই কারণে ইহা বিক্রয় করিয়া অন্য কোন সুবিধামত স্থলে ইহাকে স্থানান্তরিত করা উচিত। দেখা গিয়াছিল যে ইহার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি উঠিতে পারে। সেই টাকা দ্বারা অন্যত্র ভূমিক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ হইতে পারে। অধ্যক্ষসভা এবিষয়ে অনুমোদন করিলে বলের সহিত একার্য্যে নামা যায়।

স্থির হইল—বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ গৃহ বিক্রয় করিয়া উপযুক্ত স্থানে জমী ক্রয় করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হউক। এ বিষয়ের ভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের উপর দেওয়া হউক।

৮। ব্রাহ্মসমাজের একটী সম্মিলিত সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

ব্রাহ্মসমাজের শাখাবিভাগের কারণে ব্রাহ্মসমাজ যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবটী এই যে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা হইতে তিন তিন জন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটী সম্মিলিত সমিতি স্থাপন করা হউক; সেই সমিতিতে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে সকল প্রকার উপযুক্ত বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু কোন বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হইলেই তাহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এই বীজমন্ত্রের উপর সমিতিস্থাপন অধ্যক্ষসভার অনুমোদিত হইলে অন্যান্য শাখার নিকটে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

স্থির হইল—যে ভাবে সম্মিলিত সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হউক।

৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে সাহায্য স্বরূপে গত আষাঢ় মাস হইতে প্রতি মাসে অনধিক ১০৲ টাকা সাহায্যদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

ইনি বেদান্তবিষয়ক শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইহাঁর চরিত্র নির্ম্মল। ইনি বেদান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সমাজের আচার্য্য ও প্রচারক কার্য্যের উপযোগী হইবেন বলিয়া মনে হয়। আপাতত ইহাঁকে সমাজের গ্রন্থালয়ের ভার দিলে চলিতে পারে। ইহা ব্যতীত সম্ভব হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসরের বিষয়সূচী ইহাঁর দ্বারা করাইয়া লইবার ইচ্ছা আছে।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে সমাজ হইতে আগামী বর্ষ হইতে আপাতত মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করা হউক।

১০। কটকপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ১৩২৪ সালের ২২ শে মাঘ তারিখের পত্র আলোচিত হইল।

তিনি বলেন যে কটকের "ভদ্রলোকগণের আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহ, অতএব অতি শীঘ্রই আমাকে কটক আদিব্রাহ্মসমাজে শনিবারে উপাসনা করিতে অনুমতি প্রদান করুন এবং এখানকার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র প্রদান করুন ইহাই আমার প্রার্থনা।"

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনা অনুযায়ী কটক ব্রাহ্মসমাজে আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষে উপাসনা করিবার অধিকার দেওয়া হউক এবং এ বিষয়ে তথাকার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।

১১। আদিব্রাহ্মসমাজ মেডিক্যাল মিশন সম্বন্ধে অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত আলোচিত হইল।

গত শ্রাবণ মাস অবধি আদিব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে একটী মেডিক্যাল মিশন খোলা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে সমাগত রোগীগণকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিমতে চিকিৎসা করা হয় এবং ঔষধপ্রদান করা হয়। ট্রষ্টীডের বলে ইহার উপর সমাজের অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে অন্যতর ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেডিক্যাল মিশন খুলিবার পক্ষে মত দিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিয়াছেন—

"আমি তোমার প্রস্তাবে মত দিতেছি কিন্তু সমাজের টাকা ব্যয় না করিয়া আলাদা একটী fund খুলিলে ভাল হয়, তাতে আমরাও যথাসাধ্য দিব। Outdoor ভিন্ন বাড়ীতে কোন patient রাখার ব্যবস্থা না হয়।"

এই মিশনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য একটী কমিটি করিলে ভাল হয়।

স্থির হইল—আদিব্রাহ্মসমাজ মেডিক্যাল মিশন আপাতত যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবে পরিচালিত হউক।

১২। বগুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত এবং ধারবারপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের প্রচারমণ্ডলী সংস্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—পত্রখানি অধ্যক্ষগণের নিকট প্রচারিত হউক।

১৩। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের ১৩২৪ সালের ১৭ই মাঘের পত্র আলোচিত হইল।

পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আমি একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম সাহিত্য প্রচারে প্রয়াসী।

গত বৎসর এক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ বহু সংখ্যক ক্রয় করিয়াছি। ইহাকে ব্রাহ্মদের বাইবেল বা গীতার মত মনে করি। ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরই দৈনিক পাঠ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু ইহার বর্ত্তমান আকার তাহার অন্তরায়। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" পুস্তকখানা ইংরেজি পকেট এডিসন 'বাইবেল' 'প্রেয়ার বুক' আর্য্যমিশন "গীতা" সার রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনের উপদেশ অথবা "ব্রহ্মসঙ্গীত" পুস্তকের আকার হইলে সুবিধা হয়। ইহার আকার বৃহৎ হওয়া সুবিধাজনক নহে। পাতলা কাগজ ও ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইলে, মূল্যও সুলভ করা যাইতে পারে। মূল্য যাহাই হউক কাগজ পাতলা ও আকার ক্ষুদ্র হওয়া অতি আবশ্যক।

আশা করি নূতন সংস্করণ সময় আমার প্রস্তাবনা বিবেচিত হইবে।

আমি আগামী মাঘোৎসবের সময় ১০ খানা ক্রয় করিব।"

নূতন সংস্করণের ব্রাহ্মধর্ম্ম রয়াল ১৬ পেজী আকারে ছাপা হইতেছে—ইহা পকেটসংস্করণ বাইবেলের ন্যায় ব্যবহৃত হইবে আশা করা যায়।

স্থির হইল—পত্রলেখককে লেখা হউক যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পকেট সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

১৪। হুগলি পাণ্ডুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাসগুপ্তের বার্ষিক ১৲ টাকায় পত্রিকা প্রাপ্তির জন্য ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চের পত্র আলোচিত হইল।

ইনি বহুদিনের গ্রাহক। চক্ষে দেখিতে পান না বলিয়া পত্রিকা বন্ধ করেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন যে—"পড়িয়া শুনাইবার লোক আছে, আমি বার্ষিক ডাকমাশুল স্বরূপ ১৲ এক টাকা দিব।"

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাসগুপ্তকে বার্ষিক ১৲ টাকায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেওয়া হউক।

১৫। মহর্ষিদেবের বিবৃত "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি"র স্বত্ব আদিব্রাহ্মসমাজে দানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার স্বত্বাধিকারী। তিনি এই সর্ত্তে তাঁহার স্বত্ব সমাজে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন যে "উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ ফুরাইয়া গেলেই পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে অন্তত ৫০০ শত কাপির একটী সংস্করণ সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করা হইবে, এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহার হিসাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে। এই সর্ত্তের অন্যথা হইলে উহার স্বত্ব তাঁহারই নিজস্ব থাকিবে।"

স্থির হইল—জ্ঞান ও ধর্ম্মের এক খণ্ড সভাপতি মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক এবং আগামী অধিবেশনে তাঁহার মতামত সহ প্রস্তাব পুনরায় উপস্থিত করা হউক।

১৬। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নবকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর জন্য আদিব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত পুস্তক বিনামূল্যে প্রার্থনা করিয়া ১৩২৪ সালের ৪ঠা মাঘের পত্র আলোচিত হইল।

অবিনাশ বাবু তাঁহার শিক্ষাসমাচার পত্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আদিসমাজের যে সকল পুস্তক দেওয়া যাইতে পারে সেগুলির এক এক খণ্ড প্রদান করিলে উপযুক্তরূপেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

স্থির হইল—যে সকল পুস্তক বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব সেগুলি সেইরূপ মূল্যে দেওয়া হউক।

১৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নিকট প্রাপ্যের ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহার ১৯১৮ সালের ৩রা এপ্রিলের পত্র আলোচিত হইল।

পত্রের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সবিনয় নিবেদন—

আমার মিলিন্দ প্রশ্ন ছাপা সম্বন্ধে আমার নিকট আপনাদের যে পাওনা আছে, তদ্বিষয়ে আমি এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি—

এ পর্য্যন্ত যে অংশ ছাপা হইয়াছে বা হইবে, তাহার খরচ আমি কিছু দিব না।

এই ও ইহার পরবর্ত্তী অংশ সমস্তই আমি সমাজের হস্তে অর্পণ করিব, সমাজ ইহা প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করিবেন

ছাপা প্রভৃতি ইহার প্রকাশ ও প্রচার বাবতে সমাজের যাহা ব্যয় হইবে, পুস্তক বিক্রয়ের আয়ে তাহা উঠিয়া গেলে, লাভের অংশ সমাজ ও আমার মধ্যে অর্দ্ধেক হইবে। আপনারা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে অনুগৃহীত হইব।"

স্থির হইল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রস্তাব গৃহীত হউক।

১৮। মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত পি, এল নারায়ণের পত্র।

তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যানের তেলেগু ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত পি, এল নারায়ণের প্রস্তাব গৃহীত হউক।

১৯। পতিসর ঠাকুর কাছারীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর পতিসর মহর্ষি ইনষ্টিটিউটের বেতনের বিল ছাপা সম্বন্ধে ১৩২৫ সালের ১৪ই আশ্বিন তারিখের পত্র আলোচিত হইল। তিনি উক্তপত্রে লিখিয়াছেন যে—

কোন্ অর্ডারে ছাপা হইয়াছে, তাহা মধু বাবু ১৩২০ সালের ২১ শে মাঘের পত্রে জানিতে চাহেন। উক্ত পত্রের উত্তরে ৩০ শে মাঘ ৮৯ নং পত্রে অর্ডারের বিষয় জানান হয়। ৩০ শে মাঘ মধু বাবু পেন্সন লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়ায় সে সময়ে জানকী বাবুর উপর কার্য্যভার থাকে। তিনি উক্ত ৮৯ নং পত্র পাইয়া যথা সময়ে রসিদ বহিগুলি না পাঠানে এক্ষণে আর তাহা কোন প্রয়োজনে লাগিবে না, সুতরাং উহার মূল্যও দেওয়া হইবে না বলিয়া বিজেন বাবুকে লিখেন। তাহার পর আমি ও জানকী বাবু কয়েক বার কলিকাতা গেলে উক্ত টাকা না পাইলে তাঁহার দণ্ড হয় বলিয়া বিজেন বাবু কাকুতি মিনতি করেন। অগত্যা রূপে

টাকা দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক বারই বলা হইয়াছে।

স্থির হইল—পতিসর মহর্ষি ইনষ্টিটিউটের বেতনের বিলছাপা বাবতে পাওনা ৩২।০ ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

২০। কার্য্যাধ্যক্ষের ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসব উপলক্ষে সমস্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কার্য্যাধ্যক্ষকে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব গৃহীত হউক।

২১। কম্পোজিটার শ্রীগোপীনাথ ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲ সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কম্পোজিটর গোপীনাথ ঘোষকে ৫৲ টাকা সাহায্য দিবার প্রস্তাব গৃহীত হউক।

২২। বর্দ্ধমান রাজ-ষ্টেটের সুপারিটেনডেণ্ট শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৬ই মাঘের পত্র আলোচিত হইল।

তিনি লিখিয়াছেন যে কালনা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সত্বর উক্ত সমাজবাটীর কবুলতি প্রদান করিয়া সমাজের ব্যবস্থা করিতে লিখিয়াছেন।

স্থির হইল—সমাজবাটীর কবুলতি সম্পাদন করিয়া সমাজের ব্যবস্থা করা হউক।

২৩। মালাবার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রায় সাহেব এ, গোপালম মহাশয়ের ৩০শে জানুয়ারীর পত্র আলোচিত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য মালাবারী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রয়োজন, অর্থাভাবে পারিতেছেন না, তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।

স্থির হইল—বর্ত্তমান বৎসরে সাহায্যের প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না।

২৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে আচার্য্যের কার্য্য করিতে দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে উপাচার্য্যপদে নিযুক্ত করা হউক।

২৫। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক পতিসর মহর্ষি ইনষ্টিটিউট, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মহাশয়গণের প্রেসের দেনা সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

স্থির হইল—উহাঁদের দেনা হিসাব হইতে বাদ দিয়া উহাঁদের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লওয়া হউক।

২৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়কে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাথেয় দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য একটী পৃথক অর্থভাণ্ডার খোলা হউক এবং রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের উপর এই বিষয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করিবার বিশেষ ভার অর্পিত হউক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী। সভাপতি

৬ই ফাল্গুন ১৩২৫।

কুড়ানো গান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক হিন্দী অবলম্বনে)

(১)

প্রাণারাম ভজ না—মনরে দেখ না
সংসার কি কারখানা।
সাধুসঙ্গে সদাই রে রহ
ছাড়িয়া রঙ্গ ছলনা
বাপ মা বল স্ত্রী-পুত্র আর
হবে নাকো কেউ আপনা
ধনদৌলত রূপা সোনা
নাহি কিছু রবে তোর
ধরণী ছাড়িয়া যেতে হবে
ইহা স্মরণে রাখ না
শেষের দিনেতে একা হবে যেতে
এ কথা সবারি জানা
সে সময়ে ওরে ভগবৎ-নাম
হৃদয়ে ধরিতে ভুলো না।

(২)

মুখ রে কি আর দেখ দরপণে
দয়া ধরম তোর নাহি কিছু মনে
হরিনামের তরী করে তাঁরি দেওয়া ঘটে
সাধু যোগী কত হয়ে গেল পার
পাপী ডুবিল জলে।
তিলে তিলে মায়া চলিছে বাড়িয়া
জমা হয়ে বর্ত্তনে
ভাগ্য তব হায় টুটিবে যেদিন
কাকে খাবে যতনে
কাগজের তরী করে ছেড়েছ জলপরে
কত সাধু যোগী হয়ে গেল পার
পাপী ডুবিল জলে।

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০শে চৈত্র রবিবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃসেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।
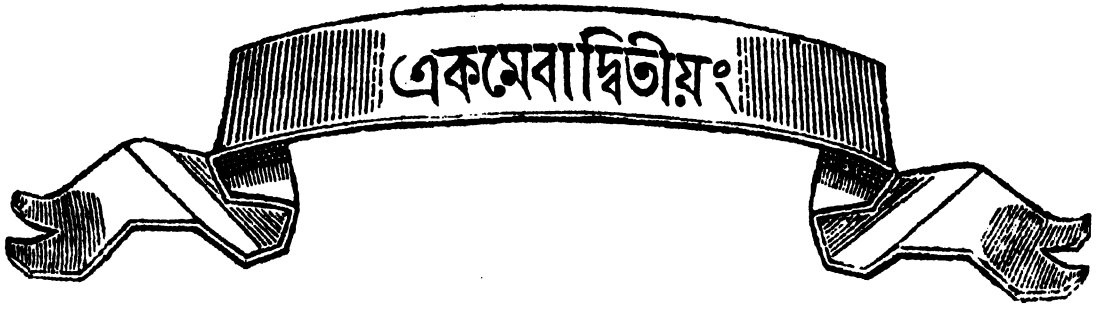
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊনবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮৪০ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৯। সম্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্দ ৫০১৮।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ঊনবিংশ কল্প, চতুর্থ ভাগ।

১৮৪০ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৯।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা"এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে...এর প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খণ্ড ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য-সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	১।৷০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
ব্রহ্মোপদেশ	।০
মাঘোৎসব	।০
দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজনদের সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত)	৶০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্য্যন্ত,) (ভাল বাঁধা)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
হিন্দি ব্রহ্মোপাসনা	৴০

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
পরলোক ও মুক্তি	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
Offering of Srimat Maharshi Devendranath Tagore	" 1 "
The Theist's Prayer Book	" 1 "
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা)	১৸০
অনুষ্ঠান পদ্ধতি	১৲

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু প্রণীত

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (১ম ভাগ)	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা (২য় ভাগ)	৸০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R.A.P. " 4 "
Adi Samaj as a Church	" 4 "
A Reply to the Query "What is Brahmoism,	" 4 "
The Doctrine of Christian Resurrection	" 4 "

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাতসম্ভূত	৶০
সোঽহং ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
আচার্য্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড	।০
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	।০
রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৲

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তত্ত্বনিধি প্রণীত

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি (ভাল বাঁধা)	৸০
রাজা হরিশ্চন্দ্র "	।০
আঁখিজল "	॥০
শ্রীভগবৎ কথা "	৸৶০
আলাপ (ভাল বাঁধা)	১।০
ওঁ পিতা নোঽসি	।০
শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা	।০
বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি	৴০
"মা" (প্রসাদী পদচ্ছায়া)	।০

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা	।০

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ঔপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর)	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৴০

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ)	১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ ভাগ)	১।০

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত

সনেট পঞ্চাশৎ	।০ ।০

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

আমার খাতা	৸০
৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত	৸০

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

গীত পরিচয়	।৶০

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত মঞ্জরী	৫৲

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সঙ্গীত চন্দ্রিকা	২৲

পরলোকগত আচার্য্য ৺বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
ধর্ম্মদীক্ষা	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১ম হইতে ৪র্থ ভাগ	৸৶০
গৃহকর্ম্ম	।০